রবীন্দ্রচেতনায় উপনিষৎ

ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর আশীর্বচন
এবং
ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত
ভূমিকা সম্বলিত।

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়
সংগ্রথিত

প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিকেসন সেলস কনসার্ন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২
ফোন ঃ ৩৪-৪৩৬৭

পরমারাধ্যা পিতামহী ৺সুরেশনন্দিনী দেবী
ও তাঁহার সহোদরা ৺সরলাবালা দেবীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

কেনোপনিষৎ

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

প্রশ্নোপনিষৎ

মহানারায়ণোপনিষৎ

মুণ্ডকোপনিষৎ

পৃষ্ঠা

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

পৃষ্ঠা

ঐতরেয়োপনিষৎ

পৃষ্ঠা

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট

আশীর্বচন

উপনিষৎ সাহিত্য যে কত সমৃদ্ধ তা সাধারণ পাঠকের জানা নাই। ভারতীয় ঋষিদের এই অবদানের গৌরব কিন্তু পৃথিবীর নানা দেশের মনীষিগণের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে আসছে। বৈদিক যুগের অবসানে ভারতীয় চিন্তায়, দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানে ও সাহিত্যে উপনিষদের তত্ত্বগুলির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যদ্যপি বেদান্তদর্শনই উপনিষদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধ তথাপি বিভিন্ন আস্তিক-দর্শনেও উপনিষদের চিন্তাধারার সন্ধান মেলে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগেও উপনিষদের ভাবধারার প্রভাব অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা সকলে অল্পবিস্তর জানেন যে, রবীন্দ্রসাহিত্য উপনিষদের কাছে কত ঋণী। এ কথা বল্লে অত্যুক্তি হবে না যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির মর্মার্থ উপনিষদের আলোকেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কবি অল্প বয়সে উপনিষদের বাণী শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁর পিতৃ-দেবের কাছে; কিন্তু উত্তরজীবনে সাক্ষাৎভাবে অথবা আরো নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁর প্রয়াসও ছিল অশেষ। বর্ত্তমান গ্রন্থকারের কাছে আমাদের ঋণ অনেক। তিনি অত্যন্ত যত্ন করে এবং সাতিশয় অভিনিবেশের দ্বারা রবীন্দ্রসাহিত্যে যেখানে-যেখানে যে-যে উপনিষদের যে-যে ভাবের ছায়া পড়েছে তা সংগ্রহ করে আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। যে কথা আমরা সামান্যভাবে জানতাম, আজ বিশেষ দর্শন করবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এ কাজটি কিন্তু নিছক মামুলী ধরণের নয়। শুধু যে সমগ্র উপনিষৎ-সাহিত্যে প্রবেশ থাকলে এ কাজটি করা সম্ভব হত এমনটা নয়; রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গেও নিখুঁত পরিচয় থাকার ফলে গ্রন্থকারের পক্ষে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থকার তাঁর এই সংগ্রহের মধ্য দিয়ে এ কথাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করেছেন যে, তিনি একজন সহৃদয় সামাজিক। রবীন্দ্রসাহিত্য যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের কাছে এই গ্রন্থখানির যে বিশেষ সমাদর হবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায় আমার আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী; আমি অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে তাঁর দীর্ঘজীবন ও সাহিত্যরুচির প্রতিষ্ঠা কামনা করি।

শ্রীগোপীনাথ শাস্ত্রী

২২৪, শ্যামনগর রোড,
কলিকাতা-৫৫
৩০।৬।৭৫

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনিষদের ওপর গভীর শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু তিনি ছিলেন ঐকান্তিকভাবে একেশ্বরবাদী। তাই উপনিষদের সর্বেশ্বর-বাদ বা শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। তবু উপনিষদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা শিথিল হয় নি। তাই দেখি, ব্রাহ্মধর্মের যে উপাসনা রীতি তিনি প্রবর্তন করেন, তার মধ্যে উপনিষদের কতকগুলি বচন স্থান পেয়েছে। তার মধ্য দিয়ে বাল্যে পারিবারিক প্রার্থনাসভায় রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের সহিত পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু সে পরিচয় ছিল একান্তই বাহ্যিক এবং সেই কারণে তাঁর উত্তরজীবনের চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে নি। তিনি নিজেই বলেছেন : "বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তিদ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব কিছু গ্রহণ করতে পারিনি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো।" (মানুষের ধর্ম. সংযোজন, ১)

পরবর্তীকালে যখন তিনি তরুণ বয়স অতিক্রম করে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসেছেন, তখন দেখি তিনি তপোবনে আশ্রিত প্রাচীন উপনিষদের অধ্যাত্মসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তপোবনের ঋষি এবং উপনিষদে বিধৃত তাঁদের বচন উভয়েই যে তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে।

এরপরে দেখি উপনিষদে নিহিত তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মনকে আরও প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে; এবং ফলে, তিনি যে তার মধ্যে আরও গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন, আমরা তার প্রমাণ পাই। এমনই ত হয়ে থাকে। প্রথমে শ্রদ্ধা আসে; তারপর যার প্রতি শ্রদ্ধা আসে তাকে ভালভাবে জানতে ইচ্ছা করে। এর সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায় 'শান্তিনিকেতনের' ভাষণমালার মধ্যে। এই ভাষণগুলি প্রদত্ত হয় বাংলা ১৩১৫ হতে ১৩২১ সালের মধ্যে। তাতে নিজস্ব কথা যেমন আছে, তেমন উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করে সমর্থনও চাওয়া হয়েছে। যাকে শ্রদ্ধা করি, তার কাছ হতেই আমরা সমর্থন খুঁজি। এমনও ভাষণ আছে যা উপনিষদের ব্যাখ্যার রূপ ধারণ করেছে। এই প্রসঙ্গে 'বিশ্ববোধ' শীর্ষক ভাষণটির বিষয়বস্তু লক্ষণীয়। এই সময়ের মধ্যেই, নোবেল পুরস্কার পাবার অব্যবহিত পূর্বে, তিনি আমেরিকায় নানা স্থানে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ পান। সেখানে তাঁর বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল উপনিষদের বাণীর ব্যাখ্যা। বলা বাহুল্য, এই ভাষণগুলি ইংরাজিতে প্রদত্ত। এদের মধ্যে The Realisation of the Infinite ভাষণটি দ্রষ্টব্য। এটি 'শান্তিনিকেতনের' অন্তর্ভুক্ত 'বিশ্ববোধ' শীর্ষক ভাষণের অনুসরণে কথিত।

সুতরাং এটি অবধারিত সত্য যে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীর সহিত আশৈশব পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তার প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাবিষ্ট হয়ে, তা সযত্নে পাঠ করে, তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। উপনিষদের বাণীর মানুষের মনকে উর্ধ্বমুখী করবার অপরিসীম শক্তির বিষয় অবহিত হয়ে তার প্রচারকের ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তবু একথা বলা হয়ত শক্ত হবে যে উপনিষদের চিন্তা দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। একথা ঠিক যে তাঁর রক্তে বৈদিক ঋষির মনোভাব প্রবাহিত ছিল। তবু মনে হয়, অতিরিক্তভাবে তাঁর নিজস্ব একটি মতিগতি ছিল।

এই দুটি শক্তি পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তাকে রূপ দিয়েছিল।

আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথ এক অবস্থায় উপনিষদের অতি কাছে এসেছেন; পরের অবস্থায় দূরে সরে গেছেন; আবার নিজস্ব চিন্তার পরিণত রূপের মধ্য দিয়ে কাছে চলে এসেছেন। প্রথম জীবনে, প্রকৃতির কবি হিসাবে তিনি সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। তার বহু দ্বারা বিখণ্ডিত বিচিত্র রূপের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্য আবিষ্কার করে, যে শক্তি তার ঐক্য বিধান করছেন, তিনি তাঁকে 'বিশ্বরূপ' বলে বর্ণনা করেছেন। উপনিষদ তাঁকেই ব্রহ্ম বলেছে এবং তাঁর বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে 'আনন্দরূপমমৃতম্' বলেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈদিক পূর্বপুরুষ যে পথে গিয়েছিলেন সেই পথই অনুসরণ করেছেন।

দ্বিতীয় অবস্থায় দেখি, রবীন্দ্রনাথ নিজের মতিগতির পথে এই ব্রহ্মবাদ হতে দূরে সরে এসেছেন। তিনি বিশ্বসত্তাকে শুধু জানতে চান নি, তাঁকে প্রীতির সম্বন্ধে পেতে চেয়েছেন। তাঁর এই আকূতি হতেই 'জীবনদেবতাকে' তাঁর হৃদয়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন। বিশ্বদেবতা নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। তিনি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বৃত্তিকে তৃপ্তি দিতে পারেন নি। 'জীবনদেবতা' ব্যক্তিরূপী সত্তা। তাঁর স্বতন্ত্র প্রকাশ না থাকলেও তিনি ভক্তের মনে অধিষ্ঠিত হয়ে, তাঁর সঙ্গে প্রীতির আদান-প্রদান করতে পারেন। যিনি সসীম, তিনি আনন্দ আস্বাদনের জন্য সীমার মাঝে ধরা দেন। যিনি বিধাতা হিসাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি বন্ধু হয়ে হৃদয়মন্দিরে ধরা দেন। এইভাবে তিনি উপনিষদের ব্রহ্মবাদ হতে দূরে সরে এসেছেন। ব্রহ্মবাদের ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপর একটি বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রথম প্রকাশটি কাজের এবং দ্বিতীয় প্রকাশটি আনন্দের। কাজের প্রকাশের মধ্যে বিশ্বদেবতাকে পাই, আনন্দের প্রকাশের মধ্যে 'জীবনদেবতা'কে পাই। এই জীবন-দেবতা-তত্ত্ব একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব। উপনিষদে তার স্বীকৃতি নাই।

তৃতীয় অবস্থায় দেখি, তাঁর মানবিকতা-তত্ত্বের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার উপনিষদের কাছে সরে এসেছেন। দুই পথে তিনি তাঁর মানবিকতাকে লাভ করে-ছিলেন। একটি হল ধর্মসাধনার পথে, অপরটি হল অখণ্ডবোধের পথে। সাধনার পথে তিনি পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিগ্রহপূজাকে গ্রহণ করেন নি; তিনি পরিবারের নিরাকার রীতিতে একেশ্বরবাদ পরিকল্পিত ঈশ্বরের উপাসনায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এমন একদিন এসেছিল, যখন এই উপাসনা রীতি তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। তিনি বিশ্বের মানুষের মাঝখানে ঈশ্বরের সহিত কর্মযোগের সূত্রে মিলতে চেয়েছিলেন। তাই একদিন অন্ধকার ঘরে অবস্থিত অরূপরতন রাজার সহিত মিলনে তৃপ্তি না পেয়ে তিনি বলেছিলেন, "বিশ্বসাথে যোগে যেথা বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।"

দ্বিতীয় পথটিতে তিনি স্পষ্টতই উপনিষদের চিন্তার অনুসরণ করেছেন। উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্বের উপলব্ধি হতে মানুষে মানুষে একত্ববোধ পরিস্ফুট হয়। সেই বোধ পরিস্ফুট হলে পরার্থে স্বার্থত্যাগ করা সহজ হয়। কাজেই এখানে পাই, অখণ্ড জ্ঞান হতে প্রীতির সঞ্চার এবং প্রীতিবোধ হেতু সর্বজনীন কল্যাণকর্মে উৎসাহ। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান-প্রেম-কর্মতত্ত্ব এই পথের অনুসরণ করেছে। এইভাবে পরিণত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আবার উপনিষদের খুব কাছে ফিরে এসেছে।

এই আলোচনা হতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের চিন্তার অন্ধ অনুগামী ছিলেন না। তিনি স্বাধীন পথে চিন্তা করে, সাধনা করে, তাঁর নিজস্ব তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। এইভাবে অজানিতে তিনি কোথাও উপনিষদের চিন্তার অনুবর্তী হয়েছেন, কোথাও উপনিষদের চিন্তা হতে দূরে সরে এসেছেন। তবে একথা খুবই সত্য তিনি উপনিষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় উপনিষদের চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে নানাভাবে। সেগুলি সম্ভবত নীচে স্থাপিত শ্রেণীগুলির মধ্যে স্থাপন করা যায় :

১। কবিতায়। এখানে দুভাবে তা পাই। প্রথম, সোজাসুজি উপনিষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে; যেমন 'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলিতে। দ্বিতীয়ত, নিজস্ব কবিতায় উপনিষদের ভাবধারার ছায়াপাত ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ একেবারে জীবনের শেষপ্রান্তে রচিত একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> জীবনের দুঃখে শোকে তাপে,
> ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে
> হয়েছে উজ্জ্বল,
> আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
>
> (রোগশয্যায়, ২৫)

২। নিজের ভাষণে বা রচনায় উপনিষদের বাণীর উদ্ধৃতি। এগুলি প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর নিজস্ব চিন্তার সমর্থনে। 'শান্তিনিকেতনে'র ভাষণ-মালায় তার প্রচুর উদাহরণ মিলবে। তাঁর ইংরাজি গ্রন্থেও এই রকম ব্যবহার আছে। যেমন, Personality, Religion of Man।

৩। উপনিষদের বিশেষ মন্ত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা। এখানে স্পষ্টতই নিজের মনোমত ব্যাখ্যাই তিনি দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে উপনিষদের ভাবধারার সঙ্গে বা যে প্রসঙ্গে তা প্রয়োগ করা হয়েছে তার সঙ্গে তার সঙ্গতি মিলবে না। তবে এরকম ব্যাখ্যা ত শংকরাচার্যও করেছেন বলা যায়। এই প্রসঙ্গে 'শান্তি-নিকেতনে'র অন্তর্ভুক্ত 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রের ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যেতে পারে। নিজের মনের মত ব্যাখ্যা দেবার অধিকার তাঁর আছে।

৪। চিঠিপত্রে উল্লেখ। উপনিষদের ভাবধারার সহিত তিনি এত পরিচিত হয়েছিলেন যে চিঠিতেও তার প্রয়োগ এসে পড়ত। এই প্রসঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ এন্ডরুজকে লিখিত চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে।

৫। কথোপকথনে। অনুরূপভাবে কথোপকথনেও নানা সূত্রে উপনিষদের কথা এসে পড়েছে। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' শীর্ষক গ্রন্থে ও ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় তার পরিচয় মিলবে।

শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বর্তমান সংকলন একটি মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় বিক্ষিপ্ত আকারে উপনিষদ সম্বন্ধে যে নানা মন্তব্য ছড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যেই উপনিষদের বাণীর উপর তাঁর নিজস্ব ভাষ্য বিধৃত হয়ে আছে। সেগুলি সংগ্রহ করে একত্র স্থাপন করলে সেই ভাষ্যের পরিচয় সহজে মিলবে। এই উদ্দেশ্যে সংকলক মহাশয় প্রভূত শ্রম স্বীকার করে, সেগুলি বর্তমান গ্রন্থে

স্থাপন করেছেন। দেখা যায়, উপরে যে পাঁচটি শ্রেণী বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে, সেগুলির প্রথমটি ছাড়া, আর সকল শ্রেণী হতে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি চয়ন করে, এখানে স্থাপন করা হয়েছে। প্রথমটি বাদ পড়বার কারণ সম্ভবত সেখানে উপনিষদের আলোচনা প্রত্যক্ষভাবে আসে নি বা যেখানে এসেছে সেখানে তা প্রশস্তিমূলক।

সংকলিত বস্তুর বিন্যাসে সংকলক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উপনিষদের যে বাণীগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনায় সমগ্রভাবে বা অংশত ব্যবহার হয়েছে, তিনি তাদের উপনিষদ অনুসারে ভাগ করেছেন। তারপর তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি স্থাপন করেছেন। এই মন্তব্যগুলি কালানুক্রমে সাজানো। তাতে একটা সুবিধা আছে। এমনও হয়েছে যে একই মন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসে গেছে। তার ফলে উপনিষদের ব্যাখ্যাকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিবর্তন সহজেই নজরে আসবে। প্রতি উদ্ধৃতির নীচে তা কোন গ্রন্থ হতে সংকলিত হয়েছে তার উল্লেখ আছে।

এইসব কারণে আমার মনে হয় বর্তমান সংকলন গ্রন্থটি রবীন্দ্রসাহিত্যপিপাসুদের একটি বড় অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার সহিত যাঁরা নিবিড় পরিচয়ে উৎসুক তাঁদের কাছে এটি বিশেষ সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১লা আষাঢ়, ১৩৮২

অবতরণিকা

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "পঞ্চভূত" গ্রন্থে "কাব্যের তাৎপর্য" শীর্ষক প্রবন্ধে অনুপম ভাষায় বলিয়াছেন, "কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি-অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতশবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতশবাজি"।

উপনিষদ নিঃসন্দেহে একখানি মহান কাব্য ও রবীন্দ্রনাথের মত পাঠক সুদুর্লভ। উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ মণিকাঞ্চনযোগ।

উপনিষদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে সুরু হয় তাঁহার বাল্যকাল হইতে। ১২৭৯ সাল ২৫ মাঘ রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। তখন তাঁহার বয়স এগার বৎসর। উপনয়নের প্রাক্কালে ˚বেচারাম চট্টোপাধ্যায় অনেকদিন ধরিয়া প্রত্যহ রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্ম-ধর্মগ্রন্থে সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইতেন। উপনয়নের অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হিমালয় যাত্রা করেন। সূর্যোদয় কালে মহর্ষি তাঁহার প্রভাতের উপাসনার শেষে রবীন্দ্রনাথকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করিয়া আর-একবার উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও একটি উল্লেখযোগ্য সমাবেশ হইত। উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের সহিত এই পরিবারের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলাদেশে ধর্মসাধনা সাধারণতঃ ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া থাকে; কিন্তু উপনিষদকে আশ্রয় করিয়া মহর্ষিদেব তাঁহার পরিবারে যে উপাসনা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন তাহা সেই ভাবাবেগ হইতে মুক্ত হইয়া শান্ত সমাহিত রূপ লাভ করিয়াছিল। মহর্ষিদেবের অধ্যাত্মজীবনে গভীর পরিবর্ত্তন আসে ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোককে আশ্রয় করিয়া। তাই ঈশোপনিষদ তথা সমগ্র উপনিষদ-সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। ঈশোপনিষদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ২৭ মে ১৯৩৮ সালে শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তীকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে লেখেন, "ঐ উপনিষদটি আমার সব চেয়ে প্রিয়—ওর মধ্যে তত্ত্বের গভীরতা আশ্চর্য গভীর"। প্রখ্যাত দার্শনিক-অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকারকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "উপনিষদের তত্ত্বকে আমি জীবনের সাধনা বলে গ্রহণ করেছি"। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন, "বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ মিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে"।

উপনিষদের শ্লোক রবীন্দ্রনাথের কাছে মন্ত্র মাত্র ছিল না; উপনিষদের দর্শন তাঁহার কাছে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব মাত্রও ছিল না; যে মহর্ষিদেবের জীবনে উপনিষদের মন্ত্র সাধনা ও উপলব্ধি বিষয় ছিল, সেই মহর্ষিদেবের অন্তরঙ্গ সাহচর্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে একটি দুর্লভ সুযোগ বলিয়া মনে করিতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষে উপনিষদের বাণী মানুষকে বল দিয়েছে। কিন্তু সে তো মন্ত্র, ধ্যানের বিষয়। যাঁদের জীবনে রূপ পেয়েছে সেই বাণী তাঁরা যদি আমাদের আপন হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে আসেন তবে সে আমাদের মস্ত সুযোগ। কেননা শাস্ত্রবাক্য তো কথা বলে না, মানুষ বলে"। উপনিষদের মন্ত্র মহর্ষিদেবেরই মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের নিকট

প্রত্যক্ষ ও বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ, এই কথাটি যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সত্য, রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের সম্পর্কেও সেইমত সত্যের সম্ভাবনায় পূর্ণ।

আবাল্যকাল উপনিষদ পাঠ ও আবৃত্তির ফলে রবীন্দ্রনাথের মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে স্বীকার করিতে অভ্যস্ত হয়; সেই পরিপূর্ণতা অবশ্যই বস্তুর নয়, তাহা আত্মার। উপনিষৎ হইতে তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহার জীবনের মহামন্ত্র। উপনিষদের মন্ত্রে জন্মিয়াছিল তাঁহার একাগ্র শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠিত নির্ভরতা। সকল চিত্তবিক্ষোভ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য ও সংসারের সঙ্কীর্ণতা হইতে চিত্তের এক উদার মুক্তিক্ষেত্রে উপনীত হইবার জন্য তিনি উপনিষদের কোন কোন শ্লোককে যেমন একদিকে আশ্রয়ের মত অবলম্বন করিতেন, তেমনই অপরদিকে উপনিষদকে তিনি সর্বধর্মের ভিত্তি বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন।

উপনিষদের মন্ত্র ও সাধনা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব মনস্বিতা ও কবিপ্রতিভার প্রসাদে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেন। উপনিষদের প্রভাব তাঁহার জীবনের মর্মমূলে বাসা বাঁধে, তাঁহার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে। উপনিষদের মন্ত্র-নির্ভর তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা ছিল প্রাণবান ও গতিতে চঞ্চল। তাই, উপনিষদের মন্ত্র বার বার নূতন নূতন তাৎপর্য লইয়া বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মনকে আন্দোলিত করে। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের উপনিষৎ-চেতনা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবকে পাথেয় স্বরূপ অবলম্বন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেও পরিণতিতে সকল প্রভাব-উত্তীর্ণ একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গৌরব লাভ করে। সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন। তাই, তিনি গভীর আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত বলিতে পারিয়াছিলেন, **"উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব"**। এই কথাটিরই সম্প্রসারণ পাই তাঁহার ইংরাজী "Sadhana" গ্রন্থে "Author's Preface"-এ (গ্রন্থকারের ভূমিকায়)। সেখানে তিনি লিখিয়াছেন : "The meaning of the living words that come out of the experiences of great hearts can never be exhausted by any one system of logical interpretation. They have to be endlessly explained by the commentaries of individual lives, and they gain an added mystery in each new revelation. To me the verses of the Upanishads and the teachings of Buddha have ever been things of the spirit, and therefore endowed with boundless vital growth ; and I have used them, both in my own life and in my preaching, as being instinct with individual meaning for me, as for others, and awaiting for their confirmation, my own special testimony, which must have its value because of its individuality.

উপনিষদের প্রভাবের সার্থক প্রত্যুত্তরও রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন আপন স্বকীয় মহিমায়, তাঁহার নিজের ভাষাতেই, "With his own special testimony which must have its value because of its individuality".

উপনিষদের সর্বজনীন আবেদন রবীন্দ্রনাথের উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের গরিমায় একটি স্বতন্ত্র ভাস্বর জোতির্বলয় সৃষ্টি করিয়াছে। সেই জ্যোতিঃ পুনরায় বিকীর্ণ হইয়াছে তাঁহার সমগ্র সাহিত্যকৃতির বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে।

পূর্বতন আচার্যগণের উপলব্ধি হইতে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া আচার্য ⁺ক্ষিতিমোহন সেন লেখেন :

"উপনিষদের বাণী নিয়ে প্রাচীন যুগে বহু আচার্য বহু ভাষ্য লিখে গেছেন। গুরুদেবও 'শান্তিনিকেতন' ও আরও নানা স্থানে উপনিষদের যেসব **নব নব তাৎপর্য** ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে উপনিষদের ভাষ্যকারদের মধ্যে তাঁরও একটা স্থান থাকা উচিত। উপনিষদের বাণী ও কবিগুরু রচিত সেই সব ভাষ্য নিয়ে একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করা যেত। ভারতীয় অনেক বড় বড় পণ্ডিতজন তা চেয়েছিলেন। তা করা যায়নি। এ দুঃখ এখনও আমার মনে আছে।"

[উপনিষদের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায় কোথাও অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন, কোথাও বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা ভাব-সম্প্রসারণ করিয়াছেন; আবার কোথাও কোন মন্ত্র অবলম্বনে তাঁহার নিজস্ব ভাবধারা ও অনুভূতিকে মূল মন্ত্রের সহিত সঙ্গত করিয়া রস-সার্থক ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। শেষের ক্ষেত্রে উপনিষদের মন্ত্র উপলক্ষ্য মাত্র হইয়াছে; তাঁহার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, বিচিত্র চিন্তাশক্তি ও গভীর রসোপলব্ধি অকুণ্ঠ প্রকাশ-গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে।

উপনিষদের মন্ত্র বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে নূতন নূতন অর্থসম্ভারে তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে; সুতরাং তাঁহার রচনার বিভিন্ন স্থানে একই মন্ত্রের আলোচনা আপাতপ্রতীয়মান পুনরুল্লেখ মনে হইলেও অনেক ক্ষেত্রে তাহারা তাঁহার ক্রমাগ্রসর উপলব্ধির পথসূচী বিশেষ। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রসঙ্গ উপলক্ষে একই মন্ত্রের পুনরালোচনা যেখানে অপরিহার্যভাবে আসিয়াছে, সেখানে পূর্বাপর সঙ্গতিগুণে ও রচনার প্রসাদমাধুর্যে পুনরুক্তি কোন গৌরবহানি ত ঘটায় নাই বরং রবীন্দ্রনাথের ভাব উপলব্ধি বুঝিবার পক্ষে সহায়তাই করিয়াছে।]

সুতরাং আচার্য ⁺ক্ষিতিমোহন সেন যেমন বলিয়াছেন, সেইমত রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যে যে-যে রচনা উপনিষদের বিভিন্ন শ্লোকের সহিত আশ্রয়-যোগে যুক্ত তাহাদের একত্রিত করিলে উপনিষদের বিশিষ্ট মন্ত্রগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রভাষ্য গঠন করা যায়। এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে কবি নিজেও সচেতন ছিলেন। শ্রীমতী হেমন্ত বালা দেবীকে ৭ ভাদ্র ১৩৩৮ (ইং ২৪ আগষ্ট ১৯৩১) তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহাতে লেখেন :

("বীরেন্দ্রকিশোরকে পত্রে জানিয়েছিলুম যে তোমাকে যে সব চিঠি লিখেছি, তার থেকে উদ্ধার করে ধর্ম সম্বন্ধে আমার মতটাকে প্রকাশ করব। কিন্তু থাক্। আপাতত তোমার পত্রের মধ্যেই নিহিত রইল। যদি ওর প্রাণশক্তি থাকে তবে কোন এক সময়ে আপনি আবরণ ভেদ করে আবিষ্কৃত হবে—")

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতই বলি বা ধর্ম-উপলব্ধিই বলি, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন উপনিষদের নিকট হইতে এ কথা তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি শ্রীমতী হেমন্ত বালা দেবীকে ৩ আষাঢ় ১৩৩৮ (ইং ১৮ জুন ১৯৩১) তারিখে লেখেন :

"আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে-উপনিষদকে একদা বাংলাদেশের বেদ-বর্জিত নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিল রামমোহন রায়ের জাল-করা, —যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার, **সেই পরম চরিতার্থতা দেউলে দরোগায় নয়, পাণ্ডাপুরোহিতের পদসেবায় নয়।**

যে-য়ুরোপ জ্ঞানকে সংস্কারমুক্ত করে কর্মকে বিশ্বসেবার অনুকূল করেছে সেই য়ুরোপ উপনিষদের মন্ত্রশিষ্য জানুক বা না জানুক।"

রবীন্দ্রনাথ মহাপ্রয়াণ করেন ৭ই আগষ্ট ১৯৪১ সালে। ৩রা মে ১৯৪১ তারিখে তিনি শ্রীমতী নির্মল কুমারী মহলানবিশকে লেখেন : "উপনিষদের সঙ্গে আমার নিরাসক্ত সম্বন্ধ প্রত্যহ নিবিড় হয়ে আসচে"। কবি উপনিষদকে বলতেন, "আমার সখা"।

শ্রীমতী নির্মল কুমারী মহলানবিশ লিখিয়াছেন : "মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আমরা যখন মনে করেছি যে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই, কিন্তু তবুও তাঁর নাৎবৌ শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর ঠোঁটে ফোঁটা ফোঁটা জল দিচ্ছেন আর কানের কাছে মুখ নিয়ে তাঁর প্রতিদিনের ধ্যানের মন্ত্র শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ তাঁকে শোনাচ্ছেন তখন খানিক পরে ডান হাত-খানি কষ্টে উপরে তুলে কোনোমতে কপালে স্পর্শ করবামাত্র প্রাণটা বেরিয়ে গেলো এবং হাতখানি পড়ে গেলো। শেষমুহূর্তেও উপনিষদই তাঁর সঙ্গী।"

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই লিখিয়াছেন "উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের গভীর আত্মিক যোগ ছিল"।

উপনিষদকে আশ্রয় করিয়া সাধক রবীন্দ্রনাথের যে সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁহার বিরাট সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ আছে, অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন উপনিষদের পর-পর শ্লোকের সহিত সঙ্গত করিয়া বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

যদিও মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তথাপি কবিতার ক্ষেত্রে যেখানে উপনিষদ-নির্ভরতা অত্যন্ত সুপ্রত্যক্ষ ও যে সকল ক্ষেত্রে তিনি শ্লোকগুলির সরল অনুবাদ করিয়াছেন, আমি স্থানবিশেষে সেই সকল কবিতা বা কবিতাংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছি। কবিতা ও গানের ক্ষেত্রে, এক এক কবিতা বা গানে একাধিক উপনিষদের মন্ত্রের প্রভাব অনুস্যূত থাকায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া অনুরূপ কার্য একটি স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার পর্যায় পড়ে বলিয়া মনে করি এবং সেইজন্য এই ক্ষেত্রে আমি তাহা হইতে বর্ত্তমানে বিরত হইয়াছি।

আমরা 'শ্রীমতী নির্মল কুমারী মহলানবিশে'র 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি উপনিষদের উপর একমাত্র গীতাঞ্জলির গানেরই কী পরিমাণ নির্ভর, তাহার কথা উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"যখন পুত্রশোকাতুরা মা, কি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে, আমাকে এসে বলে যায় যে আমি তাদের জীবনে শান্তি দিয়েছি, তাই তারা আমাকে এত ভালোবাসে, তখন বুঝি আমার গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়ে আমি আমার বড়ো-আমিকে প্রকাশ করেছি, যার সঙ্গে এই প্রতিদিনের আমিটার অনেক তফাৎ। গীতাঞ্জলি শুধুই যদি কবিতা হতো, তাহলে জনসাধারণের মনে এমন করে স্থান পেতুম না, কারণ কয়জনই বা কবিতা বোঝে? **এই বড়ো জায়গায় মনকে পোঁছে দিতে উপনিষদ আমাকে সাহায্য করেছে।** যুদ্ধের পরে সমস্ত য়ুরোপ মনের একটি আশ্রয় পেতে চাচ্ছে, তাই এরা আমাকে এত ভালোবাসে।"

উপনিষদের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিবার সময় আমি আচার্য শঙ্করের মতানুযায়ী পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রনাথ কোথায় পাঠান্তর গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট হইবে। উদাহরণস্বরূপ, ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে

পারে। আচার্য শংকরের মতে যেখানে পাঠ "ঈশা বাস্যম্", রবীন্দ্রনাথ সেখানে পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন "ঈশাবাস্যম্" (= ঈশা + আবাস্যম্)।

যে যে ক্ষেত্রে পাঠকগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সেখানে বড় হরফে মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছি। রচনাগুলি রচনার কালক্রম অনুযায়ী সাজাইয়াছি। গ্রন্থের শেষে শ্লোকগুলির বর্ণানুক্রমিক সূচী সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনা ছাড়া ইংরাজী Personality গ্রন্থে উপনিষদের নানান শ্লোক, বিশেষতঃ ঈশোপনিষদের প্রায় সকল শ্লোকের আলোচনা আছে। ৺সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মূল গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ-গ্রন্থ ব্যক্তিত্ব; প্রকাশ করিয়াছেন বিশ্বভারতী। আমি এই গ্রন্থ হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমতী মলিনা রায়। বিশ্বভারতী তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তাহা হইতে যথাসংগত অংশ অনেক জায়গায় আহরণ করিয়াছি।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে অনুমতি দান করায় তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ অপরিসীম। তাঁহাদের উদার প্রসন্ন দৃষ্টির জন্যই আমার পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হইল।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এস এ মাসুদ এবং শ্রীরণজিৎ রায়—ইঁহারা সকলে এই বিষয়ে ও অন্যান্য নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আমার প্রতি তাঁহাদের সহৃদয়তার জন্য আমি তাঁহাদের সকলকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীমতী নির্মল কুমারী মহলানবিশের "বাইশে শ্রাবণ" গ্রন্থে, রবীন্দ্রনাথ কথা-প্রসঙ্গে ঈশোপনিষদের ও অন্যান্য উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্র সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথনের অনুলিপি আছে। আমি শ্রীমতী মহলানবিশকে অনুরোধ করা মাত্র তিনি আমাকে উহা উদ্ধৃত করিতে অনুমতি দান করেন। তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

মুদ্রণের কাজ যখন বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন ৺ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত উপনিষদ সম্পর্কে কবির বিভিন্ন উক্তি ও তাঁহার রচিত "দাদূ" গ্রন্থে কবির লিখিত ভূমিকায় উপনিষদের কয়েকটি শ্লোক সম্পর্কে আলোচনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই সকল অংশ বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্র শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হ'ন। তাঁহাকে আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই। কিন্তু গ্রন্থের প্রায় অর্ধেক তখন ছাপা হইয়া যাওয়ায়, প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি "পরিশিষ্ট"-এ যোজিত হইয়াছে। যে অংশ তখনও মুদ্রিত হয় নাই, সে ক্ষেত্রে যথাস্থানে উদ্ধৃতিগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী স্নেহপরবশ হইয়া এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে আশীর্বচন করিয়াছেন; তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

এই গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশনে আমাকে যাঁহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন ও উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন শ্রীসরোজকুমার দাস, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও আমার

মাতুল দীপ্তি প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শ্রীদেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তাঁহাদের সকলের নিকট আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

*সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার এই কার্যে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করেন; তিনি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হ'ন কিন্তু প্রকাশ-আকারে এই গ্রন্থ তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না—এই দুঃখ আমার মনে রহিয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলীর অনুবাদিকা শ্রীমতী মলিনা রায়কে আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

পুস্তকপ্রকাশক মিত্র ও ঘোষকে তাঁহাদের সহযোগিতার জন্য আমার ধন্যবাদ জানাই।

এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন আমার বৈবাহিক মহাশয় শ্রীগিরিজাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই।

সম্প্রতি দেশ পত্রিকায় *প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে পত্রধারা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে এক জায়গায় পাই, 'সংগ্রহ' ও 'সাজানো'—এই দুইটি বিষয় একত্রে বোঝাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'সংগ্রথন' শব্দের ব্যবহার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমি এই গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে 'সংগ্রথিত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি।

এইজাতীয় সংকলন কার্যের সম্পাদনা অত্যন্ত দুরূহ, ত্রুটিবিচ্যুতির সম্ভাবনা পদে পদে। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী রচনা অবলম্বন করিয়া অনুরূপ গ্রন্থ "Upanishad in the Eyes of Rabindra Nath Tagore" প্রণয়ন করিয়া গত জানুয়ারী মাসে অত্যন্ত সংকোচের সহিত উহা প্রকাশ করি। বিশ্বজ্জন সমাজ আমার প্রচেষ্টাকে উদার স্নেহদৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাবন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন। উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা এবং বিনয়কে সম্বল করিয়া আমার এই প্রচেষ্টা। ইহাকে তাঁহারা অনুরূপ প্রীতিসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করিলে আমি আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

তিলে তিলে বহুদিনের যত্নে ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছি। তাহাও পারিয়াছি আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়ের আদ্যন্ত নিরলস পরিশ্রম ও সাগ্রহ সহযোগিতার জন্য। পাণ্ডুলিপি রচনা হইতে প্রুফ সংশোধন পর্যন্ত সকল কাজেই তিনি উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী শান্তা মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপি অনুলেখনে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

মুদ্রাকর রে অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারিগণ শ্রীসোমনাথ রায় ও শ্রীঅরবিন্দ রায় এবং কর্মচারিগণ বিশেষতঃ শ্রীগৌরচন্দ্র সিন্‌হা, শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই গ্রন্থের মুদ্রণ-পারিপাট্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

৮১/১বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৪
১ শ্রাবণ, ১৩৮২

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

ঈশোপনিষৎ

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ ১

ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে,

(অবতরণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড)

ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি বৃহৎ বলিয়া না জানিয়া সংসারকেই বৃহৎ বলিয়া জানে সংসার-যাত্রা সে সহজে নির্বাহ করিতে পারে না,—সংসার তাহাকে রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া নিজের জঠরানলে দগ্ধ করিতে থাকে!

এইজন্য ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা কিছু আচ্ছন্ন জানিবে এবং—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং

তাঁহার দ্বারা যাহা দত্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন তাহাই ভোগ করিবে পরের ধনে লোভ করিবে না।

সংসারযাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বরকে সর্বত্র দর্শন করিবে, ঈশ্বরের দত্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করিবে, লোভের দ্বারা পরকে পীড়িত করিবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে—সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে—সেই ভোগে সে ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করে না—নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না। সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি তবে সংসারসুখের জন্য আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এইজন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে—কারণ সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের সহিত সংসারযাত্রা নির্বাহ সম্ভব হয়।

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮ই মাঘ, ১৩০৭)

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—যে ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্বত্র অনুভব করিবেন উপনিষদের এই অনুশাসন।

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিত সংগ্রহ ২য় খণ্ড, ৮ই মাঘ, ১৩০৭)

যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেই ঋষিরা কী বলিয়াছিলেন? তাঁহারা বলেন, ...

বিশ্বজগতে যাহা কিছু চলিতেছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে, অন্যের ধনে লোভ করিবে না।

ইহার অর্থ এমন নহে যে, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী' এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার পরে সংসারে যেমন ইচ্ছা, তেমনই করিয়া চলা। যথার্থভাবে ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবার অর্থ অত্যন্ত বৃহৎ—সেরূপ করিয়া না দেখিলে সংসারকে সত্য করিয়া দেখা হয় না এবং জীবনকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্—ইহা কাজের কথা; ইহা কাল্পনিক কিছু নহে, ইহা কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণ দ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী স্বদেশী ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

(ধর্মপ্রচার, ধর্ম, ফাল্গুন ১৩১০)

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'—যাহা-কিছু সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে, ধনের দ্বারা নহে, স্বার্থের দ্বারা নহে, আত্মাভিমানের দ্বারা নহে—

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১)

'জগতে যাহা-কিছু সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবে, তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, কাহারো ধনে লোভ করিবে না।'

....

যে শক্তি সহস্র বৎসরকে জয় করিয়াছে, ধনরত্নরাশিকে পরাস্ত করিয়াছে, বাহিরে তাহা দেখিতে কি দীন কি দুর্বল! তাহা একটিমাত্র ক্ষুদ্র শ্লোক, একটিমাত্র ছিন্নপত্র তাহার বাহন—কিন্তু তাহার নিকট মানীর মস্তক নত, ভোগীর ভোগ লজ্জিত, ধনীর ধন ধূলিপুঞ্জ!

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১১ই মাঘ, ১৩১১)

জীবনকে ও জীবনের অবসানকে, কর্মকে ও কর্মের সমাপ্তিকে এইরূপ অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে কথাটি মনে রাখিতে হইবে তাহা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা-কিছু আচ্ছন্ন জানিবে। এবং—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

তিনি যাহা ত্যাগ করিতেছেন, তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি তাহা হইলে সংসারের

বিষ কাটিয়া যায়, তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি-মারামারি থামিয়া যায়।

এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড়ো করিয়া জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবননির্বাহের গোড়াকার কথা। ভারতবর্ষ এই ভূমার সুরেই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজকে বাঁধিয়া মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শরীরকে অপবিত্র বলিয়া পীড়া দিতে চায় নাই, সমাজকে কলুষিত বলিয়া পরিহার করিতে চায় নাই, জীবনকে অনিত্য বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চায় নাই—সে সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা অখণ্ড-পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল।

(ততঃ কিম্‌, ধর্ম, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩)

সেই যে আমাদের ভিতরের মহলটি আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্বদা ধারণ করে আছে বেষ্টন করে আছে, এই অবকাশ তো কেবল শূন্যতা নয়। তা স্নেহে প্রেমে আনন্দে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্ছেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখতে বলেছেন। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সমস্ত কাজকে বেষ্টন করে সমস্ত মানুষকে বেষ্টন করে সর্বত্রই সেই পরিপূর্ণ অবকাশটি আছেন; তিনিই পরস্পরের যোগসাধন করছেন এবং পরস্পরের সংঘাত নিবারণ করছেন। সেই তাঁকেই নিভৃত চিত্তের মধ্যে নির্জন অবকাশরূপে নিরন্তর উপলব্ধি করবার অভ্যাস করো, শান্তিতে মঙ্গলে ও প্রেমে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ অবকাশরূপে তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সর্বদাই জানো। যখন হাসছ খেলছ কাজ করছ তখনও একবার সেখানে যেতে যেন কোন বাধা না থাকে—বাহিরের দিকেই একেবারে কাত হয়ে উল্টে পড়ে তোমার সমস্ত কিছুকেই নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ো না। অন্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাকলে তবেই সংসার আর সংকটময় হয়ে উঠবে না, বিষয়ের বিষ আর জমে উঠতে পারবে না—বায়ু দূষিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠবে না।

(অন্তর বাহির, শান্তিনিকেতন, ৩ ফাল্গুন, ১৩১৫)

আমাদের প্রতি এই সাধনার উপদেশ যে, ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যা কিছু আছে তারই সমস্তকে ঈশ্বরের দ্বারাই আবৃত করে দেখবে। আর-একটা কোনো অতিরিক্ত দেখবার জিনিস সন্ধান বা নির্মাণ করবে না। এই হলেই আত্মা আশ্রয় পাবে আনন্দ পাবে।

এমনি করে তো নিখিলের মধ্যে তাঁকে জানবে। আর ভোগ করবে কী? না, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, তিনি যা দান করেছেন তাই ভোগ করবে। মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং, আর কারও ধনে লোভ করবে না।

এর মানে হচ্ছে এই যে, যেমন জগতে যা কিছু আছে তার সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করে আছেন এইটেই উপলব্ধি করতে হবে তেমনি তুমি যা কিছু পেয়েছ সমস্তই তিনি দিয়েছেন বলে জানতে হবে। তা হলেই কি হবে? না, তুমি যা কিছু পেয়েছ তার মধ্যেই তোমার পাওয়া তৃপ্ত হবে। আরও কিছু যোগ করে দাও এটা আমাদের

প্রার্থনার বিষয় নয়—কারণ সেরকম দিয়ে দেওয়ার শেষ কোথায়? কিন্তু আমি যা-কিছু পেয়েছি সমস্তই তিনি দিয়েছেন এইটেই যেন উপলব্ধি করতে পারি। তাহলেই অল্পেই হবে বহু, তাহলেই সীমার মধ্যে অসীমকে পাব। নইলে সীমাকেই ক্রমাগত জুড়ে জুড়ে বড়ো করে কখনোই অসীমকে পাওয়া যায় না—এবং কোটির পরে কোটিকে উপাসনা করেও সেই একের উপাসনায় গিয়ে পৌঁছোনো যেতে পারে না। জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর অখণ্ড প্রকাশে এবং আমাদের অসংখ্য ভোগের বস্তু সার্থকতা লাভ করেছে তাঁরই দানে। এইটেই ঠিকমতো জানতে পারলে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে কোনো বিশেষ স্থানের কোনো বিশেষ রূপের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয় না। এবং ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্যে কোনো বিশেষ ভোগের সামগ্রীর জন্যে বিশেষভাবে লোলুপ হয়ে উঠতে হয় না।

(অখণ্ড পাওয়া, শান্তিনিকেতন, ১৭ চৈত্র, ১৩১৫)

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্তস্বরূপ—অর্থাৎ এককথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে-কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্তস্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে এই তো আমাদের প্রতি উপদেশ।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

(যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্যন্তই সে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার।)

ভারতবর্ষ এই সাধনার 'পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ, সর্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উদ্বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অনুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়ার মূল্য কী? আপনাকে

দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই—আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা যায়, এইটেই তার মূল্য, এইজন্যই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সংকেত আছে—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই লাভ করো, ভোগ করো। মা গৃধঃ, লোভ ক'রো না।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনও স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হচ্ছে পাপ।

এইজন্যই ত্যাগের প্রয়োজন। (এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এইজন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।) *

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ। কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের সকল কালের, কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অনুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা। লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার—এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। (জগতের সৃষ্টি-কার্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিস, মানুষের জীবনগঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি; এর দ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করছেন। ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে-ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন।)

(তপোবন, শান্তিনিকেতন)

মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাইনে যে এই আদি দম্পতি প্রেমের আনন্দ-প্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদীগিরিঅরণ্যের সঙ্গে নানা লীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে "Beast, bird, insect or worm durst enter none; such was their awe of man."—অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্ত্য কাব্য ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্যেই; ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

(তপোবন, শান্তিনিকেতন)

(যে সৃষ্টিকর্তা সে আপনাকে সর্জন করে; আপনাকে ত্যাগ করেই সে সৃষ্টি করে। এই ত্যাগের শক্তিই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি। এই ত্যাগের শক্তির দ্বারাই মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে। যে-পরিমাণেই সে আপনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে সেই পরিমাণেই সে লাভ করেছে। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টিশক্তি। এই সৃষ্টিশক্তিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। তিনি বন্ধনহীন বলেই আনন্দে আপনাকে নিত্যকাল ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর সৃষ্টি। আমাদের চিত্ত যে-পরিমাণে স্বার্থবর্জিত হয়ে মুক্ত আনন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, সেই পরিমাণে সেও সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণেই তার চিন্তা, তার কর্ম সৃষ্টি হয়ে ওঠে।)

(দুর্লভ, শান্তিনিকেতন)

যাঁরা সংসার থেকে উচ্চ হয়ে উঠে ব্রহ্মের মধ্যে মাথা তুলে সঞ্চরণ করতে শিখেছেন, তাঁদের এই ত্যাগের শক্তিই মুক্তিলাভ করেছে। এই আসক্তিবন্ধনহীন আত্মত্যাগের অব্যাহত শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিক লোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করেন। এই অধিকারের জোরে সর্বত্রই তাঁরা রাজা। এই অধিকারই মানুষের পরম অধিকার। এই অধিকারের মধ্যেই মানুষের চরম স্থিতি। এইখানে মানুষকে 'পারি নে' বললে চলবে না;—চিরজীবন সাধনা করেও এই চরম গতি তাকে লাভ করতে হবে, নইলে সে যদি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হয় তবু তার মহতী বিনষ্টিঃ।

(দুর্লভ, শান্তিনিকেতন)

উপনিষদে আছে—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ অর্থাৎ—জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করিয়া জানিবে। আমরা তাহাই

করি না বলিয়া সংসার একেবারেই আমাদের মর্মস্থানের উপরে চাপিয়া পড়িয়া আমাদিগকে বেদনা দেয়।

(আমাদের অন্তর বাহির সমস্তই যখন তাঁহার দ্বারা আবৃত বলিয়া জানি তখন মাঝখানে তিনি থাকেন—বোঝা একেবারে আমাদের মাথায় চাপিয়া পড়েনা আঘাত একেবারে আমাদের বুকে আসিয়া বাজে না। সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও তাঁহাকে চারিদিকে আবির্ভূত বলিয়া অনুভব করিবার সাধনা করিলে তাঁহার সম্মুখে আর সমস্তই মাথা নত করে—যাহা ছোট তাহা ছোট হইয়াই থাকে, যাহা যথার্থ অন্তরের সামগ্রী নহে তাহা বাহিরেই পড়িয়া থাকে। জগতে যিনি সকলের বড় তিনিই আমাদের জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো স্থান অধিকার করিয়া থাকুন—তাঁহাকেই সংসারের চেয়ে ছোট করিয়া ফেলি বলিয়া এত দুঃখ পাই।)

(চিঠিপত্র, ৭ম খন্ড, ২৬ জুলাই, ১৯০৯)

সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। মানবজীবনের সাধনাতেও যাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান তাঁহারাও বাহ্য উপকরণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সংযমকে আশ্রয় করেন। এইজন্য আত্মার সাধনায় এমন একটি অদ্ভুত কথা বলা হইয়াছে : ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে।

(অন্তর বাহির; পথের সঞ্চয়, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯)

মানুষের যে রিপু তাহার কানে মিথ্যামন্ত্র জপ করে লোভ তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য। সে মানুষকে এই কথা বলে, 'তুমি যাহা তাহার মধ্যে সত্য নাই, তাহার বাহিরেই সত্য।'

কিন্তু, উপনিষৎ বলিয়াছেন : মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। কাহারও ধনে লোভ করিয়ো না। অর্থাৎ তোমার সীমার বাহিরে যাহা আছে তাহার পশ্চাতে চিত্তকে ও চেষ্টাকে ধাবিত করিয়ো না।

কেন করিব না ওই শ্লোকে সে কথাটাও বলা আছে। উপনিষৎ বলিতেছেন, তিনিই সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন; অতএব, যাহার মধ্যে তিনি আছেন, যাহা তাঁহার দান, তাহার মধ্যে কোনো অভাবই নাই। নিজের মধ্যে যখন ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করি না তখনই মনে করি, ঐশ্বর্য পরের মধ্যেই আছে। কিন্তু, যে দীনতাবশত ঐশ্বর্যকে নিজের মধ্যে পাই নাই, সেই দীনতাবশতই তাহাকে অন্যত্র পাইবার আশা নাই।

(সীমার সার্থকতা, পথের সঞ্চয়, প্রথম প্রকাশ
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩১৯)

যখন আমি সমস্ত ভোগকে আমার দিকেই টানতে থাকি, যখন অহোরাত্রি সমস্ত জীবন আমি এমন করে চলতে থাকি যেন আমার স্বামী নেই, আমার স্বামীর সংসারকে কেবলই বঞ্চনা করে নিজের অংশকেই সকলের চেয়ে বড়ো করতে চাই, তখনই আমার জীবন আগাগোড়া কলঙ্কে লিপ্ত হতে থাকে, তখন আমি অসতী। তখন আমি সত্যের ধন হরণ করে অসত্যের পূরণ করবার চেষ্টা করি। সে চেষ্টা চিরকালের মতো সফল হতেই পারে না; যা-কিছু কেবল আমার দিকেই টানব তা নষ্ট হবেই, তার বৃহৎ সফলতা স্থায়ী সফলতা হতেই পারে না; তার জন্যে ভয় ভাবনা এবং শোকের অন্ত নেই। অসত্যের দ্বারা সত্যকে আঁকড়ে রাখা কোনমতেই চলে না। ভোগের ফুলের মাঝখানে একটি কীট আছে, সেই কীট আমি এই অসত্য আমি; সে ফুলে ফল

ধরে না। ভোগের তরণীর মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে, সে ছিদ্র আমি এই অসত্য আমি; এ তরণী অতৃপ্তিদুঃখের সমুদ্র কখনোই পার হতে পারে না, পথের মধ্যেই সে ডুবিয়ে দেয়।

সেইজন্যে শুচিতার সাধনা যাঁরা করেন ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা প্রশ্রয় দেন না। কেননা, এই স্বামিবিমুখ আমির উপকরণ যতই জোগাতে থাকি ততই সে উন্মত্ত হয়ে উঠতে থাকে, ততই তার অতৃপ্তিই তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাত করে তাকে প্রলয়ের পথে দৌড় করাতে থাকে। এইজন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই উচ্চ সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ ভোগকে খর্ব করা, সুখের ইচ্ছাকে পরিমিত করা। অর্থাৎ, এমন করে চলা যাতে নিজের দিকেই সমস্ত বোঝা বাড়তে বাড়তে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে সেই দিকটাতেই কাত হয়ে না পড়ি।

(শুচি, শান্তিনিকেতন, আশ্বিন, ১৩১৯)

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখো।......সর্বত্র সকল অবস্থায় আমরা যেন দেখতে পাই তিনি সত্য, জগতের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে তিনি সত্যকেই প্রকাশ করছেন।

(মুক্তির দীক্ষা, শান্তিনিকেতন, মাঘ, ১৩২০)

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো।......উপনিষদের এই মন্ত্র, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে না। এ বাণী দেশে দেশান্তরে নির্ঝরধারার মতো যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে চলতে থাকবে : দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো।

(অগ্রসর হওয়ার আহ্বান, শান্তিনিকেতন, মাঘ, ১৩২০)

লোভ নিজেকেই নিজে ক্ষয় করে, সে যদি দেবত্বের প্রতি লোভ হয়, তাও।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
মলিনা রায়, ২৩ মে, ১৯১৪)

যে পরম ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ বিধৃত ও চালিত, যে পরম ইচ্ছায় সূর্য চন্দ্র তারা নিয়মিত এবং আকাশের অনন্ত আরতিদীপের কোনোদিন নির্বাণ নেই, সেই পরম ইচ্ছার দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আচ্ছন্ন তা উপলব্ধি করো। সব স্পন্দিত তাঁর ইচ্ছার কম্পনে, তাঁর আনন্দের বিদ্যুতে। সেই আনন্দকে দেখো। তিনি ত্যাগ করছেন তাই ভোগ করছি। তিনি ত্যাগ করছেন তাই জীবনের উৎস দশদিকে প্রবাহিত হচ্ছে; আনন্দের নদী শাখায় প্রশাখায় বয়ে যাচ্ছে; ঘরে ঘরে স্বামীস্ত্রীর পবিত্র প্রীতিতে, পিতামাতার গভীর স্নেহে, মাধুর্যধারার অবসান নেই। অজস্র ধারায় সেই জীবন, সেই আনন্দ, সেই প্রেম প্রবাহিত; ভোগ করো, আনন্দে ভোগ করো। আকাশের নীলিমায়, কাননের শ্যামলিমায়, জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে ভোগ করো, পরিপূর্ণরূপে ভোগ করো। মা গৃধঃ। মনের ভিতরে কোনো কলুষ কোনো লোভ না আসুক, পাপের লোভের সকল বন্ধন মুক্ত হোক।

(দীক্ষার দিন, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ, ১৩২১)

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। ভয় নেই; সমস্তই পরিপূর্ণতার দ্বারা আবৃত। মৃত্যুর

উপরে সেই অমৃত। ঈশের দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেখো—সর্বত্র সেই আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হবে, ভয় চলে যাবে। দূর করো সব জালজঞ্জাল, বেরিয়ে এসো।

(আরো, শান্তিনিকেতন, মাঘ, ১৩২১)

সেকালে যতই পূজা, হোম, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান থাকুক-না কেন, সেই-সকলের আবরণ ভেদ করে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্যকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক হচ্ছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

সকলি দেখতে হবে সেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন ক'রে, তাঁর দান ভোগ করতে হবে।

(ভারতপথিক রামমোহন রায়, ১০ আশ্বিন, ১৩২২)

যেহেতু এই জগৎ সীমাহীন ব্যক্তিত্বের জগৎ, সে কারণে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই জগতের সঙ্গে ত্রুটিহীন ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন—ঈশোপনিষৎ এই শিক্ষাই দিয়েছেন। তাই ঈশোপনিষদের সূচনা হয়েছে এই শ্লোকে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

অর্থাৎ আমাদের জানতে হবে এই জগতের নানা গতি নিতান্ত অন্ধগতি নয়; তারা এক মহান্ পুরুষের ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কিত। সত্যের নিছক জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ, কেননা তা ব্যক্তিগত নয়। কিন্তু আনন্দোপভোগ ব্যক্তিগত, এবং আমার উপভোগের ঈশ্বর চলছেন; তিনি ক্রিয়াশীল; তিনি নিজেকে দান করছেন। এই দানক্রিয়ায় অসীম সীমার রূপ ধারণ করেন, এবং সেজন্য এমনভাবে বাস্তব হয়ে ওঠেন যা'তে তাঁর মধ্যে আমি আমার আনন্দকে পাই।

আমাদের যুক্তির আধারে প্রতিভাত জগৎ অদৃশ্য হয়ে যায় ও আমরা তাকে বলি মায়া। এ হল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু আমাদের উপভোগ ইতিবাচক। বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে একটি ফুল কিছুই না, কিন্তু যখন আমরা তা উপভোগ করি তখন ফুল সত্যই ফুল। এই আনন্দ সত্য, কেননা তা ব্যক্তিগত। আর সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন সত্যকে কেবল আমাদের ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে পাই।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঈশ্বরের মধ্যে একের প্রেরণা ঐক্য উপলব্ধির জন্যে অবশ্যই বহুকে চাইরে। প্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সকলের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। ঈশোপনিষৎ বলেছেন : তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। তিনি ত্যাগ করছেন। যখন আমি উপলব্ধি করি তিনি নিজেকে ত্যাগ করছেন, তখন আমি আনন্দ উপভোগ করি। কারণ আমার এই আনন্দ হল নিজেকে তাঁর মধ্যে ত্যাগ করা থেকে উৎপন্ন ভালোবাসার আনন্দ।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যখন ঈশোপনিষৎ আমাদের ঈশ্বরের ত্যাগ উপভোগের শিক্ষা দেন, তখন বলেন : মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

কারণ আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসার পক্ষে বাধা। এ হল সত্যের বিপরীত দিকে গতি, স্বার্থচিন্তা আমাদের শেষ উদ্দেশ্য—এই মায়ার দিকে গতি।

সুতরাং আমাদের আত্মোপলব্ধির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে। নৈতিক দিকে রয়েছে স্বার্থহীনতার শিক্ষা, আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণ; আধ্যাত্মিক দিকে রয়েছে সহানুভূতি ও ভালোবাসা। এদের একত্রে গ্রহণ করাই উচিত; কখনো স্বতন্ত্রভাবে দেখা উচিত নয়। কেবলমাত্র আমাদের প্রকৃতির নৈতিক দিকের চর্চা হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও কাঠিন্যের অন্ধকার রাজ্যে আমাদের নিয়ে যায়, নিয়ে যায় ভালোত্বের অসহ্য দম্ভের পথে। আর কেবল আধ্যাত্মিক দিকের চর্চা আমাদের নিয়ে যায় কল্পনার অসংযমের অন্ধকারতর আমোদের ক্ষেত্রে।

(ঈশোপনিষদের কবির অনুসরণে আমরা সকল বাস্তবতার অর্থে উপনীত হয়েছি, সেখানে সীমার মাধ্যমে অসীম নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। কবিতা বা শিল্পকর্মের মতো বাস্তবতা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। মহান্ পুরুষ তাঁর জগতে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। আর যে ভাবে একটি কবিতার মধ্যে আমি নিজেকে আবিষ্কার করে কবিতাটিকে পাই, সে ভাবে আমি একে আপন করে নিচ্ছি। যদি আমার ব্যক্তিত্ব আমার জগতের কেন্দ্রচ্যুত হয়, তবে এক মুহূর্তেই তা তার সকল গুণ থেকে ভ্রষ্ট হয়। এর থেকে আমি জানি যে আমার জগতের অস্তিত্ব আমার সম্পর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমি জানি যে এক ব্যক্তিগত সত্তা ব্যক্তিগত **আমাকে** এই জগৎ দিয়েছেন। এই দেবার প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের দ্বারা শ্রেণীভুক্ত ও সূত্রবদ্ধ করা যায়, কিন্তু দানকে আবদ্ধ করা যায় না। কারণ দান হল আত্মা থেকে আত্মায়, সুতরাং কেবল আনন্দের মধ্যেই আত্মা একে উপলব্ধি করতে পারে, যুক্তিবিদ্যার দ্বারা একে বিশ্লেষণ করা যায় না।)

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যে প্রকৃতিতে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, তা নিছক অসম্পূর্ণ সত্য, তা মাতৃগর্ভের সত্যের মতোই অসম্পূর্ণ। বরং পূর্ণ সত্য এই যে, আমরা অনন্ত ব্যক্তিত্বের কোলে জন্মেছি। আমাদের সত্য জগৎ জড়পদার্থ ও শক্তির নিয়মের জগৎ নয়; তা হল ব্যক্তিত্বের জগৎ। আমরা যখন তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি, তখনি আমাদের মুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। তখন উপনিষৎ যে-কথা বলেছেন, তা আমরা বুঝতে পারি—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The Second Birth. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই বাইরের জগতে যা-কিছু চলছে সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করে জানবে এবং অন্তরের জগতে যা-কিছু ভোগ করি সে সমস্তকে তারই দান বলে গ্রহণ করবে, বাইরের ধনে লোভ করবে না।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩২৬)

...লোভ যতই বাড়তে থাকে মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু লোভ তো একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্ছে রিপু। রিপুর কর্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধন লাভ করে, বল লাভ করে, সুবিধাসুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে, মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্বল করে।

....

তত্ত্ব কাকে বলে? যিশু বলেছেন : আমি আর্ আমার পিতা এক। এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যে ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

পশ্চিম সভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে. পূর্বেই তার নিন্দা করেছি। কিন্তু, নিন্দাটা কিসের? ঈশোপনিষদে তত্ত্বস্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। ঋষি বলেছেন : মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন করব না? যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। নাইবা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই। ভোগ কোরো না, একথা তো বলা হচ্ছে না। ভুঞ্জীথাঃ, ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। তাহলে সত্যটা কী? সত্য হচ্ছে এই : ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। সংসারে যা-কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা-কিছু চলছে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আরকিছুই না থাকত, তাহলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো সাধনা হত। তাহলে লোভই মানুষকে সবচেয়ে বড়ো চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা। আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়। সাত মাস ধরে আমেরিকায় আকাশের বক্ষবিদারী ঐশ্বর্যপুরীতে বসে এই সাধনার উল্টোপথে চলা দেখে এলেম। সেখানে 'যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, আর 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' সেটাই ডলারের ঘন ধূলায় আচ্ছন্ন। এইজন্যেই সেখানে 'ভুঞ্জীথাঃ' এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে; ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে।

(শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, আশ্বিন, ১৩২৮)

যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এইখানে বিজ্ঞানকে চাই। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্, এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেছেন তখন পূর্ব পশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

(শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, আশ্বিন, ১৩২৮)

'ঈশ্বরের দ্বারা সবকে আচ্ছন্ন করে দেখবে—যা-কিছু আছে যা-কিছু চলছে, ত্যাগের দ্বারা লাভ করবে, লোভ করবে না।'

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৬ মাঘ ১৩২৮)

আমরা চোখে যা দেখছি তা কী? এই যে নানা গতিবেগ পরিবর্তনের মধ্যে যা চলছে ঘটছে, এটাই তো প্রত্যক্ষ। কিন্তু বাহিরের এই গতিকেই মানুষ চরম বলে স্বীকার করে নি। যাঁর দৃষ্টি সত্য হয়েছে তিনি এই চলনশীলতার ভিতর যখন পরিপূর্ণতার আদর্শ দেখেছেন তখন তাঁর চিন্তা, বাক্য, কর্ম সত্য হয়েছে। অন্ধ গতিকে চরম বলে মেনে নিলে জগতে বিরোধের অন্ত থাকে না। মানুষ তাহলে ঘোর অন্ধতার দ্বারা নীত হয়ে চলে, পরস্পরকে বেদনা দেয়।

কিন্তু শুধু ধ্যানের দৃষ্টিতে সত্যকে দেখা এবং সেই ধ্যানের আনন্দে মুগ্ধ থাকাই জীবনের পূর্ণতা সাধন নয়। দীক্ষার মন্ত্র শুধু ধ্যানের মন্ত্র নয়, তা কর্মের মন্ত্র। সত্যের দীক্ষা নিখিলের সঙ্গে চিন্তা, ভাব ও কর্মের সত্য যোগসাধন করে—সেই যোগে কল্যাণ। সেইজন্য এই দীক্ষামন্ত্রের প্রথম অংশে আছে বটে যে বিশ্বজগতে যা-কিছু নিরন্তর চলছে তাকে ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করে উপলব্ধি করো কিন্তু কেবল আন্তরিক উপলব্ধির মধ্যেই মন্ত্রটি থামে নি, তার পরে বলা হয়েছে যে, যে ভোগের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে সেই আকাঙ্ক্ষাকে কোন্ সত্যের দ্বারা নিয়মিত করবে? 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা', ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে—'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। লোভের দ্বারা মানুষ ভোগের যে আয়োজন করে তাতেই অনর্থপাত করে; সেই ভোগ নিজের আত্মাকে অবরুদ্ধ ও অন্যের আত্মাকে পীড়িত করতে থাকে—অবশেষে একদিন প্রলয়ের মধ্যে তার অবসান হয়। তার কারণ যে-লোভ স্বার্থের দিকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে তা সেই বাণীকে অস্বীকার করে যে বাণী জানায় যে, যা-কিছু আছে সমস্তকে এক অনন্ত পুরুষের দ্বারা অধিকৃত বলে জানবে। লোভ ক্রোধ মোহ আমাদের চিত্তের স্বাভিমুখী গতি, তা আমাদের স্বার্থের সীমার দিকে টানে, যিনি সকলকে সর্বত্র অধিকার করে আছেন তাঁর দিকের থেকে ফিরিয়ে আনে। এইজন্য পৃথিবীতে লোভকৃত কর্ম স্বার্থঘটিত চেষ্টা কোনো মহৎকে সৃষ্টি করে না—কেননা সৃষ্টি সেই সত্যের দ্বারাই হয় যা নিঃস্বার্থ আনন্দময়। পূর্ণতার যে প্রেরণা সেই হচ্ছে সৃষ্টির প্রেরণা, সেই হচ্ছে ত্যাগের প্রেরণা। সেই ত্যাগের দীক্ষাই আমাদের সত্য দীক্ষা, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ।'

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩২৮)

একদা প্রিয়জনের মৃত্যুঘটনায় মহর্ষির মনে দীক্ষার প্রথম উদ্‌বোধন জাগে। প্রেম মৃত্যুকে স্বীকার করতে চায় না, সে নিজের মধ্যেই অমৃতলোকের সাক্ষ্য পায়। প্রেম কোনো না-পদার্থকে মানে না—তার নিজের অস্তিত্বই পূর্ণতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য প্রেম যখন মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়ায় তখন তার সম্মুখে মৃত্যুই অমৃতলোকের বার্তা বহন করে, সে বলে, 'না-পদার্থ কোথাও নেই, সমস্তই পরিপূর্ণতার মধ্যে।' এই কথাই ঋষির বাণী অবলম্বন করে দীক্ষামন্ত্ররূপে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' এই দীক্ষাবাণী নিয়ে বিশ্বজগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখতে পাওয়াই তো অমৃতলোককে উপলব্ধি করা। এই পূর্ণতার উপলব্ধি দ্বারাই মানুষ ত্যাগের সাধনা গ্রহণ করতে পারে। সেইজন্যে যে-মন্ত্রের প্রথম অংশে পরিপূর্ণতার কথা আছে সেই মন্ত্রেরই দ্বিতীয় অংশে আছে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং।' অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপকে যিনি জেনেছেন, তাঁর আনন্দ ভোগের দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারা। পূর্ণই যে সত্য এ কথা ত্যাগের দ্বারাই আমরা বুঝি। এই বুঝেই আমাদের মুক্তি। ওই মন্ত্রে আছে 'মা গৃধঃ',

লোভ কোরো না। কেননা, লোভ যে বন্ধন। সেই বন্ধন থেকেই যত যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি। সকল পাপের মূলে এই লোভ। লোভ অসীমকে অস্বীকার করে, সংকীর্ণের মধ্যেই আত্মাকে বদ্ধ করতে চায়।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩২৯)

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

সেই পূর্ণস্বরূপের দ্বারা সকল চরাচর পূর্ণ হয়ে রয়েছে, ত্যাগের দ্বারা নয়। আপনাকে যখনই সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতে পারবে তখনই বেঁচে যাবে—অমৃতকে লাভ করবে।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩৩০)

আমি যখন টাকা করতে চাই তখন আমার টাকা করবার নানা প্রকার চেষ্টা ও চিন্তার মধ্যে একটি ঐক্য বিরাজ করে। বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে একটিমাত্র লক্ষ্যের ঐক্য অর্থকামীকে আনন্দ দেয়। কিন্তু এই ঐক্য আপন উদ্দেশ্যের মধ্যেই খণ্ডিত, নিখিলের সৃষ্টিলীলার সঙ্গে যুক্ত নয়। ধনলোভী বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে খাবলে নিয়ে আপন মুনফার মধ্যে সঞ্চিত করতে থাকে। অর্থকামনার ঐক্য বড়ো ঐক্যকে আঘাত করতে থাকে। সেইজন্যে উপনিষদ যেখানে বলেছেন, নিখিল বিশ্বকে একের দ্বারা পূর্ণ করে দেখবে, সেইখানেই বলেছেন, মা গৃধঃ—লোভ করবে না। কারণ, লোভের দ্বারা একের ধারণা থেকে, একের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। লোভীর হাতে কামনার সেই লণ্ঠন যা কেবল একটি বিশেষ সংকীর্ণ জায়গায় তার সমস্ত আলো সংহত করে; বাকি সব জায়গার সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য গভীর অন্ধকারে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। অতএব লোভের এই সংকীর্ণ ঐক্যের সঙ্গে সৃষ্টির ঐক্যের, রসসাহিত্য ও ললিতকলার ঐক্যের সম্পূর্ণ তফাত। নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে হয় রস। লক্ষপতি টাকার থলি নিয়ে ভেদ ঘোষণা করে; আর গোলাপ নিখিলের দূত, একের বার্তাটি নিয়ে সে ফুটে ওঠে। যে এক অসীম, গোলাপের হৃদয়টুকু পূর্ণ করে সেই তো বিরাজ করে।

(তথ্য ও সত্য, সাহিত্যের পথে, ভাদ্র ১৩৩১)

কলাসৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ করবার সমস্যা হচ্ছে—রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা, অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন করে দেখা, ঈশোপনিষদের সেই বাণীটিকে গ্রহণ করা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত করে দেখা এবং 'মা গৃধঃ'—লোভ কোরো না—এই অনুশাসন গ্রহণ করা। সৃষ্টির তত্ত্বই এই; জগৎসৃষ্টিই বল, আর কলাসৃষ্টিই বল। রূপকে মানতেও হবে, নাও মানতে হবে, তাকে ধরতেও হবে, তাকে ঢাকতেও হবে। রূপের প্রতি লোভ না থাকে যেন।

(সৃষ্টি, সাহিত্যের পথে, কার্তিক ১৩৩১)

গীতায় আছে, কর্মের বিশুদ্ধ মুক্তরূপ হচ্ছে তার নিষ্কামরূপ। অর্থাৎ, ত্যাগের দ্বারা নয়, বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধ রূপ আছে, সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয় "মা গৃধঃ", লোভ কোরো না।

(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫)

যাহা অনন্ত সত্য, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি, তাহা অনন্ত গতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এই জন্য সকল প্রকাশের মধ্যেই দুই দিক আছে। তাহা একদিকে বদ্ধ, নতুবা প্রকাশই হয় না, আর একদিকে মুক্ত, নতুবা অনন্তের প্রকাশ হইতে পারে না। একদিকে তাহা হইয়াছে আর একদিকে তাহার হওয়া শেষ হয় নাই, তাই সে কেবলি চলিতেছে। এইজন্যই জগৎ জগৎ, সংসার সংসার। এইজন্য কোনো বিশেষ রূপ আপনাকে চরমভাবে বদ্ধ করে না—যদি করিত তবে সে অনন্তের প্রকাশকে বাধা দিত।

তাই যাঁহারা অনন্তের সাধনা করেন, যাঁহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহাদিগকে বারবার একথা চিন্তা করিতে হয়, চারিদিকে যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি ইহাই চরম নহে, স্বতন্ত্র নহে, কোনো মুহূর্তেই ইহা আপনাকে আপনি পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতেছে না—যদি তাহা করিত তবে ইহারা প্রত্যেকে স্বয়ম্ভূ স্বপ্রকাশ হইয়া স্থির হইয়া থাকিত। ইহারা অন্তহীন গতি দ্বারা যে অন্তহীন স্থিতিকে নির্দেশ করিতেছে সেইখানেই আমাদের চিত্তের চরম আশ্রয় চরম আনন্দ।

অতএব আধ্যাত্মিক সাধনা কখনই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গোচর যে কোন বস্তু আপনাকেই চরম বলিয়া স্বতন্ত্র বলিয়া ভান করিতেছে, সাধক তাহার সেই ভানের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে চায়। ভেদ করিতেই পারিত না যদি এই সমস্ত নাম রূপের আবরণ চিরন্তন হইত। যদি ইহারা অবিশ্রাম প্রবহমান ভাবে নিয়তই আপনার বেড়া আপনিই ভাঙিয়া না চলিত তবে ইহারা ছাড়া আর কিছুর জন্য কোনো চিন্তাও মানুষের মনে মুহূর্ত-কালের জন্য স্থান পাইত না—তবে ইহাদিগকে সত্য জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতাম—তবে বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই সমস্ত অচল প্রত্যক্ষ সত্যের ভীষণ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া একেবারে মূক হইয়া মূর্ছিত হইয়া থাকিত। ইহার পিছনে কিছুই দেখিতে পাইত না। কিন্তু, সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলি চলিতেছে বলিয়াই, সারি সারি দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি।

(রূপ ও অরূপ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

চলমান জগতে যা কিছু চল্‌চে সমস্তকেই অধিকার করে পূর্ণস্বরূপ আছেন অতএব, মা গৃধঃ, লোভ কোরো না—এই হোলো ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক। পূর্ণকে উপলব্ধি করতে যদি চাই তবে কোনো একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ করাই লোভ এবং ব্যর্থতা, তাকে বিষয়সুখই বলি আর আধ্যাত্মিক আনন্দই বলি। এই হোল আমার নিজের কথা। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান দর্শন লোকসেবা সব দিকেই নিজেকে মুক্তি দেওয়ার দ্বারাই পূর্ণকে উপলব্ধি করব—চিত্তে তাঁর বিচিত্র প্রকাশের পথকে সব জানলার যোগেই খুলে রেখে দেব তবেই আমার মনুষ্যত্ব সার্থক হবে। য়ুরোপের সাধকেরা যে মুক্তির পথে অসীম অধ্যবসায়ে মানুষের সহায়তা করছে তাকে আমি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেচি, আবার ভারতীয় সাধকেরা আপনার মধ্যে আত্মজ্যোতিদর্শনের যে সাধনাকে গ্রহণ করেচেন তাকেও আমি প্রণাম করে মেনে নিই। এই উভয়ের মধ্যে জাতিভেদ ঘটিয়ে যদি পংক্তি বিভাগ করি, এবং এক পাশ ঘেঁষে সমস্ত জীবন কেবল শুচিবায়ুর চর্চা করি তাহলে কৃপণের গতি লাভ করব।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ২৭ জুলাই ১৯৩১)

ঈশোপনিষদে এক ঈশ্বরের কথা আছে—তিনি সর্বভূতকে অনন্তকাল ব্যাপ্ত করে আছেন,

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ২১ অক্টোবর ১৯৩১)

যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার ব'লে সকলের মধ্যে জানা যে-পরিমাণে আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি। মানুষের রিপু মাঝখানে এসে এই সোঽহম্ উপলব্ধিকে দুই ভাগ করে দেয়, একান্ত হয়ে ওঠে অহম্।

তাই উপনিষদ বলেন, মা গৃধঃ—লোভ কোরো না। লোভ বিশ্বের মানুষকে ভুলিয়ে বৈষয়িক মানুষ করে দেয়। যে-ভোগ মানুষের যোগ্য তা সকলকে নিয়ে, তা বিশ্বভৌমিক, তা মানুষের সাহিত্যে আছে, শিল্পকলায় আছে, তাই প্রকাশ পায় মানুষের সংসারযাত্রায় তার হৃদয়ের আতিথ্যে।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

বার বার নিজেকে বলেছি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ। আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে—যা রয়েছে তোমার চারদিকে তারই মধ্যে চিরন্তন—লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়; তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা, আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী; রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেখানেই তাঁর সত্য প্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

(রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রথম খণ্ডের অবতরণিকা)

উপনিষদের আর একটা মন্ত্রও এইরকম আছে, যেটা সম্বন্ধে আমার বার বার মনে হয়েছে যে একটু বুঝিয়ে না দিলে তার মানেটা ঠিক পরিষ্কার হয় না। সেটা হচ্ছে, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ ধনম্।' হঠাৎ শুনেই শ্লোকটা কি রকম খাপছাড়া ঠেকে,—ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদিত করো, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো, কারও ধনে লোভ কোরো না—এটা কি যথেষ্ট পরিষ্কার হল? প্রথম লাইনটা তো বুঝলুম, কিন্তু দ্বিতীয়টা? ত্যাগের দ্বারা ভোগ কি করে করবো, ত্যাগ এবং ভোগ একই সঙ্গে কি করে সম্ভব? কিন্তু যদি একটু ভেবে দেখো, দেখবে মানেটা খুবই পরিষ্কার। যেই ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎসংসারকে আচ্ছাদিত দেখা সম্ভব হবে, অমনি আর ছোটো জিনিসের মধ্যে মন আবদ্ধ থাকতে চাইবে না। মন তখন আপনিই সব বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে উঠবে। তাই ভোগ যখন করবো, তখনও ভোগের বস্তু সম্বন্ধে আসক্ত হয়ে পড়বো না। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার মানেই হল তাই। আসক্তি যদি না থাকে, তাহলে যে-কোনো মুহূর্তের যে-কোনো বস্তু ত্যাগ করা সম্ভব। তাই বলেছে 'মা গৃধঃ।' এইটাই হল সবচেয়ে বড় উপদেশ যে, লোভ কোরো না। এই পরের ধনে লোভ এবং নিজের ধনে

আসক্তি নিয়েই তো যত অশান্তি, যত হানাহানি। কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে প্রথমেই 'ঈশাবাস্যমিদম্‌ সর্বম্‌' বলে। আগে সেইটে অভ্যাস করতে হবে। তারপরে সবটাই সহজ, কারণ যার জীবনে, সমস্ত জগৎসংসারকে, প্রতি তুচ্ছ বস্তুকেও ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখা সম্ভব হয়েছে, তার আর ভাবনা কি? সে সব-কিছুর মধ্যে থেকেও সব-কিছুকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তখন মনে কোনো আসক্তি থাকে না, লোভ থাকে না, একেবারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। এই লোভ এবং আসক্তিই তো মানুষকে পরাধীন করেছে। তাই মানুষ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে চায়। কিন্তু উপনিষদ তো সন্ন্যাসী হতে বলেননি। সব-কিছুর মধ্যেই নিরাসক্তভাবে বাস করতে বলেছেন, লোভকে একেবারে সম্পূর্ণ বর্জন করে। আসক্তি এবং লোভকে কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়ে যায়, যদি গোড়াকার উপদেশটা জীবনে সাধনা করি 'ঈশাবাস্যমিদম্‌ সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' নইলে সংসার ত্যাগ করলেও আসক্তি আমাকে ত্যাগ করে না। সন্ন্যাসীর জীবনেও নিজের ছোটো-আমিকে বড়ো করে তোলবার লোভ হয়। তখন সে গুরু হয়ে বসে, নিজের শিষ্যের সংখ্যা বাড়াবার দিকে মন দেয়, ধর্মকে নিয়ে কেনা-বেচা শুরু করে, আরো কত কি। সে আসক্তি কি গৃহীর আসক্তির চেয়ে কম? 'মা গৃধঃ' তখন তার কানে পৌঁছয় না। এই জন্যে বুদ্ধদেবও এই লোভকেই একেবারে জড়সুদ্ধ নষ্ট করতে বলেছেন। মনকে একেবারে আসক্তিমুক্ত করা বড়ো সহজ কথা নয়, তবে একেবারে যে অসম্ভব তাও নয়—এটা আমি নিজের জীবনে দেখেছি। কিন্তু প্রতিনিয়ত এর জন্যে চেষ্টা করতে হয়। নিজের ছোটো-আমিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সেই বড়ো-আমির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারলে সে ভারি আরাম। তখন আর কিছুই মনকে বিচলিত করতে পারে না। তাই আমি প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠে চুপ করে বসে নিজের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করি। এক-একদিন পারিনে, শক্ত হয়। কিন্তু আবার কোনো-কোনো দিন দেখি ফস্‌ করে বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেছে। যেন স্পষ্ট দেখতে পাই আমার ছোটো-আমিটা ঐ দূরে আলাদা হয়ে বসে রয়েছে, যাকে তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলো সেই মানুষটা। সেই লোকটা অতি তুচ্ছ। তার রাগ আছে, ক্ষোভ আছে, আরো কত ক্ষুদ্রতা আছে, সে অতি সাধারণ একটা মানুষ, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে সে চঞ্চল হয়; কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি তার চেয়ে অনেক বড়ো। আমাকে ছোটো সুখ-দুঃখ নিন্দা-প্রশংসা স্পর্শ করে না, আমার মনের গভীর শান্তির ব্যাঘাত কেউ করতে পারে না, আমি যেন নিজেকে সেই বিরাটের মধ্যে বিলীন দেখতে পাই। এটার জন্যে কি কম চেষ্টা করতে হয়—প্রতিদিন ক্রমাগত চেষ্টা করতে করতে তবে সহজ হয়ে আসে।

(ওঁ পিতা নোঽসি, বাইশে শ্রাবণ, শ্রীমতী নির্মল কুমারী মহলানবিশ;
বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০)

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥ ২

কর্ম করিয়া শত বৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে,—হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই, কর্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮ মাঘ ১৩০৭)

কর্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না—কিন্তু ঈশ্বর সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ইহাই স্মরণ করিয়া কর্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া কর্ম করিতে হইবে।

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮ মাঘ ১৩০৭)

জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। সেইরূপ সর্বাঙ্গীণভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার—আমাদের এই কর্মক্ষেত্র; ইহাই আমাদের ধর্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির। এখানে জগৎমণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান, জগৎসৌন্দর্যের ভোগে ঈশ্বরের ভোগ এবং জগৎসংসারের কর্মে ঈশ্বরের কর্ম জড়িত রহিয়াছে;—সংসারের সেই জ্ঞান সৌন্দর্য ও ক্রিয়াকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে অন্তরতর করিয়া জানা যায় এবং সংসারযাত্রাও কল্যাণকর হইয়া উঠে। তখন ত্যাগ এবং ভোগের সামঞ্জস্য হয়, কাহারও ধনে লোভ থাকে না, অনর্থক বলিয়া জীবনের প্রতি উপেক্ষা জন্মে না, শতবর্ষ আয়ু যাপন করিলেও পরমায়ুর সার্থকতা উপলব্ধি হয়—

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮ মাঘ ১৩০৭)

গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।......

এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধাবিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।

(ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ, ভাদ্র ১৩০৯)

সংসারের মধ্যেই যদি সংসারের শেষ দেখি, তবে দুঃখকষ্টের পরিমাণ অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে? কেনই বা বহন করিবে? কিন্তু যেমন নদীর এক প্রান্তে পরমবিরাম সমুদ্র, অন্যদিকে সুদীর্ঘতটনিরুদ্ধ অবিরাম যুধ্যমান জলধারা, তেমনি আমাদেরও যদি একই সময়ে একদিকে ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্রাম ও অন্যদিকে সংসারের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে, তবে এই গতির কোনোই তাৎপর্য থাকে না, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অদ্ভুত উন্মত্ততা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি। শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ।

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মাণি সমর্পয়েৎ।*

যে যে কর্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

ইহাতে একইকালে কর্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে একদিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্যদিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয়, সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি।

প্রেম তো কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব যদি একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জন দিতাম কী? তবে ভক্তি তাহার সার্থকতা লাভ করিত কেমন করিয়া? সংসারেই আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে,— যখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের— সে কর্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিক্ষণেই মুক্তিলাভ করিতেছে —এক পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহার বিচিত্র কর্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানা দুঃখের এক আনন্দ-অবসান,—ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম করিব, সকল কর্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম এবং মুক্তি একই কথা হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত দুঃখের ঝংকার একটি আনন্দ-সংগীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রেম যাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয়, ততই তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ দুঃখের দ্বারাই সম্পূর্ণ—প্রীতিমাত্রই কষ্ট দ্বারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্রমাণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে, তখন আমাদের সংসারধর্ম দুঃখক্লেশের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা আমাদের প্রেমকেই প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে, অলংকৃত করিবে; ব্রহ্মের প্রতি আমাদের আত্মোৎসর্গকে দুঃখের মূল্যেই মূল্যবান করিয়া তুলিবে।

(মনুষ্যত্ব, ধর্ম, ১৩১০)

মানুষকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন এবং সম্পূর্ণ কর্মের প্রয়োজন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়, কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসে।

(ততঃ কিম্, ধর্ম, অগ্রহায়ণ ১৩১৩)

কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেননি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতে হতেই পারে না।

(কর্ম, শান্তিনিকেতন, ২৭ পৌষ ১৩১৫)

কর্ম দুই রকমে হয়—এক অভাবের থেকে হয়, আর প্রাচুর্য থেকে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে হয় বা আনন্দ থেকে হয়।

* (মহানির্বাণ তন্ত্র ৮, ২৩)

প্রয়োজন থেকে অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দের থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।

এইজন্য আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া—আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে।

(কর্ম, শান্তিনিকেতন, ২৭ পৌষ ১৩১৫)

আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয় তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগের একটি লৌকিকরূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসার-কর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য, সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হত তা হলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন।

আমাদের কর্মক্ষেত্র এই কর্মযোগের যদি তপোবন হয় তবে কর্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন হয় না। তাহলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্মের দ্বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন আমরাও তেমনি কর্মের দ্বারাই কর্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে—মৃত্যুং তীর্ত্বা—অমৃতকে লাভ করি।

এইজন্যই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং ঈর্ষাদ্বেষ লোভক্ষোভের বিষনিঃশ্বাসে তিনি জর্জরিত হতে থাকবেন, তিনি—যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তা হলে, সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন—কারণ কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না আনন্দসাধনরূপেই জানেন—আমরাও তেমনি কর্মের আসক্তি দূর করে কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করে, কর্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারব—এবং যে আনন্দ আকাশে না থাকলে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ—কেই বা কিছুমাত্র চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ ধারণ করত। জগতের সেই সকল চেষ্টার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেষ্টাকে যুক্ত করে জেনে আমরা কোনো কালেও এবং কাহা হতেও ভয় প্রাপ্ত হব না।

(কর্ম, শান্তিনিকেতন, ২৭ পৌষ ১৩১৫)

বুদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনা বর্জনের শিক্ষা; গীতাতেও বলছে, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এই সকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগৎকে মিথ্যা বলে কল্পনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উল্টো।

যে-লোক আপনাকেই বড়ো করে চায় সে আর-সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়ে বদ্ধ, বাকি সমস্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয় তো নিষ্ঠুর। এর কারণ এই, প্রভুত্বে কেবল তারই

রুচি যে-ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকেই সত্যতম ব'লে জানে, বাসনার বিষয়ে তারই রুচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য আর সমস্তই মায়া। এই সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাদী।

মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহংকার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে, তখনই সে বড়ো হতে শুরু করে। কিন্তু সেই বড়ো হবার মূল্যটি কী? নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে অহংকারকে খর্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্যে, সামাজিক হবার জন্যে, স্বাদেশিক হবার জন্যে মানুষকে শিশুকাল থেকে কী সাধনাই না করতে হয়। তার যে-সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড়ো ক'রে পরকে আঘাত করে তাকে কেবলই খর্ব করতে হয়। তার যে-সকল হৃদয়-বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা এবং চর্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধে মানুষ একদিকে যতই বড়ো হয় অন্যদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়। ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। একেই ত বলে বীতরাগ হওয়া। এই জন্যেই মহত্ত্বের সাধনা মাত্রই মানুষকে বলে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। বলে, মা গৃধঃ।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ যেমন মাৎলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যাঁরা কর্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু এই কথা মনে রাখতে হবে, নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করছে; তাই যদি না হত তা হলে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে—মানুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, আপনাকেই নানা দিক থেকে দেখতে পাচ্ছে।

এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মতো ভয়ংকর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের প্রয়াস। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাইরে আকারগ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের আত্মাও অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে

মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলই কর্মসৃষ্টি করছে। যে কর্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয়, তাকেও কেবলই সে তৈরী করে তুলছে। কেননা, সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈরি করে তখন কুরূপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্যকে মুক্ত করে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন করে অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তি দান করে সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করে না। এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্যকে, মঙ্গলকে, নিজের আত্মাকে, নানাবিধ কর্মের ভিতরে কেবলই বন্ধনমুক্ত করে দিচ্ছে। যতই তাই করছে ততই আপনাকে মহৎ করে দেখতে পাচ্ছে; ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

উপনিষৎ বলেছেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্বল মুহ্যমানভাবে বলেন না—জীবন দুঃখময় এবং কর্ম কেবলই বন্ধন। দুর্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্বেই খসে যায় তাঁরা তেমন নন। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়ছি নে। তাঁরা সংসারের মধ্যে কর্মের মধ্যে আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছা করেন। দুঃখ তাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখদুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্ম্যকে উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটিত করে আপনাকে দেখেন এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মতো সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান। বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙাগড়ার মধ্যে লীলা করছে—তারই নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে; তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দ, সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তর-বাহিরকে সুধাময় করে তোলে। তাঁরাই বলেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কাজ করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে।

(কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

মানুষের মধ্যে এই-যে জীবনের আনন্দ, এই-যে কর্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। এ কথা বলতে পারব না এ আমাদের মোহ, এ কথা বলতে পারব না যে একে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনোই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের নিরন্তর কর্ম-চেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্যদৃষ্টিতে দেখো। যদি তা দেখ তা হলে কর্মকে কি কেবল দুঃখের রূপেই দেখা সম্ভব হবে। তা হলে আমরা দেখতে পাব কর্মের দুঃখকে মানুষ বহন করছে এ কথা তেমন সত্য নয় যেমন সত্য কর্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করছে, বহু ভার লাঘব করছে। কর্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেলছে, অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা

সত্য নয় যে মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম করছে—তার একদিকে দায় আছে, আর-এক দিকে সুখও আছে; কর্ম একদিকে অভাবের তাড়নায়, আর-এক দিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এই জন্যেই মানুষ যতই সভ্যতার বিকাশ করছে ততই আপনার নূতন নূতন দায় কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ততই নূতন নূতন কর্মকে সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করছে। প্রকৃতি জোর করে আমাদের কতকগুলো কাজ করিয়ে সচেতন করে রেখেছে, নানা ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় আমাদের যথেষ্ট খাটিয়ে মারছে। কিন্তু, আমাদের মনুষ্যত্বের তাতেও কুলিয়ে উঠল না। পশুপক্ষীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে যে কাজ করতে হচ্ছে তাতেই সে চুপ করে থাকতে পারলে না; কাজের ভিতর দিয়ে ইচ্ছা করেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। মানুষের মতো কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরী করতে হয়েছে। এখানে কতকাল থেকে সে কত ভাঙছে গড়ছে, কত নিয়ম বাঁধছে কত নিয়ম ছিন্ন করে দিচ্ছে, কত পাথর কাটছে কত পাথর গাঁথছে, কত ভাবছে কত খুঁজছে কত কাঁদছে। এই ক্ষেত্রেই তার সকলের চেয়ে বড়ো বড়ো লড়াই লড়া হয়ে গেছে। এইখানেই সে নব নব জীবন লাভ করেছে। এইখানেই তার মৃত্যু পরম গৌরবময়। এইখানে সে দুঃখকে এড়াতে চায় নি, নূতন নূতন দুঃখকে স্বীকার করেছে। এইখানেই মানুষ সেই মহৎতত্ত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারি দিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্তমানের চেয়ে অনেক বড়ো—এইজন্যে কোনো-একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তার আরাম হতে পারে, কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়। সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না। এইজন্যই, তার বর্তমানকে ভেদ করে বড়ো হবার জন্যই, এখনও সে যা হয়ে ওঠেনি তাই হতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলই বারবার দুঃখ পেতে হচ্ছে। সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব। এই কথা মনে রেখে, মানুষ আপনার কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করে নি, কেবলই তাকে প্রসারিত করেই চলেছে। অনেক সময় এতদূর পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে যে কর্মের সার্থকতাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, কর্মের-স্রোতে-বাহিত আবর্জনার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানবচিত্ত এক-একটা কেন্দ্রের চারদিকে ভয়ংকর আবর্ত রচনা করছে—স্বার্থের আবর্ত্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত্ত, ক্ষমতাভিমানের আবর্ত্ত। কিন্তু, তবু যতক্ষণ গতিবেগ আছে ততক্ষণ ভয় নেই; সংকীর্ণতার বাধা সেই গতির মুখে ক্রমশই কেটে যায়, কাজের বেগই কাজের ভুলকে সংশোধন করে। কারণ, চিত্ত অচল জড়তার মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেই তার শত্রু প্রবল হয়ে ওঠে, বিনাশের সঙ্গে আর সে লড়াই করে উঠতে পারে না। বেঁচে থেকে কর্ম করতে হবে, কর্ম করে বেঁচে থাকতে হবে, এই অনুশাসন আমরা শুনেছি। **কর্ম করা এবং বাঁচা, এই দুইয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।**

প্রাণের লক্ষণই হচ্ছে এই যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই, তাকে বাইরে আসতেই হবে। তার সত্য—অন্তর এবং বাহিরের যোগে। দেহকে বেঁচে থাকতে হয় বলেই বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অন্নজলের সঙ্গে তাকে নানা যোগ রাখতে হয়। শুধু প্রাণশক্তিকে নেবার জন্যে নয়, তাকে দান করবার জন্যেও বাইরেকে দরকার। এই দেখ-না কেন, শরীরকে তো নিজের ভিতরের কাজ যথেষ্টই করতে হয়; এক নিমেষও তার হৃৎপিণ্ড থেমে থাকে না, তার মস্তিষ্ক তার পাকযন্ত্রের কাজের অন্ত নেই; তবু দেহটা নিজের ভিতরকার এই অসংখ্য প্রাণের কাজ করেও স্থির থাকতে পারে না—তার প্রাণই তাকে বাইরের নানা কাজে এবং নানা খেলায়

ছুটিয়ে বেড়ায়। কেবলমাত্র ভিতরের রক্ত চলাচলেই তার তুষ্টি নেই, নানাপ্রকারে বাইরের চলাচলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের চিত্তেরও সেই দশা। কেবলমাত্র আপনার ভিতরের কল্পনা ভাবনা নিয়ে তার চলে না। বাইরের বিষয়কে সর্বদাই তার চাই—কেবল নিজের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নয়, নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে, দেবার জন্যে এবং নেবার জন্যে।

আসল কথা, যিনি সত্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে ভাগ করতে পেলেই আমরা বাঁচি নে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় করতে হবে বাইরেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে। তাঁকে যেদিকে ত্যাগ করব সেইদিকে নিজেকেই বঞ্চিত করব।....................তিনি আমাকে বাহিরে ধরে রেখেছেন। তিনি আমাকে অন্তরেও জাগিয়ে রেখেছেন। আমরা যদি এমন কথা বলি যে, তাঁকে কেবল অন্তরের ধ্যানে পাব, বাইরের কর্ম থেকে তাঁকে বাদ দেব —কেবল হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা তাঁকে ভোগ করব, বাইরের সেবার দ্বারা তাঁর পূজা করব না—কিংবা একেবারে এর উল্টো কথাটাই বলি, এবং এই ব'লে জীবনের সাধনাকে যদি কেবল একদিকেই ভারগ্রস্ত করে তুলি তা হলে প্রমত্ত হয়ে আমাদের পতন ঘটবে।

আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখছি সেখানে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে একান্ত ঝুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ভালো করে বিশ্বাসই করে না। এতদূর পর্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোনো জায়গাতেই দেখতে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বলছে বিশ্বজগৎ কেবলই পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে, তেমনি য়ুরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে—জগতের ঈশ্বরও ক্রমশঃ পরিণত হয়ে উঠছেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলছেন এই তাদের কথা।

ব্রহ্মের একদিকে ব্যাপ্তি, আর-একদিকে সমাপ্তি; একদিকে পরিণতি, আর-একদিকে পরিপূর্ণতা; একদিকে ভাব, আর-একদিকে প্রকাশ—দুই একসঙ্গে গান এবং গান-গাওয়ার মতো অবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে আছে এটা তারা দেখতে পাচ্ছে না। এ যেন গায়কের অন্তঃকরণকে স্বীকার না করে বলা যে 'গান কোনো জায়গাতেই নেই—কেবলমাত্র গেয়ে যাওয়াই আছে'। কেননা, আমরা যে গেয়ে যাওয়াটাকেই দেখছি, কোনো সময়েই তো সম্পূর্ণ গানটাকে এক সঙ্গে দেখছিনে—কিন্তু, তাই বলে কি এটা জানিনে যে সম্পূর্ণ গান চিত্তের মধ্যে আছে?

এমনি করে কেবলমাত্র ক'রে-যাওয়া চলে-যাওয়ার দিকটাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্ত্য জগতে আমরা একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে, এই পণ করে বসে আছে। তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ। জীবনের কোনো জায়গাতেই তারা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে স্বীকার করে না। সমাপ্তিকে তারা সুন্দর বলে দেখতে জানে না।

আমাদের দেশে ঠিক এর উলটো দিকে বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে, ব্যাপ্তির দিককে, আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই দেখব, তাঁকে বিশ্বব্যাপারে নিত্য পরিণতির দিক দিয়ে দেখব না, এই আমাদের পণ। এইজন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনার কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে

কোনোপ্রকার যুক্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়, আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না, স্থাণু হয়ে বসে আপনাকে আপনিই নিরীক্ষণ করতে চায়; আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধুলোয় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে। এতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কতদূর বিকৃতি ও দুর্বলতা ঘটে তা ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখি নি। আমাদের যে দাঁড়িপাল্লা অন্তর-বাহিরের সমস্ত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে তাই দিয়েই আমরা আমাদের ধর্মকর্ম ইতিহাস-পুরাণ সমাজ-সভ্যতা সমস্তকে ওজন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি, আর-কোনো প্রকার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁতভাবে সত্য নির্ণয় করবার কোনো দরকারই দেখি নে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অন্তর-বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের একদিকে নিয়ম, একদিকে আনন্দ। তার একদিকে ধ্বনিত হচ্ছে : ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি। আর-এক দিকে ধ্বনিত হচ্ছে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। একদিকে বন্ধনকে না মানলে অন্যদিকে মুক্তিকে পাবার জো নেই। ব্রহ্ম একদিকে আপনার সত্যের দ্বারা বদ্ধ, আর-এক দিকে আপনার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখনই মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।

সে কেমনতরো? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারের তার যখন একেবারে ঠিক সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে স্বরতত্ত্বের নিয়মের যখন লেশমাত্র স্খলন না হয়, তখন সেই তারে গান বাজে এবং সেই গানের সুরের মধ্যেই সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। একদিকে সে নিয়মের মধ্যে অবিচলিতভাবে বাঁধা পড়েছে বলেই অন্যদিকে সে সংগীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাঁধা হয়নি ততক্ষণ সে কেবলমাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর-কিছুই নয়। কিন্তু, তাই বলে এই তার খুলে ফেলাকেই মুক্তি বলে না। সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুলতে পারলেই সে বদ্ধ থেকেও এবং বদ্ধ থাকাতেই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

আমাদের জীবনের বীণাতেও কর্মের সরু মোটা তারগুলি ততক্ষণ কেবলমাত্র বন্ধন যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ধ্রুব করে না বেঁধে তুলতে পারি। কিন্তু, তাই বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে, ব্যর্থতার মধ্যে, নিষ্ক্রিয়তা-লাভকে মুক্তিলাভ বলে না।

তাই বলছিলুম কর্মকে ত্যাগ করা নয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোলবার সাধনাই হচ্ছে সত্যের সাধনা, ধর্মের সাধনা। এই সাধনারই মন্ত্র হচ্ছে : যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। যে যে কর্ম করবে সমস্তই ব্রহ্মকে সমর্পণ করবে। অর্থাৎ, সমস্ত কর্মের দ্বারা আত্মা আপনাকে ব্রহ্মে নিবেদন করতে থাকবে। অনন্তের কাছে নিত্য এই নিবেদন করাই আত্মার গান, এই হচ্ছে আত্মার মুক্তি। তখন কী আনন্দ যখন সকল কর্মই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কর্ম যখন আমাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে না আসে, কর্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হয়ে ওঠে—সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ—তখন সংসারই তো আনন্দনিকেতন।

কর্মের মধ্যে মানুষের এই-যে বিরাট আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই-যে নিরন্তর আত্মনিবেদন, ঘরের কোণে বসে একে কে অবজ্ঞা করতে চায়! সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানবমাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করছে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টিব্যাপার থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোনো-একটা ভাবরসসম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্মের চরম সাধনা! ওরে উদাসীন, ওরে আপনার মাদকতায় বিভোর বিহ্বল সন্ন্যাসী, এখনই শুনতে কি পাচ্ছ না ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জনে আপনার কর্মের বিজয় রথে, চলেছে বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকারকে বিস্তীর্ণ করতে। তার সেই আকাশে আন্দোলিত জয়পতাকার সম্মুখে পর্বতের প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে; বন-জঙ্গলের ঘনছায়াচ্ছন্ন জটিল চক্রান্ত সূর্যালোকের আঘাতে কুহেলিকার মতো তার সম্মুখে দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্ধান করছে; অসুখ অস্বাস্থ্য অব্যবস্থা পদে পদে পিছিয়ে গিয়ে প্রতিদিন তাকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে; অজ্ঞতার বাধাকে সে পরাভূত করছে, অন্ধতার অন্ধকারকে সে বিদীর্ণ করে ফেলছে। তার চারি দিকে দেখতে দেখতে শ্রীসম্পদ কাব্যকলা জ্ঞানধর্মের আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে। বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুরত্যয় পথে মানবাত্মার এই-যে বিজয়রথ অহোরাত্র পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বলতে চাও তার কেউ সারথি নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে না? এইখানেই, এই মহৎ সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের পথেই কি রথীর সঙ্গে সারথির যথার্থ মিলন ঘটছে না? রথ চলেছে, শ্রাবণের অমারাত্রির দুর্যোগও সেই সারথির অনিমেষ নেত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারছে না, মধ্যাহ্নসূর্যের প্রখর আলোকেও তাঁর ধ্রুব দৃষ্টি প্রতিহত হচ্ছে না; আলোকে অন্ধকারে চলেছে রথ, আলোকে অন্ধকারে মিলন রথীর সঙ্গে সেই সারথির—চলতে চলতে মিলন, পথের মধ্যে মিলন, উঠবার সময় মিলন, নামবার সময় মিলন, রথীর সঙ্গে সারথির। ওরে, কে সেই নিত্য মিলনকে অগ্রাহ্য করতে চায়! তিনি যেখানে চালাতে চান কে সেখানে চলতে চায় না! কে বলতে চায় আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে, নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তাঁর সঙ্গে মিলব। কে বলতে চায় এই-সমস্তই মিথ্যা—এই বৃহৎ সংসার, এই নিত্য বিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তর-বাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা, এই পরম দুঃখের এবং পরম সুখের সাধনা। যে লোক এ-সমস্তকেই মিথ্যা বলে কত বড়ো মিথ্যা তার চিত্তকে আক্রমণ করেছে! এত বড়ো বৃহৎ সংসারকে এত বড়ো ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সত্যই বিশ্বাস করে! যে মনে করে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় সে কবে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে কতদূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য তার আছে কি! তা নয়—ভীরু যে, পালাতে যে চায়, সে কোথাও তাঁকে পায় না। সাহস করে বলতে হবে এই-যে তাঁকে পাচ্ছি, এই-যে এখনই, এই-যে এখানেই। বারবার বলতে হবে আমার প্রত্যেক কর্মের মধ্যে আমি যেমন আপনাকে পাচ্ছি তেমনি আমার আপনার মধ্যে যিনি আপনি তাঁকে পাচ্ছি। কর্মের মধ্যে আমার যা-কিছু বাধা, যা-কিছু বেসুর, যা-কিছু জড়তা, যা-কিছু অব্যবস্থা, সমস্তকেই আমার শক্তির দ্বারা সাধনার দ্বারা দূর করে দিয়ে এই কথাটি

অসংকোচে বলবার অধিকারটি আমাদের লাভ করতে হবে যে, কর্মে আমার আনন্দ, সেই আনন্দেই আমার আনন্দময় বিরাজ করছেন।

(কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

কর্মের মধ্য দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিইনে ব'লে, দান করিনে ব'লে কর্ম আমাদের চেপে রাখে। কিন্তু, হে আত্মদা, বিশ্বের কর্মে তোমার আনন্দমূর্তি প্রত্যক্ষ করে কর্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা আগুনের মতো তোমার দিকেই জ্বলে উঠুক, নদীর মতো তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক, ফুলের গন্ধের মতো তোমার মধ্যেই বিস্তীর্ণ হতে থাক্। জীবনকে তার সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ক্ষয়-পূরণ, সমস্ত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ করে ভালোবাসতে পারি এমন বীর্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিশ্বকে পূর্ণশক্তিতে দেখি, পূর্ণশক্তিতে শুনি, পূর্ণশক্তিতে এখানে কাজ করি। জীবনে সুখ নেই ব'লে, হে জীবিতেশ্বর, তোমাকে অপবাদ দেব না। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ **এই জীবনে পরিপূর্ণ করে আমি বাঁচব,** বীরের মত একে আমি গ্রহণ করব এবং দান করব, এই তোমার কাছে প্রার্থনা। দুর্বল চিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম থেকে বিযুক্ত একটা আধারহীন আকারহীন বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। কর্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্নসূর্যালোকে তোমার আনন্দরূপকে প্রকাশমান দেখে হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্বত্র যেন তোমার জয়ধ্বনি করতে পারি। মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করছে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্যামল শস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে; যেখানেই জলাজঙ্গল গর্ত গাড়িকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলছে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবার জন্যে মানুষ অশ্রান্ত কর্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করছে সেইখানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে মানুষের জীবনের আনন্দ চিত্তের আনন্দ কেবলই কর্মের রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করছে সেখানে সে মহৎ, সেখানে সে প্রভু, সেখানে সে দুঃখকষ্টের ভয়ে দুর্বল ক্রন্দনের সুরে নিজের অস্তিত্বকে কেবলই অভিশাপ দিচ্ছে না। যেখানেই জীবনে মানুষের আনন্দ নেই, কর্মে মানুষের অনাস্থা, সেইখানেই তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নিখিলের প্রবেশদ্বার সংকীর্ণ। সেইখানেই যত সংকোচ, যত অন্ধ সংস্কার, যত অমূলক বিভীষিকা, যত আধিব্যাধি এবং পরস্পর বিচ্ছিন্নতা।

(কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

হে বিশ্বকর্মন্, আজ আমরা তোমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটি জানাতে এসেছি, আমার এই সংসার আনন্দের, আমার এই জীবন আনন্দের। বেশ করেছ আমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জাগিয়ে রেখেছ তোমার এই জগতে, তোমার এই বহুধা শক্তির অসীম লীলাক্ষেত্রে। বেশ করেছ তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে সম্মান দিয়েছ, বিশ্বসংসারে অসংখ্য জীবের চিত্তে দুঃখতাপের দাহে যে অগ্নিময়ী পরমাসৃষ্টি চলছে বেশ করেছ আমাকে তার সঙ্গে যুক্ত করে গৌরবান্বিত করেছ। সেই সঙ্গে প্রার্থনা করতে এসেছি, আজ তোমার বিশ্বশক্তির প্রবলবেগ বসন্তের উদ্দাম দক্ষিণ বাতাসের মতো ছুটে চলে আসুক, মানবের বিশাল ইতিহাসের মহাক্ষেত্রের উপর দিয়ে ধেয়ে

আসুক—নিয়ে আসুক তার নানা ফুলের গন্ধকে, নানা বনের মর্মরধ্বনিকে বহন করে, আমাদের দেশের এই শব্দহীন প্রাণহীন শুষ্কপ্রায় চিত্ত-অরণ্যের সমস্ত শাখা-পল্লবকে দুলিয়ে কাঁপিয়ে মুখরিত করে দিক—আমাদের অন্তরের নিদ্রোত্থিত শক্তি ফুলে ফলে কিশলয়ে অপর্যাপ্তরূপে সার্থক হবার জন্যে কেঁদে উঠুক। দেখতে দেখতে শতসহস্র কর্মচেষ্টার মধ্যে আমাদের দেশের ব্রহ্মোপাসনা আকার ধারণ করে তোমার অসীমতার অভিমুখে বাহু তুলে আপনাকে একবার দিগবিদিকে ঘোষণা করুক। মোহের আবরণকে উদ্‌ঘাটন করো, উদাসীনতার নিদ্রাকে অপসারিত করে দাও—এখনই এই মুহূর্তে অনন্ত দেশে কালে ধাবমান ঘূর্ণমান চিরচাঞ্চল্যের মধ্যে তোমার নিত্য বিলসিত আনন্দরূপকে দেখে নিই; তার পরে সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে প্রণাম করে সংসারে মানবাত্মার সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করি, যেখানে নানা দিক থেকে নানা অভাবের প্রার্থনা, দুঃখের ক্রন্দন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্যের নিমন্ত্রণ আমাকে আহ্বান করছে—যেখানে আমার নানাভিমুখী শক্তির একমাত্র সার্থকতা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে এবং যেখানে বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোম হুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ লাভক্ষতিকে পুণ্য আহুতির মতো সমর্পণ করে দেবার জন্যে আমার অন্তরের মধ্যে কোন্‌ তপস্বিনী মহানিষ্ক্রমণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

(কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে একই কালে একদিকে আনন্দের দ্বারা অন্যদিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলই রসে মজে থাকতে হবে না—জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্মে পেতে হবে, তাঁকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

(ছোটো ও বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ই মাঘ ১৩২০)

আমাদের বাঁচতে হবে। জীবনের সত্য আনন্দকে আমাদের পেতে হবে। কবি তাঁর কবিতায় নিজেকে ঢেলে দিয়ে যে আনন্দ পান, এ আনন্দ তা'ই। আমাদের মধ্যে যে অনন্ত রয়েছে, আসুন তাকে আমরা আমাদের চারপাশের সব-কিছুতে প্রকাশ করি। আমাদের কর্মে, আমাদের ব্যবহৃত বস্তুতে, যে-সব মানুষের সঙ্গে আমরা ব্যবহার করি তাদের মধ্যে। আমাদের চারপাশের জগতের নানা উপভোগের মধ্যে আমরা এই অনন্তকে প্রকাশ করি। আমাদের আত্মাকে আমাদের পরিবেশের মধ্য দিয়ে যেতে দিন ও সর্ববস্তুতে নিজেকে সৃজন করতে দিন, এবং সর্বকালের প্রয়োজনসাধনের মধ্য দিয়ে আপন পূর্ণতাকে দেখাতে দিন। আমাদের এই জীবন দিব্য দাতার উপহারে পূর্ণ হয়ে আছে। তারকামণ্ডলী এই জীবনের কাছে গান গেয়েছে; প্রভাতআলোকের দৈনন্দিন আশীর্বাদ-পূত হয়ে এ জীবন ধন্য হয়েছে, ফলমূল এর কাছে সুমিষ্ট হয়েছে, এবং এর বিশ্রামের জন্য পৃথিবী তার শ্যামল তৃণাবরণ বিছিয়ে দিয়েছে। অনন্ত আত্মার স্পর্শে এই জীবন তার আত্মার আনন্দগানে অবাধে উৎসারিত হোক। আর সে-কারণেই ঈশোপনিষদের কবি বলেছেন—

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

কেবল পরিপূর্ণভাবে জীবন উপভোগ করেই আপনি একে উত্তীর্ণ হতে পারেন। বাতাসে নেচে, শাখা থেকে রস আহরণ করে, ও সূর্যালোকে পরিপক্ক হয়ে যখন ফলের জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন সে তার অন্তরে বাইরের আহ্বান শুনতে পায় এবং ব্যাপকতর জীবনের জন্যে প্রস্তুত হয়। জীবনধারণের বিচক্ষণ জ্ঞান আপনাকে এই জীবনত্যাগের ক্ষমতা দেয়। কারণ মৃত্যু হল অমরতার দ্বার। সে কারণে এ কথা বলা হয়েছে, কর্ম করো, কিন্তু কর্ম যেন তোমাতে লিপ্ত না হয়। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কর্ম জীবনের সঙ্গে প্রবাহিত হয়, ততক্ষণ তা আপনার জীবনকে প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তা জীবনের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন তা জীবনের প্রবাহকে রুদ্ধ করে, এবং জীবনকে নয়, নিজেকেই প্রদর্শন করে। তখন কর্ম নদীবাহিত বালুকার মতো আত্মা-স্রোতের গতিকে রুদ্ধ করে। শারীরিক জীবনের প্রকৃতিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এলোমেলোভাবে আক্ষিপ্ত হয়, তখন তাদের চলাফেরার সঙ্গে জীবনের সঙ্গতি থাকে না, পরন্তু তা ব্যাধি হয়ে ওঠে। এ ঠিক সেই সব কর্মের মতো যা মানুষকে জড়িয়ে ধরে ও তার আত্মাকে হত্যা করে।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মানুষের মধ্যে যেমন এই জ্ঞানের মুক্তির প্রেরণা তেমনি প্রেরণা কর্মের মুক্তির। যে-কর্ম নিজের ছোটো স্বার্থের বেড়ার মধ্যেই বন্ধ সেই কর্মের মধ্যেই তো মানুষের পরিতৃপ্তি হল না। ভোগের কর্ম জীবনমাত্রেরই ত্যাগের কর্ম মানুষের। ভোগের যে অনুষ্ঠান যে আয়োজন তাতে ক্ষয় লেগে আছে। তাতে যা ব্যয় হয় তা নষ্ট হয়, এইজন্যেই ভোগের ক্ষেত্রে জন্তুতে জন্তুতে কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত নেই। এই কাড়াকাড়ি মারামারির চেষ্টাকেই মানুষ আপন জীবনের একমাত্র নিত্য চেষ্টা বলে স্থির করে বসে নেই। তার যে-কর্মে আত্মত্যাগের চেষ্টা প্রকাশ পায় সেই কর্মই তার মুক্ত কর্ম। সেখানে সে যে-ফললাভ করে সে-ফল তার অন্তরে; টাকাকড়ির মতো সে-ফল নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে না। মানবদের মধ্যে যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা নিজের সমস্ত জীবন দিয়ে এই কথাই প্রকাশ করেছেন যে, ভোগের জগতেই বন্ধন, ত্যাগের জগতেই মুক্তি।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩২৯ সাল)

মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে। তা করতে গেলে কর্ম চাই। ঈশোপনিষদ্ তাই বলেন, "শত বৎসর তোমাকে বাঁচতে হবে, কর্ম তোমার না করলে নয়।" শত বৎসর বাঁচাকে সার্থক করো কর্মে, এমনতরো কর্মে যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণের সঙ্গে বলতে পারা যায় সোঽহম্। এ নয় যে, চোখ উলটিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বসে থাকতে হবে মানুষের থেকে দূরে। অসীম উদ্বৃত্ত থেকে মানুষের মধ্যে যে-শ্রেষ্ঠতা সঞ্চারিত হচ্ছে সে কেবল সত্যং ঋতং নয়, তার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ ভূতং ভবিষ্যৎ। এই যে-কর্ম, এই যে-শ্রম, যা জীবিকার জন্যে নয়, এর নিরন্তর উদ্যম কোন্ সত্যে। কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে

অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল। তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে, সোঽহম্‌। সেই অধিকার জাতিবর্ণ নির্বিচারে সকল মানুষেরই।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

সংসারধর্ম পালন করতে করতে তৎসত্ত্বেও মুক্তি পেতে হবে সংসারের এই শিক্ষা। প্রমাণ করতে হবে মানুষ কেবল দেহমন নিয়েই কাল যাপন করবে না, দেহমনের অতীত যে আত্মা তারই আত্মিক ধর্ম তাকে রক্ষা করতে হবে। তাকে সংসারের কর্তব্যের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করতে হবে যে সে পশুধর্মের অতীত।

আমাদের দেশবাসীরা বলে থাকেন যে এ-সব মুনি-ঋষির কথা। আমরা সংসারী, আমরা পবিত্র ও মুক্ত হতে পারি না। কিন্তু এমন কথা মানুষের আত্মাবমাননার কথা। সংসার ও সন্ন্যাসকে বিভক্ত করা মানুষের শ্রেয়ঃ পথ নয়। গৃহী মানবকেই সন্ন্যাসী হতে হবে এবং নিরাসক্ত হয়ে সংসারধর্ম পালন করতে হবে। আজকার দিনে পশ্চিমে ঘোর দুর্গতির কাল ঘনিয়ে এসেছে, দেশে-দেশে মানুষের মনে হিংস্রতার ও দ্বন্দ্বের অন্ত নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজকে যদি বলি যে বিজ্ঞানের পাঠশালা বন্ধ করে গিরিগুহায় অরণ্যে চোখ বুজে বসে থাকো তবে মিথ্যা বলা হবে। এ যেমন নিরর্থক, তেমনি যদি বলা যায় যে লুব্ধ স্বার্থকে বিস্তার করো, বিজ্ঞানের অস্ত্রে দুর্বলকে মারো, সেও তেমনি মিথ্যা কথা। কিন্তু বলতে হবে যে সংসারের সকল কর্তব্য পালনের মধ্যেই মানুষের আত্মিক শক্তিকে জয়যুক্ত করো। সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করো, কিন্তু নিরাসক্তভাবে, আত্মার উদার লোকে সভ্যতাকে উন্নীত করো। আজকের দিনে এ কথা বলে লাভ নেই যে ধন-সম্পদের আহরণ বন্ধ করো, যা-কিছু সব ত্যাগ করো, কিন্তু মানুষকে বলতে হবে যে ঐশ্বর্য-সাধনার ভিতর দিয়েই সন্ন্যাসী হও, সংসারের মধ্যে থেকেই তোমার মাহাত্ম্যের পরিচয় দাও।

একদা ভারতবর্ষের সাধক সংসারের মধ্যে বাস করেই এই আধ্যাত্মিকতার সাধনা করেছিলেন। তাঁরা গৃহী ছিলেন। পরবর্তী যুগে এই সাধনাপথের পরিবর্তন হল, মানুষ অঙ্গে বিভূতি মেখে জনসমাজ থেকে দূরে গিয়ে আপনাকে শূন্যের মধ্যে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্রাচীন যুগে মানুষ যে নিভৃত নির্জনতায় সাধনার আসন পেতেছিলেন সেখানেও সংসারীদের যাতায়াত ছিল। সব ত্যাগ করে চলে যেতে হবে মানুষের পক্ষে এ কথা সত্য হতে পারে না। সংসারের তিমিরান্ধকারের মধ্য হতেই আলোকের পথ আবিষ্কার করতে হবে, জ্যোতির্ময় পুরুষকে জানতে হবে।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩৪৩)

মানুষ আপনার কৃতিত্ব প্রমাণ করবার জন্য যখন কর্মের আয়োজন করে তখন দ্বন্দ্বের অন্ত থাকে না, কারণ কর্মক্ষেত্র তখন অহং ঘোষণার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। আজ উৎসবের দিনে আমরা এই কথা বলব যে এখানকার কর্মপ্রচেষ্টা ক্ষুদ্র আপনাকে প্রচারের প্রয়াস নয়, আত্ম-উপলব্ধির সাধনা।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩৪৩)

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩

আমরা অবশ্যই আমাদের আত্মাকে হত্যা করব না। আমরা এ কথা কিছুতেই ভুলব না যে আমাদের মধ্যে যে অনন্ত আছে, জীবন তাকে প্রকাশ করতেই এখানে এসেছে। যদি আমরা আলস্যে অথবা মহতের স্বাধীনতাহীন বস্তুসমূহের অন্বেষণে রত হই, তবে আমরা আমাদের অনন্তের চেতনাকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে হত্যা করব। তার ফলে মৃতবীজ-যুক্ত ফলের মতো আমরা অসম্পূর্ণের আদিম তমসার রাজ্যে ফিরে যাব। জীবন হল নিরন্তর সৃষ্টি। যখন জীবন নিজেকে ছাড়িয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করে তখন তা সত্যকে পায়। কিন্তু যখন জীবন থেমে যায়, সঞ্চয় করে ও ফিরে তাকায়, যখন সে পিছনের বাধা-অতিক্রমী দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে, তখন জীবনকে মরতেই হয়। তখন জীবন সৃজনের জগৎ থেকে বিচ্যুত হয় এবং স্তূপীকৃত বস্তুনিচয়ের চাপে পড়ে বিনাশের ধূলিতে পরিণত হয়। তাদের সম্পর্কে ঈশোপনিষৎ বলেছেন—

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পুরানো সভ্যতার মাটি চাপা ভাঙাচোরা চিহ্নশেষ উদ্ধার করলে তার মধ্যে দেখা দেয় আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষের প্রভূত প্রয়াস। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের ব'লে সে অনুভব করেছে তারই দ্বারা সর্ব-কালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল, কত কৌশল। ছবিতে, মূর্তিতে, ঘরে ব্যবহারের সামগ্রীতে, সে ব্যক্তিগত মানুষের খেয়ালকে প্রচার করতে চায় নি, বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে তার দুঃসাধ্য সাধনা। মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, আপন আত্মায় সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অভ্যুদয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন। বাহ্য সম্পদের প্রাচুর্যের মাঝখানেই সেই বিনষ্টির লক্ষণ সহসা এসে দেখা দেয় যখন মদান্ধ স্বার্থান্ধ মানুষ চিরমানবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে কি সেই লক্ষণ আজ দেখা দেয়নি। সেখানে বিজ্ঞান আছে, বাহুবল আছে, অর্থবল আছে, বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু তার দ্বারাও মানুষ রক্ষা পায় না। স্বাজাত্যের শিখরের উপরে চড়ে বিশ্বগ্রাসী লোভ যখন মনুষ্যত্বকে খর্ব করতে স্পর্ধা করে, রাষ্ট্র-নীতিতে নিষ্ঠুরতা ও ছলনার সীমা থাকে না, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এবং সংশয় যখন নিদারুণ হিংস্রতায় শান দিতে বসে, তখন মানবের ধর্ম আঘাত পায় এবং মানবের ধর্মই মানুষকে ফিরে আঘাত করে। এ কোনো পৌরাণিক ঈশ্বরের আদিষ্ট বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা নয়। এই সব আত্মম্ভরীরা **আত্মহনো জনাঃ**। এরা সেই আত্মাকে মারে যে আত্মা স্বদেশের বা স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বদ্ধ নয়, যে আত্মা নিত্যকালের বিশ্বজনের। একলা নিজেকে বা নিজেদেরকে বড়ো করবার চেষ্টায় অন্য-সকল প্রাণীরই উন্নতি ঘটতে পারে, তাতে তাদের সত্যদ্রোহ ঘটে না; কিন্তু মানুষের পক্ষে সেইটেই

অসত্য, অধর্ম, এই জন্যে সকল প্রকার সমৃদ্ধির মাঝখানেই তার দ্বারাই মানুষ সমূলেন বিনশ্যতি।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

আজ মানুষের মধ্যে আত্ম-অবিশ্বাস প্রবল। **এই-আত্ম-অবিশ্বাসই আত্মঘাত।**

(অরবিন্দ ঘোষ, ২৯ মে ১৯২৮)

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪

'আত্মা কী' এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ঈশোপনিষৎ এইভাবে—

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥

মনের নানা বাধানিষেধ আছে। সামনে যা আছে তা নিয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাম খুব ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আমাদের মধ্যে একত্বের প্রতিভা আছে, তা মনের চিন্তার সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আবার এর উপস্থিতিতে জীবন-প্রেরণা জীবন-শক্তিসমূহকে নিয়তই সামনে এগিয়ে যেতে বলে। আমাদের মধ্যে এই একের সম্পর্কে আমরা সচেতন বলেই আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে এর মৃত্যু আছে, কেন না এই এক তার সকল বস্তুর চেয়ে বেশি, তা সকল ক্ষণমুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে যায়। এই একের একত্বের জন্য, অংশের চেয়ে এ বেশি বলে, এর ক্রমান্বয় ঊর্ধ্বতন ও নিরন্তর উৎসারের জন্য আমরা একে মৃত্যুর সকল সীমার বাইরে অনুভব করি।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মানুষ এক যুগে যাকে আশ্রয় করছে আর-এক যুগে উন্মাদের মতো তার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে পথে। এই যে বারে বারে ঘর ভেঙে দিয়ে চলবার উদ্দামতা, যার জন্যে সে প্রাণপণ করে, এ প্রমাণ করছে কোন সত্যকে। সেই সত্য সম্বন্ধেই উপনিষদ বলেন, মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ। তিনি মনকে ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়ে চলে গেছেন। ছাড়িয়ে যদি না যেতেন তবে পদে পদে মানুষও আপনাকে ছাড়িয়ে যেত না। অথর্ববেদ বলেছেন, এই আরও-র দিকে, এই ছাড়িয়ে যাবার দিকে মানুষের শ্রী, তার ঐশ্বর্য, তার মহত্ব।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫

দূরের দ্বারা নিকট বর্জিত নিকটের দ্বারা দূর বর্জিত, চলার দ্বারা থামা বর্জিত থামার দ্বারা চলা বর্জিত, অন্তরের দ্বারা বাহির বর্জিত বাহিরের দ্বারা অন্তর বর্জিত। কিন্তু

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তৎ সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।

তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে অথচ তিনি সকলের বাহিরেও।

অর্থাৎ চলা না-চলা, দূর নিকট, ভিতর বাহির সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি, কাউকে ছেড়ে তিনি নন। এইজন্য তিনি ওঁ।

(ওঁ, শান্তিনিকেতন, ১৫ই চৈত্র ১৩১৫)

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুইই আছে;

(ছোটো ও বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ই মাঘ ১৩২০)

কোনো কোনো দর্শন বলে—গতিটাই মায়া, সত্য যা তা স্থির। অন্যরা আবার বলে—আসলে সত্য গতিশীল; সত্যকে স্থিররূপে প্রতিভাত করে মায়া।

সত্য কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রের অতীত। এ এক অনন্ত-রহস্য। একাধারে স্থাবর এবং জঙ্গম, আদর্শ এবং বাস্তব, পূর্ণ ও অপূর্ণ উভয়ই।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
মলিনা রায়, ৭ আগষ্ট ১৯১৫)

দূর ও নিকট দুই ভিন্ন ঘটনা-শ্রেণীর রক্ষক, কিন্তু তা'রা উভয়েই একই সত্যের অন্তর্ভুক্ত—এই সত্যই তাদের প্রভু। সেই কারণে যখন আমরা এক পক্ষকে ভর্ৎসনা করার জন্য অপর পক্ষ অবলম্বন করি, তখন যে সত্য উভয়কেই ধরে আছে তাকে আঘাত করি।

ঈশোপনিষদে ভারতীয় ঋষি এই সত্য সম্পর্কে বলেছেন—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

এর অর্থ এই, যখন আমরা সত্যকে নিকটের অংশে অনুভব করি, তখন সত্যকে চলমানরূপে দেখি; যখন আমরা সত্যকে সমগ্ররূপে দেখি—যা দূর থেকে দেখা—তখন তা নিশ্চল থাকে। যেমন আমরা একটি গ্রন্থকে যখন অধ্যায়ে অধ্যায়ে পড়ি তখন তা চলমান। কিন্তু যখন আমরা সম্পূর্ণ গ্রন্থটিকে জানি, তখন সকল অধ্যায়কে আন্তর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করে গ্রন্থটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে —এইরূপেই দেখি।

এই একটি ক্ষেত্র যেখানে অস্তিত্বের রহস্যে সকল বিরোধের মিলন ঘটে; এখানে গতি সবটাই গতি নয় ও নিশ্চলতা সবটাই নিশ্চলতা নয়; এখানে ভাব ও রূপ, অন্তর ও বাহির, মিলিত হয়; এখানে অসীমতা না হারিয়ে অসীম সীমায় পরিণত হয়।

যদি এই মিলন ভেঙে যায়, তখন সকল বস্তুই অবাস্তব হয়ে পড়ে।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সকল সীমার বাইরে একত্বের চেতনা হল আত্মার চেতনা। আর এই আত্মা সম্পর্কে ঈশোপনিষৎ বলেছেন—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

এ হল আত্মাকে দূর ও নিকটের, ভিতর ও বাইরের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে জানা। সকল বিস্ময়ের মধ্যে এই-যে বিস্ময়, আমার মধ্যে এই-যে এক, আমার সকল বাস্তবতার কেন্দ্র এই এক-কে আমি জেনেছি। কিন্তু আমি এখানেই থামতে পারি না। আমি বলতে পারি না যে এ-সকল সীমাকে অতিক্রম করে গেছে, তথাপি আমাতে বাঁধা পড়েছে।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঘড়ি-ধরা অবিশ্বাসী, সময়কে আপেক্ষিক অর্থাৎ মায়া বলে মানতে চায় না, সে জানে না—নিমেষই বল আর লক্ষ যুগই বল, দুয়ের মধ্যে অসীম সমানভাবেই আছেন, শুধু কেবল উপলব্ধির অপেক্ষা। এইজন্যই কবি প্রেমের ভাষায় অর্থাৎ নিবিড় সত্য-উপলব্ধির ভাষায় বলেছেন, "নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।" যারা আয়তনকে ঐকান্তিক সত্য বলে মনে করে তারাই অসীমের সীমা শুনলে কানে হাত দেয়। কিন্তু দেশই বল আর কালই বল, যাতে করে সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করে দেয়, দুইই আপেক্ষিক, দুইই মায়া। সিনেমাতে কালের পরিমাণ বদল করে দিয়ে যে ব্যায়ামক্রীড়া দেখানো হয় তাতে দেখি যে ঘড়ি-ধরা কালে যা একভাবে প্রত্যক্ষ, কালকে বিলম্বিত করে দিলে তাকেই অন্যভাবে দেখা যায়, অর্থাৎ স্বল্পকালের সংহতিতে যা চঞ্চল, বৃহৎ কালের ব্যাপ্তিতে তাই স্থির। শুধু কাল কেন, আকাশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমাদের দৃষ্টির আকাশে গোলাপ ফুলকে যে-আয়তনে দেখছি অণুবীক্ষণের আকাশে তাকে সে-আয়তনে দেখিনে। আকাশকে আরও অনেক বেশী আণুবীক্ষণিক করে দেখতে পারলে গোলাপের পরমাণুপুঞ্জকে বৈদ্যুতিক যুগলমিলনের নৃত্যলীলারূপে দেখতে পারি, সে আকাশে গোলাপ একেবারে গোলাপই থাকে না। অথচ, সে-আকাশ দূরস্থ নয়, স্বতন্ত্র নয়, এই আকাশেই। তাই পরম সত্যকে উপনিষৎ বলেছেন, তদেজতি-তন্নৈজতি, একই কালে তিনি চলেনও তিনি চলেনও না।

(পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫)

নিকটকে বাদ দিয়ে দূর, এবং দূরকে বাদ দিয়ে নিকট যে একটা ভয়ংকর কবন্ধ। দূর এবং নিকট এরা দুইজনে দুই বিভিন্ন তথ্যের মালিক কিন্তু এরা দুইজনেই কি এক সত্যের অধীন নয়?

সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেচেনঃ—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে—

তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরো ঘোর অন্ধকার।

(আমার জগৎ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বল্‌তে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চল্‌চে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখ্‌চি নইলে দেখা বলে' জানা বলে' পদার্থটা থাক্‌তই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিদ্যার মায়া। আবার আর এককালের পণ্ডিত বলেছিলেন, ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই; চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ এক পক্ষের ওকালতি করবেন ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অন্ত থাক্‌বে না। কিন্তু সরলবুদ্ধি জানে, চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্তী, সেটা চল্‌ছে; সমগ্র, যেটা দূরবর্তী, সেটা স্থির রয়েচে।

এ সম্বন্ধে একটা উপমা আমি পূর্ব্বেই ব্যবহার করেছি, এখনো ব্যবহার করব। গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্তে চল্‌তে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্ত্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যেই চলে না সেটা গানই নয়, যেটা কোনো গানের মধ্যেই স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না। গানে ও গাওয়ায় মিলে যে সত্য সেই তো তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে—সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে।

(আমার জগৎ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

মানুষ একদিকে মৃত্যুর অধিকারে, আর-এক দিকে অমৃতে; এক দিকে সে ব্যক্তিগত সীমায়, আর-এক দিকে বিশ্বগত বিরাটে। এই দুয়ের কোনটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। মানুষ নিজেকে জানে : তদ্‌দূরে তদ্বন্তিকে চ। সে দূরেও বটে, সে নিকটেও। সেই দূরের মানুষের দাবি নিকটের মানুষের সব-কিছুকেই ছাড়িয়ে যায়। এই অপ্রত্যক্ষের দিকে মানুষের কল্পনাবৃত্তি দৌত্য করে; ভুল করে বিস্তর, যেখানে থই পায় না সেখানে অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে ফাঁক ভরায়; তবুও এই অপ্রতিহত প্রয়াস সত্যকেই প্রমাণ করে, মানুষের এই একটি আশ্চর্য সংস্কারের সাক্ষ্য দেয় যে, যেখানে আজও তার জানা পৌঁছয়নি সেখানেও শেষ হয় নি তার জানা।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন, এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ই মাঘ ১৩০৭)

এই যে নিজের অন্তরাত্মাকে বাহিরে অনুভব করা, এটা প্রথমে মানুষের মধ্যেই মানুষ অতি সহজে এবং সম্পূর্ণরূপে করিতে পারে। চোখের দেখায়, কানের শোনায়, মনের ভাবায়, কল্পনার খেলায়, হৃদয়ের নানান টানে, মানুষের মধ্যে সে স্বভাবতই নিজেকে পুরাপুরি আদায় করে। এইজন্য মানুষকে জানিয়া, মানুষকে টানিয়া, মানুষের কাজ করিয়া, সে এমন কানায়-কানায় ভরিয়া উঠে। এইজন্যই দেশে এবং কালে যে-মানুষ যত বেশি মানুষের মধ্যে আপনার আত্মাকে মিলাইয়া নিজেকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন তিনি ততই মহৎ মানুষ। তিনি যথার্থই মহাত্মা। সমস্ত মানুষেরই মধ্যে আমার আত্মার সার্থকতা, এ যে-ব্যক্তি কোনো-না-কোনো সুযোগে কিছু-না-কিছু বুঝিতে না পারিয়াছে তাহার ভাগ্যে মনুষ্যত্বের ভাগ কম পড়িয়া গেছে। সে আত্মাকে আপনার মধ্যে জানাতেই আত্মাকে ছোটো করিয়া জানে।

(বিশ্বসাহিত্য, সাহিত্য, ১৩১৩)

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্তা এসে পৌঁছেছিল, সেদিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জানতেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

(নবযুগের উৎসব, শান্তিনিকেতন)

আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি * নয়, কেবল আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়, সেই দেখাই আবার সর্বত্রেই।

(ওঁ, শান্তিনিকেতন, ১৫ই চৈত্র ১৩১৫)

যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তা হলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের

* বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।২৩

অধিকার নয়—যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্যন্তই সে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার 'পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ, সর্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উদ্বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্যাকে সব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেইজন্যে আমাদেরই এই সমস্যার আসল উত্তরটি দিতে হবে, এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয় নি।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

আমরা দুঃখের দ্বারা পরস্পরকে আপন করিতে পারি নাই। আমরা দেশের মানুষকে কোনো মূল্য দিই নাই—মূল্য না দিয়া পাইব কী করিয়া? মা আপন গর্ভের সন্তানকেও অহরহ সেবাদুঃখের মূল্য দিয়া লাভ করেন। যাহাকেই আমরা সত্য বলিয়া মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করি তাহাকেই এই মূল্য আমরা স্বভাবতই দিয়া থাকি, কাহাকেও তাগিদ করিতে হয় না। চারিদিকের মানুষকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাই আপনাকে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতেও পারিলাম না।

মানুষকে এইরূপ সত্য বলিয়া দেখা, ইহা আত্মার সত্যদৃষ্টি, অর্থাৎ, প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে, সর্বভূতই এক, সে একটা বাক্যমাত্র; সেই তত্ত্বকথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবৎ করা যায় না। প্রেম-নামক আত্মার যে চরমশক্তি, যাহার ধৈর্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ সেই সেবাতৎপর প্রেম নহিলে আর-কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না; এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

(যাত্রার পূর্বপত্র, পথের সঞ্চয়, আষাঢ় ১৩১৯)

ঈশোপনিষৎ বলেছেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

বিচ্ছিন্ন তথ্যাবলীর মাঝে যেমন সত্য লুকিয়ে থাকে সে ভাবেই আমাদের মধ্যে আমরা লুকিয়ে আছি। যখন আমরা জানি যে আমাদের মধ্যে এই এক সকলের মধ্যেই এক, তখনি আমাদের সত্য উদ্ঘাটিত হয়।

কিন্তু আত্মার ঐক্য সম্পর্কে এই জ্ঞান অবশ্যই বিমূর্ত হবে না। যা একজন বা অপরজনের মধ্যে নেই এমন নেতিবাচক বিবেকতা এ নয়। এই আত্মা বিমূর্ত আত্মা নয়, পরন্তু তা আমার আপন আত্মা—যাকে আমি অবশ্যই অপরের মধ্যে উপলব্ধি করব। আমি নিশ্চয়ই জানি যে যদি আমার আত্মা কেবলমাত্র আমারই হয়, তবে তা সত্য হতে পারে না; সেই সঙ্গে এ'ও জানি যদি তা শেষ পর্যন্ত আমার না হয়, তবে তা বাস্তব নয়।

ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা কোনোদিনই এই সত্যে উপনীত হতে পারব না যে আমার মধ্যে ঐক্যবিধায়ক নীতিস্বরূপ যে আত্মা রয়েছে, তা অপরের মধ্যে পূর্ণতাকে পায়। এই সত্যের আনন্দের মধ্য দিয়ে আমরা তাকে জেনেছি। আমাদের বাইরে আত্মোপলব্ধিতেই আমাদের আনন্দ। যখন আমি ভালোবাসি বা অন্য কথায়, যখন আমি ছাড়া অন্য কারোর মধ্যে আমি নিজেকে সত্যতর রূপে উপলব্ধি করি, তখনি আমি খুশী হয়ে উঠি। কারণ তখন আমার মধ্যে যে এক রয়েছেন, তিনি অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐক্যের সত্যকে উপলব্ধি করেন, আর সেখানেই তাঁর আনন্দ।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

একা মানুষ ভয়ংকর নিরর্থক; কেন না, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোটো বড়ো সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি। এঞ্জিনিয়র সাহেব নীল রঙের মোমজামার উপর বাড়ির প্ল্যান আঁকেন, তাকে ছবি বলি নে; কেননা, সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আত্মিক সম্বন্ধ নয়, বাহির-মহলের ব্যবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল সৃজন, প্ল্যান হল নির্মাণ।

....

ঐক্য দান করে সত্য। ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। তা ছাড়া সে অন্তরাত্মাকে শূন্য রাখে; সেইজন্যে সেই শূন্যতার ক্ষোভে পূর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে হয়; 'আরো' 'আরো' হাঁকতে-হাঁকতে হাঁপাতে-হাঁপাতে নামতার কোঠায় কোঠায় আকাঙ্ক্ষার ঘোড়-দৌড় করাতে-করাতে ঘূর্ণি লাগে; ভুলেই যেতে হয় অন্য যা-কিছু পাই আনন্দ পাচ্ছি নে।

তা হলে চরিতার্থতা কোথায়? তার উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। আপেল পড়ার অন্তবিহীন সংখ্যাগণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় এ কথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধাক্কা দিয়ে বলবে 'ততঃ কিম্'। তার দৌড়ও থামবে না, তার প্রশ্নের উত্তরও মিলবে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল পড়া যেমনি একটি আকর্ষণতত্ত্বে এসে ঠেকে অমনি বুদ্ধি খুশি হয়ে বলে ওঠে, 'বাস! হয়েছে।'

এই তো গেল আপেল পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্সস্ রিপোর্টে?

এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বরূপপ্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যায়? এই প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেছেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রীবুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর, যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না; সে অকুণ্ঠিত চিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেছে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে, এর চেয়ে স্পষ্ট ক'রে ইতিহাসে আর-কখনো দেখা যায় নি।

(শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, আশ্বিন ১৩২৮)

যারা অন্যকে আপনার মতো জেনেছে 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তারাই প্রকাশ পেয়েছে, এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি, মানুষের দল পর্বত সমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েছে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তা হলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলই হানাহানি করেছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েছে, তারা কোন্ কালে লোপ পেয়েছে। আর, যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতি-রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

(শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, আশ্বিন ১৩২৮)

বীজ যখন অঙ্কুররূপে প্রকাশিত হয় তখন ত্যাগের দ্বারা হয়। সে ত্যাগ নিজেকেই ত্যাগ। সে আপনাকে বিদীর্ণ করে তবে আপনার সত্যকে মুক্তি দিতে পারে। তেমনি, যে আপন সকলের তাকে পাবার জন্যে মানুষেরও ত্যাগ করতে হয় যে আপন একলার, তাকে। এইজন্যে ঈশোপনিষদ বলেছেন, যে মানুষ আপনাকে সকলের মধ্যে ও সকলকে আপনার মধ্যে পায় 'ন ততো বিজুগুপ্সতে'—সে আর গোপন থাকে না।

(বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ বৈশাখ ১৩৩০)

ভারতবর্ষ এই কথা বলেছিল যে, যিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ সত্যকে লাভ করেছেন। তিনি অপ্রকাশ থাকেন না; 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তিনি সর্বলোকে সর্বকালে প্রকাশিত হন।

(বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ৭ পৌষ ১৩৩০)

মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে—সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি

তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকুল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি না।

(ধর্মের নবযুগ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

তোমার তর্ক এই যে, কাছে থেকে কেবল অংশকে দেখা যায়, দূরে না দাঁড়ালে সমগ্রকে দেখা যায় না। তোমার এ কথাটায় সায় দিতে রাজি আছি। এই জন্যই তো আপনার সম্বন্ধে মানুষের মিথ্যা অহঙ্কার। কেননা আপনি অত্যন্ত কাছে। শাস্ত্রে তাই বলে, **আপনাকে যে লোক অন্যের মধ্যে দেখে সেই সত্য দেখে**—অর্থাৎ আপনার থেকে দূরে না গেলে আপনার গোলাকার বিশ্বরূপ দেখা যায় না।

(আমার জগৎ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

এক আমি-আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে প'ড়েছেন--তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছির প্রকাশ কিন্তু তাই ব'লে এ কথা বলাও চলে না যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি-আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আমি-আছিকে অতিক্রম ক'রেও আছেন। সেই জন্যেই অগণ্য আমি-আছির মধ্যে যোগের পথ র'য়েচে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেচেন, "সর্বভূতের মধ্যে যে লোক আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে যে লোক সর্বভূতকে জানে সে আর গোপন থাক্‌তে পারে না।" আপনাকে সেই জানে না যে-লোক আপনাকে কেবল আপনি বলেই জানে, অন্যকেও যে আপন ব'লে জানে না।

(আমার জগৎ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্যমান সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা তার দুটো দিক, কিন্তু তারা পরস্পরযুক্ত। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা, আর-একটা সামাজিক, এদের মাঝখানে ভেদ নেই। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের ঐকান্তিকতা অসম্ভব। মানবলোকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েছেন তাঁদের শক্তি সকলের শক্তির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিচ্ছিন্ন নয়। মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয়, সেইখানেই বর্বরতা। বর্বর একা একা শিকার করে, খণ্ড খণ্ড ভাবে জীবিকার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই জীবিকার ভোগ অত্যন্ত ছোটো সীমার মধ্যে। বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত ক'রে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদ্‌কে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ্ সুপ্রতিষ্ঠ করাই হল সভ্য মানবের লক্ষ্য।

উপনিষৎ বলেন, আমরা যখন আপনার মধ্যে অন্যকে ও অন্যের মধ্যে আপনাকে পাই তখনই সত্যকে পাই—ন ততো বিজুগুপ্সতে—তখন আর গোপনে থাকতে পারি নে, তখনই আমাদের প্রকাশ। সভ্যতায় মানুষ প্রকাশমান, বর্বরতায় মানুষ অপ্রকাশিত। পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের আত্মোপলব্ধি যতই সত্য হতে থাকে ততই সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। ধর্মের নামে, কর্মের নামে, বৈষয়িকতার নামে, স্বাদেশিকতার নামে, যেখানেই মানুষ মানবলোকে ভেদ সৃষ্টি করেছে, সেইখানেই দুর্গতির কারণ গোচরে অগোচরে বল পেতে থাকে। সেখানে মানব আপন মানবধর্মকে আঘাত করে, সেই হচ্ছে আত্মঘাতের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিহাসে যুগে যুগে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

(পল্লীসেবা, পল্লীপ্রকৃতি, ফাল্গুন ১৩৩৭)

মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল—তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃষ্টানকে, ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর এক পঙ্‌ক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব ভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্‌সতে।

যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না।

(সভাপতির অভিভাষণ, রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উৎসব,
ভারতপথিক রামমোহন, ১৪ পৌষ ১৩৪০)

ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয় নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে : বিদ্বান্ ইতি সর্বান্তরস্থ স্বসংবিদ্ রূপবিদ্ বিদ্বান্। নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ ক'রে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্।

(সভাপতির অভিভাষণ, রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উৎসব,
ভারতপথিক রামমোহন, ১৪ পৌষ ১৩৪০)

মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছে : আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি।* যিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে সত্যকে যিনি এমনি করে জেনেছেন তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানবমহিমায় দেদীপ্যমান।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।

মানুষের এই প্রকাশ জগতে আজ অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবৃত। কিছু কিছু দেখা যায়, অনেকখানি দেখা যায় না। পৃথিবীসৃষ্টির আদিযুগে ভূমণ্ডল ঘন বাষ্প-আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানে সেখানে উচ্চতম পর্বতের চূড়া অবারিত আলোকের মধ্যে উঠতে পেরেছে। আজকের দিনে তেমনি অধিকাংশ মানুষ প্রচ্ছন্ন, আপন স্বার্থে, আপন অহংকারে, অবরুদ্ধ চৈতন্যে। যে সত্যে আত্মার সর্বত্র প্রবেশ সেই সত্যের বিকাশ তাদের মধ্যে অপরিণত।

মানুষের সৃষ্টি আজও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। এই অসমাপ্তির নিবিড় আবরণের মধ্য থেকে মানুষের পরিচয় আমরা পেতুম কী করে যদি না মানব সহসা আমাদের কাছে আবির্ভূত হ'ত কোনো প্রকাশবান্ মহাপুরুষের মধ্যে?

(বুদ্ধদেব, বৈশাখী পূর্ণিমা, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২)

---

*আপস্তম্ভসংহিতা ১০।১১

**যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭**

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য ক'রে তুলবে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ওপারের মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, 'আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?' তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছুক যে, 'মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।'

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

(শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, আশ্বিন ১৩২৮)

**স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮**

আমাদের শাস্ত্র ঈশ্বরকে কবি বলেন, কারণ আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী। এই জন্যই তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করেন নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টিরূপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থই তাহাই।

(মেঘনাদবধ কাব্য, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ভাদ্র ১২৮৯)

স পর্যগাৎ শুক্রং আবার তিনিই ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ অনন্তদেশে তিনি স্তব্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনন্ত কালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাজ করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি গতিও তিনি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটিমাত্র জায়গায় দেখতে পাই; সে হচ্ছে প্রেমে। এই চঞ্চল সংসারের মধ্যে যেখানে আমাদের প্রেম কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের চিত্তের স্থিতি—আর সমস্তকে আমরা ছুঁই আর চলে যাই, ধরি আর ছেড়ে দিই, যেখানে প্রেম সেইখানেই আমাদের মন স্থির হয়। অথচ সেইখানেই তার ক্রিয়াও বেশি। সেইখানেই আমাদের মন সকলের চেয়ে সচল। প্রেমেতেই যেখানে স্থির করায় সেইখানেই অস্থির করে। প্রেমের মধ্যেই স্থিতিগতি এক নাম নিয়ে আছে।

কর্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত—তারা বিপরীতপর্যায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও যা লাভও তাই। যাকে ভালোবাসি তাকে যা দিই সেই দেওয়াটাই লাভ। আনন্দের হিসাবের খাতায় জমা খরচ একই জায়গায়—সেখানে দেওয়াও যা পাওয়াও তাই। ভগবানও সৃষ্টিতে এই যে আনন্দের যজ্ঞ এই যে প্রেমের খেলা ফেঁদেছেন এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করছেন। এই দেওয়াপাওয়াকে একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।

দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে, ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই হ্যাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নির্গুণ। তার একদিক বলে আমি আছি আর একদিক বলে আমি নেই। "আমি" না হলেও প্রেম নেই "আমি" না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেইজন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে—সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

(সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন, অগ্রহায়ণ ১৩১৫)

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে সেই নির্মল স্বরূপকে বলতে হবে, বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—সমস্ত পাপ দূর করো—একেবারে বিশ্বদুরিত সমস্ত পাপ—একটুও বাকি থাকলে চলবে না—কেন না তুমি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং, আত্মা তোমাকেই চায়—সেই তার একমাত্র যথার্থ চাওয়া, সেই তার শেষ চাওয়া।

(পাপ, শান্তিনিকেতন, অগ্রহায়ণ ১৩১৫)

বিধান জিনিসটা তো খামখেয়ালি হলে চলে না; আজ একরকম কাল অন্যরকম—আমার পক্ষে একরকম অন্যের পক্ষে অন্যরকম—কখন কী রকম তার কোনো স্থিরতা নেই, এ তো বিধান নয়। বিধান যে বিশ্ববিধান।

এই বিধানের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে এই পৃথিবীর ধূলি থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। আমার সুখসুবিধার জন্য যদি বলি, তোমার বিধানের সূত্র এক জায়গায় ছিন্ন করে দাও—এক জায়গায় অন্য সকলের সঙ্গে আমার নিয়মের বিশেষ পার্থক্য করে দাও তাহলে বস্তুত বলা হয় যে এই কাদাটুকু পার হতে আমার কাপড়ে দাগ লাগছে অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্যসূত্রটিকে ছিঁড়ে সমস্ত সূর্যতারাকে রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দাও।

এই বিধান জিনিসটা কারও একলার নয় এবং কোনো একখণ্ড সময়ের নয়—এই বিশ্ববিধানের যোগেই সমষ্টির সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে যুক্ত হয়ে আছি এবং কোনো-কালে সে যোগের বিচ্ছেদ নেই। উপনিষৎ বলেছেন, যিনি বিশ্বের প্রভু, তিনি "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ" তিনি নিত্যকাল হতে এবং নিত্য-কালের জন্য সমস্তই যথার্থরূপে বিধান করছেন। এই বিধানের মূলে শাশ্বতকাল—এ বিধান অনাদি অনন্ত কালের বিধান তারপরে আবার এই বিধান যাথাতথ্যতঃ বিহিত হচ্ছে—এর আদোপান্তই যথাতথা—কোথাও ছেদ নেই, অসংগতি নেই। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশ্ববিধান সম্বন্ধে এর চেয়ে জোর করে এবং পরিষ্কার করে কিছু বলে নি।

(বিধান, শান্তিনিকেতন, ২১ পৌষ ১৩১৫)

প্রকৃতিতে ঈশ্বর নিয়মের দ্বারা সীমার দ্বারা যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন

সে যদি কেবলমাত্রই পার্থক্য হত তা হলে জগৎ তো সমষ্টিরূপ ধারণ করত না। তা হলে অসংখ্য বিচ্ছিন্নতা এমনি বিচ্ছিন্ন হত যে কেবলমাত্র সংখ্যাসূত্রেও তাদের একাকারে জানবার কিছুই থাকত না।

অতএব এর মধ্যে আর একটি জিনিস আছে যা এই চিরন্তন পার্থক্যকে চিরকালই অতিক্রম করছে। সেটি কী? সেটি হচ্ছে শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি এই সমস্ত পার্থক্যের উপর কাজ করে একে এক অভিপ্রায়ে বাঁধছে। সমস্ত স্বতন্ত্র নিয়মবদ্ধ দাবাবড়ের ঘুঁটির মধ্যে একই খেলোয়াড়ের শক্তি একটি এক-তাৎপর্যবিশিষ্ট খেলাকে অভিব্যক্ত করে তুলছে।

এইজন্যই তাঁকে ঋষিরা বলেছেন "কবিঃ"। কবি যেমন ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নিজের ইচ্ছার অধীনে নিজের শক্তির অনুগত করে সুন্দর ছন্দোবিন্যাসের ভিতর দিয়ে একটি আশ্চর্য অর্থ উদ্ভাবিত করে তুলছে—তিনিও তেমনি "বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নি-হিতার্থোদধাতি" অর্থাৎ শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত করে বহুর সঙ্গে যুক্ত করে অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তুলছেন—নইলে সমস্তই অর্থহীন হত।

(পার্থক্য, শান্তিনিকেতন, ২৩ পৌষ ১৩১৫)

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে খাপছাড়া এবং অদ্ভুত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ এইভাবে শুনে আসছি—

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

ঈশ্বরের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানাস্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন এগুলি আবৃত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে এজন্য আর চিন্তা করতে হয় না—সুতরাং যে শোনে তারও চিন্তা উদ্রেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিন্তার দ্বারা গ্রহণ করি নি, বরঞ্চ আমার চিন্তার মধ্যে একটি বিদ্রোহ ছিল। প্রথমত এর ব্যাকরণ এবং রচনা-প্রণালীতে ভারি একটা শৈথিল্য দেখতে পেতুম। তিনি সর্বব্যাপী—এই কথাটাকে একটা ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যথা—স পর্যগাৎ; তার পরে তাঁর অন্য সংজ্ঞাগুলি শুক্রম্ অকায়ম্ প্রভৃতি বিশেষণ-পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শুক্রম্ অকায়ম্ এগুলি ক্লীবলিঙ্গ, তার পরেই হঠাৎ কবির্মনীষী প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত ব্রহ্মের শরীর নেই এই পর্যন্তই সহ্য করা যায় কিন্তু ব্রণ নেই স্নায়ু নেই বললে এক তো বাহুল্য বলা হয় তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই সকল কারণে আমাদের উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্ঘকাল আমাকে পীড়িত করেছে।

অন্তঃকরণ যখন ভাবকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকে না তখন শ্রদ্ধাহীন শ্রোতার কাছে কথাগুলি তার সমস্ত অর্থটা উদ্ঘাটিত করে দেয় না। অধ্যাত্মমন্ত্রকে যখন সাহিত্য-সমালোচকের কান দিয়ে শুনেছি তখন সাহিত্যের দিক দিয়েও তার ঠিক বিচার করতে পারি নি।

আমি সেজন্য অনুতপ্ত নই বরঞ্চ আনন্দিত। মূল্যবান জিনিসকে তখনই লাভ

করা সৌভাগ্য যখন তার মূল্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে হয়েছে—যথার্থ অভাবের পূর্বে পেলে পাওয়ার আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পূর্বে আমি দেখতে পাইনি যে এই মন্ত্রের দুটি ছত্রে দুটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্ছে পর্যগাৎ—তিনি সর্বত্রই গিয়াছেন সর্বত্রই আছেন। আর একটি হচ্ছে ব্যদধাৎ—তিনি সমস্তই করেছেন। এই মন্ত্রের এক অর্ধে তিনি আছেন, অন্য অর্ধে তিনি করছেন।

যেখানে আছেন সেখানে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ-পদ, যেখানে করছেন সেখানে পুংলিঙ্গ বিশেষণ। অতএব বাহুল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইঙ্গিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি সর্বত্র আছেন কেন না তিনি মুক্ত তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পাপের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মুক্ত বিশুদ্ধ স্বরূপকে মনে উজ্জ্বল করে দেখতে হয়। তিনি যে কিছুতেই বদ্ধ নন এইটিই সর্বব্যাপিত্বের লক্ষণ।

শরীর যার আছে সে সর্বত্র নেই। শুধু সর্বত্র নেই তা নয় সে সর্বত্র নির্বিকারভাবে থাকতে পারে না কারণ শরীরের ধর্মই বিকার। তাঁর শরীর নেই সুতরাং তিনি নির্বিকার, তিনি অব্রণ। যার শরীর আছে সে ব্যক্তি স্নায়ু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সাধন করে— সে রকম সাহায্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শরীর নেই বলার দরুণ কী বলা হল তা ওই অব্রণ অস্নাবির বিশেষণের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে—তাঁর শারীরিক সীমা নেই সুতরাং তাঁর বিকার নেই এবং খণ্ডভাবে খণ্ড উপকরণের দ্বারা তাঁকে কাজ করতে হয় না। তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং—কোনো প্রকার পাপ প্রবৃত্তি তাঁকে একদিকে হেলিয়ে একদিকে বেঁধে রাখে না। সুতরাং তিনি সর্বত্রই সম্পূর্ণ সমান। এই তো গেল—স পর্যগাৎ।

তার পরে—স ব্যদধাৎ; যেমন অনন্ত দেশে তিনি পর্যগাৎ তেমনি অনন্ত কালে তিনি ব্যদধাৎ। ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। নিত্যকাল হতে বিধান করেছেন এবং নিত্যকালের জন্য বিধান করছেন। সে বিধান কিছুমাত্র এলোমেলো নয়— যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ—যেখানকার যেটি অর্থ ঠিক সেইটেই একেবারে যথাতথরূপে বিধান করছেন। তার আর লেশমাত্র ব্যত্যয় হবার জো নেই।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর স্বরূপ কী? তিনি কবি। এ স্থলে কবি শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ সর্বদর্শী কথাটা ঠিক চলে না। কেন না এখানে তিনি যে কেবল দেখছেন তা নয় তিনি করছেন। কবি শুধু দেখেন জানেন তা নয় তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি, অর্থাৎ তাঁর আনন্দ যে একটি সুশৃংখল সুষমার মধ্যে সুবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করছে, তা তাঁর এই জগৎ মহাকাব্য দেখলেই টের পাওয়া যায়। জগৎ-প্রকৃতিতে তিনি কবি, মানুষের মনঃপ্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্বমানবের মন যে আপনা-আপনি যেমন-তেমন করে একটা কাণ্ড করছে তা নয় তিনি তাকে নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষুদ্র থেকে ভূমার দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন। তিনিই হচ্ছেন পরিভূঃ। কী জগৎ প্রকৃতি কী মানুষের মন সর্বত্র তাঁর প্রভুত্ব। কিন্তু তাঁর কবিত্ব ও প্রভুত্ব বাইরের কিছু থেকে নিয়মিত হচ্ছে না; তিনি স্বয়ম্ভু—তিনি নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন। এই জন্যে তাঁর কর্মকে তাঁর বিধানকে বাইরে থেকে দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই—এবং এই কারণেই শাশ্বতকালে তাঁর বিধান, এবং যথাতথরূপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এই রকম ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য দুইই বাচ্য আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও যথাযথ হয়ে উঠবে। অমাদের হওয়ার পূর্ণতা কিসে? না, পাপশূন্য বিশুদ্ধতায়। বৈরাগ্যদ্বারা আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হও—পবিত্র হও, নির্বিকার হও। সেই ব্রহ্মচর্য সাধনায় তোমার হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হতে থাকবে, যতই তুমি তোমার বাধামুক্ত নিষ্পাপ চিত্তের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাকবে, যতই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে—ততই তুমি সংসারকে কাব্য করে তুলবে, মনকে রাজ্য করে তুলবে, বাহিরে এবং অন্তরে প্রভুত্ব লাভ করবে। অর্থাৎ আত্মার স্বয়ম্ভূত্ব সুস্পষ্ট হবে, অনুভব করবে তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিষ্ঠান আছে।

একই অনন্তচক্রে ভাব এবং কর্ম কেমন মিলিত হয়েছে, হওয়া থেকে করা স্বতই নিজের স্বয়ম্ভু আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে বহুধা হয়ে উঠেছে, বিশুদ্ধ নির্বিশেষ বিচিত্র বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন, যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্য রচনা করছেন, যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হয়েছেন—কোনোখানে এর আর ছেদ পাওয়া যায় না—উপনিষদের ওই একটি ছোটো মন্ত্রে সে-কথা সমস্তটা বলা হয়েছে।

(দুই, শান্তিনিকেতন, ৪ঠা মাঘ ১৩১৫)

আর বেশি কিছু নয়, আমরা প্রতিদিনে প্রভাতে সেই যিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করব। তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করে বলব, তোমার পায়ের ধুলো নিলুম আমার ললাট নির্মল হয়ে গেল। আজ আমার সমস্ত দিনের জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চিত হল। প্রাতে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে প্রণাম করেছি, তোমার পদধূলি মাথায় তুলে সমস্ত দিনের কর্মে নির্মল সতেজভাবে তার পরিচয় গ্রহণ করব।

(ভাবুকতা পবিত্রতা, শান্তিনিকেতন, ২ ফাল্গুন ১৩১৫)

যে সময়ে ভূমা সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন থাকেন—যে সময়ে, হয় আমরা একান্তই আপিসের জীব হয়ে উঠি, নয়তো আহার-পরিপাকের জড়তায় আমাদের অন্তরাত্মার উজ্জ্বলতা অত্যন্ত ম্লান হয়ে আসে, সেই শুষ্কতা ও জড়ত্বের আবেশকালে তুচ্ছতার আক্রমণকে আমরা যেন প্রশ্রয় না দিই—আত্মার মহিমাকে তখনও যেন প্রত্যক্ষগোচর করে রাখি। যেন তখনই মনে পড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে, মনে পড়ে যে অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ এই মুহূর্তে আমাদের অন্তরে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন, মনে পড়ে যে সেই শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সমস্ত হাস্যালাপ, সমস্ত কাজকর্ম, সমস্ত চাঞ্চল্যের অন্তরতম মূলে যেন একটি অবিচলিত পরিপূর্ণতার উপলব্ধি কখনো না সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

(পরশরতন, শান্তিনিকেতন, ১২ ফাল্গুন ১৩১৫)

সর্বলোকে আপনাকে পরিকীর্ণ করা আত্মার ধর্ম—পরমাত্মারও সেই ধর্ম। তাঁর সেই ধর্ম পরিপূর্ণ, কেননা তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং। তিনি নির্বিকার, তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। সেইজন্যে সর্বত্রই তাঁর প্রবেশ।

পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে। তখন আমরা কী

হব? পরমাত্মার মতো সেই স্বরূপটি লাভ করব যে স্বরূপে তিনি কবি, মনীষী, প্রভু, স্বয়ম্ভু। আমরাও আনন্দময় কবি হব, মনের অধীশ্বর হব, দাসত্ব থেকে মুক্ত হব, আপন নির্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব। তখন আত্মা সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে আপনাকে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ রূপে প্রকাশ করবে—আপনাকে ক্ষুব্ধ করে লুব্ধ করে খণ্ডবিখণ্ডিত করে দেখাবে না।

(আদেশ, শান্তিনিকেতন, ৯ই চৈত্র ১৩১৫)

উপনিষদে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলবার সময় যখন তাঁকে অপাপবিদ্ধ বলা হয়েছে তখন তার তাৎপর্য এই। তিনি স্বভাবে অবাধে পরিব্যাপ্ত। পাপ তাঁকে কোনো একটা বিশেষ সংকীর্ণতায় আকৃষ্ট আবদ্ধ করে অন্যত্র থেকে পরিবহণ করে নেয় না—এই গুণেই তিনি সর্বব্যাপী। আমাদের মধ্যে পাপ সমগ্রের ক্ষতি করে কোনো একটাকেই স্ফীত করতে থাকে। তাতে করে কেবল যে নিজের স্বভাবের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য থাকে না তা নয়, চারিদিকের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়।

(স্বভাবলাভ, শান্তিনিকেতন, ১৬ই চৈত্র ১৩১৫)

কবি যেখানে সত্য, যেখানে সে আপনার অসীমকে আপনার সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, আপনার আনন্দকে আপনার শক্তির মধ্যে মূর্তিদান করে, সেখানে সে সৃষ্টি করে।

(সীমার সার্থকতা, পথের সঞ্চয়, ১৩১৯)

...উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যাথাতথ্যতো'র্থান ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, এলোমেলো নয় এবং সে-বিধান শাশ্বত কালের। তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্যকালের জন্য বিহিত, তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্য বিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেন না, যে-বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই! এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথ রূপে জানাই বিধান।

(কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কালান্তর, ১৩২৪)

অসীমের নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় দিক দুটি নিয়ে ঈশোপনিষৎ আলোচনা করে একটি শ্লোকে বলেছেন—

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

নেতিবাচক গুণবিচারে ব্রহ্ম নিশ্চল। ইতিবাচক গুণবিচারে ব্রহ্ম সর্বকালের উপর ক্রিয়া করেন। তিনি কবি, তিনি তাঁর মনকে উপাদানরূপে ব্যবহার করেন। তিনি বন্ধনের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশের উৎস তাঁর আনন্দের প্রাচুর্য্য। বাইরের কোনো প্রয়োজনের তাগিদে এই প্রকাশ ঘটে না। সুতরাং কেবল তিনিই অন্তহীন সময়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে দান ক'রে আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

এখানেই আমরা আমাদের আদর্শকে পাই। নিত্য বর্জনই জীবনের সত্য। এর

পূর্ণতায় আমাদের জীবনের পূর্ণতা। সকল অভিব্যক্তির মধ্যে আমাদের জীবনকে আমাদের কবিতা ক'রে গড়ে তুলতে হবে। এই রচনা আমাদের অনন্ত আত্মার পূর্ণ ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতবাহী হবে। তা আমাদের সম্পদের প্রকাশস্থল হয়ে উঠবে না, কেননা সম্পদের কোনো নিজস্ব অর্থ নেই। আমাদের মধ্যে অসীমের যে চেতনা রয়েছে, তা আমাদের প্রাচুর্য থেকে আমাদের আত্মদানের আনন্দে আত্মপরিচয় দেয়। আর সেই কারণে আমাদের কর্ম আমাদের আত্মত্যাগের প্রক্রিয়া মাত্র। তা আমাদের জীবনের সঙ্গে এক হয়ে আছে। এ নদীর প্রবাহের মতো, আর এই প্রবাহই নদী।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর-কেউ না, আর-কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেছেন : যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অথাৎ, অর্থের বিধান তিনি যা করেছেন সে বিধান যথাতথ, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বত কালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্ছে, অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্যে পাকা করে দিয়েছেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে হত; কেবলই এ ভয়ে, ও ভয়ে, সে ভয়ে, পেয়াদার ঘুষ জুগিয়ে ফতুর হতে হত। কিন্তু, তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে যে দলিল সে হচ্ছে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল; তারই মহা আশ্বাসবাণী হচ্ছে : যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেছেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন, 'বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে,ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর-এক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুয়ের যোগে তুমি বড় হও। জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক; এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই, এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

(শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, আশ্বিন ১৩২৮)

শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার
নাহি তাঁর আশ্রয় আধার—
তিনি শুদ্ধ, পাপ তাঁহে নাই।
তিনি বিরাজেন সর্ব ঠাঁই।
তিনি কবি বিশ্বরচনের,
তিনি পতি মানবমনের,
তিনি প্রভু নিখিলজনার—
আপনিই প্রভু আপনার।

বাধাহীন বিধান তাঁহার
চলিছে অনন্তকাল ধরি,
প্রয়োজন যতটুকু যার
সকলই উঠিছে ভরি ভরি।

(রূপান্তর)

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥৯
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥১১

সংসারের সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসার কর্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে—তদপেক্ষা ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্তব্য কর্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্মের উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে।

কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্মনির্বাহও ভাল তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম পরিহারপূর্বক কেবলমাত্র আত্মার আনন্দসাধনের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্মসাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা, সংসারের তাৎপর্য তাই। মঙ্গলকর্ম সাধনেই আমাদের স্বার্থ-প্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ আমাদের হৃদ্‌গত বন্ধন সকলের মোচন হইয়া থাকে—আমাদের যে রিপু সকল মৃত্যুর মধ্যে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখে সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গল কর্মের সংঘর্ষেই ছিন্ন হইয়া যায়। কর্তব্য কর্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা,—

....

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম দ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলাভের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

ইহাই সংসারের ধর্মের মূলমন্ত্র—কর্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন। কর্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অভ্রভেদী মন্দির নির্মাণ করিতে থাকিবে, ব্রহ্ম সেই মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। নহিলে কিসের জন্য আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাম পাইয়াছি, কেন এই পেশী, এই স্নায়ু, এই বাহুবল, এই বুদ্ধিবৃত্তি, কেন এই স্নেহ-

প্রেম দয়া, কেন এই বিচিত্র সংসার? ইহার কি কোন অর্থ নাই? ইহা কি সমস্তই অনর্থের হেতু? ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া উঠে এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাঁহাকে একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট হই।

পিতা আমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন, সেখানকার নিয়ম এবং কর্তব্য সর্বথা সুখজনক নহে। সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বালক পিতৃগৃহে পালাইয়া আনন্দ লাভ করিতে চায়। সে বোঝে না বিদ্যালয়ে তাহার কি প্রয়োজন—সেখান হইতে পলায়নকেই সে মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, কারণ পলায়নে আনন্দ আছে। মনোযোগের সহিত বিদ্যা সম্পন্ন করিয়া বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহা সে জানে না। কিন্তু সুছাত্র প্রথমে পিতার স্নেহ সর্বদা স্মরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার দুঃখকে গণ্য করে না, পরে তাহার সহিত বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হইবার আনন্দও যুক্ত হয়—অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তি লাভের আনন্দে সে ধন্য হইয়া থাকে।

যিনি আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন সংসার-বিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যেন সন্দেহ না করি—এখানকার দুঃখকাঠিন্য বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া এখানকার কর্তব্য একান্তচিত্তে পালন করিয়া পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ব্রহ্মামৃত লাভের সার্থকতা যেন অনুভব করি। ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি তাহাই মুক্তি। সংসারকে অপমানপূর্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিড়ম্বনা—তাহা এক জাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। কারণ সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থ সাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থ-ত্যাগ করিতে হয়। সংসারে পরের দিকে একেবারে না তাকাইলে নিজের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। নৌকা যেমন গুণ দিয়া টানে তেমনি সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্বদাই প্রতিকূল স্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশই আমাদের সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বার্থ, স্বদেশের স্বার্থ এবং সর্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু যাহারা সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

বৃক্ষে যে ফল থাকে সে ফল বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠে। যতই সে পরিপক্ক হইতে থাকে ততই বৃক্ষের সহিত তাহার বৃন্তবন্ধন শিথিল হইয়া আসে—অবশেষে তাহার অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোলে। আমরাও সংসারবৃক্ষ হইতে সেইরূপ বিচিত্র রস আকর্ষণ করি—মনে হইতে পারে তাহাতে সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে—কিন্তু তাহা নহে,—আত্মার যথার্থ পরিণতি হইলে বন্ধন আপনি শিথিল হইয়া আসে। ফলের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আত্মা সচেতন; রস নির্বাচন ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে আমাদের স্বায়ত্ত। আত্মার পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচারপূর্বক সংসার হইতে রস গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারিলেই সংসারের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সেই সঙ্গে আত্মার সফলতা সম্পন্ন হইলে

সংসারের কল্যাণবন্ধন সহজেই শিথিল হইয়া আসে। অতএব ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন জানিয়া সংসারকে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, তাঁহার দত্ত সুখসমৃদ্ধির দ্বারা ভোগ করিবে—সংসারকে শেষ পরিণাম বলিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে না। অপরপক্ষে সংসারের বৃন্তবন্ধন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মঙ্গলরস হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করিবে না। ঈশ্বর এই সংসারবৃক্ষের সহস্র তন্তুর মধ্য দিয়া আমাদের আত্মায় কল্যাণরস প্রেরণ করেন; এই জীবধারয়িতা বিপুল বনস্পতি হইতে দম্ভভরে পৃথক্ হইয়া নিজের রস নিজে যোগাইবার ক্ষমতা আমাদের হস্তে নাই।

কোন সত্যকে অস্বীকার করিয়া আমাদের নিস্তার নাই। মত্ততার বিহ্বলতায় মাতাল বিশ্বসংসারকে নগণ্য করিয়া যে অন্ধ আনন্দ উপভোগ করে, সে আনন্দের শ্রেয়স্করতা নাই। বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সৎ এবং অসৎ, ব্রহ্ম এবং সংসার উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য কর্তব্য বন্ধন ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে একেবারেই "না" করিয়া দিয়া একাকী আনন্দ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া একজাতীয় প্রমত্ততা। সত্যের একদিককে উপেক্ষা করিলে অপরদিকও অসত্য হইয়া উঠে।

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮ মাঘ ১৩০৭)

গম্যস্থানের পক্ষে পথ যেমন একই কালে পরিহার্য এবং অবলম্বনীয় ব্রহ্মলাভের পক্ষে সংসার সেইরূপ। পথকে যেমন আমরা প্রতিপদে পরিত্যাগ করি এবং আশ্রয় করি, সংসারও সেইরূপ আমাদের প্রতিপদে বর্জনীয় এবং গ্রহণীয়। পথ নাই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া পথপ্রান্তে পড়িয়া স্বপ্ন দেখিলে গৃহলাভ হয় না—এবং পথকেই শেষ লক্ষ্য বলিয়া বসিয়া থাকিলে গৃহে গমন ঘটে না। গম্যস্থানকে যে ভালোবাসে, পথকেও সে ভালোবাসে—পথ গম্যস্থানেরই অঙ্গ, অংশ এবং আরম্ভ বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মকে যে চায়, ব্রহ্মের সংসারকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না—সংসারকে সে প্রীতি করে এবং সংসারের কর্মকে ব্রহ্মের কর্ম বলিয়াই জানে।

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮ মাঘ ১৩০৭)

যাঁহারা দ্বিজ তাঁহাদিগকে এক সময় কর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন তাঁহারা আর ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, বৈশ্য নহেন—তখন তাঁহারা নিত্যকালের মানুষ—তখন কর্ম তাঁহাদের পক্ষে আর ধর্ম নহে, সুতরাং অনায়াসে পরিহার্য। এইরূপে দ্বিজসমাজ বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই রক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন, অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে, অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করিবে। এই সংসারই মৃত্যু নিকেতন, ইহাই অবিদ্যা—ইহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইলে ইহার ভিতর দিয়াই যাইতে হয়; কিন্তু এমনভাবে যাইতে হয়, যেন ইহাই চরম না হইয়া ওঠে। কর্মকেই একান্ত প্রাধান্য দিলে সংসারই চরম হইয়া ওঠে; মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না; অমৃত লাভ করিবার লক্ষ্যই ভ্রষ্ট হয়, তাহার অবকাশই থাকে না। এইজন্যই কর্মকে সীমাবদ্ধ করা, কর্মকে ধর্মের সহিত যুক্ত করা—কর্মকে প্রবৃত্তির হাতে, উত্তেজনার হাতে, কর্মজনিত বিপুল বেগের হাতে, ছাড়িয়া না দেওয়া—এবং এইজন্যই ভারতবর্ষে কর্মভেদ বিশেষ বিশেষ জনশ্রেণীতে নির্দিষ্ট করা।

ইহাই আদর্শ। ধর্ম ও কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং মানুষের চিত্ত হইতে

কর্মের নানা পাশ শিথিল করিয়া তাহাকে একদিকে সংসারব্রতপরায়ণ অন্য দিকে মুক্তির অধিকারী করিবার অন্য কোনো উপায় তো দেখি না। এই আদর্শ উন্নততম আদর্শ, এবং ভারতবর্ষের আদর্শ।

(ব্রাহ্মণ, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩০৯)

বন্ধন ও মুক্তি, উপায় ও উদ্দেশ্য, উভয়কেই মান্য করিবার কথা প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেও দেখা যায়। ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুকে প্রথমে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার পরে অমৃত লাভ। সংসারের ভিতর দিয়া এই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তারপরে ব্রহ্মলাভের কথা; সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না।

(ততঃ কিম্, ধর্ম, অগ্রহায়ণ ১৩১৩)

যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।

এই সমস্যার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যা দ্বারা জীব অমৃত লাভ করে।

ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। কারণ, তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত-কিছু-বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।

(কর্ম, শান্তিনিকেতন, ২৭ পৌষ ১৩১৫)

উপনিষৎ বলেছেন যারা অবিদ্যাকেই সংসারকেই একমাত্র করে জানে তারা অন্ধকারে পড়ে, আবার যারা বিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্ন করে জানে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে। একদিকে বিদ্যা আর একদিকে অবিদ্যা, একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর-একদিকে সংসার। এই দুইয়ের যেখানে সমাধান হয়েছে সেইখানেই আমাদের আত্মার স্থিতি।

(ওঁ, শান্তিনিকেতন, ১৫ই চৈত্র ১৩১৫)

ঈশোপনিষদের ঋষির কাছে আমি ফিরে যাই এবং সীমা-অসীমের এই বিরোধিতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শুনি। তিনি বলেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যাঁরা সীমাজ্ঞানের খাতিরেই তার অনুসরণ করেন, তাঁরা সত্যকে পান না। এ যেন মরা দেয়াল, পিছনের দৃষ্টিকে আড়াল করে। এই জ্ঞান কেবল সঞ্চয় করে, কিন্তু দীপ্তি দেয় না। এ যেন আলোহীন প্রদীপ, সঙ্গীতহীন বেহালা। বইয়ের পাতা মেপে, ওজন করে ও গুণে আপনি বইটিকে জানতে পারেন না, এর কাগজ বিশ্লেষণ করেও না। একটি কৌতূহলী মূষিক পিয়ানোর কাঠের ফ্রেম দংশন করতে পারে, এর সব কটি তার কেটে ফেলতে পারে। তথাপি সংগীত থেকে সে ক্রমশঃই দূরে চলে যাবে। এ হল সীমার খাতিরে সীমার অন্বেষণ।

কিন্তু উপনিষদের মতে, অসীমের একান্ত অন্বেষণ আরো গাঢ় অন্ধকারে আমাদের নিয়ে যায়, কেন না পরম অসীম শূন্যতা মাত্র। সীমা হল একটা কিছু; একটা ব্যাঙ্কে জমাহীন হিসেবের চেক বইয়ের মতো। কিন্তু পরম অসীমের কোনো কিছুই জমা নেই। এমন-কি চেক-বই পর্যন্ত না। আদিম মানুষ গভীর মানসিক অজ্ঞতায় বিশ্বাস করত যে ব্যক্তিগত খেয়ালের বশে প্রতিটি আপেল মাটিতে পড়ে। কিন্তু তুলনায় আদিম মানুষের অজ্ঞতা কিছুই না বলে মনে হয় যখন জানি এমন মানুষও আছে যে এমন মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের ধ্যানরত যেখানে আপেল বা কোনো কিছুই পড়ে না।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিষয়ের সেবা-ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়। এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না; তাকে বিশুদ্ধ-রূপে পূর্ণ করে তবে উঠতে হয়। তাই উপনিষৎ বলেছেন : অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃত লাভ হবে। শুক্রাচার্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্য পাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্ছে জড় বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম-মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েছে। এইটে হচ্ছে সাধনার সব-নিচেকার ভিত, কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামি করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এমনি ক'রে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে উপর-পানে মাথা তোলবার ফুরসুত তার নেই বললেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, না-জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্য বন্ধন

কল্পনা করি সেও মায়া; এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিম মহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে; সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের ক'রে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্বপশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এইখানে বিজ্ঞানকে চাই। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্‌ এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেছেন তখন পূর্বপশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশংকা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর-একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে।.. আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তা হলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়।

(শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, আশ্বিন ১৩২৮)

সৃষ্টি তো কালের সৃষ্টি নয়—সে যে মনের সৃষ্টি। মনকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা, আর রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ গান একই কথা।

বৈজ্ঞানিক ব'ল্‌বেন—এক এক মন এক এক রকমের সৃষ্টি যদি ক'রে বসে তা হ'লে সেটা যে অনাসৃষ্টি হ'য়ে দাঁড়ায়।

আমি বলি,—তা তো হয় নি। হাজার লক্ষ মনের যোগে হাজার লক্ষ সৃষ্টি কিন্তু তবুও তো দেখি সেই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। তাই তো তোমার কথা আমি বুঝি, আমার কথা তুমি বোঝ।

তার কারণ হ'চ্ছে, আমার এক্‌-টুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমারই হ'ত তা হ'লে মনের সঙ্গে মনের কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটা জগদ্ব্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ হয়েচে বলেই যে সেটা খণ্ডিত তা নয়। সেইজন্যেই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যতত্ত্ব আছে। তা না হ'লে মানুষের সমাজ গড়্‌ত না। মানুষের ইতিহাসের কোনো অর্থ থাক্‌ত না।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ক'র্‌চেন, এই মন পদার্থটা কী শুনি।

আমি উত্তর করি যে, তোমার ঈথর-পদার্থের চেয়ে কম আশ্চর্য এবং অনির্বচনীয় নয়। অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেচেন সেইটে হ'ল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল; সেই দিকেই রূপরসগন্ধ; সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ।

বৈজ্ঞানিক বলেন, অসীমের সীমা এ সব কথা কবি যখন আলোচনা করেন তখন কি কবিরাজ ডাকা আবশ্যক হয় না?

আমার উত্তর এই যে, এ আলোচনা নতুন নয়। পুরাতন নজির আছে। ক্ষ্যাপার বংশ সনাতন কাল থেকে চলে আস্‌ছে। তাই পুরাতন ঋষি ব'ল্‌চেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যে-লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরো বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

অন্তকে অনন্তকে সে একত্র ক'রে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।

(আমার জগৎ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০
অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১৩

সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারেই ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয় সে কথাও আছে। তাঁরা ব'ল্‌চেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কী ক'রে? আবার যদি বিরোধ থাকে তা হ'লেই বা সৃষ্টি হয় কী ক'রে? সেই জন্যে অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সংকুচিত ক'রেচেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি সেইখানেই তাঁর বহুত্ব—কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেন নি।

(আমার জগৎ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ১২
সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪

আমরা ডাঙার লোকেরা ভগবানের সমাপ্তির দিককেই সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি। তাহাতে ক্ষতি হইত না। কিন্তু আমরা তাঁহার ব্যাপ্তির দিকটাকে একেবারেই মিথ্যা বলিয়া, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছি—সত্যকে এক অংশে মিথ্যা বলিলেই তাহাকে অপরাংশেও মিথ্যা করিয়া তোলা হয়। আমরা স্থিতিকে আনন্দকে মানিলাম, কিন্তু শক্তিকে দুঃখকে মানিলাম না। তাই আমরা রাণীকে অপমান করাতে রাজার স্তব করিয়াও রক্ষা পাইলাম না; সত্য আমাদিগকে শত শত বৎসর ধরিয়া নানা আঘাতেই মারিতেছেন।

সমুদ্রের লোকেরা ভগবানের ব্যাপ্তির দিকটাকেই একেবারে একান্ত সত্য করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা সমাপ্তিকে কোনোমতেই মানিবে না, এই তাহাদের পণ। এইজন্য বাহিরের দিকে তাহারা যেমন কেবলই আহরণ করিতেছে অথচ সন্তোষ নাই বলিয়া কিছুকেই লাভ করিতেছে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের দিকেও তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, সত্যের মধ্যে গম্যস্থান বলিয়া কোনো পদার্থই নাই, আছে কেবল গমন। কেবলই হইয়া উঠা, কিন্তু কী-যে হইয়া উঠা তাহার কোনো ঠিকানা কোনো-খানেই নাই। ইহা এমন একটি সমুদ্রের মতো যাহার কূলও নাই, তলও নাই, আছে কেবল ঢেউ—যাহা পিপাসাও মেটায় না, ফসলও ফলায় না, কেবলই দোলা দেয়।

আমরা দেখিলাম আনন্দকে, আর দুঃখকে বলিলাম মিথ্যা মায়া; উহারা দেখিল দুঃখকে, আর আনন্দকে বলিল মিথ্যা মায়া। কিন্তু, পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে তো কোনোটাই বাদ পড়িতে পারে না; পূর্ব পশ্চিম সেখানে না মিলিলে পূর্বও মিথ্যা হয়, পশ্চিমও মিথ্যা হয়। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—অর্থাৎ, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু জন্মিতেছে—এ কথা যেমন সত্য, 'স তপোঽতপ্যত' অর্থাৎ, তপস্যা হইতে দুঃখ হইতেই সমস্ত-কিছু সৃষ্ট হইতেছে, এ কথা তেমনি সত্য। গায়কের চিত্তে দেশকালের অতীত গানের পূর্ণ আনন্দও যেমন সত্য আবার দেশকালের ভিতর দিয়া গান গাহিয়া প্রকাশ করিবার বেদনাও তেমনি সত্য। এই আনন্দ এবং দুঃখ, এই সমাপ্তি ও ব্যাপ্তি এই চিরপুরাতন এবং চিরনূতন, এই ধনধান্যপূর্ণ ভূমি ও দুঃখাশ্রু-চঞ্চল সমুদ্র, উভয়কে মিলিত করিয়া স্বীকার করাই সত্যকে স্বীকার করা।

এইজন্য দেখিতেছি, যাহারা চরমকে না মানিয়া কেবল বিকাশকেই মানিতেছে তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া অপঘাত মৃত্যুর অভিমুখে ছুটিতেছে, পদে পদেই তাহাদের জাহাজ কেবল আকস্মিক বিপ্লবের চোরা পাহাড়ের উপর গিয়া ঠেকিতেছে। আর, যাহারা বিকাশকে মিথ্যা বলিয়া কেবলমাত্র চরমকেই মানিতে চায়, তাহারা নির্বীর্য ও জীর্ণ হইয়া এক শয্যায় পড়িয়া অভিভূত হইয়া মরিতেছে।

কিন্তু, চলিতে চলিতে একদিন ঐ ডাঙার গাড়ি এবং সমুদ্রের জাহাজ যখন একই বন্দরে আসিয়া পৌঁছিবে এবং দুই পক্ষের মধ্যে পণ্য বিনিময় হইবে তখনি উভয়ে বাঁচিয়া যাইবে। নহিলে কেবলমাত্র আপনার পণ্য দিয়া কেহ আপনার দারিদ্র্য ঘুচাইতে পারে না; বিনিময় না করিতে পারিলে বাণিজ্য চলে না এবং বাণিজ্য না চলিলে লক্ষ্মীর দেখা পাওয়া যায় না।

এই বাণিজ্যের যোগেই মানুষ পরস্পর মিলিবে বলিয়াই, পৃথিবীতে ঐশ্বর্য দিকে দিকে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একদা জীবরাজ্যে স্ত্রীপুরুষের বিভাগ ঘটাতেই যেমন দেখিতে দেখিতে বিচিত্র সুখদুঃখের আকর্ষণের ভিতর দিয়া প্রাণীদের প্রাণসম্পদ আজ আশ্চর্যরূপে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তেমনি মানুষের প্রকৃতিও কেহ-বা স্থিতিকে কেহ-বা গতিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করাতেই, আজ আমরা এমন একটি মিলনকে আশা করিতেছি মানুষের সভ্যতাকে যাহা বিচিত্রভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে।

(জলস্থল, পথের সঞ্চয়, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)

মানুষের উদ্যম যখন কেবলই একটানা চলিতে থাকে তখন সে একটা জায়গায় আসিয়া আপনাকে আপনি ব্যর্থ করিয়া বসে। পূর্ণতায় পথ সোজা পথ নহে। সেইজন্য আজ য়ুরোপের যাহা বেদনা আমাদের বেদনা কখনোই তাহা নহে। য়ুরোপ তাহার দেহকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে।

আমাদের আত্মা দেহ হারাইয়া প্রেতের মতো পৃথিবীতে নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেছে। সেই আত্মার বাহ্য প্রতিষ্ঠা কোথায়? তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরের সাধর্ম্য আছে,—সে আপনার ঐশ্বর্য বিস্তার না করিয়া বাঁচে না। সে যে আপনাকে নানা দিকে প্রকাশ করিতে চায়—রাজ্যে, বাণিজ্যে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে—এখানে সেই প্রকাশের উপকরণ কই? সেই উপকরণের প্রতি তাহার কর্তৃত্ব কোথায়? দেখিতেছি, তাহার কলেবর এক জায়গায় যদি বাঁধে তো আর-এক জায়গায় আলগা হইয়া পড়ে—ক্ষণ-কালের জন্য যদি তাহা নিবিড় হইয়া দাঁড়ায় তবে পরক্ষণেই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। তাই আজ যেমন করিয়াই হউক, আমাদিগকে এই দেহতত্ত্ব সাধন করিতে হইবে; যেমন করিয়া হউক, আমাদিগকে এই কথাটা বুঝিতে হইবে যে, কলেবরহীন আত্মা কখনোই সত্য নহে— কেননা, কলেবর আত্মারই একটা দিক। তাহা গতির দিক, শক্তির দিক, মৃত্যুর দিক—কিন্তু তাহারই সহযোগে আত্মার স্থিতি, আনন্দ, অমৃত। এই কলেবর-সৃষ্টির অসম্পূর্ণতাতেই আমাদের দেশের শ্রীহীন আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। বাহিরের সত্যকে দূরে ফেলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা কেবলই অবাধে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। সে আপনার ওজন হারাইয়া ফেলিতেছে, এইজন্য তাহার অন্ধ-বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ নাই, কোনো পরিমাণ নাই; এইজন্য কোথাও বা সত্যকে লইয়া সে মায়ার মতো খেলা করিতেছে, কোথাও বা মায়াকে লইয়া সে সত্যের মতো ব্যবহার করিতেছে।

(সমুদ্র পাড়ি, পথের সঞ্চয়, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)

সীমা আছে এ কথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন এ কথা তেমনি সত্য। আমরা উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তখনই আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি। তখনই আমরা এমন একটা ভুল করিয়া বসি যে, আপনার সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই বুঝি আমরা অসীমকে পাইব—যেন আত্মহত্যা করিলেই অমরজীবন পাওয়া যায়। যেন আমি না হইয়া আর-কিছু হইলেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু, আমি হওয়াও যা আর-কিছু হওয়া যে তাহাই, সে কথা মনে থাকে না। আমার এই আমির মধ্যে যদি ব্যর্থতা থাকে তবে অন্য কোন আমিত্ব লাভ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। আমার ঘটের মধ্যে ছিদ্র থাকাতে যদি জল বাহির হইয়া যায় তবে সে জলের দোষ নহে। দুধ ঢালিলেও সেই দশা হইবে, এবং মধু ঢালিলেও তথৈব চ।

(সীমার সার্থকতা, পথের সঞ্চয়, প্রথম প্রকাশ,
তত্ত্ববোধিনী, আশ্বিন ১৩১৯)

ধর্মের সাহায্যে মানুষ আপনার সীমা খুঁজিতেছে, অথচ সেই ধর্মের সাহায্যেই মানুষ আপনার অসীমকে খুঁজিতেছে। ইহাই আশ্চর্য। বিশ্বসংসারে সমস্ত পূর্ণতার মূলেই আমরা এই দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। যাহা ছোটো করে তাহাই বড়ো করে, যাহা পৃথক করিয়া দেয় তাহাই এক করিয়া আনে, যাহা বাঁধে তাহাই মুক্তিদান করে; অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে। বস্তুত, এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা। যেখানে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া একটা দিকই প্রবল হইয়া উঠে সেইখানেই যত অমঙ্গল। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তাহা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে নির্দেশ করে না সেখানে তাহা নিরর্থক। মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে

সেখানে তাহা উন্মত্ততা, বন্ধন যেখানে মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু, আসল কথা এই, অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিযুক্ত অসীমও মায়া।

যে গান আপনার সুরের সীমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে সে গান কেবলমাত্র সুর-সমষ্টিকে প্রকাশ করে না—সে আপনার নিয়মের দ্বারাই আনন্দকে, সীমার দ্বারাই সীমার চেয়ে বড়োকে ব্যক্ত করে। গোলাপ-ফুল সম্পূর্ণরূপে আপনার সীমাকে লাভ করিয়াছে বলিয়াই সেই সীমার দ্বারা সে একটি অসীম সৌন্দর্যকে প্রকাশ করিতে থাকে। এই সীমার দ্বারা গোলাপ-ফুল প্রকৃতিরাজ্যে একটি বস্তুবিশেষ কিন্তু ভাবরাজ্যে আনন্দ। এই সীমাই তাহাকে একদিকে বাঁধিয়াছে আর-এক দিকে ছাড়িয়াছে।

(সীমা ও অসীমতা, পথের সঞ্চয়, কার্তিক ১৩১৯)

মানুষ যখন জগৎকে না'এর দিক থেকে দেখে তখন তার রূপক একেবারে উলটে যায়। প্রকাশের একটা উলটো পিঠ আছে, সে হচ্ছে প্রলয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ছাড়া প্রাণের বিকাশ হতেই পারে না। হয়ে-ওঠার মধ্যে দুটো জিনিস থাকাই চাই—যাওয়া এবং হওয়া। হওয়াটাই হচ্ছে মুখ্য, যাওয়াটাই গৌণ।

কিন্তু, মানুষ যদি উলটো পিঠেই চোখ রাখে, বলে, সবই যাচ্ছে, কিছুই থাকছে না—বলে, জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখছি এ সমস্তই 'না' —তা হলে এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো ক'রে, ভয়ংকর ক'রে দেখে। তখন সে দেখে, এই কালো কোথাও এগোচ্ছে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য করছে। আর, অনন্ত রয়েছেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মতো চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু স্তব্ধকে স্পর্শ করতে পারছে না। এই কালো দৃশ্যত আছে, কিন্তু বস্তুত নেই; আর, যিনি কেবলমাত্র আছেন তিনি স্থির, ওই প্রলয়রূপিণী না-থাকা তাঁকে লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের লীলা নেই; এখানে যোগের অর্থ হচ্ছে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যেই এক। মিলনে এক নয়, প্রলয়ে এক।

কথাটাকে আর-একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি।

একজন লোক ব্যবসা করছে। সে লোক করছে কী? তার মূলধনকে অর্থাৎ পাওয়া সম্পদকে সে মুনফা অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ করছে। পাওয়া সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার ক'রে না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেছে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে কিন্তু তার বাঁশি বাজছে, সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে বণিক সেই বাঁশি শোনে সে আপন ব্যাঙ্কে-জমানো কোম্পানি-কাগজের কূল ত্যাগ করে সাগর গিরি ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কী দেখছি? না, পাওয়া সম্পদের সঙ্গে না-পাওয়া সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ। কেননা, এই যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্ছে, এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্ছে।

কিন্তু মনে করা যাক, একজন ভীতু লোক বণিকের খাতায় ওই খরচের দিকের হিসাবটাই দেখছে। বণিক কেবলই আপনার পাওয়া টাকা খরচ করেই চলেছে, তার অন্ত নেই। তার গা শিউরে ওঠে। সে বলে, এই তো প্রলয়! খরচের হিসাবের কালো

অঙ্কগুলো রক্তলোলুপ রসনা দুলিয়ে কেবলই যে নৃত্য করছে! যা খরচ, অর্থাৎ বস্তুত যা নেই, তাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্ক-বস্তুর আকার ধরে খাতা জুড়ে বেড়ে বেড়েই চলেছে! একেই তো বলে মায়া! বণিক মুগ্ধ হয়ে এই মায়া-অঙ্কটির চিরদীর্ঘায়মাণ শৃঙ্খল কাটাতে পারছে না। এ স্থলে মুক্তিটা কী? না, ওই সচল অংকগুলোকে একেবারে লোপ করে দিয়ে খাতার নিশ্চল নির্বিকার শুভ্র কাগজের মধ্যে নিরাপদ ও নিরঞ্জন হয়ে স্থিরত্ব লাভ করা। দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে-একটি আনন্দময় সম্বন্ধ আছে, যে সম্বন্ধ থাকার দরুণ মানুষ দুঃসাহসের পথে যাত্রা ক'রে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জয়লাভ করে, ভীতু মানুষ তাকে দেখতে পায় না।

(জাপানযাত্রী, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)

গান ও গান গাওয়া যেমন এক, সীমা ও অসীম তেমনি এক। গান গাওয়া ব্যাপারটি অসম্পূর্ণ; সম্পূর্ণ হল গান। গান গাওয়া তার ক্রমান্বয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গানকে পথ ছেড়ে দেয়। পরম অসীম এমন এক সংগীত যা সকল স্পষ্ট সুর-ছাড়া, আর সে কারণেই অর্থহীন।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পরম অনন্ত হচ্ছে কালহীনতা, আর তার কোনো অর্থই নেই—এ কেবল একটি শব্দ। যেখানে সকল সময় সংহত হয়ে আছে সেখানেই অনন্তের সত্যতা।

সেই কারণে উপনিষৎ বলেছেন—

....

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয়ঃ ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥

আমরা দেখেছি যে বস্তুসমূহের আকৃতি ও তাদের পরিবর্তনসমূহের একেবারেই কোনো পরম বাস্তবতা নেই। আমাদের ব্যক্তিত্বে তাদের সত্যের অধিষ্ঠান, আর কেবল সেখানেই তা বাস্তব, বিমূর্ত নয়। আমরা দেখেছি, যদি আমাদের মনের চলাফেরা, দেশকাল পরিবর্তন করে, তবে একটি পর্বত ও একটি জলপ্রপাত অন্য-কিছু হয়ে যেতে পারে, অথবা আমাদের কাছে কিছুই না বলে মনে হতে পারে।

আমরা আরো দেখেছি, আমাদের এই সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ জগৎ স্বেচ্ছাচারী নয়। এ ব্যক্তিগত, অথচ বিশ্বগত। আমার জগৎ আমারই, এর উপাদান আমার মন, তথাপি আপনার জগৎ নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বে নিহিত নয়, বরং এক সীমাহীন ব্যক্তিত্বের অধীন।

যখন এই ব্যক্তিত্বের স্থলে আমরা আইনকে বসাই, তখন সমস্ত জগৎ বিমূর্ততায় ভেঙে পড়ে। তখন তা হয়ে পড়ে উপাদান ও শক্তি, আয়ন ও ইলেকট্রন। তখন তার রূপ নষ্ট হয়, স্পর্শবোধ ও রুচি বিলুপ্ত হয়। তখন সৌন্দর্য-মুখর বিশ্ব-নাটক নীরব হয়, সংগীত নিস্তব্ধ হয়। তখন অন্ধকারে বিশ্বরঙ্গমঞ্চের কলাকৌশল প্রেতে পরিণত হয়, অকল্পনীয় নাস্তিত্বের ছায়া দর্শকহীন প্রেক্ষাগৃহে দেখা দেয়।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমি নির্গুণ নিরঞ্জন নির্বিশেষের সাধক এমন একটা আভাস তোমার চিঠিতে পাওয়া গেল। কোনো একদিক থেকে সেটা হয় তো সত্য হতেও পারে—যেখানে সমস্তই শূন্য সেখানেও সমস্তই পূর্ণ-যিনি তিনি আছেন এটাও উপলব্ধি না করব কেন? আবার এর উল্টো কথাটাও আমারি মনের কথা। যেখানে সব-কিছু আছে সেখানেই সবার অতীত সব হয়ে বিরাজ করেন এটাও যদি না জানি তা হলে সেও বিষম ফাঁকি।

আজ এই প্রৌঢ় বসন্তের হাওয়ায় বেলফুলের গন্ধসিঞ্চিত প্রভাতের আকাশে একটা রামকেলী রাগিণীর গান থাকে ব্যাপ্ত হয়ে—স্তব্ধ হয়ে একা একা বেড়াই যখন, তখন সেই অনাহত বীণার আলাপে মন ওঠে ভরে। এই হলো গানের অন্তলীন গভীরতা। তার পরে হয় তো ঘরে এসে দেখি গান শোনবার লোক বসে আছে—তখন গান ধরি, "প্যালা ভর ভর লায়ীরি।" সেই ধ্বনিলোকে দেহমন সুরে সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে, যা-কিছুকে সেই সুর স্পর্শ করে তাই হয় অপূর্ব। এও তো ছাড়বার জো নেই। সুরের গান, না-সুরের গান, কাকে ছেড়ে কাকে বাছব? আমি দুইকেই সমান স্বীকার করে নিয়েছি।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ১২ এপ্রিল ১৯৩১)

উপনিষদ্ বলেন, অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশে কালে অভিব্যক্ত।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ১৬

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্যকেই দেবতা বলে পূজো করতেন। আবার উপনিষদের ঋষি সেই সূর্যকেই বলেছেন, 'হে সূর্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত করো, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ময় সত্যদেবতাকে দেখি।'

(ভারতপথিক রামমোহন রায়, রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে বক্তৃতা;
১০ আশ্বিন ১৩২২)

ঈশোপনিষদের কবি তাঁর উপদেশাবলীর শেষভাগে আকস্মিকভাবে একটি শোকে আত্মোদ্ঘাটন করেছেন—যা তার সারল্যে প্রভাত-সূর্যের প্রতি বিশাল পৃথিবীর দৃষ্টিক্ষেপের গীতি-নৈঃশব্দবাহী। কবি গেয়েছেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্

সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রত্যেক মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা। সৃষ্টির যে লীলা, তার এক দিকে আবরণ আর-এক দিকে প্রকাশ। প্রকাশের যে আনন্দ, দেশকালের মধ্যে দিয়ে সে আপন আবরণ মোচনের দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করছে। উপনিষদ বলছেন—'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্', হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হয়ে আছে। কিন্তু একান্তই যদি আবৃত হয়ে থাকত তা হলে পাত্রকেই জানতুম, সত্যকে জানতুম না। সত্য যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এ কথা বলবারও জোর থাকত না। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে সত্যের প্রকাশের প্রক্রিয়া সেইজন্যে উপনিষদের ঋষি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে বলতে পেরেছেন, 'হে সূর্য, তোমার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সত্যকে দেখি।'

মানুষ যে এমন কথা বলতে পেরেছে তার কারণ এই, মানুষ নিজের মধ্যেই দেখছে যে, প্রত্যক্ষ যে অবস্থার মধ্যে সে বিরাজমান সেইটেই তার চরম নয়। তার লোভ আছে এবং লোভ চরিতার্থ করবার প্রবল বাসনা আছে; কিন্তু তার অন্তরাত্মা বলছে, লোভের আবরণ থেকে মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিতে চাই। অর্থাৎ যে পদার্থটা তার মধ্যে অতিরিক্ত-মাত্রায় প্রবল হয়ে আছে সেটাকে সে আপন মনুষ্যত্বের প্রকাশ বলে স্বীকার করে না, বাধা বলেই স্বীকার করে। যা আছে তাই সত্য, যা প্রতীয়মান তাই প্রতীতির যোগ্য, মানুষ এ কথা বলে নি। পশুবৎ বর্বর মানুষের মধ্যে বাহ্যশক্তি যতই প্রবল থাক্, তার সত্য যে ক্ষীণ অর্থাৎ তার প্রকাশ যে বাধাগ্রস্ত এ কথা মানুষ প্রথম থেকেই কোনরকম করে উপলব্ধি করেছিল বলেই সে যাকে সভ্যতা বলে সে পদার্থটা তার কাছে নিরর্থক হয় নি।

সভ্যতা-শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা-শব্দের ধাতুগত অর্থ এই যে, যেখানে আভা যেখানে আলোক আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে। যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণে আচ্ছন্ন। এইজন্যেই মানুষ কেবলই আপনাকে আপনি বলছে—'অপাবৃণু,' খুলে ফেলো, তোমার একলা-আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার সকল-আপনের সত্যে প্রকাশিত হও; সেইখানেই তোমার দীপ্তি, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

(বিশ্বভারতী, রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ বৈশাখ ১৩৩০)

মানুষের আত্মা বলছে, 'অপাবৃণু'—আবরণ উদ্‌ঘাটন করো। মনুষ্যত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়েছে বলে স্বজাতির নামে পাপাচরণ সবন্ধে মানুষ এতদিন এমন স্পষ্ট ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে, এবং মনে করতে পেরেছে যে, তাতে তার কোন ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যখন আপনার মুষল আপনি প্রসব করতে আরম্ভ করেছে তখন য়ুরোপে নেশন আপনার মূর্তি দেখে আপনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

নূতন যুগের বাণী এই যে, আবরণ খোলো, হে মানব, আপন উদার রূপ প্রকাশ করো।

(বিশ্বভারতী, রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ বৈশাখ ১৩৩০)

সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ঐ মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়েছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ঐ আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ঐ আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র; অন্তরে ঐ তেজই মানসভাব ধারণ করে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রঙ, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। ঐ যে-জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক-এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হল। এখনই আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়স্বরূপ নয় যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঁকার ধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে।

হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হয়ে, গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, জয় হোক! বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও! এই ঢাকা-খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা-খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ। অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝর ধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষন্, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরন্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক।

(পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪)

ঈশোপনিষদে বলেছেন, হে পূষন্, তোমার ঢাকা খুলে ফেলো, সত্যের মুখ দেখি; আমার মধ্যে যিনি সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।

এই বাদলার অন্ধকারে আজ আমার মধ্যে যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ সে ঐ ব্যাকুলতারই একটি রূপ। সেও বলছে, হে পূষন্, তোমার ঐ ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার জ্যোতির মধ্যে আমার আত্মাকে উজ্জ্বল দেখি। অবসাদ দূর হোক। আমার চিত্তের বাঁশিতে তোমার আলোকের নিশ্বাস পূর্ণ করো—সমস্ত আকাশ আনন্দের গানে জাগ্রত হয়ে উঠুক। আমার প্রাণ-যে তোমার আলোকেরই একটা প্রকাশ, আমার দেহও তাই। আমার চিত্তকে তোমার জ্যোতিরঙ্গুলি যখনই স্পর্শ করে তখনই তো ভূর্ভুবস্বঃ দীপ্যমান হয়ে ওঠে। মেঘে মেঘে তোমার যেমন নানা রঙ আমার ভাবনায় ভাবনায় তোমার তেজ তেমনি সুখদুঃখের কত রঙ লাগিয়ে দিচ্ছে। একই জ্যোতি বাইরের পুষ্প পল্লবের বর্ণে গন্ধে এবং অন্তরের রাগে অনুরাগে বিচিত্র হয়ে ঠিকরে পড়ছে। প্রভাতে সন্ধ্যায় তোমার গান দিকে দিগন্তে বেজে ওঠে; তেমনি তোমারই গান আমার কবির চিত্ত গলিয়ে দিয়ে ভাষার স্রোতে ছন্দের নাচে বয়ে চলল। এক জ্যোতির এত রঙ, এত রূপ, এত ভাব এত রস! অন্ধকারের সঙ্গে নিত্য ঘাতে প্রতিঘাতে তার এত নৃত্য, এত গান,

তার এত ভাঙা, এত গড়া—তারি সারথ্যে যুগযুগান্তরের এমন রথযাত্রা! তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনাই তো গাছ হয়ে, ঘাস হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, অপাবৃণু—ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা-খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলা থেকেই তার ফুলফল। এই প্রার্থনাই আদিম জীবাণুর মধ্যে দিয়ে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত। মানুষের প্রাণের ঘাট পেরিয়ে মানুষের চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। মানুষের ইতিহাস বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খোলো। জীব বলছে, আমার মধ্যে যে সত্য আছে তার জ্যোতির্ময় পূর্ণস্বরূপ দেখি। হে পূষন্, হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের মুখের আবরণ ঘুচুক, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক—সেই রহস্য আমার মধ্যে তোমার মধ্যে একই।

প্রাণ যখন ক্লান্ত হয় তখন বলি, সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাক, সৃষ্টির লীলা-তরঙ্গে আর উঠতে নামতে পারি নে; পাত্রের ঢাকা কেবল খুলে যাক তা নয় পাত্রটাই যাক ভেঙে, একের বক্ষে বিরাজ না করে একের মধ্যে বিলুপ্ত হই। ভারতবর্ষে এই প্রার্থনা ক্ষণে ক্ষণে শুনতে পাই।

কিন্তু আমি বলি, অপাবৃণু, সত্যের মুখ খুলে দাও—একেকে অন্তরে বাহিরে ভালো করে দেখি, তা হলেই অনেককে ভালো করে বুঝতে পারব। গানের মধ্যে আগাগোড়া যে একটি আনন্দময় এক আছে তাকে যতক্ষণ বুঝতে না পারি ততক্ষণ সুরের সঙ্গে সুরের দ্বন্দ্ব আমাকে সুখ দেয় না, আমাকে পীড়া দেয়। তাই বলে আমি বলব না, গান যাক লুপ্ত হয়ে; আমি বলব, পূর্ণ গানটাকে অন্তরে যেন জানি, তা হলেই খণ্ড সুরের দ্বন্দ্বটা বাহিরে আমাকে আর বাজবে না, সেটাকেও অখণ্ড আনন্দের মধ্যে বিধৃত করে দেখব।

(পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪)

অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সঙ্কুচিত ক'রেচেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি সেইখানেই তাঁর বহুত্ব—কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেন নি।

নিজের অস্তিত্বটার কথা চিন্তা কর্‌লে এ কথা বোঝা সহজ হবে। আমি আমার চলাফেরা কথাবার্তায় প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে প্রকাশ ক'রচি—সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম ক'রে আছি। আমার এক কোটিতে অন্ত আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য। আমার ব্যক্ত-আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।

তার পরে কথা এই যে, তবে এই আমিটা কোথা থেকে আসে। সেটাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত ক'রেছেন সেখানেই অহঙ্কার। সোঽহমস্মি। সেখানেই তিনি হ'চ্চেন আমি আছি। অসীমের বাণী, অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্চে, অহমস্মি। আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হ'ল সেইখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম ব'ল্‌চেন, অহমস্মি। আমি আছি, এইটেই হচ্চে সৃষ্টির ভাষা।

(আমার জগৎ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

আমাদের শাস্ত্রে সোঽহম্ ব'লে যে তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে তা যত বড়ো অহংকারের মতো শুনতে হয় আসলে তা নয়। এতে ছোটোকে বড়ো বলা হয়নি। এতে

সত্যকে ব্যাপক বলা হয়েছে। আমার যে ব্যক্তিগত আমি তাকে ব্যাপ্ত করে আছে বিশ্বগত আমি। মাথায় জটা ধারণ করলে, গায়ে ছাই মাখলে, বা মুখে এই শব্দ উচ্চারণ করলেই সোঽহম্-সত্যকে প্রকাশ করা হল, এমন কথা যে মনে করে সেই অহংকৃত। যে-আমি সকলের সেই আমিই আমারও এটা সত্য, কিন্তু এই সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল এই সাধনাই নানা রূপে নানা নামে নানা সংকল্পের মধ্য দিয়ে চলেছে। যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার ব'লে সকলের মধ্যে জানা যে-পরিমাণে আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি। মানুষের রিপু মাঝখানে এসে এই সোঽহম্-উপলব্ধিকে দুই ভাগ করে দেয়, একান্ত হয়ে ওঠে অহম্।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

......সোঽহং তত্ত্ব—অর্থাৎ, আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলে আছি যিনি আমার এবং আমার অতিরিক্ত।

আমাদের দেশে এমন-সকল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সোঽহং তত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্যে ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন জীবপ্রকৃতিকে লঙ্ঘন করবার জন্যে, মানুষের স্বাধীন দায়িত্বও ত্যাগ করেন মানব-প্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে-আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে-উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন; তাঁদের ভূমা সব-কিছু হতে বর্জিত, সুতরাং তাঁর মধ্যে কর্মতত্ত্ব নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ডকর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম; যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ—যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তিকর্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

আমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সত্যসাধনার মূলে আর ভাষান্তরে এই কথাই সোঽহম্।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

একদিন ব্রাহ্মণ রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে চলে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। সেদিনকার সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করলে। কিন্তু, তিনি একলাই সেদিন সকলের চেয়ে বড়ো জাতিতে উঠেছিলেন যে জাতি নিখিল মানুষের। সেদিন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ধিক্‌কারের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রামানন্দই বলেছিলেন সোঽহম্; সেই সত্যের শক্তিতেই তিনি পার হয়ে গিয়েছিলেন সেই ক্ষুদ্র সংস্কারগত ঘৃণাকে যা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে সমাজস্থিতির নামে সমাজধর্মের মূলে আঘাত করে।

একদিন যিশু খৃষ্ট বলেছিলেন, "সোঽহম্। আমি আর আমার পরমপিতা একই।" কেননা, তাঁর যে-প্রীতি যে-কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি সমান প্রসারিত

সেই প্রীতির আলোকেই আপন অহংসীমাকে ছাড়িয়ে পরম মানবের সঙ্গে তিনি আপন অভেদ দেখেছিলেন।

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে, যাবৎ নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে—একেই বলে ব্রহ্মবিহার।

এত বড়ো উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেন না, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোঽহংতত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্যে থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

আমাদের দেশে এমন আত্মাবমাননার কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, সোঽহং-তত্ত্ব সকলের নয়, কেবল তাঁদেরই যাঁরা ক্ষণজন্মা। এই ব'লে মানুষের অধিকারকে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট-ভেদে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে নিশ্চেষ্ট নিকৃষ্টতাকে আরাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে যাদের অন্ত্যজ বলা হয় তারা যেমন নিজের হেয়তাকে নিশ্চল করে রাখতে কুণ্ঠিত হয় না, তেমনি এ দেশে অগণ্য মানুষ আপন কনিষ্ঠ অধিকার নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়ে মূঢ়তাকে, চিত্তের ও ব্যবহারের দীনতাকে, বিচিত্র আকারে প্রকাশ করতে বাধা পায় না। কিন্তু, মানুষ হয়ে জন্মেছি, ললাটের লিখনে নিয়ে এসেছি সোঽহম্, এই বাণীকে সার্থক করবার জন্যেই আমরা মানুষ। আমাদের একজনেরও অগৌরব সকল মানুষের গৌরব ক্ষুণ্ণ করবে। যে সেই আপন অধিকারকে খর্ব করে সে নিজের মধ্যে তাঁর অসম্মান করে যিনি কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী —যিনি সকলের কর্মের অধ্যক্ষ, সকলের যিনি অন্তরতম সাক্ষী, সকলের মধ্যে যাঁর বাস।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

শত বৎসর বাঁচাকে সার্থক করো কর্মে, এমনতরো কর্মে যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণের সঙ্গে বলতে পারা যায় সোঽহম্। এ নয় যে, চোখ উলটিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বসে থাকতে হবে মানুষের থেকে দূরে। অসীম উদ্বৃত্ত থেকে মানুষের মধ্যে যে-শ্রেষ্ঠতা সঞ্চারিত হচ্ছে সে কেবল সত্যং ঋতং নয়, তার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ ভূতং ভবিষ্যৎ। এই-যে কর্ম, এই-যে শ্রম যা জীবিকার জন্যে নয়, এর নিরন্তর উদ্যম কোন্ সত্যে। কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল। তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে, সোঽহম্। সেই অধিকার জাতিবর্ণ-নির্বিচারে সকল মানুষেরই।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

অথর্ববেদে শুধু কেবল সত্য ও ঋতের কথা নেই, আছে রাষ্ট্রের কথাও। জন-সংঘের শ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ করবার জন্যে তার রাষ্ট্র। ছোটো টবের বাইরে বনস্পতি যদি তার হাজার শিকড় মেলতে না পারে তা হলে সে বেঁটে হয়ে, কাঠি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষ বর্জিত হয়ে থাকে। আপনার মধ্যে

যে-ভূমাকে প্রমাণ করবার দায়িত্ব মানুষের, সমস্ত জাতি বৃহৎ জীবনযাত্রায় তার থেকে বঞ্চিত হলে ইতিহাসে ধিক্‌কৃত হয়। সকলের মাঝখানে সকল কালের সম্মুখে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে না সোঽহম্, বলতে পারে না, "আমি আছি আমার মহিমায়, যে-আমি কেবল আজকের দিনের জন্যে নয়, যার আত্মঘোষণা ভাবীকালের তোরণে তোরণে ধ্বনিত হতে থাকবে।"

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে-শ্রেষ্ঠতার কথা অথর্ববেদ বলেছেন সে কোনো-একটিমাত্র বিশেষ সিদ্ধিতে নয়। মানুষের সকল তপস্যাই তার মধ্যে, মানুষের বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং সমস্ত তার অন্তর্গত। মনুষ্যত্বের বহুধা বৈচিত্র্যকে একটিমাত্র বিন্দুতে সংহত ক'রে নিশ্চল করলে হয়তো তার আত্মভোলা একটা আনন্দ আছে। কিন্তু, ততঃ কিম্, কী হবে সে আনন্দে। সে আনন্দকে বলব না শ্রেয়, বলব না চরম সত্য। সমস্ত মানব-সংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোনো একটিমাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। একটিমাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না, সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান। সেই জন্যে মানুষের মুক্তি যে-মহাপুরুষেরা কামনা করেছেন তাঁদেরই বাণী "সম্ভবামি যুগে যুগে"। যুগে যুগেই তো জন্মাচ্ছেন তাঁরা দেশে দেশে। আজও এই মুহূর্তেই জন্মেছেন, কালও জন্মাবেন। সেই জন্মের ধারা চলেছে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, এই বাণী বহন ক'রে—সোঽহম্।

I and my Father are one.

সোঽহম্ মন্ত্র মুখে আউড়িয়ে তুমি দুরাশা কর কর্ম থেকে ছুটী নিতে! সমস্ত পৃথিবী রইল পড়ে, তুমি একা যাবে দায় এড়িয়ে! যে-ভীরু চোখ বুজে মনে করে "পালিয়েছি" সে কি সত্যই পালিয়েছে। **সোঽহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভি-ব্যক্তির মন্ত্র,** কেবল একজনের না। ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে কেউ যতটুকু মুক্ত হচ্ছে সেই মুক্তি তার নিরর্থক যতক্ষণ সে তা সকলকে না দিতে পারে। বুদ্ধদেব আপনার মুক্তিতেই সত্যই যদি মুক্ত হতেন, তা হলে একজন মানুষের জন্যেও তিনি কিছুই করতেন না। দীর্ঘজীবন ধরে তাঁর তো কর্মের অন্ত ছিল না। দৈহিক প্রাণ নিয়ে তিনি যদি আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তা হলে আজ পর্যন্তই তাঁকে কাজ করতে হত আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। কেন না, যাঁরা মহাত্মা তাঁরা বিশ্বকর্মা।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক—মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক —"সোঽহম্"।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

'অপাবৃণু', হে সত্য, তোমার আবরণ অপাবৃত করো। ভারতের এই বাণী কেবল স্বদেশের জন্যে নয়, সকল দেশের সকল কালের জন্যে। এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁরই প্রকাশের ক্ষেত্র সর্বজনীন।

(ভারতপথিক রামমোহন, ১৬ পৌষ ১৩৪০)

প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্য যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।

(প্রথম খণ্ড রচনাবলীর অবতরণিকা)

আপনাকে চেনার সময় পায়নি সে,
ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দায়;
পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ,
তোমারি সঙ্গে তার রূপের মিল।

(ছয় সংখ্যক কবিতা, পত্রপুট, ২৪.১০.১৯৩৫)

এই দেহখানা বহন ক'রে আসছে দীর্ঘকাল
বহু ক্ষুদ্র মুহূর্তের রাগদ্বেষ ভয়ভাবনা,
কামনার আবর্জনারাশি।
এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাকা পড়ে
আত্মার মুক্ত রূপ।

....

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।
অসংখ্য দণ্ড-পল-নিমেষের জটিল মলিন জালে বিজড়িত
দেহটাকে সরিয়ে ফেলি মনের থেকে
যেখানে সরে যায় অন্ধকার রাতের
নানা ব্যর্থ ভাবনার অত্যুক্তি,
যায় বিস্মৃত দিনের অনবধানে পুঞ্জিত লেখন যত—
সেই সব নিমন্ত্রণলিপি নীরব যার আহ্বান,
নিঃশেষিত যার প্রত্যুত্তর।
তখন মনে পড়ে, সবিতা,
তোমার কাছে ঋষি-কবির প্রার্থনামন্ত্র,—
যে মন্ত্রে বলেছিলেন— হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।

আমিও প্রতিদিন উদয়দিগ্বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ,
বলি— হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন—
তোমার তেজোময় অঙ্গে সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে-আমার দেহের অণুপরমাণু,

তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।
(দশ সংখ্যক কবিতা, পত্রপুট, ৭.১১.১৯৩৫)

চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাতসূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ;
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম 'চাই নে কিছু চাই নে'—
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,
যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জনতা।
কালরাত্রে, শ্যামলী, ২৩.৬.১৯৩৬)

দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ, পরিচিত তীরে তীরে
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে
সন্ধ্যা-আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।
দুই তটে ক্ষান্ত হল পারাপার, ঘনালো রজনী,
বিহঙ্গের মৌনগান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড়হাতে—
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।
(৯-সংখ্যক কবিতা, প্রান্তিক, ৮.১২.১৯৩৭)

ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া

অমর্তলোকের দ্বারে
নিদ্রায়-জড়িত রাত্রি-সম।
হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত॥
(২৩ সংখ্যক কবিতা, জন্মদিনে, ৭ পৌষ ১৩৪৭)

আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোকে-আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।
(১৩ সংখ্যক কবিতা, জন্মদিনে, ১১ মাঘ ১৩৪৭)

বায়ুরনিলমমৃতমেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥ ১৭
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥ ১৮

উপসংহারে মৃত্যুহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই কবি মৃত্যু সম্পর্কে গেয়েছেন—
বায়ুরনিলমমৃতমেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম।

জীবন থেকে মৃত্যুতে, আবার মৃত্যু থেকে জীবনে যিনি পরিভ্রমণ করেছেন, ঈশোপনিষদের সেই কবি এইখানেই থেমেছেন। ব্রহ্মকে অনন্ত সত্তারূপে ও সীমাবদ্ধ প্রাণীরূপে একই সঙ্গে দেখার সাহস তাঁর আছে। তিনি ঘোষণা করেছেন কর্মের মধ্যেই জীবন, কর্মই আত্মাকে ব্যক্ত করে। আমাদের সত্তা বর্জনে ও সকলের সঙ্গে মিলনে সেই মহান্ সত্তার মধ্যে আমাদের আত্মাকে উপলব্ধি করার শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়েছেন।

ঈশোপনিষদের কবি যে গভীর সত্যকে প্রকাশ করেছেন সে সত্য সরল মনের সত্য; তা বাস্তবতার রহস্যের সঙ্গে গভীর প্রেমে আবদ্ধ। আর যে যুক্তি তার

বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশ্বকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে আসে সেই যুক্তির চূড়ান্ত বক্তব্যে এই সত্য বিশ্বাস স্থাপন করে না।

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The World of Personality. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মহাবায়ুতে আমার প্রাণবায়ু এবং এই শরীর ভস্মে মিলিত হোক॥

ওঁ, আপন কর্তব্য স্মরণ করো, আপন কৃতকার্য স্মরণ করো॥

হে অগ্নি, আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব, তুমি আমাদের সকল কার্য জান, তুমি আমাদের সমস্ত কুটিল পাপকে বিনাশ করো। তোমাকে আমরা বারংবার নমস্কার করি॥

(পরিশিষ্ট, তপতী, ভাদ্র ১৩৩৬)

যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবায়ু,
ভস্মে যার দেহ অন্ত হবে,
যাত্রাপথে সে আপন না ফেলুক ছায়া
সত্যের ধরিয়া ছদ্মবেশ।

(১৩ সংখ্যক কবিতা, জন্মদিনে, ১১ মাঘ ১৩৪৭)

উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয় এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে।

(প্রার্থনা, শান্তিনিকেতন, ২ পৌষ ১৩১৫)

কেনোপনিষৎ

সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু,
মা বিদ্বিষাবহৈ॥ (শান্তিপাঠ)

আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্যপ্রকাশ করি।...তেজস্বীভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক।...আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।

(জাতীয় বিদ্যালয়, শিক্ষা, ভাদ্র ১৩১৩)

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাংগানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্মং নিরাকরোৎ; অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণমেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

(শান্তিপাঠ)

উপনিষৎ-কথিত সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্রহ্ম আমার বাক্য প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ইন্দ্রিয়, আমার সমুদয় অংগকে পরিতৃপ্ত করুন! ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি, তিনি অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা-কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন! সেই পরমাত্মায় নিরত আমাতে উপনিষদের যে সকল ধর্ম্ম তাহাই হোক্, আমাতে তাহাই হোক্! ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

(ঔপনিষদ ব্রহ্ম, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ'—
আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ করিলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না করুন।

(মহর্ষির জন্মোৎসব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১১)

যিনি সত্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে ভাগ করতে গেলেই আমরা বাঁচিনে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় করতে হবে বাইরেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে। তাঁকে যেদিকে ত্যাগ করব সেইদিকে নিজেকেই বঞ্চিত করব। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেন নি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি। তিনি আমাকে বাহিরে ধরে রেখেছেন। তিনি আমাকে অন্তরেও জাগিয়ে রেখেছেন।

(কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। (১।১)

কেনোপনিষৎ প্রশ্ন করেছেন—কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ? প্রাণ কাহার দ্বারা তার প্রথম প্রৈতি (energy) লাভ করেছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যিনি মহাপ্রাণ তাঁর দ্বারা।

(প্রাণ ও প্রেম, শান্তিনিকেতন, ২৮শে চৈত্র ১৩১৫)

তাঁরা (আরণ্যক ঋষিগণ) গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না—রূপের ঝর্ণা অহরহ ঝরতে লাগল; তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণ প্রৈতির নব নবোন্মেষ-শালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

(ভূমিকা, বনবাণী, ২৩.১০.১৯২৬)

যে প্রথম প্রাণ
একই বেগ জাগাইছে গোপন সঞ্চারে
রসরক্তধারে
মানবশিরায় আর তরুর তন্তুতে,
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে।

(স্কুল পালানে, আকাশপ্রদীপ, ১৪.১০.১৯৩৮)

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং (১।২)
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। (১।৪)

"এই যে আমি শুনছি" এ হল সহজ কথা। তবুও মানুষ বললে, এর শেষকথা সেইখানে যেখানে ইদং সর্বনাম পৌঁছয় না। খ্যাপার মত সে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় আছে শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং—শ্রবণেরও শ্রবণ। ভৌতিক প্রণালীতে খোঁজ করতে করতে এসে ঠেকে বাতাসের কম্পনে। কিন্তু, ওখানেও রয়েছে ইদং, এই-যে কম্পন। কম্পন তো শোনা নয়। যে বলছে "আমি শুনছি" তার কাছে পৌঁছনো গেল। তারও সত্য কোথায়।

উপর থেকে নিচে পড়ল একটা পাথর। জ্ঞানের দেউড়িতে যে-দ্বারী থাকে সে খবর দিলে, এই-যে পড়েছে। নিচের দিকে উপরের বস্তুর যে-টান সেইটে ঘটল। দ্বারীর কর্তব্য শেষ হল। ভিতর মহল থেকে শোনা গেল, একে টান, ওকে টান, তাকে টান, বারে বারে 'এই যে'। কিন্তু সব 'এই-যে'কে পেরিয়ে বিশ্বজোড়া একমাত্র টান।

উপনিষদ সকলের মধ্যে এই এককে জানাই বলেন, প্রতিবোধবিদিতম্ *—প্রত্যেক

---

* কেনোপনিষৎ ২।৪

পৃথক পড়ার বোধে একটি অদ্বিতীয় টানকে সত্য বলে জানা। তেমনি, আমি শুনি, তুমি শোন, এখন শুনি, তখন শুনি, এই প্রত্যেক শোনার বোধে যে একমাত্র পরম শোনার সত্য বিদিত সেই প্রতিবোধবিদিত এক সত্যই—শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং। তার সম্বন্ধে উপনিষদ বলেন, অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। আমরা যা-কিছু জানি এবং জানি নে সব হতেই স্বতন্ত্র। ভৌতিক বিজ্ঞানেও যা গুহাহিত তাকে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কেবল যে মেলাতে পারি নে তা নয়, বলতে হয়, এ তার বিপরীত। ভাষায় বলি ভারাকর্ষণ শক্তি কিন্তু আকর্ষণ বলতে সাধারণত যা বুঝি এ তা নয়, শক্তি বলতে যা বুঝি এ তাও নয়।

প্রকৃতির গুহাহিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার করেই মানুষের বাহিরের সমৃদ্ধি; যে সত্যে তার আত্মার সমৃদ্ধি সেও গুহাহিত, তাকে সাধনা করেই পেতে হবে। সেই সাধনাকে মানুষ বলে ধর্মসাধনা।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

যদ্‌বাচাহনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ (১। ৫)
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্‌।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ (১। ৬)
নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥ (২। ২)

যিনি বাক্য দ্বারা উদিত নহেন, বাক্য যাহার দ্বারা উদিত, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।.........

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।

যাঁহাকে বলা যায় না, যাঁহাকে ভাবা যায় না তাঁহাকেই জানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নহে—যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হইত তবে তাঁহাকে জানিয়া আমাদের আনন্দামৃত লাভ হইত না। তাঁহাকে আমরা অন্তরাত্মার মধ্যে এতটুকু জানি যাহাতে বুঝিতে পারি তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহাতেই আমাদের আনন্দের শেষ থাকে না।

....

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানি এমন আমি মনে করি না, না জানি যে তাহাও নহে, আমাদের মধ্যে যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি ইহা জানেন যে, তাঁহাকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে।

শিশু কি তাহার মাতার সম্যক্‌ পরিচয় জানে? কিন্তু সে অনুভবের দ্বারা এবং এক অপূর্ব্ব সংস্কার দ্বারা এটুকু ধ্রুব জানিয়াছে যে তাহার ক্ষুধার শান্তি, তাহার ভয়ের নিবৃত্তি, তাহার সমস্ত আরাম মাতার নিকট। সে তাহার মাতাকে জানে এবং জানেও না। মাতার অপর্য্যাপ্ত স্নেহ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার সাধ্য তাহার নাই, কিন্তু

যতটুকুতে তাহার তৃপ্তি ও শান্তি ততটুকু সে আস্বাদন করে এবং আস্বাদন করিয়া ফুরাইতে পারে না। আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মকে এই জগতের মধ্যে এবং আপন অন্তরাত্মার মধ্যে কিছু জানিতে পারি এবং সেইটুকু জানাতেই ইহা জানি যে, তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না; জানি যে, তাঁহা হইতে বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ, এবং মাতৃ-অংককামী শিশুর মতো ইহাও জানিতে পারি যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—তাঁহার আনন্দ যে পাইয়াছে তাহার আর কাহারও নিকট হইতে কদাচ কোন ভয় নাই।

(ঔপনিষদ ব্রহ্ম, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

আমি তাঁকে জানতে পারলুম না একথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখি যেমন করে জানে আমি আকাশ পার হতে পারলুম না তেমনি করে জানা চাই, পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল না। আকাশ পার হওয়া গেল না জানে বলেই তার আনন্দ, এইজন্যেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কোনো প্রাপ্তি নয়, কোন সমাপ্তি নয়, কোন প্রয়োজন নয়, কিন্তু উড়েই তার আনন্দ।

পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে আমি আকাশকে শেষ করে জানলুম না এবং এই জেনে না-জানাতেই তার আনন্দ, ব্রহ্মকে জানার কথাতেও এই কথাটাই খাটে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেন, নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ, আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এও নয় আমি যে একেবারে জানিনে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন আমরা ব্রহ্মকে একেবারেই জানতে চাই, যেমন করে এই সমস্ত জিনিষপত্র জানি; নইলে আমার কিছুই হল না।

আমি বলছি আমরা তা চাইনে। যদি চাইতুম তাহলে সংসারই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে জিনিষপত্রের অন্ত কোথায়? এর উপরে আবার কেন? নীড়ের পাখি যেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন কিছুকে চাই যাকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে আছে, যাঁরা ব্রহ্মকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেকদিন হল বলেছিলেন—একদল গাঁজাখোর রাত্রে গাঁজা খাবার সভা করেছিল। টিকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে যাওয়াতে তারা সংকটে পড়েছিল। তখন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠছিল। একজন বললে, ওই যে, ওই আলোতে টিকা ধরাব। বলে টিকা নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমুখে বাড়িয়ে ধরলে। টিকা ধরল না। তখন আর একজন বললে, দূর চাঁদ বুঝি অত কাছে! দে আমাকে দে। বলে সে আরও কিছু দূরে গিয়ে টিকা বাড়িয়ে ধরলে। এমনি করে সমস্ত গাঁজাখোরের শক্তি পরাস্ত হল—টিকা ধরল না।

এই গল্পের ভাবখানা হচ্ছে এই যে, যে-ব্রহ্মের সীমা পাওয়া যায় না তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা এই রকম বিড়ম্বনা।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে কারও কারও মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিই চাই—টিকেয় আমাদের আগুন ধরাতে হবে।

এ কথাটা যে কত অমূলক তা ওই চাঁদের কথা ভাবলেই বোঝা যাবে। আমরা দেশলাইকে যে ভাবে চাই চাঁদকে সে ভাবে চাইনে, চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই, চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সংকীর্ণ প্রয়োজনের অতীত বলেই তাকে চাই। সেই চির-অতৃপ্ত অসমাপ্ত পাওয়ার চাওয়াটাই সব চেয়ে বড়ো চাওয়া। সেইজন্যেই পূর্ণচন্দ্র

আকাশে উঠলেই নদীতে নৌকায় ঘাটে গ্রামে পথে নগরের হর্ম্যতলে গাছের নীড়ে চারিদিক থেকে গান জেগে ওঠে, কারও টিকেয় আগুন ধরে না বলে কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না।

ব্রহ্ম তো তাল বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বশ করে নিয়ে প্রয়োজন সিদ্ধি করব। কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিতেই পাওয়ার দরকার, আনন্দের পাওয়াতে ঠিক তার উল্টো। তাতে না-পাওয়াটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। যে-জিনিস আমরা পাই তাতে আমাদের যে সুখ সে অহংকারের সুখ। আমার আয়ত্তের জিনিস আমার ভৃত্য আমার অধীন, আমি তার চেয়ে বড়ো।

কিন্তু এই সুখই মানুষের সবচেয়ে বড়ো সুখ নয়। আমার চেয়ে যে বড়ো তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্ছে আনন্দ। আমার যিনি অতীত আমি তাঁরই, এইটি জানাতেই অভয়, এইটি অনুভব করাতেই আনন্দ। যেখানে ভূমানন্দ সেখানে আমি বলি, আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম। গেল আমার অহংকার, গেল আমার শক্তির ঔদ্ধত্য। এই না পেরে ওঠার মধ্যে এই না পাওয়ার মধ্যে নিজেকে একান্ত ছেড়ে দেওয়াই মুক্তি।

মানুষ তো সমাপ্ত নয়, সে তো হয়ে বয়ে যায় নি, সে যেটুকু হয়েছে সে তো অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনন্ত। মানুষ যখন আপনার এই হওয়া-রূপী জীবের বর্ত্তমান প্রয়োজন সাধন করতে চায় তখন প্রয়োজনের সামগ্রীকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারিদিকে মিলিয়ে নিতে হয়, তার বর্ত্তমানটি একেবারে সম্পূর্ণ বর্ত্তমানকেই চাচ্ছে। কিন্তু সে তো কেবলই বর্ত্তমান নয়, সে তো কেবলই হওয়া-রূপী নয়, তার না-হওয়ারূপী অনন্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনন্ত না-পাওয়া তার সেই অনন্ত না-হওয়াকে আশ্রয় দিচ্ছে, খাদ্য দিচ্ছে। এইজন্যেই মানুষ কেবলই বলে, অনেক দেখলুম অনেক শুনলুম অনেক বুঝলুম, কিন্তু আমার না-দেখার ধন না-শোনার ধন না-বোঝার ধন কোথায়? যা অনাদি বলেই অনন্ত, যা হয় না বলেই যায় না, যাকে পাই নে বলেই হারাই নে, যা আমাকে পেয়েছে বলেই আমি আছি, সেই অশেষের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করবার জন্যেই আত্মা কাঁদছে। সেই অশেষকে সশেষ করতে চায় এমন ভয়ংকর নির্বোধ সে নয়। যাকে আশ্রয় করবে তাকে আশ্রয় দিতে চায় এমন সমূলে আত্মঘাতী নয়।

(পাওয়া ও না-পাওয়া, শান্তিনিকেতন, ৪ বৈশাখ ১৩১৬)

পরিমিত পদার্থের মতো করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্য পদার্থের মতো যাঁকে না-পাওয়া যায় না—যাঁকে পেতে গেলে একদিকে জ্ঞানকে খর্ব করতে হয় না, অন্যদিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না—যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দিষ্ট নন—যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্‌ বলেছেন যে, যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানি নে সেও তাঁকে জানে না। এককথায় যাঁর সাধনা হচ্ছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

(সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেন)

•

যখন ছোটো ছিলেম, মনে পড়ে, বিশ্বজগৎ আমার কাছে প্রতিদিন অন্ধকার রাত্রির গর্ভ থেকে নূতন দেহ ধরে জন্ম নিত। পরিচয় আর অপরিচয় আমার মনের মধ্যে এক হয়ে মিলেছিল। আমার সেই শিশুকাল পথিকের কাল। তখন পথের শেষের দিকে

লক্ষ্য খুঁজিনি, পথের আশেপাশে চেয়ে চেয়ে চলছি যেন কোন্ আবছায়ার ভিতর থেকে আচমকা দেখা দেবে একটা "কী জানি", একটা "হয়তো"। বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড়ো করে আতার বিচি পুঁতে রোজ জল দিয়েছি। আজ যেটা আছে বীজ কাল সেটা হবে গাছ, ছেলেবেলায় সে একটা মস্ত "কী জানি"র দলে ছিল। সেই কী-জানিকে দেখাই সত্য দেখা। সত্যের দিকে চেয়ে যে বলে "জানি" সেও তাকে হারায়, যে বলে "জানিনে" সেও করে ভুল, আমাদের ঋষিরা এই বলেন। যে বলে "খুব জানি" সেই অবোধ সোনা ফেলে চাদরের গ্রন্থিকে পাওয়া মনে করে, যে বলে "কিছুই জানিনে" সে তো চাদরটাকে সুদ্ধ খুইয়ে বসে।.............."জানি না" যখন "জানি"র আঁচলে গাঁঠছড়া বেঁধে দেখা দেয় তখন মন বলে, "ধন্য হলেম।" পেয়েছি মনে করার মতো হারানো আর নেই।

(পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫)

এই যে জল, এই যে স্থল, এই যে এটা, এই যে ওটা, যত কিছু পদার্থকে নির্দেশ করে বলি 'এই যে,' এ-সমস্তই ভালো করে জেনে-বুঝে নিতে হবে, নইলে ভালো করে বাঁচা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বলে, তদ্‌বিদ্ধি নেদং যদিদম্ উপাসতে। তাকেই জানো। কাকে, না ইদং অর্থাৎ এই-যে ব'লে যাকে স্বীকার করি তাকে নয়।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

ডিমের মধ্যেই পাখির প্রথম জন্ম। তখনকার মতো সেই ডিমটাই তার একমাত্র ইদম্। আর-কিছুই সে জানে না। তবু তার মধ্যে একটা প্রবর্ত্তনা আছে বাইরের অজানার মধ্যে সার্থকতার দিকে। সেই সার্থকতা—নেদং যদিদমুপাসতে। যদি খোলাটার মধ্যেই এক-শো বছর সে বেঁচে থাকত তাহলে সেটাকেই বলা যেত তার মহতী বিনষ্টি।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥ (২।৩)

আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয় সে না পেতেও চায়। এইজন্যেই সংসারের সমস্ত দৃশ্যস্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে কেবলই পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চিরদিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি।

....

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্, যিনি বলেন আমি তাঁকে জানি নি তিনিই জানেন, যিনি বলেন আমি জেনেছি তিনি জানেন না।

(পাওয়া ও না-পাওয়া, শান্তিনিকেতন, ৪ বৈশাখ ১৩১৬)

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ (২।৫)

কেন আমরা বলিতেছি, নিরাকার ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের গম্য নহেন, আমাদের ভক্তির আয়ত্ত নহেন, আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য নহেন? ঋষিরা কি এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রত্যক্ষ এবং তাঁহাদের উপদেশ কি সুস্পষ্ট নহে? তাঁহারা বলিতেছেন—

চেৎ অবেদীদথ সত্যমস্তি,
ন চেৎ ইহাবেদান্মহতী বিনষ্টিঃ;

এখানে যদি তাঁহাকে জানা যায় তবেই জন্ম সত্য হয়, যদি না জানা যায় তবে মহতী বিনষ্টিঃ, মহা বিনাশ।

(ঔপনিষদ ব্রহ্ম, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

যদি তাঁহাদের এই কথা বিশ্বাস কর যে, ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, এখানে তাঁহাকে জানিলেই জীবন সার্থক হয়—নচেৎ মহতী বিনষ্টিঃ, তবে বিনয়ের সহিত শ্রদ্ধার সহিত মহাজনপ্রদর্শিত সেই সত্য পথই অবলম্বন করিতে হইবে।

'(ঔপনিষদ ব্রহ্ম, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

মানবসভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা-প্রশাখায় ব্যপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারংবার মন্ত্র জপ করছিলেন—এক এক এক! তিনি বলছিলেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি—এই একেকেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়। ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই একেকে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ-পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধির অভাবে। যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্বল্য সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই একেকে প্রচার করতে। যত মহা-বিপ্লবের আগমন সে এই একেকে উদ্ধার করবার জন্যে।

(নবযুগের উৎসব, শান্তিনিকেতন, ১৩১৫)

ভারতবর্ষের কাছে অনন্ত সকল ব্যবহারের অতীত শূন্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়, অনন্ত তার কাছে করতলন্যস্ত আমলকের মতো স্পষ্ট বলেই তো জলে স্থলে আকাশে অন্নে পানে বাক্যে মনে সর্বত্র সর্বদাই এই অনন্তকে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষবোধের মধ্যে সুপরিস্ফুট করে তোলবার জন্যে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই জন্যেই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য বা স্বদেশ বা স্বাজাতিকতার মধ্যেই মানুষের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ্য করে নি।

এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে-বোধ সকলের চেয়ে বড়ো সেই বিশ্ববোধ, যে-লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ

সেই ব্রহ্মলাভ কাল্পনিকতা নয়, তারই সাধনা প্রচার করবার জন্যে এ দেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি,
ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ,
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি।

এ'কে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল—এ'কে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ; ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোটো করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানাদিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়; ছোটো বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা, সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন; যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন কিন্তু বিরুদ্ধ করেন নি। তাঁকে হারানো মানেই হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই, যা ভালো তা কেবলই বাধা পায়, পদে পদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া সর্বত্র ছড়াতে পায় না। সদনুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না। দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলই পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মতো টলমল করতে থাকে। তার কারণ আর কিছুই নয় আমরা খাওয়া শোওয়া ওঠা বসায় যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বিস্তার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে। তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করছে। যে-বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে আবরিত করছে। দুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুলছে এবং মানব-ঘৃণার কাঁটা গাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্মাণ করছে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মনুষ্যত্বকে তার বৃহৎ ক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরর্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম হয়ে দাঁড়াল শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সংকীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোটো হয়ে গেল, ভরসা রইল না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলই তফাতে তফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলই টুকরো টুকরো করে দেওয়া, কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়া—শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই; যে-মাছ সমুদ্রের সে

যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত-খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই **মহতী বিনষ্টি** হতে কে আমাদের বাঁচাবে? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে। ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ। ইঁহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইঁহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জানতে হবে? না, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য—প্রত্যেকের মধ্যে সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বল, সমাজেই বল, রাষ্ট্রেই বল, যে-পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই; যে-পরিমাণে না করি সেই পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এইজন্য সকল দেশেই সর্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করছে, সে বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজছে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্ছে, কেননা সেই একই অমৃত, সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

আমাদের ঋষিরা যে মন্ত্র দেখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন তাকে প্রমাণ করবার ভার আমাদের প্রত্যেকের উপর আছে—যতক্ষণ সে শুধু পুঁথির মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তা হয় না। আমাদের দেশে এমন কথাও শোনা যায়—এ-সব বড়ো ভাব, বড়ো কথা, মুনি-ঋষিদের জন্য, সংসারীর পক্ষে ও-সব নয়। আমাদের সাধকেরা, যে সত্যকে জীবনে লাভ করেছিলেন তাকে এর চাইতে আর কোনোমতে বেশি তিরস্কৃত করা যায় না। তাঁরা বলেছেন তাঁকে না পেলে 'মহতী বিনষ্টিঃ'—এ যদি তোমার জীবনের ভিতর দিয়ে না জানলে তবে সমস্ত জন্ম ব্যর্থ হয়ে গেল, এত বড়ো বিনাশ আর নেই। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে বিশ্বাস করো, অভ্যাসের দ্বারা জড়িত হয়ে থেকো না, দুর্বল আত্মাকে আলস্যে মগ্ন করে এত বড়ো বাণীকে অপমানিত করতে দিয়ো না!

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৬ মাঘ ১৩২৮)

মানুষ তার যে জীবনকে সহজে পেয়েছে সেই জীবনকে সৃষ্টি করার দ্বারা বিশিষ্টতা দিলে তবেই তাকে যথার্থ করে পায়। তা করতে গেলেই কোনো-একটি বড় সত্যকে আপন জীবনের কেন্দ্ররূপে আশ্রয় করা চাই। সেই কেন্দ্রস্থিত ধ্রুব সত্যের সঙ্গে আপন চিন্তাকে কর্মকে আপন দিনগুলিকে সংযুক্ত করে জীবনকে সুসংযত ঐক্য দিতে পারলে তবেই তাকে বলে সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কেন্দ্রটি না পেলে তার দিনগুলি হয় বিচ্ছিন্ন, তার কর্মগুলির মধ্যে কোনো নিত্যকালের তাৎপর্য থাকে না। তখন জীবনটা আপন উপকরণ নিয়ে স্তূপাকার হয়ে থাকে, রূপ পায় না। তাতেই মানুষের দুঃখ। এই বিশ্বসৃষ্টির যজ্ঞে যা-কিছু থাকে অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত, যা-কিছু রূপ না পায়, তাই হয় বর্জিত। একেই বলে বিনষ্টি। যাঁরা আপনার মধ্যে সৃষ্টির সার্থকতা পেয়েছেন, যাঁরা নিজের জীবনের মধ্যে সত্যকে বাস্তব করে তুলেছেন, তাকে রূপ দিতে পেরেছেন, অমৃতাস্তে ভবন্তি।

অধিকাংশ মানুষ বিষয়লাভের উদ্দেশ্যকেই জীবনের কেন্দ্র করে। তার অধিকাংশ

উদ্যম এই এক উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতেও জীবনকে ব্যর্থ করে তার কারণ এই যে, মানুষ মহৎ। যতটুকু তার নিজের পোষণের জন্য, যতটুকু কেবল তার অদ্যতন, তাতে তার সমস্তটাকে ধরে না। এই সত্যটিকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষ দুটি শব্দ সৃষ্টি করেছে—অহং আর আত্মা। অহং মানুষের সেই সত্তা যার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজন চিরকালের থেকে ক্ষণিকতার মধ্যে, সর্বলোকের থেকে এককের মধ্যে তাকে পৃথক করে রেখেছে। আর, আত্মার মধ্যে তার সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্তা। সমস্ত জীবন দিয়ে যদি মানুষ অহংকেই প্রকাশ করে তবে সে সত্যকে পায় না; তার প্রমাণ, সে সত্যকে দেয় না। কেননা সত্যকে পাওয়া আর সত্যকে দেওয়া একই কথা, যেমন প্রদীপের পক্ষে আলোকে পাওয়া। মানুষের পক্ষে আত্মাকে উপলব্ধি ও আত্মাকে দান করা একই কথা। আপনার সৃষ্টিতে মানুষ আপনাকে পায় এবং আপনাকে দেয়। এই দান করার দ্বারাই সে সর্বকাল ও সর্বজনের মধ্যে নিত্য হয়।

আমাদের মধ্যে বিচিত্র অসংলগ্ন ও পরস্পরবিরুদ্ধ কত প্রবৃত্তি রয়েছে। এগুলি প্রাকৃতিক—মাটি যেমন, শিলাখণ্ড যেমন প্রাকৃতিক। এরা সৃষ্টির উপকরণ। প্রকৃতির ক্ষেত্রে এদের অর্থ আছে, কিন্তু মানুষ এদের ভিতর থেকে আপন সংকল্পের বলে যখন একটি সম্পূর্ণ মূর্তি উদ্ভাবিত করে তখনি মানুষ এদের প্রতি আপন সার্থকতার মূল্য অর্পণ করে। বাঘের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রয়োজন আছে, তার হিংস্রতা তার জীবনযাত্রার উপযোগী, এইজন্য তার মধ্যে ভালোমন্দর মূল্যভেদ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র জৈব অস্তিত্ব রক্ষায় মানুষের সম্পূর্ণতা নয়; বহুযুগের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষ আপনাকে সৃষ্টি করে তুলছে—সেই তার মনুষ্যত্ব। এই তার আপন সৃষ্টির পক্ষে তার প্রকৃতিগত যে উপাদান অনুকূল তাই ভালো, যা প্রতিকূল তাই রিপু। এইজন্যে মানুষের জীবনের মাঝখানে এমন একটি মূল সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকা চাই যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা-বিরুদ্ধতাকে সমন্বয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে ঐক্যদান করতে পারে। তবেই সে আপনার পরিপূর্ণ চিরন্তন সত্যকে পায়। সেই সত্যকে পাওয়াই অমৃতকে পাওয়া, না পাওয়া মহতী বিনষ্টি। অর্থাৎ যে বিনাশ তার দৈহিক জীবনের অভাবের বিনাশ সে নয়, তার চেয়েও বেশি; যা তার অমৃত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিনাশ, তাই।

যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে তেমনি তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, দুর্বল হয়, তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সর্বজনীন সত্য হওয়া চাই যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য দিতে পারে—নইলে তার না থাকে শান্তি, না থাকে শক্তি, না থাকে সমৃদ্ধি; সে এমন-কিছুকে উদ্ভাবন করতে পারে না যার চিরকালীন মূল্য আছে। সমাজ মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সৃষ্টি। সেইজন্যেই দেখি ইতিহাসের আরম্ভ হতেই, যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই, সে তার সম্মিলনের কেন্দ্রে এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা তার সমস্ত খণ্ডকে জোড়া দিয়ে এক করতে পারে। এইটের উপরেই তার কল্যাণের নির্ভর। এইটেই তার সত্য, এইটেই তার অমৃত, নইলে তার বিনষ্টি।

(ভারতপথিক রামমোহন, ১১ মাঘ ১৩৩৫)

কঠোপনিষদ

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥ ১।২।১
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ॥ ১।২।২

ধর্ম শাস্ত্রের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা ক'রে সাধনা ক'রে স্বভাবকে পাওয়া, কথাটা শোনায় স্ববিরোধী অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে পাওয়া। খৃষ্টান শাস্ত্রে মানুষের স্বভাবকে নিন্দা করেছে, বলেছে, তার আদিতেই পাপ, অবাধ্যতা। ভারতীয় শাস্ত্রেও আপনার সত্য পাবার জন্যে স্বভাবকে অস্বীকার করতে বলে। মানুষ নিজে সহজে যা, তাকে শ্রদ্ধা করে না। মানুষ বলে বসল, তার সহজ স্বভাবের চেয়ে তার সাধনার স্বভাব সত্য। একটা স্বভাব তার নিজেকে নিয়ে, আর-একটা স্বভাব তার ভূমাকে নিয়ে।

কথিত আছে—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ও আছে, প্রেয়ও আছে। ধীর ব্যক্তি দুইকে পৃথক করেন। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, যিনি প্রেয়কে করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে হীন হন।

এ সব কথাকে আমরা চিরাভ্যস্ত হিতকথা বলে গণ্য করি অর্থাৎ মনে করি, লোকব্যবহারের উপদেশরূপেই এর মূল্য। কিন্তু, সমাজ-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করেই এ শ্লোকটি বলা হয় নি। এই শ্লোকে আত্মাকে সত্য করে জানবার উপায় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা যা ইচ্ছা করি সেই প্রেয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে বর্ত্তমান, আবার যা ইচ্ছা করা উচিত সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবে। শ্রেয়কে গ্রহণ করার দ্বারা মানুষ কিছু একটা পায় যে তা নয়। কিছু একটা হয়। সেই হওয়াকে বলে সাধু হওয়া। তার দ্বারা ধনী হয় না, বলী হয় না, সমাজে সম্মানিত হতেও পারে না-হতেও পারে, এমন কি, অবমানিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সাধু হওয়া পদার্থটা কী, প্রকৃতির রাজ্যে তার কোনো কিনারা নেই। শ্রেয় শব্দটাও তেমনি। অপরপক্ষে প্রেয়কে একান্তরূপে বরণ করার দ্বারা মানুষ আর-একটা কিছু হয়, তাকে উপনিষদ বলছেন—আপন অর্থ থেকে হীন হওয়া। নাগর শব্দ বলতে যদি citizen না বুঝিয়ে libertine বোঝায় তা হলে বলতে হয়, নাগর শব্দ আপন সত্য অর্থ হতে হীন হয়ে গেছে। তেমনি একান্তভাবে প্রেয়কে অবলম্বন করলে, মানুষ বলতে যা বোঝায় সেই সত্য হীন হয়ে যায়। নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই

সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া। প্রাকৃতিক স্বভাবের উপরেও মানুষের আত্মিক স্বভাব যদি না থাকত তা হলে এ সব কথার অর্থ থাকত না।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা; তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবেই বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা। অহংকারকে ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি।

জ্যোতির্বিদ্ দেখলেন, কোনো গ্রহ আপন কক্ষ পথ থেকে বিচলিত। নিঃসন্দেহ মনে বললেন, অন্য কোনো অগোচর গ্রহের অদৃশ্য শক্তি তাকে টান দিয়েছে। দেখা গেল, মানুষেরও মন আপন প্রকৃতিনির্দিষ্ট প্রাণধারণের কক্ষপথ যথাযথ আবৃত্তি করে চলছে না। অনির্দিষ্টের দিকে, স্বভাবের অতীতের দিকে ঝুঁকছে। তার থেকে মানুষ কল্পনা করলে দেবলোক। বললে, আদেশ সেইখানকার, আকর্ষণ সেখান হতে। কে সেই দেবলোকের দেবতা তা নিয়ে মানুষে মানুষে হানাহানি চলেছে। যিনিই হোন, তাঁকে দেবতাই বলি আর যাই বলি, মানুষকে জীবসীমার মধ্যে কিছুতেই স্থির থাকতে দিলেন না।

সমুদ্র চঞ্চল হল। জোয়ার-ভাঁটার ওঠাপড়া চলছেই। চাঁদ না দেখা গেলেও সমুদ্রের চাঞ্চল্যেই চাঁদের আহ্বান প্রমাণ হত। বাঁচবার চেষ্টাতেও মানুষ অনেক সময় মরে। যে ক্ষুধা তার অন্তরে নিঃসংশয় তার লক্ষ্য যে তার বাইরেও সত্য, সে কথাটা সদ্যোজাত শিশুও স্বতই জানে। মানুষের প্রাণান্তিক উদ্যম দেখা গেছে এমন-কিছুর জন্যে যার সঙ্গে বাঁচবার প্রয়োজনের কোন যোগই নেই। মৃত্যুকে ছাড়িয়ে আছে যে-প্রাণ সেই তাকে দুঃসাহসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ভৌতিক প্রাণের পথে প্রাণীর নিজেকে রক্ষা, আর এ পথে আত্মবানের আত্মাকে রক্ষা নয় আত্মাকে প্রকাশ।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ ১।২।১২

উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন—গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং—অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা-কিছু প্রকাশিত, তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে—তেমনি যা গূঢ়, যা গভীর, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা যদি না

থাকত, তা-হলে সেদিকে আমরা ভুলেও মুখ ফিরাতুম না; গহনকে পাবার জন্য আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে ব'লেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ ক'রে কেবল বাইরের জিনিসে সন্তুষ্ট থাকে নি। তাই সে চারিদিকে খুঁজে খুঁজে মরছে, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতে থামতে দিচ্ছে না। কোথা থেকে সে এই খুঁজে-বের-করবার পরোয়ানা নিয়ে সংসারে এসে উপস্থিত হল? যা-কিছু পাচ্ছি, তার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে পাচ্ছি নে—যা পাচ্ছি নে, তার মধ্যেই আমাদের আসল পাবার সামগ্রীটি আছে, এই একটি সৃষ্টিছাড়া প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মাল?

পশুদের মনে তো এই তাড়নাটি নেই। উপরে যা আছে তারি মধ্যে তাদের চেষ্টা ঘুরে বেড়াচ্ছে—মুহূর্তকালের জন্যেও তারা এমন কথা মনে করতে পারে না যে যাকে দেখা যায় না তাকেও খুঁজতে হবে, যাকে পাওয়া যায় না তাকেও লাভ করতে হবে। তাদের ইন্দ্রিয় এই বাইরে এসে থেমে গিয়েছে, তাকে অতিক্রম করতে পারছে না ব'লে তাদের মনে কিছুমাত্র বেদনা নেই।

কিন্তু এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার, মানুষ প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনকে কিছুমাত্র কম করে চায় না—এমন কি, বেশী করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ বলেছে, 'দেখতে পাচ্ছি নে কিন্তু আরোও আছে, শোনা যাচ্ছে না কিন্তু আরো আছে।'

জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেললেই তা প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে, এ কিন্তু সে-রকম নয়—এ আচ্ছন্ন ব'লে গুপ্ত নয়, এ গভীর ব'লেই গুপ্ত, সুতরাং একে যখন আমরা জানতে পারি তখনো এ গভীর থাকে।

গোরু উপরের থেকে ঘাস ছিঁড়ে খায়, শূকর দাঁত দিয়ে মাটি চিরে সেই ঘাসের মুথা উপড়ে খেয়ে থাকে, কিন্তু এখানে উপরের ঘাসের সঙ্গে নিচেকার মুথার প্রকৃতি-গত কোনো প্রভেদ নেই, দুটিই স্পর্শগম্য এবং দুটিতেই সমান-রকমেই পেট ভরে। কিন্তু মানুষ গোপনের মধ্যে যা খুঁজে বের করে, প্রকাশ্যের সঙ্গে তার যোগ আছে—সাদৃশ্য নেই। তা খনির ভিতরকার খনিজের মতো তুলে এনে ভাণ্ডার বোঝাই করবার জিনিস নয়। অথচ মানুষ তাকে রত্নের চেয়ে বেশী মূল্যবান রত্ন বলেই জানে।

তার মানে আর-কিছুই নয়, মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে—তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

এইজন্যই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্য মানুষ, আকাশে তারা আছে, কেবল এইটুকুমাত্র দেখেই মাটির দিকে চোখ ফেরায় নি—এইজন্যে কোন্ সুদূর অতীত কালে ক্যালডিয়ার মরু-প্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে নিশীথরাত্রের আকাশপৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্ক রহস্য পাঠ করে নেবার জন্যে রাত্রের পর রাত্রে অনিমেষ-নিদ্রাহীন-নেত্রে যাপন করেছে;—তাদের যে-মেষরা চরছিল তার মধ্যে কেহই একবারও সেদিকে তাকাবার প্রয়োজন মাত্র অনুভব করে নি।

কিন্তু মানুষ যা দেখে তার গুহাহিত দিকটাও দেখতে চায়, নইলে সে কিছুতেই স্থির হতে পারে না।

এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ করতে করতে মানুষ-যে কেবল সত্যকেই উদ্‌ঘাটন করেছে, তা বলিতে পারি নে। কত-ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তার সীমা নেই।

গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও যে প্রতিদিন এককে আর ব'লে দেখে, কত ভুলকেই তার কাটিয়ে উঠতে হয় তার সীমা নেই. কিন্তু তাই-ব'লে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে তো একেবারে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তেমনি অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই, সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে-যে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছি' তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূতপ্রেত কত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্ত্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই. কিন্তু তাই নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখি নে। গভীর জলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগলি ওঠে, তার থেকেই জালফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেলছে তার থেকে এ পর্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে—কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নে। সকল দেখার চেয়ে বেশী দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশী পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা, এইটেই একটি আশ্চর্য ব্যাপার;—আফ্রিকার বন্য বর্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয় পাই, তখন তাদের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্ত্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না।

মানুষের এই শক্তিটি সত্য—এবং এই শক্তিটি সত্যকেই গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে।

এই শক্তিটি মানুষের এত সত্য যে. একে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মানতে চায় না। এখানে সমুদ্র পর্বতের নিষেধ মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়, এখানে ভয় তাকে ঠেকাতে পারে না বারংবার নিষ্ফলতা তার গতিরোধ করতে পারে না;—এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ তার সমস্ত ত্যাগ করে এবং অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করতে পারে।

মানুষ-যে দ্বিজ; তার জন্মক্ষেত্র দুই জায়গায়। এক-জায়গায় সে প্রকাশ্য, আর-এক জায়গায় সে গুহাহিত, সে গভীর। এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করছে, সেজন্যে তাকে চতুর্দ্দিকে কত সংগ্রহ কত সংগ্রাম করতে হয় তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই ক'রে মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, কিন্তু তবু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জন করেছে। এই ভিতরকার জীবনটিকে মানুষ অনাদর করে নি—এমন কি, তাকেই বেশী আদর করেছে এবং তাই যারা করেছে তারাই সভ্যতার উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করেছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড়ো করে তোলে তখন সব দিক থেকেই তার সুর নেবে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে, গোপনের দিকে, গভীরতার দিকে, মানুষের চেষ্টাকে যখন টানে তখনি মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে,—ভূমার দিকে অগ্রসর হয়,—তখনি মানুষের চিত্ত সর্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে। যা সুগম, যা প্রত্যক্ষ, তাতে মানুষের সমস্ত চেতনাকে উদ্যম দিতে পারে না, এইজন্য কেবলমাত্র সেই দিকে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

তা-হলে দেখতে পাচ্ছি, মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তাঁর সঙ্গেই কারবার করে— সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক; সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহা-লোকই তার লোক।

এইখান থেকে সে যা-কিছু পায় তাকে বৈষয়িক পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করাই

যায় না—তাকে মাপ ক'রে ওজন ক'রে দেখবার কোনো উপায়ই নেই—তাকে যদি কোনো স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তি অস্বীকার করে বসে, যদি বলে, 'কী তুমি পেলে একবার দেখি'—তা-হলে বিষম সংকটে পড়তে হয়। এমন কি, যা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতেই যার প্রতিষ্ঠা তার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষতার স্থূল আবদার চলে না। আমরা দেখাতে পারি, ভারি জিনিস হাত থেকে পড়ে যায় কিন্তু মহাকর্ষণকে দেখাতে পারি নে। অত্যন্ত মূঢ়ও যদি বলে, 'আমি সমুদ্র দেখব, আমি হিমালয় পর্বত দেখব,' তবে তাকে এ-কথা বলতে হয় না যে 'আগে তোমার চোখ দুটোকে মস্ত-বড় করে তোলো তবে তোমাকে পর্বত সমুদ্র দেখিয়ে দিতে পারব'—কিন্তু সেই মূঢ়ই যখন ভূবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাকে বলতেই হয়, 'একটু রোসো; গোড়া থেকে শুরু করতে হবে; আগে তোমার মনকে সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত করো তবে এর মধ্যে তোমার অধিকার হবে। অর্থাৎ চোখ মেললেই চলবে না, কান খুললেই হবে না, তোমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।' মূঢ় যদি বলে, 'না, আমি সাধনা করতে রাজী নই, আমাকে তুমি এ-সমস্তই চোখে-দেখা কানে-শোনার মতো সহজ করে দাও', তবে তাকে হয় মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে হয়, নয় তার অনুরোধে কর্ণপাত করাও সময়ের বৃথা অপব্যয় বলে গণ্য করতে হয়।

তাই যদি হয় তবে উপনিষৎ যাঁকে গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখাশোনার সামগ্রী করে বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আবদার আমাদের খাটতেই পারে না। এই আবদার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেকসময় খুঁজে থাকি, কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, 'আচ্ছা বেশ, তাঁকে খুব সহজে করে দিচ্ছি' —ব'লে সেই যিনি নিহিতং গুহায়াম্ তাঁকে আমাদের চোখের সম্মুখে যেমন-খুশী একরকম করে দাঁড় করিয়ে দেন, তা-হলে বলতেই হবে, তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরো গোপন করে দিলেন। এ-রকম স্থলে শিষ্যকে এই কথাটাই বলবার কথা যে, মানুষ যখন সেই গুহাহিতকে, সেই গভীরকে চায়, তখন তিনি গভীর ব'লেই তাঁকে চায়—সেই গভীর আনন্দ আর-কিছুতে মেটাতে পারে না ব'লেই তাঁকে চায়—চোখে-দেখা কানে-শোনার সামগ্রী জগতে যথেষ্ট আছে, তার জন্যে আমাদের বাইরের মানুষটা তো দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী সে সমস্ত-কিছু চায় না ব'লেই একাগ্রমনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই তাঁর সাধনা করো—এবং যখন তাঁকে পাবে, তোমার 'গুহাশয়' রূপেই তাঁকে পাবে; অন্য রূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না; সে কেবল বিষয়কেই অন্য একটা নাম দিয়ে চাচ্ছে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্ছে, তিনি সহজ বলেই তাঁকে চাচ্ছে না—তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্ছে। যিনি ভূমা, সর্বত্রই তিনি গুহাহিতং, কি সাহিত্যে কি ইতিহাসে, কি শিল্পে কি ধর্মে কি কর্মে।

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়ো, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়ার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, এই কথাটি-যে মানুষ বলতে পেরেছে, এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই, এইজন্যেই সে গভীরকে চায়—তবু যদি তুমি বল, 'আমার হাতের তোলার মধ্যে সহজকে এনে দাও', তবে তুমি আর-কিছুকে চাচ্ছ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা অনায়াসে দেখছি, অনায়াসে শুনছি, অনায়াসে বুঝছি, তার মতো কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতি-

প্রত্যক্ষগোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহুকালের বহু চেষ্টায় এই সহজ দেখাশোনার আবরণ ভেদ করেই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে, দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে, যা-কিছু পাওয়ার মত পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনায় আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে ভেদ ক'রে তবে কর্ত্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধাতৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মতো সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি; এইজন্যেই শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে—বারংবার পরাস্ত হয়েও সে পরাভব স্বীকার করতে পারছে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্মে নয়, হৃদয় ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে; ভালোবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় সে যতই অকৃতকার্য হ'ক, একে সে কোনোমতেই অশ্রদ্ধা করতে পারে না; তাকে বলতেই হবে 'যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য, তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্যসাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয় সুতরাং সে গভীরতর আনন্দ পায়, অর্থাৎ এই কঠিন ব্রতই আমাদের গুহাহিত মানুষটির যথার্থ জীবন—কেন না, তার পক্ষে নাল্পে সুখমস্তি।'

জ্ঞানে ভাবে কর্মে মানুষের পক্ষে সর্বত্রই যদি এই কথাটি খাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে সর্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম ক'রে গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত শ্রেয় লাভ করে থাকে, তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ দীনভাবে সহজকে প্রার্থনা ক'রে আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে? মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে একথা বলে না, 'টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে।'—টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয়; টাকা ঢেলার মতো সুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উল্টা কথা বলতে যাব। কেন বলব, 'তাঁকে আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই।' কেন বলব, 'আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্যে অপহরণ ক'রে তাঁকে হাতে হাতে চোখে চোখে ফিরিয়ে বেড়াব।'

না, কখনো তা আমরা চাইনে। তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই, জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি, না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আস্বাদ পয়েছি, এমনি করে সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি করে একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠছে। হে গূঢ়, তুমি গূঢ়তম বলেই তোমার টান প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানকে প্রেমকে কর্মকে গভীর হতে গভীরতরে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই অতল গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাচ্ছে, তার বন্ধন আলগা করে দিচ্ছে, তার জীবনমরণের তুচ্ছতা দূর করছে; তোমার এই পরম গোপনতা থেকেই তোমার বাঁশির মধুরতম গভীরতম সুর আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে; মহত্ত্বের উচ্চতা, প্রেমের গাঢ়তা, সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ, সমস্ত তোমার ওই অনির্বচনীয় গভীরতার দিকে টেনে নিয়ে আমাদের সুধায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। মানবচিত্তের এই আকাঙ্ক্ষার আবেগ, এই আনন্দের বেদনাকে তুমি এমনি করে চিরকাল জাগিয়ে রেখে চিরকাল তৃপ্ত করে চলেছ। হে গুহাহিত, তোমার গোপনতার শেষ নেই বলেই জগতের

যত প্রেমিক যত সাধক যত মহাপুরুষ তোমার গভীর আহ্বানে আপনাকে এমন নিঃশেষে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন; এমন মধুর করে তাঁরা দুঃখকে অলংকার করে পরেছেন, মৃত্যুকে মাথায় করে বরণ করেছেন। তোমার সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেছে, তারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুটচ্ছে—তারা বল তেজ সম্পদ সমস্ত হারিয়েছে—তাদের চেষ্টা ও চিন্তা কেবলি ছোটো ও জগতে তাদের সমস্ত অধিকার কেবলি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজেকে দুর্বল কল্পনা করে তোমাকে যারা সুলভ করতে চেয়েছে, তারা মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ গৌরবকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে।

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তারি চিরন্তন বন্ধু; প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে না দেখি। তোমাদের ওই পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে, ততই তার কাব্য সংগীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চলব,—আমার সমস্ত যাত্রাসংগীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে,—পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমকে, কোনো ছোটোকে, কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে;—আমার আনন্দের আবেগধারা সমুদ্রে চিরকাল বহমান হবার সংকল্প ত্যাগ ক'রে যেন মরুবালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাপ্ত করে না দেয়।

(গুহাহিত, শান্তিনিকেতন, ২৩ চৈত্র ১৩১৬)

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। ১।২।২৩

সাধকেরা আপনারাই বলিয়াছেন তাঁহাকে পাইবার পথ, "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" অর্থাৎ এটা কোনোমতেই পঠন পাঠনের ব্যাপার নহে।

(ধর্মশিক্ষা, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাহপি প্রজ্ঞানেনৈমাপ্নুয়াৎ॥ ১।২।২৪

হওয়ার দ্বারা পাওয়ার কথা উপনিষদে বার বার শোনা যায়; তার থেকে এই

বুঝি, মানুষের যা চরম পাবার বিষয় তার সঙ্গে মানুষ একাত্মক, মানুষ তারই মধ্যে সত্য—কেবল তার বোধের বাধা আছে।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্ নাশান্তো নাসমাহিতঃ
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈমাপ্নুয়াৎ।

বলছেন, কেবল জানার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। হওয়ার দ্বারা পেতে হবে, দুশ্চরিত থেকে বিরত হওয়া, সমাহিত হওয়া, রিপুদমন করে অচঞ্চল মন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে। অর্থাৎ, এ এমন পাওয়া যা আপনারই চিরন্তন সত্যকে পাওয়া।

......ভৌতিক সত্যকে বিশুদ্ধ করে দেখতে গেলে কাছের সমস্ত মলিনতা ও চাঞ্চল্য, ব্যক্তিগত সমস্ত বিকার দূর করা চাই। আত্মিক সত্য সম্বন্ধে সে কথা আরো বেশি খাটে। যখন পশুসত্তার বিকার আমরা আত্মিক সত্যে আরোপ করি তখন সেই প্রমাদ সব চেয়ে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কেন না, তখন আমাদের হওয়ার ভিত্তিতেই লাগে আঘাত।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

প্রজ্ঞানেনৈমাপ্নুয়াৎ—যুক্তিতর্কের যোগে বাহ্যজ্ঞানের বিষয়কে যেমন করে জানি এ তো তেমন করে জানা নয়, অন্তরে হওয়ার দ্বারা জানা। নদী সমুদ্রকে পায় যেমন ক'রে, প্রতিক্ষণেই সমুদ্র হতে হতে। একদিকে সে ছোটো নদী, আর-এক দিকে সে বৃহৎ সমুদ্র। সেই হওয়া তার পক্ষে সম্ভব, কেন না সমুদ্রের সঙ্গে তার স্বাভাবিক ঐক্য; বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে সেই ঐক্য। জীবধর্ম যেন উঁচু পাড়ির মতো জন্তুদের চেতনাকে ঘিরে আটক করেছে। মানুষের আত্মা জীবধর্মের পাড়ির ভিতর দিয়ে তাকে কেবলই পেরিয়ে চলেছে, মিলেছে আত্মার মহাসাগরে, যেই সাগরের যোগে সে জেনেছে আপনাকে। যেমন নদী পায় আপনাকে যখন সে বৃহৎ জলরাশিকে আপন করে, নইলে সে থাকে বদ্ধ হয়ে, বিল হয়ে, জলা হয়ে। তাই বাউল মানুষকে বলেছে, "তোরেই ভিতর অতল সাগর।"

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। ১।৩।১০

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়, কিন্তু সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ, তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

(তপোবন, শান্তিনিকেতন)

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ ১।৩।১৪

মহৎ লক্ষ্যের জন্য ফাঁকি দিয়া সারিবার সংক্ষিপ্ত রাস্তা নাই। দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। সেই দুর্গম পথ এড়াইবার উপায় থাকিলে ভাবনা ছিল না। কষ্ট করিতে হয়, চেষ্টা করিতে হয় বলিয়া বিনা-প্রয়াসের পথ অবলম্বন করিলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যে-লোক ধনী হইতে চায় সে সমস্ত দিন খাটিয়া রাত্রি একটা পর্যন্ত হিসাব মিলাইয়া তবে শুইতে যায়; পায়ের উপর পা দিয়া তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। আর যে ঈশ্বরকে চায়, পথ দুর্গম বলিয়া সে কি খেলা করিয়া তাঁহাকে পাইবে?

আসল কথা, ঈশ্বরকে সকলে চায় না, পরমার্থিক দিকে স্বভাবতই অনেকের মন নাই। ধন ঐশ্বর্য সুখ সৌভাগ্য পাপক্ষয় এবং পুণ্য-অর্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেবসেবা ও ধর্মকর্ম করাকে জর্জ এলিয়ট other-worldliness নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ সেটা পারলৌকিক বৈষয়িকতা। তাহা আধ্যাত্মিকতা নহে। যাহাদের সেই দিকে লক্ষ্য সাকার-নিরাকার তাহাদের পক্ষে উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং হাতের কাছে যেটা থাকে, যাহাতে সুবিধা পায়, দশজনে যেটা পরামর্শ দেয় তাহাই অবলম্বন করিয়া ধর্মচতুর লোক পুণ্যের খাতায় লাভের অঙ্ক জমা করিতে থাকেন। নিরাকারবাদী এবং সাকার-বাদী উভয় দলেই তেমন লোক ঢের আছে।

কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যাঁহাদের প্রকৃতির সহজ ধর্ম, সংসার যাঁহাদিগকে তৃপ্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না, যে দিকেই স্থাপন কর কম্পাসের কাঁটার মতো যাঁহাদের মন এক অনির্বচনীয় চুম্বক-আকর্ষণে অনন্তের দিকে আপনি ফিরিয়া দাঁড়ায়, জগদীশ্বরকে বাদ দিলে যাঁহাদের নিকট আমাদের স্থিতিগতি চিন্তাচেষ্টা ক্রিয়াকর্ম একেবারেই নিরর্থক এবং সমস্ত জগদ্ব্যাপার নিরবচ্ছিন্ন বিভীষিকা, যাঁহারা অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ আনন্দ উপভোগ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, সাধনা তাঁহাদের নিকট দুঃসাধ্য নহে এবং তাঁহারা আপনাকে ভুলাইয়া এবং আপনার ঈশ্বরকে ভুলাইয়া সংক্ষেপে কার্যোদ্ধার করিতে চাহেন না-- কারণ, নিত্যসাধনাতেই তাঁহাদের সুখ, নিয়ত প্রয়াসেই তাঁহাদের প্রকৃতির পরিতৃপ্তি।

(সাকার ও নিরাকার, আধুনিক সাহিত্য, ১৩০৫)

উঠ, জাগো, যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হও। কবিরা বলিতেছেন, সেই পথ ক্ষুরধারা শাণিত দুর্গম।

(ব্যাধি ও প্রতিকার, সমাজ, ১৩০৮)

"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!" উত্থান করো, জাগ্রত হও—এই বাণী উদ্ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না—কিন্তু "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই বাক্য বারবার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা প্রত্যেক দুঃখ প্রত্যেক বিচ্ছেদ কত শত বার আমাদের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত

দিয়া যে-ঝংকার দিয়াছে, তাহাতে কেবল এই বাণীই ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,"—উত্থান করো, জাগ্রত হও। অশ্রুশিশিরধৌত আমাদের নব-জাগরণের জন্য নিখিল অনিমেষ নেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব বিকাশকে নির্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে।

(মনুষ্যত্ব, ধর্ম, ১৩১০)

উঠ, জাগো, যথার্থ গুরুকে পাইয়া বোধলাভ করো। সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কবিরা এইরূপ বলেন।

(মনুষ্যত্ব, ধর্ম, ১৩১০)

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি, কবিরা বলেন, সেই পথ ক্ষুরধারানিশিত অতি দুর্গম পথ।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১১)

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! সকালবেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা এক মুহূর্তেই ভেঙে যায়। কিন্তু সন্ধ্যা-বেলাকার মোহ কে ভাঙাবে। সমস্ত দীর্ঘদিনের চিন্তা ও কর্ম হতে উৎক্ষিপ্ত একটা কুহকের আবেষ্টন, তার থেকে চিত্তকে নির্মল উদার শান্তির মধ্যে বাহির করে আনব কী করে? সমস্ত দিনটা একটা মাকড়সার মতো জালের উপর জাল বিস্তার করে আমাদের নানা দিক থেকে জড়িয়ে রয়েছে—চিরন্তনকে, ভূমাকে একেবারে আড়াল করে রয়েছে—এই সমস্ত জালকে কাটিয়ে চেতনাকে অনন্তের মধ্যে জাগ্রত করে তুলব কী করে! ওরে, "উত্তিষ্ঠত। জাগ্রত।"

দিন যখন নানা কর্ম নানা চিন্তা নানা প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে একটি একটি পাক আমাদের চারদিকে জড়াতে থাকে, বিশ্ব এবং আমার আত্মার মাঝখানে একটা আবরণ গড়ে তুলতে থাকে, সেই সময়েই যদি মাঝে মাঝে আমাদের চেতনাকে সতর্ক করতে না থাকি—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই জাগরণের মন্ত্র যদি ক্ষণে ক্ষণে দিনের সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারের মাঝখানেই আমাদের অন্তরাত্মা থেকে ধ্বনিত হয়ে না উঠতে থাকে তা হলে পাকের পর পাক পড়ে ফাঁসের পর ফাঁস লেগে শেষ কালে আমাদের অসাড় করে ফেলে; তখন আবল্য থেকে নিজেকে টেনে বের করতে আমাদের আর ইচ্ছাও থাকে না, নিজের চারিদিকের বেষ্টনকেই অত্যন্ত সত্য বলে জানি—তার অতীত যে উন্মুক্ত বিশুদ্ধ শাশ্বত সত্য তার প্রতি আমাদের বিশ্বাসই থাকে না, এমন কি তার প্রতি সংশয় অনুভব করবারও সচেষ্টতা আমাদের চলে যায়। অতএব সমস্ত দিন যখন নানা ব্যাপারের কলধ্বনি, তখন মনের গভীরতার মধ্যে একটি একতারা যন্ত্রে যেন বাজতে থাকে ওরে, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"

(উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, শান্তিনিকেতন, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫)

সংশয়ের যে বেদনা সেও যে ভালো। কিন্তু যে প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে সংশয়কেও আবৃত করে থাকে তার হাত থেকে যেন মুক্তি লাভ করি। নিজের অজ্ঞতা-সম্বন্ধে অজ্ঞানতার মতো অজ্ঞান আর তো কিছু নেই। ঈশ্বরকে যে জানি নে, তাঁকে

যে পাই নি এইটে যখন অনুভবমাত্র না করি তখনকার যে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ততা সেইটে থেকে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। সেই অসাড়তাকে বিচলিত করে গভীরতর বেদনা জেগে উঠুক।

(সংশয়, শান্তিনিকেতন, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৫)

বলা হইয়াছে, ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের মত দুর্গম। সে পথ যদি অসীম-বিস্তৃত হইত তবে সকল মানুষই যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারিত, কাহারও কোথাও কোনো বাধাবিপত্তি থাকিত না। কিন্তু, সে পথ সুনিশ্চিত নিয়মের সীমায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এইজন্যই তাহা দুর্গম। ধ্রুবরূপে এই সীমা-অনুসরণের কঠিন দুঃখকে মানুষের গ্রহণ করিতেই হইবে।

(সীমা ও অসীমতা, পথের সঞ্চয়, ১৩১৯)

মানুষের পন্থা সম্বন্ধে যে-গুরু বলেন, 'দুর্গং পথস্তৎ,' তাঁকে নমস্কার করি। চরিতার্থতার পথে মানুষের সকল শক্তিকেই আমরা দাবি করব।

(অরবিন্দ ঘোষ, ২৯ মে ১৯২৮)

মানুষের পক্ষে যাহা সত্য মানুষের পক্ষে তাহাই যে সহজ তাহা নহে। তবেই দেখা যাইতেছে সহজকেই আপনার ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া মানুষ আরাম পাইতে চায় না, এবং যে-কোনো দুর্ব্বলচিত্ত সহজকেই আপনার ধর্ম্ম বলিয়াছে এবং ধর্ম্মকে আপনার সুবিধামত সহজ করিয়া লইয়াছে তাহার আর দুর্গতির অন্ত থাকে না। আপন ধর্ম্মের পথকে মানুষ বলিয়াছে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

(ধর্মের অধিকার, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

মানুষেরও আনন্দ মহিমায়। তাই বলা হয়েছে, ভূমৈব সুখম্। কিন্তু, যে স্বভাবে তার মহিমা সেই স্বভাবকে সে পায় বিরোধের ভিতর দিয়ে, পরম সুখকে পায় পরম দুঃখে। মানুষের সহজ অবস্থা ও স্বভাবের মধ্যে নিত্যই দ্বন্দ্ব। তাই ধর্মের পথকে অর্থাৎ মানুষের পরম স্বভাবের পথকে—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

জন্তুর অবস্থাও যেমন স্বভাবও তার অনুগত। তার বরাদ্দও যা, কামনাও তার পিছনে চলে বিনা বিদ্রোহে। তার যা পাওনা, তার বেশি তার দাবি নেই। মানুষ বলে বসল, "আমি চাই উপরি-পাওনা।" বাঁধা বরাদ্দের সীমা আছে, উপরি-পাওনার সীমা নেই। মানুষের জীবিকা চলে বাঁধা বরাদ্দে, উপরি-পাওনা দিয়ে প্রকাশ পায় তার মহিমা।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

..............................আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য.................। এতদ্বৈ তৎ॥ ২।১।৫

আমাদের অনন্তকালের ঈশ্বর, আমাদের ভূতভবিষ্যতের প্রভু,

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১১)

তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

সমস্ত মানুষের ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ২।১।১০

মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, যে ইহাকে নানা করিয়া দেখে।

খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই একেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে ধন-জন-মান বড়ো আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্বরথ-ইষ্টক কাষ্ঠ মর্যাদা লাভ করে, দ্রব্যসামগ্রী-সংগ্রহচেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাড়াকাড়ি-হানাহানির মধ্যে নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকি এবং মৃত্যু যখন আমাদের এই ভাণ্ডারদ্বার হইতে আমাদিগকে অকস্মাৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই শেষ মুহূর্ত্তে সমস্ত জীবনের বহুবিরোধের সঞ্চিত স্তূপাকার দ্রব্যসামগ্রীগুলাকেই প্রিয়তম বলিয়া আত্মার পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া, অন্তিম বলে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া ধরিতে চাহি।

(প্রাচীন ভারতের একঃ, ধর্ম, ১৩০৮)

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন। ২।১।১১

মনের দ্বারাই ইহা পাওয়া যায় যে, ইঁহাতে 'নানা' কিছুই নাই।

বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন, তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন,—মনই নানার মধ্যে সেই একেকে দেখে, সেই একেকে প্রার্থনা করে, সেই একেকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই একেকে না পাইলে মনের সুখশান্তিমঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত-ভ্রমণের অবসান নাই। সে ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে, সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না—সে খণ্ড খণ্ড মৃত্যু দ্বারা আহত তাড়িত বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিকধর্মবশতই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে কখনো সরল পথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে—সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে।

(প্রাচীন ভারতের একঃ, ধর্ম, ১৩০৮)

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
২।২।৮

আমাদের জাগ্রত চৈতন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ও মানসশক্তির জালকে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করে নানা বেগ, নানা স্পর্শ, নানা লাভের দ্বারা নিজেকে সার্থক করে।

কিন্তু কেবলই জাল বাইচ করে তো জেলের চলে না। জালে গ্রন্থি পড়ে, জাল ছিঁড়ে আসে, জাল মলিন হয়। তখন আবার সেগুলো সংশোধন করে নেবার জন্যে জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়।

রাত্রে নিদ্রার সময়ে আমরা প্রাণের জাল-বাওয়া, চেতনার জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিই। তখন সংশোধন ও ক্ষতি-পূরণের সময়। তখন আমাদের ছিন্নভিন্ন গ্রন্থিল মলিন জালটিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিতে হয় "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" যে পুরুষ, সকলে যখন সুপ্ত তখন জাগ্রত থেকে, প্রয়োজন সকলকে নির্মাণ করছেন।

(রাত্রি, শান্তিনিকেতন, ১৪ই পৌষ ১৩১৫)

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ২।২।১২

আমরা তারাই যারা বলে—একোবশী সর্বভূতান্তরাত্মা। সেই এক প্রভুই সর্ব-ভূতের অন্তরাত্মা। আমরা তারাই যারা বলে না যে বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা বলি—হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ—হৃদয়স্থিত সংশয়-রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায়।

(নবযুগের উৎসব, শান্তিনিকেতন, ১৩১৫)

আপনার মধ্যে এই এককে পেয়ে মানুষ যখন ধীর হয়, যখন তার প্রবৃত্তি শান্ত হয়, সংযত হয়, তখন তার বুঝতে বাকী থাকে না এই তার এক কাকে খুঁজছে। তার প্রবৃত্তি খুঁজে মরে নানা বিষয়কে—কেন না, নানা বিষয়কে নিয়েই সে বাঁচে, নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই তার সার্থকতা। কিন্তু, যেটি হচ্ছে মানুষের এক, মানুষের আপ্‌নি, সে স্বভাবতই একটি অসীম একে, একটি অসীম আপ্‌নিকে খুঁজছে—আপনার ঐক্যের মধ্যে অসীম ঐক্যকে অনুভব করলে তবেই তার সুখের স্পৃহা শান্তি লাভ করে। তাই উপনিষৎ বলেন—'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি' যিনি একরূপকে বিশ্বজগতে বহুধা করে প্রকাশ করেছেন, 'তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ' তাঁকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করে দেখেন, অর্থাৎ যাঁরা তাঁকে আপনার একের মধ্যে, এক করে দেখেন, 'তেষাং সুখং শ্বাশতং নেতরেষাম্' তাঁদেরই সুখ নিত্য, আর-কারও না।

আত্মার সঙ্গে এই পরমাত্মাকে দেখা এ অত্যন্ত একটি সহজ দৃষ্টি, এ একেবারেই যুক্তিতর্কের দৃষ্টি নয়। এ হচ্ছে 'দিবীব চক্ষুরাততং'। চক্ষু যেমন একেবারে সহজেই আকাশে বিস্তীর্ণ পদার্থকে দেখতে পায় এ সেই রকম দেখা। আমাদের চক্ষুর স্বভাবই হচ্ছে সে কোনো জিনিসকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র করে দেখে। সে স্পেক্‌ট্রস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখার মতো করে দেখে না, সে আপনার মধ্যে সমস্তকে বেঁধে নিয়ে আপন করে দেখতে জানে। আমাদের আত্মবোধের দৃষ্টি যখন খুলে যায় তখন সেও তেমনি অত্যন্ত সহজেই আপনাকে এক ক'রে এবং পরম একের সঙ্গে আনন্দে সম্মিলিত করে দেখতে পায়। সেই রকম করে সমগ্র করে দেখাই তার সহজ ধর্ম। তিনি যে পরম আত্মা, আমাদের পরম আপ্‌নি। সেই পরম আপ্‌নিকে যদি আপন করেই না জানা যায়, তাহলে আর যেমন করেই জানা যাক্‌ তাঁকে জানাই হল না। জ্ঞানে জানাকে আপন করে জানা বলে না, ঠিক উলটো—জ্ঞান সহজেই তফাৎ করে জানে, আপন করে জানবার শক্তি তার হাতে নেই।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্‌
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্‌।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্‌॥
২।২।১৩

আমাদের আত্মা যে ব্রহ্মকে চায় তার মানেই হচ্ছে, সে বহুর দ্বারা পীড়িত এইজন্য সে এককে চায়, সে চঞ্চলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এইজন্য সে ধ্রুবকে চায়, নূতন কিছুকে বিশেষ কিছুকে চায় না। যিনি নিত্যোঽনিত্যানাং, সমস্ত অনিত্যের মধ্যে নিত্য হয়েই আছেন সেই নিত্যকে উপলব্ধি করতে চায়। যিনি রসানাং রসতমঃ*, সমস্ত রসের মধ্যেই যিনি রসতম, তাঁকেই চায়; আর-একটা কোনো নূতন রসকে চায় না।

(অখণ্ড পাওয়া, শান্তিনিকেতন, ১৭ই চৈত্র ১৩১৫)

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥
২।২।১৫

সূর্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রতারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১।১।৩

না, এই বিদ্যুৎসকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কী প্রকারে প্রকাশ করিবে?

(নিরাকার উপাসনা, পরিশিষ্ট, আধুনিক সাহিত্য, ১৩০৫)

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
২।৩।২

উপনিষদে আছে, যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্—এই সমস্ত জগৎ সেই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে। অনন্ত প্রাণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বচরাচর অহর্নিশি স্পন্দমান রহিয়াছে.................এই যাহা কিছু জগৎ সমস্ত প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে একথা মনে উদয় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৃণগুল্মলতাপুষ্পপল্লব পশুপক্ষী মনুষ্য চন্দ্রসূর্যগ্রহনক্ষত্র, জগতের প্রত্যেক কম্পমান অণুপরমাণু এক মহাপ্রাণের ঐক্যসমুদ্রে হিল্লোলিত দেখিতে পাই—এক মহাপ্রাণের অনন্ত কম্পিত বীণাতন্ত্রী হইতে এই বিপুল বিচিত্র বিশ্ব-সঙ্গীত ঝঙ্কৃত শুনিতে পাই। অনন্ত প্রাণের সেই অনির্দেশ্যতা অনির্বচনীয়তাই আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দেয়।.................আমার অশরীরী অভাবনীয় প্রাণ আমার আদ্যোপান্তে অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, আমার পদাঙ্গুলির কোষাণুর সহিত আমার মস্তিষ্কের কোষাণুকে যোগযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে,—আবার আমার এই রহস্যময় প্রাণের মধ্যে সেই পরমপ্রাণ আমার শরীর কোষের প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত সুদূরতম নক্ষত্রবর্ত্তী বাষ্পাণুর প্রত্যেক আন্দোলনকে এক অনির্বচনীয় ঐক্যে এক অপূর্ব অপরিমেয় ছন্দোবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা অনুভব করিয়া এবং অনুভবের শেষ করিতে না পারিয়া কি আমাদের চিত্ত পুলকিত প্রসারিত হইয়া উঠে না?

(ঔপনিষদ ব্রহ্ম, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখো। মানুষের একদিন এমন অবস্থা ছিল যখন সে গাছে পাথরে মানুষে মেঘে চন্দ্রে সূর্যে নদীতে পর্বতে প্রাণী-অপ্রাণীর ভেদ দেখিতে পাইত না। তখন সবই তাহার কাঁছে যেন সমান ধর্মাবলম্বী ছিল। ক্রমে তাহার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে প্রাণী ও অপ্রাণীর ভেদ একান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে অভেদ হইতে প্রথমে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। তাহা যদি না হইত, তবে প্রাণের প্রকৃত লক্ষণ-গুলিকে সে কোনদিন জানিতেই পারিত না। এদিকে লক্ষণগুলিকে যতই সে সত্য করিয়া জানিতে লাগিল, দ্বন্দ্ব ততই দূরে সরিয়া যাইতে থাকিল। প্রথমে প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝখানের গণ্ডিটা ঝাপসা হইয়া আসিল; কোথায় উদ্ভিদের শেষ ও প্রাণীর আরম্ভ, তাহা আর ঠাহর করা যায় না। তাহার পরে আজ ধাতুদ্রব্য, যাহাকে জড় বলিয়া নিশ্চিত আছি, তাহার মধ্যেও প্রাণের লক্ষণ বিজ্ঞানের চক্ষে ধরা দিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব, যে-ভেদবুদ্ধির সাহায্যে আমরা প্রাণ-জিনিসটাকে চিনিয়াছি, চেনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভেদটা ক্রমেই লুপ্ত হইতে থাকিবে, অভেদ হইতে

দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব হইতেই ঐক্য বাহির হইবে এবং অবশেষে বিজ্ঞান একদিন উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে সমান সুরে বলিবে সর্বং প্রাণ এজতি—সমস্তই প্রাণে কম্পিত হইতেছে।

(সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্য, ১৩১৪)

অমৃতকে নিজের মধ্যে বিশেষরূপে লাভ করার অপেক্ষা আছে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অমরতাকে লাভ করার একটি বিশেষ অবস্থা আছে— "য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

(ফল, শান্তিনিকেতন, ২০ ফাল্গুন ১৩১৫)

জগতে কোনো প্রাণই তো একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজের মধ্যে নিজে আবদ্ধ নয়। সমস্ত জগতের প্রাণের সঙ্গে তার যোগ। আমার এই শরীরের মধ্যে যে প্রাণের চেষ্টা চলছে সে তো কেবলমাত্র এই শরীরের নয়। জগৎজোড়া আকর্ষণ বিকর্ষণ, জগৎজোড়া রাসায়নিক শক্তি, জল, বাতাস, আলোক ও উত্তাপ একে নিখিলপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যেও যে অবিশ্রাম চেষ্টা আছে আমার এই শরীরের চেষ্টাও সেই বিরাট প্রাণেরই একটি মাত্রা। সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন—যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্, বিশ্বে এই যা কিছু চলছে সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্ছে। এই প্রাণের স্পন্দন দূরতম নক্ষত্রেও যেমন আমার হৃৎপিণ্ডেও তেমন, ঠিক একই সুরে একই তালে।

প্রাণ কেবল শরীরের নয়। মনেরও প্রাণ আছে। মনের মধ্যেও চেষ্টা আছে। মন চলছে, মন বাড়ছে, মনের ভাঙাগড়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই স্পন্দিত তরঙ্গিত মন কখনোই কেবল আমার ক্ষুদ্র বেড়াটির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ওই বর্তমান প্রাণের সঙ্গেই হাতধরাধরি করে নিখিল বিশ্বে সে আন্দোলিত হচ্ছে, নইলে আমি তাকে কোনোমতেই পেতে পারতুম না। মনের দ্বারা আমি সমস্ত জগতের মনের সঙ্গেই যুক্ত। সেইজন্যেই সর্বত্র তার গতিবিধি। নইলে আমার এই একঘরে অন্ধ মন কেবল আমারই অন্ধ-কারাগারে পড়ে দিনরাত্রি কেঁদে মরত।

আমার মনপ্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিল বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত কারণের সঙ্গে যোগযুক্ত। প্রতিমুহূর্তেই সেইখান হতে আমি প্রাণ, চৈতন্য, ধীশক্তি লাভ করছি।

(প্রাণ ও প্রেম, শান্তিনিকেতন, ২৮ চৈত্র ১৩১৫)

আমার প্রাণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ, মনের মধ্যে বিশ্বমন আছে বললে এত বড়ো কথাটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না, একে বাইরেই বসিয়ে রাখা হয়। আমার প্রাণের মধ্যে পিতার প্রাণ আমার মনের মধ্যে পিতার মন আছে এই কথাটি নিজেকে ভালো করে বলাতে হবে।

(প্রাণ ও প্রেম, শান্তিনিকেতন, ২৮শে চৈত্র ১৩১৫)

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্। এই যা কিছু জগৎ সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে—সেই যে প্রাণ, যাঁর থেকে সমস্ত উদ্ভূত হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে সমস্তই চলছে তিনি কী রকম?

না, তিনি উদ্যত বজ্রের মতো মহাভয়ংকর। সেইজন্যেই তো সমস্ত চলছে—নইলে বিশ্বব্যবস্থা উন্মত্ত প্রলাপের মতো অতি নিদারুণ হয়ে উঠত। আমাদের পিতা যে ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। এই ভয়ের দ্বারাই অনাদিকাল থেকে সর্বত্র সকলের সীমা ঠিক আছে, সর্বত্র সকলের পরিমাণ রক্ষা হচ্ছে।

আমাদেরও যে দিকটা চলবার দিক, কী বাক্যে, কী ব্যবহারে সেই দিকে পিতা দাঁড়িয়ে আছেন—মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। সেদিকে কোনো ব্যত্যয় নেই কোনো স্খলনের ক্ষমা নেই, কোনো পাপের নিষ্কৃতি নেই।

(ভয় ও আনন্দ, শান্তিনিকেতন, ২৯ চৈত্র ১৩১৫)

সুখ জিনিসটা কেবল আমার, কল্যাণ জিনিসটা সমস্ত জগতের। পিতার কাছে যখন প্রার্থনা করি—যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব, যা ভালো তাই আমাদের দাও, তার মানে হচ্ছে সমস্ত জগতের ভালো আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো। কারণ সেই ভালোই আমার পক্ষেও সত্য ভালো, আমার পক্ষেও নিত্য ভালো। যা বিশ্বের ভালো, তাই আমার ভালো কারণ যিনি বিশ্বের পিতা তিনিই আমার পিতা।

যেখানে কল্যাণ নিয়ে অর্থাৎ বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে অত্যন্ত কড়া নিয়ম। সেখানে উপস্থিত সুখ সুবিধা কিছুই খাটে না; সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম বিরামের স্থান নেই। সেখানে দুঃখও শ্রেয়, মৃত্যুও বরণীয়।

যেখানে বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে। সেখানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইখানেই মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। এইখানেই তিনি পুত্রকে একচুল প্রশ্রয় দেন না। বিশ্বের ভাগ থেকে একটি কণা হরণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এখানে কোনো স্তব-স্তুতি অনুনয়-বিনয় খাটে না।

তবে মুক্তি কাকে বলে? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মুক্তি। নিয়ম যখন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিস হবে না সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিস হবে তখনই সেই অবস্থাকে বলব মুক্তি।

(নিয়ম ও মুক্তি, শান্তিনিকেতন, ৩০ চৈত্র ১৩১৫)

প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে জগতে কোথাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না। সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রই তুমি। যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই যা কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃসৃত হচ্ছে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন, ১৩১৫)

জগতে আনন্দকে দেখে প্রত্যক্ষ ভয়কে যিনি একেবারেই অস্বীকার করেছেন তিনিই বলেছেন : মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতৎ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। এই মহদ্ ভয়কে, এই উদ্যত বজ্রকে যাঁরা জানেন তাঁদের আর মৃত্যুভয় থাকে না।

যারা জেনেছে, ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়ে আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করেন, তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে। নিয়মের বন্ধন তাদের পক্ষে নেই যে তা নয়, কিন্তু সে যে আনন্দেরই বন্ধন, সে যে প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়তমের ভুজ-বন্ধনের মতো। তাতে দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সকল বন্ধনই সে যে খুশি হয়ে

গ্রহণ করে, কোনোটাকেই এড়াতে চায় না। কেন না, সমস্ত বন্ধনের মধ্যেই সে যে আনন্দের নিবিড় স্পর্শ উপলব্ধি করতে থাকে। বস্তুত যেখানে নিয়ম নেই, যেখানে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা, সেইখানেই তাকে বাঁধে, তাকে মারে—সেইখানেই অসীমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পাপের যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আকর্ষণে সত্যের সুদৃঢ় নিয়মবন্ধন থেকে যখন সে স্খলিত হয়ে পড়ে তখনই সে মাতার আলিঙ্গনভ্রষ্ট শিশুর মতো কেঁদে উঠে বলে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে আঘাত করো না। সে বলে, বাঁধো, আমাকে বাঁধো, তোমার নিয়মে আমাকে বাঁধো, অন্তরে বাঁধো, বাহিরে বাঁধো—আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে, আবৃত করে বেঁধে রাখো; কোথাও কিছু ফাঁক রেখো না, শক্ত করে ধরো; তোমারই নিয়মের বাহুপাশে বাঁধা পড়ে তোমার আনন্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকি। আমাকে পাপের মৃত্যুবন্ধন থেকে টেনে নিয়ে তুমি দৃঢ় করে রক্ষা করো।

(কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন, ১৩১৭)

মানবসংসারেও তেমনি একটি ভীষণ শক্তির তেজ নিত্যনিয়ত কাজ করছে। আমরা তার ভিতরে আছি বলেই তার বাষ্পরাশির ভয়ংকর ঘাতসংঘাত সর্বদাই বড়ো করে প্রত্যক্ষ করছি। আধিব্যাধি দুর্ভিক্ষদারিদ্র্য হানাহানি-কাটাকাটির মন্থন কেবলই চারি-দিকে চলছে। সেই ভীষণ যদি এর মধ্যে রুদ্ররূপে না থাকত তাহলে সমস্ত শিথিল হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আকার-আয়তন-হীন কদর্যতায় পরিণত হত। সংসারের মাঝখানে সেই ভীষণের রুদ্রলীলা চলছে বলেই তার দুঃসহ দীপ্ততেজে অভাব থেকে পূর্ণতা, অসাম্য থেকে সামঞ্জস্য, বর্বরতা থেকে সভ্যতা অনিবার্যবেগে উদ্গত হয়ে উঠছে; তারই ভয়ংকর পেষণ-ঘর্ষণে রাজ্যসাম্রাজ্য শিল্পসাহিত্য ধর্মকর্ম উত্তরোত্তর নব নব উৎকর্ষ লাভ করে জেগে উঠছে। এই সংসারের মাঝখানে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং; কিন্তু এই মহদ্ভয়কে যাঁরা সত্য করে দেখেন তাঁরা আর ভয়কে দেখেন না, তাঁরা মহা-সৌন্দর্যকেই দেখেন। তাঁরা অমৃতকেই দেখেন যা এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

(সুন্দর, শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩১৮)

আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণমুখ তাই আমরা দেখব; ভীষণকে সুন্দর বলে জানব; মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যিনি তাঁকে ভয়ে নয়, আনন্দে অমৃত বলে গ্রহণ করব।

(সুন্দর, শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩১৮)

যাকে আমরা জড় বলি সেই অব্যক্ত প্রাণ বহু কোটি কোটি বৎসর সুপ্ত ছিল। কিন্তু, একটিমাত্র প্রাণকণা যেদিন এই পৃথিবীতে দেখা দিল সেই দিনই জগতের অভিব্যক্তি তার একটি মহৎ অর্থে এসে পৌঁছল। জড়ের বাহ্যিক সত্তার মধ্যে দেখা দিল একটি আন্তরিক সত্য। প্রাণ আন্তরিক। যেহেতু সেই প্রাণকণা জড়পুঞ্জের তুলনায় দৃশ্যত অতি ক্ষুদ্র এবং যেহেতু সুদীর্ঘকালের এক প্রান্তে তার সদ্য জন্ম তাই তাকে হেয় করবে কে। মৃকতার মধ্যে এই যে অর্থ অবারিত হল তার থেকে মানুষ বিরাট প্রাণের রূপ দেখলে, বললে, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্, যা-কিছু সমস্তই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণে কম্পিত হচ্ছে। আমরা জড়কে তথ্য-রূপে জানি, কেন না সে যে বাইরের। কিন্তু, প্রাণকে আমাদের অন্তর থেকে জানি সত্যরূপে। প্রাণের ক্রিয়া অন্তরে অন্তরে—তার সমস্তটাই গতি। তাই চলার একটিমাত্র

ভাষা আমাদের কাছে অব্যবহিত, সে আমাদের প্রাণের ভাষা। চলা ব্যাপারকে অন্তর থেকে সত্য করে চিনেছি নিজেরই মধ্যে। বিশ্বে অবিশ্রাম চলার যে-উদ্যম তাকে উত্তাপই বলি, বিদ্যুৎই বলি, সে কেবল একটা কথা মাত্র। যদি বলি, এই চলার মধ্যে আছে প্রাণ, তাহলে এমন-কিছু বলা হয়, আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে যার অর্থ আছে। সেই সঙ্গে এও বুঝি, আমার প্রাণ যে চলছে সেও ঐ বিশ্বপ্রাণের চলার মধ্যেই। প্রাণ-গতির এই উদ্যম নিখিলে কোথাও নেই, কেবল আকস্মিকভাবে আছে প্রাণীতে—এমন খাপছাড়া কথা আমাদের মন মানতে চায় না যে-মন সমগ্রতার ভূমিকায় সত্যকে শ্রদ্ধা জানায়।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্—এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বর্গ্‌সঁ-এর বচন। এ মহান শিশুর বাণী।

(আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, আষাঢ়, ১৩৪৩)

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ২।৩।৩

উপনিষৎ একদিকে বলেছেন, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ হতেই যা কিছু সমস্ত জন্মেছে। আবার আর-এক দিকে বলেছেন, ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ইঁহার ভয়ে অগ্নি জ্বলছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য তাপ দিচ্ছে।

তাঁর আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ নয়, তার মধ্যে একটি অমোঘ নিয়মের শাসন আছে। অনন্ত দেশে অনন্তকালে কোথাও একটি কণাও লেশমাত্র ভ্রষ্ট হতে পারে না। সেই অমোঘ নিয়মই হচ্ছে ভয়। তাঁর সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরী খাটে না, সে কোথাও কাউকে তিলমাত্র প্রশ্রয় দেয় না।

(ভয় ও আনন্দ, শান্তিনিকেতন, ২৯ চৈত্র, ১৩১৫)

তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন, এত বড়ো বিশ্ব যে এত সহজে সুন্দর হয়ে আছে তার কারণ এর অণুতে পরমাণুতে একটা প্রকাণ্ড শক্তি কাজ করছে। সেই-যে শক্তিকে দেখতে পাই সে অতি ভীষণ। সে কাটছে ভাঙছে টানছে জুড়ছে; সে তাণ্ডবনৃত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক রেণুকে নিত্যনিয়ত কম্পান্বিত করে রেখেছে; তার প্রতি পদ-ক্ষেপের সংঘাতে ক্রন্দসী রোদন করে উঠছে। ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি। যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখলে এমন ভয়ংকর তারই অখণ্ড সত্যরূপ কী পরম শান্তিময় সুন্দর। সেই ভীষণ যদি সর্বত্র কাজ না করত তা হলে এই রমণীয় সৌন্দর্য থাকত না। অবিশ্রাম অমোঘ শক্তির চেষ্টার উপরেই এই সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত। সেই চেষ্টা কেবলই বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে ব্যবস্থা, বৈষম্যের মধ্য থেকে সুষমাকে প্রবল বলে

উদ্ভিন্ন করে তুলছে সেই চেষ্টাকে যখন কেবল তার গতির দিক থেকে দেখি তখন তাকে ভয়ংকর দেখি, তখনই তার মধ্যে বিরোধ ও বিকৃতি। কিন্তু, তার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থিতির রূপটিও রয়েছে, সেখানেই শান্তি ও সৌন্দর্য। জগতে এই মুহূর্ত্তেই যেমন আকাশ-জোড়া ভাঙাচোরার ঘর্ঘর ধ্বনি এবং মৃত্যু বেদনার আর্ত্তস্বর রয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্তকে নিয়ে পরিপূর্ণ সঙ্গীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে; সেই কথাটি আজ সন্ধ্যাকাশে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। তাঁর ভয়ংকর শক্তি যে অগ্নিময় তারার মালা গেঁথে তুলছে সেই মালা তাঁর কণ্ঠে মণিমালা হয়ে শোভা পাচ্ছে. এখনই এ আমরা কত সহজে কী অনায়াসেই দেখতে পাচ্ছি—আমাদের মনে ভয় নেই. ভাবনা নেই. মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

(সুন্দর. শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩১৮)

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তাঁরই অটল নিয়মে অগ্নি ও সূর্য তাপ দিচ্ছে, এবং মেঘ বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হচ্ছে। তারা সহস্রের ইচ্ছার দ্বারা তাড়িত নয়, একের শাসনে চালিত। এইজন্যেই তারা সত্য, তারা সুন্দর: এইজন্যেই তাদের মধ্যেই আমার মঙ্গল: এইজন্যেই তাদের সঙ্গে আমার যোগ সম্ভব; এইজন্যেই তাদের কাছ থেকে আমি পাই এবং তাদের মধ্যে আমি আপনাকে দিতে পারি।

(বিশেষত্ব ও বিশ্ব. শান্তিনিকেতন, অগ্রহায়ণ ১৩১৯)

এ পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্বলতা নেই। এই পৃথিবীর ভূমি কী নিশ্চল অটল. সূর্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে কী স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত! এখানে একটি অণুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই; সমস্তই তাঁর অটল শাসনে তাঁর স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে।

(সৃষ্টির অধিকার. শান্তিনিকেন, ১১ মাঘ ১৩২০)

নাটকসৃষ্টির সর্বপ্রধান অংশ তার পঞ্চম অঙ্কে। নাটকের মধ্যে যা-কিছু চঞ্চল তা ঝ'রে প'ড়ে গিয়ে তার যেটুকু স্থায়ী সেইটুকুই পঞ্চম অঙ্কের চরম তিরস্করণীর ভিতর দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। বিশ্বনাট্যসৃষ্টিতেও পঞ্চম অঙ্কের প্রাধান্য ঋষিরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন—সেইজন্য সৃষ্টিলীলায় অগ্নি, সূর্য, বৃষ্টিধারা, বায়ুর নাট্যনৈপুণ্য স্বীকার করে সব শেষে বলেছেন : মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ইনি না থাকলে যা-কিছু ক্ষণকালের তাই জমে উঠে যেটি চিরকালের তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। যেটা স্থূল, যেটা স্থাবর, সেটাকে ঠেলে ফেলবার কাজে মৃত্যু নিয়ত ধাবমান।—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

(কবির অভিভাষণ. সাহিত্যের পথে. ফাল্গুন ১৩৩৪)

বাহিরের টানে প্রবৃত্তির জোরে কাজ করা ইহাও মানুষের সত্যতম স্বভাব নহে। বস্তুত ইহা জড়ের ধর্ম্ম। যেমন নীচের টানে পাথর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না. সে প্রবল বেগে গড়াইয়া পড়ে ইহাও সেইরূপ। এই জড়ধর্মকে খাটাইয়া প্রকৃতি আপনার কাজ চালাইয়া লইতেছে। এই জড়ধর্মের জোরে অগ্নি জ্বলিতেছে, সূর্য

তাপ দিতেছে, বায়ু বহিতেছে, কোথাও তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। ইহা শাসনের কাজ। এই জন্যেই উপনিষদ বলিয়াছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ,
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

অগ্নিকে জ্বলিতেই হইবে, মেঘকে বর্ষণ করিতেই হইবে, বায়ুকে বহিতেই হইবে এবং মৃত্যুকে পৃথিবীসুদ্ধ লোক মিলিয়া গালি দিলেও তাহার কাজ তাহাকে শেষ করিতেই হইবে।

মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে এইরূপ জড়ধর্ম্ম আছে। মানুষকে সে কানে ধরিয়া কাজ করাইয়া লয়। মানুষকে প্রকৃতি এইখানে তাহার অন্যান্য জড়বস্তুর সামিল করিয়া লইয়া জোর করিয়া আপন প্রয়োজন আদায় করিয়া থাকে।

(ধর্ম্মের অর্থ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩১৫)

অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত।

(৫৮ সংখ্যক কবিতা, নৈবেদ্য, আষাঢ় ১৩০৮)

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ২।৩।১২

উপনিষৎ বলিতেছেন—

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

তিনি আছেন এই কথা যে বলে সে ছাড়া অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে কি করিয়া উপলব্ধি করিবে? তিনি আছেন ইহার অধিক আর কি বলিবার আছে? তিনি আছেন একথা যখনি আমরা সর্ব্বান্তঃরণে সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারি তখনই আমাদের মনোনেত্রের সম্মুখে অনন্ত শূন্য ওতপ্রোত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে—তখনি যথার্থতঃ বুঝিতে পারি যে, আমি আছি, বুঝিতে পারি যে, আমার বিনাশ নাই; আত্ম ও পর, জড় ও চেতন, দেশ ও কাল নিষ্কল পরমাত্মার দ্বারা এক মুহূর্ত্তেই অখণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; তখন আমাদের এই পুরাতন পৃথিবীর দিকে চাহিলে ইহাকে আর ধূলিপিণ্ড বলিয়া বোধ হয় না, নিশীথ নভোমণ্ডলের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিলে তাহারা শুদ্ধমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে প্রতীয়মান হয় না, তখন আমার অন্তরাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ধূলিকণা, এই ভূমিতল হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত একটি শব্দ ধ্বনি-হীন গাম্ভীর্য্যে উদ্গীত হইয়া উঠে—ওঁ,—একটি বাক্য শুনিতে পাই—অস্তি, তিনি আছেন—এবং সেই একটি কথার মধ্যেই সমস্ত জগৎচরাচরের, সমস্ত কার্য্যকারণের সমস্ত অর্থ নিহিত পাওয়া যায়। সেই মহান্ অস্তি শব্দকে কোনও আকারের দ্বারা মূর্ত্তি-দ্বারা সহজ করা যায় কি? এমন সহজ কথা কি আর কিছু আছে যে তিনি আছেন? আমি আছি একথা যেমন জগতের সকল কথার অপেক্ষা সহজ তিনি আছেন

এ কথা না বলিলে আমি আছি এ কথা যে আদ্যোপান্ত নিরর্থক মিথ্যা হইয়া যায়। আমার অস্তিত্ব বলিতেছে, আমার আত্মা বলিতেছে তিনি আছেন।

(ঔপনিষদ ব্রহ্ম. অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

সুখের সময় বল, অস্তি—তিনি আছেন, দুঃখের সময় বল, অস্তি—তিনি আছেন, বিপদের সময় বল, অস্তি—তিনি আছেন!

(ঔপনিষদ ব্রহ্ম. অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো-কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই। তিনি ভালো-মন্দ সুন্দর-অসুন্দরের ভেদবর্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপপুণ্যের কথা উঠতে পারে না। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। তিনি আছেন, এ ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা চলে না।

(মানুষের ধর্ম ১৩৪০)

আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে-উপনিষদকে একদা বাংলাদেশের বেদ-বর্জিত নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিল রামমোহন রায়ের জাল-করা,—যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার, সেই পরম চরিতার্থতা দেউলে দরোগায় নয়, পাণ্ডা-পুরোহিতের পদসেবায় নয়। যে-য়ুরোপ জ্ঞানকে সংস্কারমুক্ত করে কর্ম্মকে বিশ্বসেবার অনুকূল করেছে সেই য়ুরোপ উপনিষদের মন্ত্রশিষ্য জানুক বা না জানুক। যে-য়ুরোপ শক্তি-পূজার বীভৎস আয়োজনে বিজ্ঞানের খর্পরে নররক্তের অর্ঘ্য রচনা করচে সেই য়ুরোপ পৌরাণিক—সেই য়ুরোপ জানে না বাহিরের যন্ত্র মনের দৈন্য তাড়াতে পারে না, যন্ত্রযোগে শান্তি গড়বার চেষ্টা বিড়ম্বনা। আমরাও যেমন অন্তরের পাপকে বাহিরের অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ করতে চেয়েছি—তারাও তেমনি অন্তরের অকৃতার্থতাকে বাহিরের আয়োজনে পূর্ণ করবার দুরাশা রাখে, এইখানেই যাকে আমরা পুরাতন ভারত বলি তার সঙ্গে এদের মেলে। মেলে না সেই উপনিষদের সঙ্গে যিনি বলেচেন,

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ,
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ১৮ জুন ১৯৩১)

তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো
ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১।১৫

ঋষিরা যে ব্রহ্মকে কতখানি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের একটি কথাতেই বুঝিতে পারি—তাঁহারা বলিয়াছেন—

এই যে ব্রহ্মলোক—অর্থাৎ যে-ব্রহ্মলোক সর্বত্রই রহিয়াছে—ইহা তাঁহাদেরই, তপস্যা যাঁহাদের, ব্রহ্মচর্য যাঁহাদের, সত্য যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো
ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

অর্থাৎ যাঁহারা যথার্থভাবে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে চেষ্টা করেন, যথার্থ উপায় অবলম্বন করেন। তপস্যা একটা কোন কৌশল বিশেষ নহে, তাহা কোনো গোপন-রহস্য নহে—

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দানং তপো
যজ্ঞস্তপো ভূর্ভুবঃসুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্যৈতৎ তপঃ।

ঋতই তপস্যা, সত্যই তপস্যা, শ্রুত তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তপস্যা, দান তপস্যা, কর্ম তপস্যা এবং ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকব্যাপী এই যে ব্রহ্ম, ইঁহার উপাসনাই তপস্যা।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বল তেজ শান্তি সন্তোষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, দান ও কর্ম দ্বারা স্বার্থপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তবে অন্তরে-বাহিরে আত্মায়-পরে লোক-লোকান্তরে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

(ধর্মপ্রচার, ধর্ম, ১৩১০)

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণ ২।১১

হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও।

(ভারতপথিক রামমোহন, ১৪ পৌষ ১৩৪০)

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ
তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥ ৪।৭

হে সৌম্য, পক্ষিসকল যেমন বাসবৃক্ষে আসিয়া স্থির হয়, তেমনি এই যাহা কিছু, সমস্তই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(প্রাচীন ভারতের "একঃ", ধর্ম, ১৩০৮)

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি॥ ৬।৬

আমার কল্পরূপকে আশ্রয় করে যাঁকে তুমি হৃদয়ে উপলব্ধি করেচ আমি তাঁকেই পূজা করে থাকি, তিনি আমাদের সকলের মধ্যেই—তিনি পরমমানব। নিজেকে বৃহৎ কালে বৃহৎ দেশে তাঁর মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়ে যখন আমি ধ্যান করি তখনি নিজেকে আমি সত্যরূপে জানি, আমার ছোটো-আমির যত কিছু ক্ষুদ্রতা সব বিলীন হয়ে যায় —তখন আমি সত্য আধারে নিত্য আধারে থাকি। তাঁরই আহ্বানে রাজপুত্র ছিন্নকন্থা পরে' পথে বেরিয়েছেন। বীরের বীর্য্য, গুণীর গুণ, প্রেমিকের প্রেম তাঁরি মধ্যে চিরন্তন। তুমিও হৃদয় দিয়ে তাঁকেই গভীরের মধ্যে স্পর্শ কর, যেখানে তোমার ভক্তি, তোমার প্রীতি, তোমার সত্যকার আত্মনিবেদন। তং বেদ্যং পুরুষং বেদ—তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁকে সত্য অনুভবের দ্বারা জানতে হবে, নিজের বাইরে, নিজের গভীরে।

(চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড, ২৩ জুন ১৯৩১)

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ—সেই বেদনীয় পুরুষকে আপনার মধ্যে জানো, মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দিক্।

(চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড, ২৩ জুন ১৯৩১)

যাঁর ধ্যান আমার চিত্তের অবলম্বন শাস্ত্রমতে তাঁকে কি সংজ্ঞা দেওয়া যায় জিজ্ঞাসা করেচ। সহজে বোঝাতে পারব না, উপলব্ধির জিনিষকে ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট করা যায় না। তোমার প্রশ্ন এই তিনি কি সর্ব্বমানবের সমষ্টি। সমষ্টি কথাটায় ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। এক বস্তা আলুকে আলুর সমষ্টি যদি বল তবে সে হল আর এক কথা। মানুষের সজীব দেহ লক্ষ কোটি জীবকোষের সমষ্টি, কিন্তু সমগ্র মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আত্মানুভূতিতে জীবকোষসমষ্টির চেয়ে অসীমগুণে বড়।

ব্যক্তিগত মানব মহামানব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তারি মধ্যেই তার জন্ম ও বিলয় কিন্তু তাই বলে সে তাঁর সমান হতে পারে না। ব্যক্তিগত মানব মহামানবকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়, মহিমালাভ করে যখন সে নিজের ভোগ নিজের স্বার্থকে বিস্মৃত হয়, যখন তার কর্ম্ম তার চিন্তা মরণধর্ম্মী জীবলীলাকে পেরিয়ে যায়, যখন তার ত্যাগ তার প্রয়াস সুদূর দেশ সুদূর কালকে আশ্রয় করে, তার আত্মীয়তার বোধ সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে খণ্ডিত হয়ে থাকে না। এই বোধের দ্বারা আমরা এমন একটি সত্তাকে অন্তরতমরূপে অনুভব করি যা আমার ব্যক্তিগত পরিধিকে উত্তীর্ণ করে পরিব্যাপ্ত। তখন সেই মহাপ্রাণের জন্যে মহাত্মার জন্যে নিজের প্রাণ ও আত্মসুখকে আনন্দে নিবেদন করতে পারি। অর্থাৎ তখন আমি যে জীবনে জীবিত সে জীবন আমার আয়ুর দ্বারা পরিমিত নয়। এই জীবন কার? সেই পুরুষের, যিনি সকলের মধ্যে ও সকলকে অতিক্রম করে, উপনিষদ যাঁর কথা বলেছেন "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"। কেবলমাত্র জপতপ পূজার্চনা করে তাঁর উপলব্ধি নয়, মানুষের যে-কোনো প্রকাশে মহিমা আছে, বিজ্ঞানে দর্শনে শিল্পে সাহিত্যে; অর্থাৎ যাতে সে এমন কিছুকে প্রকাশ করে যার মধ্যে পূর্ণতার সাধনা আছে। এ সমস্তই মানুষের সম্পদ, ক্ষণজীবী পশু মানুষের নয়, কিন্তু সেই চিরমানবের,—ইতিহাস যাঁর মধ্যে দিয়ে ক্রমাগতই বর্ব্বরতার প্রাদেশিকতার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন কাটিয়ে সর্ব্ব-জনীন সত্যরূপকে উদ্‌ঘাটিত করচে। সকল ধর্ম্মেই যাঁকে সর্ব্বোচ্চ বলে ঘোষণা করে

তাঁর মধ্যে মানবধর্ম্মেরই পূর্ণতা,—মানুষ যা-কিছুকে কল্যাণের মহৎ আদর্শ বলে মানে তারই উৎস যাঁর মধ্যে। নক্ষত্রলোকে মানবের রূপ নেই মানবের গুণ নেই, সেখানে কেবল বিশ্বশক্তির নৈর্ব্যক্তিক বিকাশ, বিজ্ঞান তাকে সন্ধান করে, কিন্তু মানুষের প্রেম ভক্তির স্থান সেখানে নেই। মহাপুরুষেরা সেই নিত্যমানবকেই একান্ত আনন্দের সঙ্গেই অন্তরে দেখেছেন, কিন্তু বারে বারে তাঁকে নানা নামে, নানা আখ্যানে, নানা রূপ কল্পনায় দূরে ফেলা হয়েছে, এমন কি অনেক সময় মানুষ তাঁকে নিজের চেয়েও ছোট করেছে—এবং ভূমার সাধনাকে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ভোগবিলাসের সামগ্রী করে তুলেচে।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ২০ জুলাই ১৯৩১)

আমাদের শাস্ত্র বলেন : তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয়।

বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে, অর্থাৎ পার্সোন্যালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কি হয়। মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেননা বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ।

(সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে, ভাদ্র ১৩৪০)

বাউল গেয়ে বেড়িয়েছে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

কেননা আমার মনের মানুষকেই একান্ত করে পাবার জন্যে পরম মানুষকে চাই, চাই 'তং বেদ্যং পুরুষং'; তা হলে শূন্যতা ব্যথা দেয় না।

(সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে, ভাদ্র ১৩৪০)

যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো; অন্তরে আপনার বেদনায় যাকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।

(মানুষের ধর্ম্ম, ১৩৪০)

'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ, যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ', সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো, যাঁকে জানলে মৃত্যু ব্যথা দিতে পারে না।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩৪৩)

তোমরা উপনিষদকে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু বলে স্বীকার করো কি না জানি নে, আমি উপনিষদকে সর্ব্বধর্ম্মের ভিত্তি বলে মানি।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ৮ নভেম্বর ১৯৩১)

মহানারায়ণোপনিষৎ

স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা
১।১৬

উপনিষদে ঋষি একটি কথা বলিয়াছেন—স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাদের বন্ধু—কারণ বন্ধুই যদি না হইবেন তবে সৃষ্টি করিলেন কেন? তিনি এই নিমেষেই আমাদিগকে লুপ্ত করিতে পারেন। সেই যে আমাদের জনিতা অর্থাৎ পিতা এবং বন্ধু—স বিধাতা—তিনিই আমাদের বিধাতা—অর্থাৎ আমাদের জীবনের প্রত্যেক সুখ দুঃখ তাঁহারেই বিধানে ঘটিতেছে। যখন একথা নিশ্চয় যে আমার বন্ধুর বিধান ছাড়া জগতে আর কোন বিধান নাই তখন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি ধন্য—সুখ দুঃখ আমার সকলি শিরোধার্য্য—সকল কর্ম্মে সকল স্থানেই তিনি আমাকে আমার সার্থকতার দিকেই লইয়া যাইতেছেন ইহাতে কোনো সন্দেহই নাই। আমিই কি কেবল তাঁহাকে চাই তিনি কি আমাকে চান না? যদি না চাহিবেন তবে আমার মত ক্ষুদ্রটুকুর জন্য জগৎ জুড়িয়া এত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন কেন? শুধু কেবল আমিই যদি তাঁহাকে চাহিতাম তবে কোনোকালে তাঁহাকে পাইতাম না—কিন্তু তিনি যখন আমাকে চান তখন আর ভাবনা কিসের? তাঁহার কাল অনন্ত তাঁহার পথ বিচিত্র এবং এই ক্ষুদ্র জীবনেই আমাদের শেষ নহে। অতএব প্রত্যহই তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাক—ইহা নিশ্চয় মনে রাখ তিনি তোমাকে এক মুহূর্ত্ত ছাড়েন নাই।

(চিঠিপত্র, ৭ম খণ্ড)

ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মুক্ত নন তাহলে তো তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধতেন তাহলে সৃষ্টিই হত না এবং সৃষ্টির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্য্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ, যে-রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন এই ত তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে সুন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন। এই তাঁর নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেই তো তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন তা হলে আমরা বলতে পারতুম না যে, স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা, তিনিই বন্ধু তিনিই পিতা তিনিই বিধাতা। এত বড়ো একটা আশ্চর্য কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না। কোনটা বড় কথা? ঈশ্বর শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত, এইটে? না, তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে সখিত্বে পতিত্বে বন্ধ—এইটে? দুটোই সমান বড়ো কথা। অধীনতাকে অত্যন্ত ছোটো করে দেখে তার সম্বন্ধে আমাদের একটা হীন সংস্কার হয়ে গেছে। এ রকম অন্ধ সংস্কার আরও আমাদের অনেক আছে। যেমন আমরা ছোটকে মনে করি তুচ্ছ, বড়োকেই মনে করি মহৎ—যেন গণিতশাস্ত্রের দ্বারা কাউকে মহত্ত্ব দিতে পারে! তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিয়ে থাকি। যেন, সীমা জিনিসটা যে কী তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য। এই

সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করছে। এ কী অনির্বচনীয়। এর কী আশ্চর্য রূপ, কী আশ্চর্য গুণ, কী আশ্চর্য বিকাশ। এক রূপ হতে আর এক রূপ, এক গুণ হতে আর এক গুণ, এক শক্তি হতে আর এক শক্তি—এরই বা নাশ কোথায়। এরই বা সীমা কোনখানে। সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে, যে অগণনীয় বহুলত্বে, যে অশেষ পরিবর্ত্তন-পরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এতবড়ো সাধ্য আছে কার। বস্তুত আমরা নিজের ভাষাকেই নিজে অবজ্ঞা করি কিন্তু সীমা পদার্থকে অবজ্ঞা করি এমন অধিকার আমাদের নেই। অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।

স্বাধীনতা অধীনতা নিয়েও আমরা কথার খেলা করি। অধীনতাও যে স্বাধীনতার সঙ্গেই এক আসনে বসে রাজত্ব করে একথা আমরা ভুলে যাই। স্বাধীনতাই যে আমরা চাই তা নয়, অধীনতাও আমরা চাই। যে চাওয়াতে আমাদের ভিতরকার এই দুই চাওয়ারই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় সেই হচ্ছে প্রেমের চাওয়া। বন্ধনকে স্বীকার করে বন্ধনকে অতিক্রম করব এই হচ্ছে প্রেমের কাজ। প্রেম যেমন স্বাধীন এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই আবার প্রেমের যে অধীনতা এতবড়ো অধীনতাই বা জগতে কোথায় আছে।

অধীনতা জিনিষটা যে কতো বড়ো মহিমান্বিত বৈষ্ণবধর্মে সেইটে আমাদের দেখিয়েছে। অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে অসংকোচে বলেছে ভগবান জীবের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন—সেই পরম গৌরবের উপরেই জীবের অস্তিত্ব। আমাদের পরম অভিমান এই যে তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি—এই বন্ধনটি তিনি মেনেছেন—নইলে আমরা আছি কী করে।

মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর সেবা করে তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিসকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগৎটি নিয়ে তিনি তো খুব ধুমধাম করতে পারতেন কিন্তু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভালো লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়ে দিচ্ছেন কেন? এই ভালো লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজেকে চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের প্রেম যেখানেই ভালো করে না মিলছে সেইখানে সমস্ত জগতে তার বেসুরটা বাজছে। সেইখানে কত দুঃখ যে জাগছে তার সীমা নেই—চোখের জল বয়ে যাচ্ছে। ওগো প্রেমিক, তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না তুমি যে মন ভুলিয়ে দেবে—একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাঁদিয়ে তারপরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে। তাই এত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে—তাই তো, সন্ধ্যা হয়ে আসে তবু আমার অভিসারের সজ্জা হল না।

(সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫)

এই ইচ্ছা প্রেম আনন্দের কথাটা উঠলেই তার উলটো কথাটা এসে মনের মধ্যে আঘাত করতে থাকে। সে বলে তবে এত শাসন বন্ধন কেন? যা চাই তা পাই নে কেন, যা চাই নে তা ঘাড়ে এসে পড়ে কেন?

এইখানে মানুষ তর্কের দ্বারা নয় কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা এর উত্তর দিতে চেষ্টা করছে। সে বলছে "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।"

অর্থাৎ যিনি আমাকে প্রকাশ করেছেন "স এব বন্ধুঃ" তিনি তো আমার বন্ধু হবেনই। আমাতে যদি তাঁর আনন্দ না থাকত তবে তো আমি থাকতুমই না। আবার "স বিধাতা।" বিধাতা আর দ্বিতীয় কেউ নয়—যিনি জনিতা, তিনিই বন্ধু, বিধান-কর্ত্তাও তিনি—অতএব বিধান যাই হ'ক মূলে কোনো ভয় নেই।

(বিধান, শান্তিনিকেতন, ২১ পৌষ ১৩১৫)

যদি কেবল অমোঘ নিয়মের লোহ-সিংহাসনে তিনি কেবল বিধাতারূপেই বসে থাকেন তা হলে তো সেই বিধাতার সামনে আমরা কাঠ-পাথর ধূলি-বালিরই সমান হই। তা হলে তো আমরা শিকলে বাঁধা বন্দী।

কিন্তু তিনি শুধু তো বিধাতা নন, "স এব বন্ধুঃ"—তিনিই যে বন্ধু।

বিধাতার প্রকাশ তো বিশ্বচরাচরে দেখছি, বন্ধুর প্রকাশ কোন্‌খানে? বন্ধুর প্রকাশ তো নিয়মের ক্ষেত্র নয়—সে প্রকাশ আমার অন্তরের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথায় হবে?

বিধাতার কর্ম্মক্ষেত্র এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে—আর বন্ধুর আনন্দনিকেতন আমার জীবাত্মায়।

মানুষ একদিকে প্রকৃতি আর একদিকে আত্মা—একদিকে রাজার খাজনা জোগায় আর একদিকে বন্ধুর ডালি সাজায়। একদিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর একদিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে সুন্দর হয়ে উঠতে হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে প্রকৃতি—আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন—আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।

যেদিকে আমি ইট কাঠ গাছ পাথরের সমান সেই সাধারণ দিকে ঈশ্বরের সর্বব্যাপী নিয়ম কোনো মতেই আমাকে সাধারণ থেকে লেশমাত্র তফাত হতে দেয় না—আর যেদিকে আমি বিশেষ ভাবে আছি সেই স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঈশ্বরের বিশেষ আনন্দ কোনো মতেই আমাকে সকলের সঙ্গে মিলে যেতে দেয় না। বিধাতা আমাকে সকলের করেছেন আর বন্ধু আমাকে আপনার করেছেন—সেই সকলের সামগ্রী আমার প্রকৃতি, আর সেই তাঁর আপনার সামগ্রী আমার জীবাত্মা।

(বিধান, শান্তিনিকেতন, ২১ পৌষ ১৩১৫)

উপনিষদে আছে : স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা; তিনি ভালবাসেন, তিনি সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই বিধান করেন। সৃষ্টি-করাটা সহজ আনন্দের খেয়ালে, বিধান-করায় চিন্তা আছে। যাকে খাস সাহিত্য বলে সেটা হল সেই সৃষ্টিকর্ত্তার এলেকায়, সেটা কেবল আপন মনে। যদি কোন হিসাবি লোক স্রষ্টাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে; "কেন সৃষ্টি করা হল" তিনি জবাব দেন, "আমার খুশি!" সেই খুশিটাই নানা রঙে নানা রসে আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। পদ্মফুলকে যদি জিজ্ঞাসা করো, "তুমি কেন হলে" সে বলে, "আমি হবার জন্যই হলুম।" খাঁটি সাহিত্যেরও সেই একটিমাত্র জবাব।

অর্থাৎ, সৃষ্টির একটা দিক আছে যেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্ত্তার বিশুদ্ধ বকুনি। সেদিক থেকে এমনও বলা যেতে পারে, তিনি আমাকে চিঠি লিখছেন। আমার কোনো চিঠির জবাবে নয়, তাঁর আপনার বলতে ইচ্ছে হয়েছে বলে; কাউকে তো বলা চাই। অনেকেই মন দিয়ে শোনে না, অনেকে বলে, "এ তো সারবান নয়; এ তো বন্ধুর আলাপ, এ তো সম্পত্তির দলিল নয়।" সারবান থাকে মাটির গর্ভে, সোনার খনিতে; সে নেই ফুলের বাগানে, নেই সে উদয়-দিগন্তে মেঘের মেলায়। আমি একটা গর্ব করে থাকি, ঐ চিঠি-লিখিয়ের চিঠি পড়তে পারৎপক্ষে কখনো ভুলি নে। বিশ্ববকুনি যখন-তখন আমি শুনে থাকি। তাতে বিষয়কাজের ক্ষতি হয়েছে, আর যারা আমাকে দলে ভিড়িয়ে কাজে লাগাতে চায় তাদের কাছ থেকে নিন্দাও শুনেছি; কিন্তু আমার এই দশা।

অথচ, মুশকিল হয়েছে এই যে, বিধাতাও আমাকে ছাড়েন নি। সৃষ্টিকর্ত্তার লীলাঘর থেকে বিধাতার কারখানাঘর পর্যন্ত যে-রাস্তাটা গেছে সে-রাস্তায় দুই প্রান্তেই আমার আনাগোনার কামাই নেই।

এই দোটানায় পড়ে আমি একটা কথা শিখেছি। যিনি সৃষ্টিকর্তা স এব বিধাতা; সেই জন্যেই তাঁর সৃষ্টি ও বিধান এক হয়ে মিশেছে, তাঁর লীলা ও কাজ এই দুয়ের মধ্যে একান্ত বিভাগ পাওয়া যায় না। তাঁর সকল কর্মই কারুকর্ম, ছুটিতে খাটুনিতে গড়া; কর্মের রূঢ় রূপের উপর সৌন্দর্যের আব্রু টেনে দিতে তাঁর আলস্য নেই। কর্মকে তিনি লজ্জা দেন নি। দেহের মধ্যে যন্ত্রের ব্যবস্থাকৌশল আছে কিন্তু তাকে আবৃত করে আছে তার সুষমাসৌষ্ঠব, বস্তুত সেইটাই প্রকাশমান।

(জাভাযাত্রীর পথ, যাত্রী, ২ শ্রাবণ ১৩৩৪)

উপনিষদ বলেন "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।" তোমরা উপনিষদকে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু বলে স্বীকার করো কি না জানি নে, আমি উপনিষদকে সর্ব্বধর্ম্মের ভিত্তি বলে মানি। উপনিষদে ঈশ্বরকে বলচেন বন্ধু, তাঁকেই বলচেন বিধানকর্ত্তা।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ৮ নভেম্বর ১৯৩১)

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দানং তপো
যজ্ঞস্তপো ভূর্ভুবঃসুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্যৈতৎ তপঃ॥ ১০

তপস্যা একটা কোনো কৌশলবিশেষ নহে, তাহা কোনো গোপনরহস্য নহে—

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দানং তপো
যজ্ঞস্তপো ভূর্ভুবঃসুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্যৈতৎ তপঃ।

ঋতই তপস্যা, সত্যই তপস্যা, শ্রুত তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তপস্যা, দান তপস্যা, কর্ম তপস্যা এবং ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকব্যাপী এই যে ব্রহ্ম ইঁহার উপাসনাই তপস্যা।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বল তেজ শান্তি সন্তোষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, দান ও কর্ম দ্বারা স্বার্থপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তবে অন্তরে-বাহিরে আত্মায়-পরে লোক-লোকান্তরে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

(ধর্মপ্রচার, ধর্ম, ১৩১০)

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥ ২।২।২
ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥ ২।২।৩
প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্য শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ ২।২।৪

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।

তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ কর। ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং—

উপনিষদে যে মহাস্ত্র ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া শরং হ্যুপাসা-নিশিতং সন্ধয়ীত—উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে!

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি!

তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যস্বরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর।

এই উপমাটি অতি সরল। যখন শুভ্র সবলতনু আর্য্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যখন হিংস্র পশু এবং হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে তখনকার সেই টঙ্কারমুখর অরণ্য নিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা!

এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে। ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে—ইহার মধ্যে লেশমাত্র কুণ্ঠিত ভাব নাই। প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে এমন অসঙ্কোচ বাক্য কাহারো মুখ দিয়া বাহির হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই এরূপ সাহসিক উপমা এমন সহজ এমন প্রবল সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। মৃগ যেমন ব্যাধের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, ব্রহ্ম তেমনি আত্মার অনন্য লক্ষ্যস্থল। তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি—ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে! অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। প্রমাদ-শূন্য হইয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইবে।

উপমাটি যেমন সরল, উপমার বিষয়গত কথাটি তেমনি গভীর। এখন সে অরণ্য নাই, সে ধনুঃশর নাই; এখন নিরাপদ নগরনগরী অপরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত। কিন্তু সেই আরণ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্যযুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান-বন্দুকে ধনুঃশরকে জিতিয়াছে কিন্তু সেই কত শত শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সমস্ত

প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে তদেতৎ সত্যং সেই যে একমাত্র সত্য যদ্ অণুভ্যোণু চ, যাহা অণু হইতেও অণু, অথচ যস্মিন লোকো নিহিতা লোকিনশ্চ, যাহাতে লোক সকল এবং লোকবাসী সকল নিহিত রহিয়াছে সেই অপ্রত্যক্ষ ধ্রুব সত্যকে শিশুতুল্য সরল ঋষিগণ অতি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তদমৃতং, তাহাকেই তাঁহারা অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিষ্যকে ডাকিয়া বলিয়াছেন তদ্ভাবগতেন চেতসা, তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য কর--তদেবাক্ষ্যং সোম্য বিদ্ধি, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য তাঁহাকে বিদ্ধ কর! শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ, লক্ষ্যপ্রবিষ্ট শরের ন্যায় তাঁহারই মধ্যে তন্ময় হইয়া যাও!

সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের অতীত সেই পরম সত্যকে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা সেও সামান্য কথা নহে, শুদ্ধ যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তাহাতেও সেই স্বল্পাশী বিরলবসন সরলপ্রকৃতি বনবাসী প্রাচীন আর্য ঋষিদের বুদ্ধিশক্তির মহৎ উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত।

কিন্তু উপনিষদের এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে—সকল সত্যকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাঁহাকে একমাত্র তদেতৎ সত্যং বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভ্য একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না—একাগ্রচিত্ত ব্যাধের ধনু হইতে শর যেরূপ প্রবলবেগে প্রত্যক্ষ সন্ধানে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, ব্রহ্মর্ষিদের আত্মা পরম সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইবার জন্য সেইরূপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবলমাত্র সত্য নিরূপণ নহে, সেই সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

কারণ, সেই সত্য কেবলমাত্র সত্য নহে, তাহা অমৃত। তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া নাই, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আত্মার অমরত্ব।

(ব্রহ্মমন্ত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড,
৮ মাঘ, ১৩০৭)

প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবাত্মার লক্ষ্যস্থান এই পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল ওঁ।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

তাঁহার প্রতিমা ছিল না, কোন মূর্ত্তিকল্পনা ছিল না--পূর্ব্বতন পিতামহগণ তাঁহাকে মনন করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্র শব্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে শব্দ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি পরিপূর্ণ, কোন বিশেষ অর্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সেই শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোন বিশেষ আকার দ্বারা বাধা দেয় না; সেই একটিমাত্র ওঁ শব্দের মহাসংগীত জগৎসংসারের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে।

ব্রহ্মের বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য পিতামহগণ কিরূপ যত্নবান ছিলেন ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ হইবে।

(ব্রহ্মমন্ত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড,
৮ মাঘ ১৩০৭)

প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ছিল না, কোন চিহ্ন ছিল না—কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ওঁ। এই ধ্বনির সহায়ে ঋষিগণ উপাসনা-

নিশিত আত্মাকে একাগ্রগামী শরের ন্যায় ব্রহ্মের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রহ্মবাদী সংসারীগণ বিশ্বজগতের যাহা কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

(ব্রহ্মমন্ত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ মাঘ ১৩০৭)

উপনিষৎ বলেছেন, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে—ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়। এই লক্ষ্যটি কিসের জন্যে? কিছুকে আহরণ করে নিজের দিকে টানবার জন্যে নয়—নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।

এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার আমি তা মনে করি নে। এটা হচ্ছে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে, আমি তাঁর মধ্যেই আছি; কোথাও বিচ্ছেদ নাই।

(আত্মসমর্পণ, শান্তিনিকেতন, ১৮ চৈত্র ১৩০৫)

তুমি বড়ো হও, ভালো হও এই কথাই মানুষের পক্ষে কম কথা নয় কিন্তু তাঁহারা একেবারে বলিয়া বসেন—"শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।" শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে একেবারে নিবিষ্ট হইয়া যায় তেমনি করিয়া তন্ময় হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ কর।

(ধর্মের অধিকার, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩০৫)

উপনিষদে আছে, আত্মার লক্ষ্য ব্রহ্ম, ওঙ্কারের ধ্বনিবেগ তাকে ধনুর মতো লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। এতে বলা হচ্ছে, বাক্যের দ্বারা যুক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জানবার বিষয় নন, তিনি আত্মার সঙ্গে একাত্ম হবার বিষয়। এই উপলব্ধিতে ধ্বনিই সহায়তা করে, শব্দার্থ করে না।

জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে মোকাবিলা হয় মাত্র; অর্থাৎ সান্নিধ্য হয়, সাযুজ্য হয় না। কিন্তু, এমন-সকল বিষয় আছে যাকে জানার দ্বারা পাওয়া যায় না, যাকে আত্মস্থ করতে হয়। আম বস্তুটাকে সামনে রেখে জানা চলে, কিন্তু তার রসটাকে আত্মগত করতে না পারলে বুদ্ধিমূলক কোনো প্রণালীতে তাকে জানবার উপায় নেই। ....কেবল অর্থ যথেষ্ট নয়, সেখানে ধ্বনির প্রয়োজন; কেন না ধ্বনি বেগবান্।

(গদ্যছন্দ, ছন্দ, বৈশাখ ১৩৪১)

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥ ২।২।৫

ঘুরে ফিরে মানুষ যা-কিছু করছে—কখনো বা ভুল করে কখনো বা ভুল ভেঙে—সমস্তর মূলে আছে এই আত্মবোধের সাধনা। সে যাকেই চাক-না সত্য করে চাচ্ছে এই

আপনাকে, জেনে চাচ্ছে, না জেনে চাচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকে বিরাটভাবে একটি জায়গায় মিলিয়ে জড়িয়ে নিয়ে মানুষ আত্মার একটি অখণ্ড উপলব্ধিকে পেতে চাচ্ছে। সে একরকম করে বুঝতে পারছে কোনোখানেই বিরোধ সত্য নয়, বিচ্ছিন্নতা সত্য নয়, নিরন্তর অবিরোধের মধ্যে মিলে উঠে একটি বিশ্বসংগীতকে প্রকাশ করবার জন্যেই বিরোধের সার্থকতা—সেই সংগীতেই পরিপূর্ণ আনন্দ। নিজের ইতিহাসে মানুষ সেই তানটাকেই কেবল সাধছে, সুরের যতই স্খলন হোক তবু কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছে না। উপনিষদের বাণীর দ্বারা সে কেবলই বলছে : তমেবৈকং জানীথ আত্মানম্। সেই এককে জানো, সেই আত্মাকে। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ। ইহাই অমৃতের সেতু।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্বব্যাপক ঐক্য প্রমাণ করে, সেই ঐক্য-উপলব্ধিতে আনন্দিত হয় বৈজ্ঞানিক। তেমনি আত্মার আনন্দ আত্মিক ঐক্যকে উপলব্ধি দ্বারা; যে-আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ বলছেন, তমেবৈকং জানথ আত্মানম্—সেই আত্মাকে জানো, সেই এককে, যাকে সকল আত্মার মধ্যে এক করে জানলে সত্যকে জানা হয়।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্—সেই এককে জানো, সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মন্যেব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে নয় মানবপ্রেমে, শুভকর্মে, বিষয়বুদ্ধিতে নয় আত্মার প্রেরণায়।

(আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ বৈশাখ ১৩৪৭)

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ ২।২।৭

আধুনিক কবি বলিয়াছেন : Truth is beauty, beauty truth—আমাদের শুভ্রবসনা, কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে ট্রুথ এবং বিউটি মূর্তিমতী। উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন : আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি; যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই ট্রুথ এবং বিউটি, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।

(সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য, ১৩১৩)

সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্যকারণপরম্পরা, সে-কথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে—কিন্তু, সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত।

(সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য, ১৩১৩)

যেমন সমস্তই প্রাণে কাঁপিতেছে, তেমনি সমস্তই আনন্দ, উপনিষদ এ-কথাও বলিয়াছেন। জগতের এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপ দেখিবার পথে সুন্দর-অসুন্দরের

ভেদটা প্রথমে একান্ত হইয়া মাথা তোলে। নহিলে সুন্দরের পরিচয় ঘটা একেবারে অসম্ভব।

(সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্য, ১৩১৪)

প্রকাশই আনন্দ, এইজন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন : আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি—যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ।

(সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্য, ১৩১৪)

(এই যে সকালবেলাটি প্রতিদিন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এতে আমাদের আনন্দ অল্পই। এই সকাল আমাদের অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়ে গেছে।

অভ্যাস আমাদের নিজের মনের তুচ্ছতা দ্বারা সকল মহৎ জিনিসকেই তুচ্ছ করে দেয়। সে নাকি নিজে বদ্ধ এইজন্যে সে সমস্ত জিনিসকেই বদ্ধ করে দেয়।

আমরা যখন বিদেশে বেড়াতে যাই তখন কোনো নূতন পৃথিবীকে দেখতে যাই নে। এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমুক্ত করে দেখতে যাই। আবরণটাকে ঘুচিয়ে এই পৃথিবীর উপরে চোখ মেললেই এই চিরদিনের পৃথিবীতেই সেই অভাবনীয়কে দেখতে পাই যিনি কোনোদিন পুরাতন নন। তখনই আনন্দ পাই।

যে আমাদের প্রিয়, অভ্যাস তাকে সহজে বেষ্টন করতে পারে না। এইজন্যই প্রিয়জন চিরদিনই অভাবনীয়কে অনন্তকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাকে যে আমরা দেখি সেই দেখাতেই আমাদের দেখা শেষ হয় না—সে আমাদের দেখা শোনা আমাদের সমস্ত বোধকেই ছাড়িয়ে বাকি থাকে। এইজন্যেই তাতে আমাদের আনন্দ।

তাই উপনিষৎ—আনন্দরূপমমৃতং—ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে যা মরে যায় যা ফুরিয়ে যায় তাতে আমাদের আনন্দ নেই—যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখি অমৃতকে দেখি সেইখানেই আমাদের আনন্দ।

এই অসীমই সত্য—তাঁকে দেখাই সত্যকে দেখা। যেখানে তা না দেখবে সেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা মূঢ়তা অভ্যাস ও সংস্কারের দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি, সেইজন্যে তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছি নে।)

(বৈজ্ঞানিক বল, দার্শনিক বল, কবি বল, তাঁদের কাজই মানুষের এই সমস্ত মূঢ়তা ও অভ্যাসের আবরণ মোচন করে এই জগতের মধ্যে সত্যের অনন্ত রূপকে দেখানো, যা-কিছু দেখছি একেই সত্য করে দেখানো, নূতন কিছু তৈরি করা নয় কল্পনা করা নয়। এই সত্যকে মুক্ত করে দেখানোর মানেই হচ্ছে মানুষের আনন্দের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া।

যেমন ঘর ছেড়ে দিয়ে কোনো দূরদেশে যাওয়াকে অন্ধকারমুক্তি বলে না, ঘরের দরজাকে খুলে দেওয়াই বলে অন্ধকার-মোচন, তেমনি জগৎ সংসারকে ত্যাগ করাই মুক্তি নয়; পাপ স্বার্থ অহংকার জড়তা-মূঢ়তা ও সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে, যা দেখছি একেই সত্য করে দেখা, যা করছি একেই সত্য করে করা, যার মধ্যে আছি এরই মধ্যে সত্য করে থাকাই মুক্তি।)

যদি এই কথাই সত্য হয় যে, ব্রহ্ম কেবল আপনার অব্যক্তস্বরূপেই আনন্দিত তাহলে তাঁর সেই অব্যক্তস্বরূপের মধ্যে বিলীন না হলে নিরানন্দের হাত থেকে আমাদের কোনোক্রমেই নিস্তার থাকত না। কিন্তু তা তো নয়, প্রকাশেই যে তাঁর আনন্দ। নইলে এই জগৎ তিনি প্রকাশ করলেন কেন? বাইরে থেকে কোনো প্রকাণ্ড

পীড়া জোর করে তাঁকে প্রকাশ করিয়েছে? মায়া নামক কোনো একটা পদার্থ ব্রহ্মকে একেবারে অভিভূত করে নিজেকে প্রকাশমান করেছে?

সে তো হতেই পারে না। তাই উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, এই যে প্রকাশমান জগৎ এ আর কিছু নয়, তাঁর মৃত্যুহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

তিনি যদি প্রকাশেই আনন্দিত তবে আমি কি আনন্দের জন্যে অপ্রকাশের সন্ধান করব। তাঁর যদি ইচ্ছাই হয় প্রকাশ, তবে আমার এই ক্ষুদ্র ইচ্ছাটুকুর দ্বারা আমি তাঁর সেই প্রকাশের হাত এড়াই বা কেমন করে?

তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমি কিছুতেই আনন্দিত হতে পারব না। এর সঙ্গে যেখানেই আমার যোগ সম্পূর্ণ হবে সেইখানেই আমার মুক্তি হবে সেইখানেই আমার আনন্দ হবে। বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব—নিজের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে দীপ্যমান করেই আমি মুক্ত হব। ভববন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করে মুক্তি নয়—হওয়াকেই বন্ধনস্বরূপ না করে মুক্তি-স্বরূপ করাই হচ্ছে মুক্তি। কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করছেন তেমনি আনন্দেই প্রকাশকে বরণ করা, তিনি যেমন আনন্দে কর্ম করছেন তেমনি আনন্দেই কর্মকে গ্রহণ করা, একেই বলি মুক্তি। কিছুই বর্জন না করে সমস্তকেই সত্যভাবে স্বীকার করে মুক্তি।

প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাত আমার কাছে ম্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণ শক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখতে পায় তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ওই অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়ে ছিল।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি আনন্দকে দেখছি নে, সেই-জন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে, আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয় সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয় যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয় প্রকাশের মুক্তি।

(মুক্তি, শান্তিনিকেতন, ৭ বৈশাখ ১৩১৬)

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দরূপ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কতকাল ধরে যে, তা আমি নিজেও জানি নে, কিন্তু অপেক্ষা করে আছি। যতদিন নিজেকে ক্ষুদ্র বলে জানছি, ছোটো চিন্তায় ছোটো বাসনায় মৃত্যুর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি, ততদিন তোমার অমৃতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্ছে না। ততদিন আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্ম্মে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারিদিকে শ্রী নেই; ততদিন তোমার জগদ্ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে না। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না উপলব্ধি করছি, ততদিন আমার ভয়ের অন্ত নেই, শোকের অবসান নেই,—ততদিন মৃত্যুকেই

চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ ব'লে গণ্য করি,—ততদিন সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে পারি নে, মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই,—ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি বলেই কৃপণের মতো আপনাকে কেবলি পায়ে পায়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে চাই; শ্রম বাঁচিয়ে চলি, কষ্ট বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি, কিন্তু সত্য বাঁচিয়ে চলি নে, ধর্ম বাঁচিয়ে চলি নে, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলি নে। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না দেখি ততদিন চারি-দিকের অনিয়ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান, অপূর্ণতা, অসৌন্দর্য, অপমান আমার জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না—চতুর্দিকের প্রতি আমার সুগভীর আলস্যবিজড়িত অনাদর দূর হয় না, নিখিলের প্রতি আমার আত্মা পরিপূর্ণ শক্তিতে প্রসারিত হতে পারে না; ততদিন পাপকে বিমুগ্ধ বিহ্বল ভাবে অন্তরের মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং পাপকে উদাসীন দুর্বলভাবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল প্রশ্রয় দিতেই থাকি—কঠিন এবং প্রবল সংকল্প নিয়ে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে পারি নে;—কি অব্যবস্থাকে কি অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে প্রস্তুত হই নে, পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ আমার এই আমিটুকুর মধ্যে বোধ করতে পারি নে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতা এবং দীনতার অধম দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে-মনে গৃহে-গ্রামে সমাজে-স্বদেশে সর্বত্রই নিদারুণ নৈষ্ফল্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে, এবং অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব ব্যাধিরূপে দুর্ভিক্ষরূপে, অনাচার ও অন্ধ সংস্কাররূপে, শতসহস্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারিদিকে স্তূপাকার করে তোলে।

(জাগরণ, শান্তিনিকেতন)

দৃষ্টিকে সর্বতোভাবে নিজের দিক থেকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই সত্য দৃষ্টি পাওয়া যায়—অনন্তের আনন্দরূপ অমৃতরূপ তখনি চারিদিকে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। সেই রূপটিকে আমি চোখ মেলে দেখে যাব—এরই জন্যে আমার সমস্ত জীবনের সমস্ত ক্রন্দন। এই কথাটাকেই সুস্পষ্টভাবে না বুঝেও কৌতুকের ছন্দে আমি লিখেছিলুম—

আমি চাইনে হতে নবযুগে
নব বঙ্গের চালক
যদি পরজন্মে পাই রে হ'তে
ব্রজের রাখালবালক।

ব্রজের বালকের সেই সরল দৃষ্টিটি আছে যাতে না বুঝে না জেনেও সমস্ত সুন্দর করে দেখতে পাওয়া যায়—যে দৃষ্টির কাছে অনন্ত আপনিই দিনে রাতে কাজে খেলায় অতি সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দেন।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭)

আজ সকালে জাহাজের ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আকাশের পাণ্ডুর নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত হইতে মৃদু শীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট মাধুর্যে অভিষিক্ত হইল। আমার মন বলিতে লাগিল, 'এই তো তাঁহার প্রসাদসুধার প্রবাহ।'

সকল সময় মন এমন করিয়া বলে না। অনেক সময় বাহিরের সৌন্দর্যকে আমরা বাহিরে দেখি—তাহাতে চোখ জুড়ায়, কিন্তু তাহাকে অন্তরে গ্রহণ করি না। ঠিক যেন অমৃত ফলকে আঘ্রাণ করি, তাহার স্বাদ লই না।

কিন্তু সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেইদিন তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনি সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান গাহিয়া উঠে, 'নহে, নহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে—এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা।'

আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই-যে অনির্বচনীয় মাধুর্য স্তরে স্তরে দিকে দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আছে কোন্‌খানে? ইহা কি জলে? ইহা কি বাতাসে? এই ধারণার অতীতকে কে ধারণ করিতে পারে!

ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ। ইহাই দেশে দেশে, কালে কালে, অগণ্য প্রাণীর প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে, মন হরণ করিতেছে—ইহা আর কিছুতেই ফুরাইল না। ইহারই অমৃতস্পর্শে কত কবি কবিতা লিখিল, কত শিল্পী শিল্প রচনা করিল, কত জননীর হৃদয় স্নেহে গলিল, কত প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উঠিল—সীমার বক্ষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত-ফোয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার আর অন্ত দেখি না—অন্ত দেখি না। তাহা আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য।

ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্‌। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। এই যে রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত। শুধুই রূপের মধ্যে আসিয়া মন ঠেকিল, মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া চিন্তা ফুরাইল, তবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কী পাইলাম! বস্তুকে দেখিলাম, সত্যকে দেখিলাম না!

আমার কি কেবলই চোখ আছে, কান আছে? আমার মধ্যে কি সত্য নাই, আনন্দ নাই? সেই আমার সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতের দিকে চাহিয়া দেখি তখনি দেখিতে পাই, সম্মুখে আমার এই তরঙ্গিত সমুদ্র—এই প্রবাহিত বায়ু—এই প্রসারিত আলোক—বস্তু নহে, ইহা সমস্তই আনন্দ, সমস্তই লীলা, ইহার সমস্ত অর্থ একমাত্র তাঁহারই মধ্যে আছে। তিনি এ কী দেখাইতেছেন, কী বলিতেছেন, আমি তাহার কী-ই বা জানি! এই আকাশপ্লাবী আনন্দের সহস্র লক্ষ ধারা যেখানে এক মহাস্রোতে মিলিয়া আবার তাঁহারই এই হৃদয়ের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে সেইখানে মুহূর্তকালের জন্য দাঁড়াইতে পারিলে এই সমস্ত-কিছুর মহৎ অর্থ—ইহার পরম পরিণামটিকে দেখিতে পাইতাম। এই-যে অচিন্তনীয় শক্তি, এই-যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই-যে অপরিসীম সত্য, এই-যে অপরিমেয় আনন্দ ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল বলিয়া জানিয়া গেলাম তবে সে কী ভয়ানক ব্যর্থতা, কী মহতী বিনষ্টি। নহে, নহে, এই তো তাঁহার প্রসাদ, এই তো তাঁহার প্রকাশ, এই তো আমাকে স্পর্শ করিতেছে, আমাকে বেষ্টন করিতেছে, আমার চৈতন্যের তারে তারে সুর বাজাইতেছে, আমাকে বাঁচাইতেছে, আমাকে জাগাইতেছে, আমার মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ডাক দিতেছে, আমাকে পলে পলে যুগযুগান্তরে পরিপূর্ণ করিতেছে; শেষ নাই, কোথাও শেষ নাই, কেবলই আরও আরও আরও; তবু সেই এক, কেবলই এক, সেই আনন্দময় অমৃতময় এক! সেই অতল অকূল অখণ্ড নিস্তব্ধ নিঃশব্দ সুগম্ভীর এক—কিন্তু, কত তাহার ঢেউ, কত তাহার কলসংগীত!

(আনন্দরূপ, পথের সঞ্চয়, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)

বস্তুত অস্পষ্টতাই ব্যর্থতা; সুতরাং সেইখানেই ভূমার প্রকাশ প্রতিহত, ভূমার আনন্দ প্রচ্ছন্ন। তাঁহার আনন্দ রূপগ্রহণের দ্বারাই সার্থক। অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর। এইজন্য জগৎ সৃষ্টির ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলই সুব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে; সীমা হইতে সীমার অভিমুখে চলিয়াছে অসীমের অভিসারযাত্রা। কুঁড়ি হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, কেবলই রূপ হইতে ব্যক্ততর রূপ।

(সীমার সার্থকতা, পথের সঞ্চয়, ১৩১৯)

সাঁতার যতক্ষণ না শিখি ততক্ষণ এলোমেলো হাত পা ছোঁড়া চলে। ভালো সাঁতার যেমনি শিখি অমনি আমাদের চেষ্টা সীমাবদ্ধ হইয়া আসে এবং তাহা সুন্দর হইয়া প্রকাশ পায়। পাখি যখন ওড়ে তখন সুন্দর দেখিতে হয়, কারণ, তাহার ওড়ার মধ্যে দ্বিধা নাই, তাহা সুনিয়ত, অর্থাৎ তাহা আপনার নিশ্চিত সীমাকে পাইয়াছে। এই সীমাকে পাওয়াই সৃষ্টি অর্থাৎ সত্য; এবং সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য অর্থাৎ আনন্দ। সীমা হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই কদর্যতা, তাহাই নিরানন্দ, তাহাই বিনাশ।

(সীমার সার্থকতা, পথের সঞ্চয়, ১৩১৯)

তুমি যে আনন্দ, তুমি যে অমৃত, এই কথাটি আজ স্মরণ করব। সেই স্মরণ করবার দিনই এই মহোৎসবের দিন।

(সৃষ্টির অধিকার, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করছে তেমনি আমার জীবনকে করবে।

(সৃষ্টির অধিকার, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

একটি ঘাসের শীষের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি ও আনন্দ রয়েছে, আমার সত্তায়ও সেই একই ধারা এই বোধে আমি বিস্ময়ে অভিভূত। আমরা যখন চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াই তখন নিজেদের চতুর্দিকে ধুলো ওড়াই আর এই পরম সত্যটিকে ভুলে থাকি যে, আমরা আছি। অন্তর থেকে যে দৃষ্টি আসে, সেই আলোর সংকেতে এই বিশ্বচিত্র দেখার কোন্ সে অমিত আনন্দ আপনাকে তা কী জানাব!

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, ১৫ মে ১৯১৪,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমতী মলিনা রায়)

সকাল বেলা নৌকোর ছাদে বসে বসে যখন সম্মুখে দেখি দিগন্তপ্রসারিত গিরি-শ্রেণীর নীলাভ রক্তবর্ণের মহিমা, প্রাতঃসূর্যের মুকুটে ঝলমল অপূর্ব শোভা, তখন মন বলে, অনন্ত আমার রূপ, **আমিই আনন্দরূপম্**। আমার এ দেহ তো নয় শুধু রক্তমাংসপুঞ্জ—অন্তহীন আনন্দে গড়া তার সকল অঙ্গ। যে অভ্যস্ত জীবনে আমরা আপনাকে করি একান্ত, বানাই আপন খণ্ড মাপের জগৎ, সেখানে আমাদের আত্মার উপবাসদশা ঘোচে না। সত্যকে যেদিন অন্তরে পাই, সত্য হওয়া ছাড়া তখন অন্য পথ নেই। আত্মরত অস্তিত্বের সীমানায় সত্যের অম্লানস্বরূপ ধরে না।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, ১২ অক্টোবর ১৯১৫,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমতী মলিনা রায়)

কবি কীট্‌স্‌ বলেছেন, সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ, সত্যের বাধামুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য। সত্য মুক্তি লাভ করলে আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্ণতাই সৌন্দর্য, এই কথাটাই আমি উপনিষদের এই বাণীতে অনুভব করি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌ বিভাতি; অনন্তস্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্ছেন সেইখানেই তাঁর অমৃতরূপ, আনন্দরূপ। মানুষ ভয়ে লোভে ঈর্ষায় মূঢ়তায়, প্রয়োজনের সংকীর্ণতায়, এই প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে; এবং সেই বিকৃতিকেই অনেক সময় বড়ো নাম দিয়ে বিশেষ ভাবে আদর করে থাকে।

(জাপানযাত্রী, ২৭ বৈশাখ ১৩২৩)

ওই কালো অনন্ত আসছেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ময়ী আনন্দমূর্ত্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেইজন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজছে; অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন করে সাজাচ্ছে। ওই কালো এই রূপসীকে এক মুহূর্ত্তে বুকের থেকে নামিয়ে রাখতে পারেন না, কেন না এ যে তাঁর পরমা সম্পদ্‌। ছোটোর জন্যে বড়োর এই সাধনা যে কী অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে, পাখির পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে, মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধরা পড়ছে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের?—অব্যক্ত যে ব্যক্তর মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ করছেন, আপনাকে ত্যাগ করে করে ফিরে পাচ্ছেন।

এই অব্যক্ত কেবলই যদি না-মাত্র, শূন্যমাত্র হতেন, তা হলে প্রকাশের কোনো অর্থই থাকত না, তা হলে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হত। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হত তা হলে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হয়ে থাকত, কেবলই আরো-কিছুর দিকে আপনাকে নূতন করে তুলত না। এই আরো-কিছুর দিকেই সমস্ত জগতের আনন্দ কেন? এই অজানা আরো-কিছুর বাঁশি শুনেই সে কুল ত্যাগ করে কেন? ওই দিকে শূন্য নয় ব'লেই, ওই দিকেই সে পূর্ণকে অনুভব ক'রে ব'লেই।

(জাপানযাত্রী, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)

উপনিষদ যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপের কথা বলেছেন অনন্তম্‌, সেখানে তাঁর প্রকাশের কথা কী বলেছেন। বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। এইটে হল আমাদের আসল কথা।

(সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, বৈশাখ ১৩৩০)

শুক্ল সন্ধ্যার আকাশ জ্যোৎস্নায় উপছে পড়েছে—যখন কমিটি-মিটিঙে তর্কবিতর্ক চলেছে তখন সেই আশ্চর্য খবরটি ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু তার পর যখন দশটা রাত্রে ময়দানের সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরি তখন ঘন চিন্তার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে যে প্রকাশটি আমার মনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় তাকে দেখে আর কী বলব। বলি, আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। সেই-যে যৎ, আনন্দরূপে যার প্রকাশ, সে কোন্‌ পদার্থ? সে কি শক্তি পদার্থ।

রান্নাঘরে শক্তির প্রকাশ লুকিয়ে আছে। কিন্তু ভোজের থালায় সে কি শক্তির প্রকাশ। মোগল সম্রাট প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন শক্তিকে। সেই বিপুল কাঠ-খড়ের প্রকাশকে কি প্রকাশ বলে। তার মূর্ত্তি কোথায়? আওরংজেবের নানা আধুনিক

অবতাররাও রক্তরেখায় শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে অতি বিপুল আয়োজন করেছেন। কিন্তু যিনি আবিঃ, যিনি প্রকাশস্বরূপ, আনন্দরূপে যিনি ব্যক্ত হচ্ছেন, তিনি সেই রক্ত-রেখার উপরে রবার বুলোতে এখনই শুরু করেছেন। আর তাঁর আলোকরশ্মির সম্মার্জনী তাদের আয়োজনের আবর্জনার উপর নিশ্চয় পড়তে আরম্ভ হয়েছে। কেননা তাঁর আনন্দ যে প্রকাশ, আর আনন্দই যে তাঁর প্রকাশ।

এই প্রকাশটিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর শক্তিকে যদি তিনি সামনে রাখতেন তা হলে তাঁকে মানার মতো অপমান আমার পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। যখন জাপানে যাচ্ছিলাম জাহাজ পড়ল দারুণ ঝড়ে। আমি ছিলেম ডেকে বসে। আমাকে ডুবিয়ে মারার পক্ষে পবনের একটা ছোটো নিশ্বাসই যথেষ্ট; কিন্তু কালো সাগরের বুকের উপরে পাগলা ঝড়ের যে নৃত্য তার আয়োজন হচ্ছে আমার ভিতরে যে পাগল মন আছে তাকে মাতিয়ে তোলবার জন্যে। ওই বিপুল সমারোহের দ্বারাই পাগলের সঙ্গে পাগলের মোকাবিলায় রহস্যালাপ হতে পারল। না-হয় ডুবেই মরতেম—সেটা কি এর চেয়ে বড়ো কথা। রুদ্রবীণার ওস্তাদজি তাঁর এই রুদ্রবীণার শাকরেদকে ফেনিল তরঙ্গ-তাণ্ডবের মধ্যে দুটো-একটা চক্র হাওয়ায় দ্রুততালের তাল শুনিয়ে দিলেন। সেইখানে বলতে পারলেম, 'তুমি আমার আপনার।'

অমৃতের দুটি অর্থ—একটি যার মৃত্যু নেই, এবং যা পরম রস। আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হল রস। অমৃতও যদি সেই রসই হয় তবে রসের কথা পুনরুক্ত হয় মাত্র। কাজেই এখানে বলব অমৃত মানে যা মৃত্যুহীন—অর্থাৎ আনন্দ যেখানে রূপ ধরেছে সেইখানেই সেই প্রকাশ মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। সবাই দেখাচ্ছে কালের ভয়। কালের রাজত্বে থেকেও কালের সঙ্গে যার অসহযোগ সে কোথায়।

(সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, বৈশাখ ১৩৩০)

গোলাপ-ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে, তখন এর আর-কোনো মূল্যের দরকার হয় না। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই **আনন্দরূপ।**

(তথ্য ও সত্য, সাহিত্যের পথে, ভাদ্র ১৩৩১)

সত্তাকে সত্তা বলেই যেখানে মানি সেখানে তার মধ্যে আমি সেই খুশিকেই দেখি যে-খুশি আমার নিজের মধ্যে চরমরূপে রয়েছে। দাসের মধ্যে সেই খুশিকে দেখি নে বলেই দাসত্ব এত ভয়ংকর মিথ্যে, আর মিথ্যে বলেই এত ভয়ংকর তার পীড়া।

সৃষ্টির মূলে এই লীলা, নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহৈতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত, কারো কাছে তার কোনো জবাবদিহি নেই।

ছোটো ছেলে ধুলোমাটি কাটিকুটো নিয়ে সারাবেলা বসে বসে একটা কিছু গড়ছে। বৈজ্ঞানিকের মোটা কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে, গড়বার শক্তি তার জীবনযাত্রার সহায়, সেই শক্তির চালনা চাই। এ কৈফিয়ত স্বীকার করে নিলুম; তবুও কথাটার মূলের দিকে অনেকখানি বাকি থাকে। গোড়াকার কথা হচ্ছে এই যে, তার সৃষ্টিকর্তা মন বলে "হোক", "Let there be"—সেই বাণীকে বহন করে ধুলোমাটি কুটোকাটি সকলেই বলে ওঠে, "এই দেখো, হয়েছে।"

এই হওয়ার অনেকখানিই আছে শিশুর কল্পনায়। সামনে যখন তার একটা ঢিবি তখন কল্পনা বলছে, "এই তো আমার রূপকথার রাজপুত্রের কেল্লা।" তার ঐ ধুলোর স্তূপের ইশারার ভিতর দিয়ে শিশু সেই কেল্লার সত্তা মনে স্পষ্ট অনুভব করছে; এই অনুভূতিতেই তার আনন্দ। গড়বার শক্তিকে প্রকাশ করছি বলে আনন্দ নয়, কেননা সে শক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্ছে না। একটি রূপবিশেষকে চিত্তে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলে আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষ লক্ষ্য করে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টিকে দেখা; তার আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ।

গান জিনিসটা নিছক সৃষ্টিলীলা। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো খামখেয়ালি মেজাজ দিয়া গড়া তোরণ, একটি অপূর্ব মুহূর্ত্ত কাল সেই তোরণের নিচে দিয়ে জয়যাত্রা করবে। হয়ে গেল এই খেলা, মুহূর্ত্তটি তার রঙিন উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল—তার বেশি আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙিন খেলাই হচ্ছে গীতিকাব্য। ঐ ইন্দ্রধনুর কবিটিকে পাকড়াও করে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত, "এটার মানে কী হল," সাফ জবাব পাওয়া যেত "কিছুই না"। "তবে?" "আমার খুশি।" রূপেতেই খুশি—সৃষ্টির সব প্রশ্নের এই হল শেষ উত্তর।

এই খুশির খেলাঘরে রূপের খেলা দেখে আমাদের মন ছুটি পায় বস্তুর মোহ থেকে; একেবারে পৌঁছয় আনন্দে, এমন কিছুতে যার ভার নেই, যার মাপ নেই, যা অনির্বচনীয়।

সেদিন সমুদ্রের মাঝে পশ্চিম আকাশে 'ধূমজ্যোতিঃ-সলিলমরুতে' গড়া সূর্যাস্তের একখানি রূপসৃষ্টি দেখলুম। আমার যে-পাকাবুদ্ধি সোনার খনির মুনফা গোনে, যে বোকার মতো চুপ করে রইল, আর আমার যে কাঁচা মনটা বললে, "দেখেছি" সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে সোনার খনির মুনফাটাই মরীচিকা আর যার আবির্ভাবকে ক্ষণকালের জন্যে ঐ চিহ্নহীন সমুদ্রে, নামহীন আকাশে দেখা গেল তারই মধ্যে চির-কালের অফুরান ঐশ্বর্য, সেই হচ্ছে অরূপের মহাপ্রাঙ্গণে রূপের নিত্যলীলা।

সৃষ্টির অন্তরতম এই অহৈতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখনই বাদশাহি বেকারের মতো সে গান লিখতে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একটি ছোটো জুঁই-ফুলের মতো একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেই মহাখেলা ঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয় যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহনক্ষত্রের খেলা হচ্ছে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত্ত একই, সেখানে সূর্য আর সূর্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে-রাগরাগিণী আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।

(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ৭ই অক্টোবর ১৯২৪)

সৃষ্টির চরমতা কৌশলের মধ্যে নেই। তিনি বলেন, 'জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রীরূপে আমি যে ভালো এঞ্জিনিয়র এটা নাই-বা জানলে'। তবে কী জানব। 'আনন্দ-রূপে আমাকে জানো'। ভূস্তর-সংস্থানে বড়ো বড়ো পাথরের শিলালিপিতে তার নির্মাণের ইতিহাস গুপ্ত অক্ষরে ক্ষোদিত আছে। মাটির পর মাটি দিয়ে সে সমস্তই বিধাতা চাপা দিয়ে-ছেন। কিন্তু উপরটিতে যেখানে প্রাণের নিকেতন, আনন্দনিকেতন, সেইখানেই তাঁর সূর্যের আলো, চাঁদের আলো ফেলে কত লীলাই চলছে তার সীমা নেই। এই ঢাকাটা যখন ছিল না তখন সে কী ভয়ংকর কাণ্ড। বিশ্বকর্মার কী হাতুড়ি-ঠোকাঠুকি, বড়ো বড়ো চাকার সে কী ঘুরপাক, কী অগ্নিকুণ্ড, কী বাষ্প নিশ্বাস। তার পরে কারখানা-

ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে সবুজ নীল সোনার ধারায় সমস্ত ধুয়ে মুছে দিয়ে তারার মালা মাথায় পরে ফুলের পাদপীঠে পা রেখে তিনি আনন্দে রূপের আসন গ্রহণ করলেন।

(সৃষ্টি, সাহিত্যের পথে, কার্ত্তিক ১৩৩১)

আনন্দরূপমমৃতং—অনন্ত দেশকাল আনন্দের অমৃতে নিবিড়, নিজের নিভৃত আত্মার মধ্যেই তার চরম সাক্ষ্য। সে সাক্ষ্য না পেলে বাইরের কথার কোনো মূল্য নেই।

(চিঠিপত্র, সপ্তম খণ্ড, ২০ মাঘ ১৩৩৪)

আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে, রূপে সংগীতে নৃত্যে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে। কবির কাব্যেও সেই বাণীরই ধারা। যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত, তার প্রকৃতি-অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। এই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন করে নিয়ে তার রস পাই।

(কবির অভিভাষণ, সাহিত্যের পথে, ফাল্গুন ১৩৩৪)

চারি দিকে শ্রীহীনতার অভাব নেই—কত কুৎসিত মলিনতা, কত আবর্জনা, কত অসম্পূর্ণতা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই। কিন্তু তারই মধ্যে দেখি সুন্দরকে—দেখি ক্ষণজীবী প্রজাপতির ক্ষীণ সূক্ষ্ম সুকুমার পাখার রঙে রেখায় আশ্চর্য নৈপুণ্য—তখন বুঝি যা-কিছু কুশ্রী তার বিরুদ্ধে চিরকাল ধরে চলেছে সৌন্দর্যের এই প্রতিবাদ। তখন বুঝি সমস্ত কুশ্রীতাকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যই ধ্রুবসত্য। বিশ্বজগতের ভিতরে ভিতরে আমাদের আত্মা যখন ছন্দোময় সামঞ্জস্যকে আবিষ্কার করে তখন দেখি, অনন্ত আকাশে সৌন্দর্যের তপস্যার আসন বিস্তীর্ণ। যা কুশ্রী, যা নিরর্থক, যা খণ্ড, সে-সমস্তকে একটি আশ্চর্য সুষমার মধ্যে সুপরিমিত করে নেবার জন্যে বিশ্বজগতের অন্তরে অন্তরে একটি অবিশ্রাম প্রবর্ত্তনা কাজ করছে। বিক্ষিপ্তকে সংযত, বিকৃতকে সংস্কৃত করবার এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যতত্ত্ব আশ্রয় করে আছে আনন্দস্বরূপকে অমৃতস্বরূপকে। বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত করে আনন্দরূপমমৃতং প্রকাশমান বলেই এটি সম্ভবপর হয়েছে।

(ভারতপথিক রামমোহন, ৬ ভাদ্র ১৩৩৫)

এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতেছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই—স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ। আশ্চর্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ। ভারি নেশা। আজকাল রেখায় আমাকে পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছি নে। কেবলি তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পরে তাঁর মনের কথা জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করছেন—আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অন্তহীন। আর কিছু নয়, সুনির্দিষ্টতাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। অমিতা

যখন সুমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে যে আনন্দ, সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি—মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম—তা সে যাকেই দেখি-না কেন, এক টুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটা গাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক। নিশ্চিত দেখতে পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি।

(পথে ও পথের প্রান্তে, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫)

বিশ্বজগতের বিচিত্র ও নিত্য প্রবাহিত রূপের চিরপরিবর্তনশীল অন্তহীন প্রকাশের মধ্যেই আমরা অনন্তের আনন্দকে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাই।

(রূপ ও অরূপ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

অণু পরমাণু যুক্তির দ্বারা বিশ্লিষ্ট এবং ইন্দ্রিয় মনের আশ্রয় থেকে একেবারে ভ্রষ্ট হ'তে হ'তে ক্রমে আকার আয়তনের অতীত হ'য়ে প্রলয়-সাগরের তীরে এসে দাঁড়ায় সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর বা মনোহর বোধ হয় না। রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হ'য়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।

(আমার জগৎ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

এই সৃষ্টির দিকে প্রথমে তাকালে কী দেখতে পাই? এর আগাগোড়া সমস্ত নিয়মে বাঁধা, এর সমস্ত অণুপরমাণুর মধ্যে নিয়মের ফাঁক এতটুকুও নেই। কেমন জানো? যেমন একটি সহস্র-তার-বাঁধা বীণাযন্ত্র। এই বীণার প্রত্যেক তারটি খুব খাঁটি হিসাব করে বাঁধা অর্থাৎ এই বীণাটির তুম্বী থেকে আরম্ভ করে এই সূক্ষ্মতম তারটি পর্যন্ত সমস্তই সত্য। কিন্তু না-হয় সত্যই হলো, তাতে আমার কী? বীণার তার বাঁধার খাঁটি নিয়ম নিয়ে আমি কী করব? তেমনি এই জগতে সূর্যচন্দ্রগ্রহ অণু-পরমাণু সমস্তই ঠিক সময় রেখে ঠিক নিয়ম রেখে চলচে—এই কথাটা যত বড়ো কথাই হোক-না, কেবল তাতে আমাদের মন ভরে না। আমরা এই কথা বলি, শুধু বীণার নিয়ম চাই নে, বীণার সঙ্গীত চাই। সঙ্গীতটি যখন শুনতে পাই, তখনি ঐ বীণা-যন্ত্রের শেষ অর্থটি পাই—তা নইলে ও কেবল খানিকটা কাঠ এবং পিতল। জগতের এই বীণাযন্ত্রে আমরা সঙ্গীতও শুনেছি; শুধু কেবল নিয়ম নয়। সকাল বেলার আলোতে আমরা শুধু কেবল মাটি জল, শুধু কেবল কতকগুলো জিনিষ দেখতে পাই, তা নয়। সকাল বেলার শান্তি, স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য, পবিত্রতা সে তো কেবল বস্তু নয় সেই হচ্ছে সকালের বীণাযন্ত্রের সঙ্গীত। তারই সুরে আমাদের হৃদয় পাখীর সঙ্গে মিলে গান গাইতে চায়। যেখানে বীণা শুধু বীণা সেখানে সে বস্তুমাত্র—কিন্তু যেখানে বীণায় সঙ্গীত ওঠে, সেখানে বীণার পিছনে আমাদের ওস্তাদজি আছেন। সেই ওস্তাদজির আনন্দই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়। সৃষ্টির বীণা তো ওস্তাদজি আমাদের বাজিয়ে চলেছেন, কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও যদি সুরে না বাজে তা হলে আমাদের হৃদয়বীণার ওস্তাদজিকে চিনব কী করে? তাঁর আনন্দরূপ দেখবো কী করে? না যদি দেখি তা হলে কেবল বেসুর, কেবল ঝগড়া-বিবাদ, কেবল ঈর্ষা-বিদ্বেষ, কেবল কৃপণতা, স্বার্থপরতা, কেবল লোভ এবং ভোগের লালসা। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সংগীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই। আমাদের

জীবনযন্ত্রের ওস্তাদজিকেই দেখতে পাই। তখন দুঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র ক'রে দেয় না, তখন ওস্তাদজির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্থটি দেখতে পাই। **সেইটি দেখতে পাওয়াই মুক্তি।** সেইজন্যই তো চিত্তবীণায় সত্যসুরে তার বাঁধতে চাই, সেইজন্যে কঠিন চেষ্টায় মনকে বশ করতে চাই, চৈতন্যকে নির্মল করে তুলতে চাই—সেইজন্যে নিজের স্বার্থ নিজের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ভুলে হৃদয়কে স্তব্ধ করতে চাই—তা হলেই আমার সুর বাঁধা যন্ত্র ওস্তাদের হাতে বেজে উঠবে; আমাদের প্রার্থনা হচ্চে এই : 'তব অমল পরশ রস অন্তরে দাও।' তাঁর সেই স্পর্শের রসই হচ্চে আমাদের অন্তরের সংগীত। তুমিও জানো, আমি সন্ধ্যা-বেলায় প্রায়ই গান করি—

বীণা বাজাও হে, মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে
আনন্দিত তান শুনাও হে, মম অন্তরে।

(ভানুসিংহের পত্রাবলী, চৈত্র ১৩৩৬)

তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে তর্কের কিছু নেই, সেই দেখাকে তখন সত্যরূপে জেনেছি। এখনও বাসনা আছে, হয়তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে কোনো-এক শুভমুহূর্তে আবার তেমনি পরিপূর্ণভাবে কখনও দেখতে পাব। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেইজন্যেই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেছি তা নিয়ে তর্ক কেন। স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্যু নেই।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—আমার কাছে এই মর্ত্যের রূপই আনন্দরূপ অমৃতরূপ—একে অবজ্ঞা করি এত বড়ো ধৃষ্টতা আমার নেই। এর চেয়ে আরো কিছু উঁচু আছে বলে যে মনে করে, তার নিজের চোখে দোষ আছে! আমার এই উত্তরের দিকের জানলা দিয়ে নীল আকাশ ঢেলে দিচ্চে তার আলোকসুধা, পূর্ব্ব দিকের খোলা দরজার সামনে উদার পৃথিবী তার শ্যামল আমন্ত্রণ প্রসারিত করে ধরেছে—আমি এই সোনার ধারা সবুজ ধারার মোহানায় বসে দুই চক্ষুকে ছাড়া দিয়েচি, বেলা যাচ্চে কেটে —আর কি চাই আমার—বুঝতেই পারি নে যত সব হযবরল মন্ত্র। এত বড় সুস্পষ্টতার মধ্যেও যদি উপলব্ধি না হয় তবে কিছুতেই হবে না।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ৪ অক্টোবর ১৯৩৩)

সংসারও পবিত্র, স্বয়ং পরমাত্মার আনন্দরূপ, যখন তাকে সেই ভাবে দেখতে পারি।.........বিধাতার জগৎকে অবিশ্বাস কোরো না, ঘৃণা কোরো না, তিনি পৃথক একটা স্বর্গ সৃষ্টি করে নিজের পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ বাধান নি। সব কিছুতে আনন্দিত হও, সবাইকে আনন্দিত করার সাধনা করো, এতেই মুক্তির স্বাদ।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ১৯ অক্টোবর ১৯৩৫)

আমার কবি প্রকৃতি, সুতরাং আমি সীমার মধ্যেই অসীমকে উপলব্ধি করি, সে সীমায় তিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন—কোনো দেশবিশেষের সম্প্রদায় বিশেষের আপন খেয়ালে গড়া এমন সীমা নয় যা সেই সম্প্রদায়ের বাইরে বিশ্বভুবনে আর কোথাও কোন সাক্ষ্য রাখে না। যদি বল, নিজসৃষ্ট সীমার মধ্যে তাঁর যে প্রকাশ-রূপ, তাঁর ইচ্ছা তাকেও আমরা আপন ঐশ্বর্যে সাজাই। সে কাজ তো করেই আসচি, ছন্দ দিয়ে, সুর দিয়ে আনন্দ দিয়ে—ঠাকুর ঘরের সেই শাশ্বত সেবাই ত কবিদের হাতে। আমাদের এই সাজের ফুল তোমরাও ব্যবহার করতে পার—যেমন করে ব্যবহার করো বাগানের ফুল।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ২৮ অক্টোবর ১৯৩৬)

চারিদিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি, এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারিদিকে এমন-কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে রাখে, তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুত মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ।

(ভূমিকা, সাহিত্যের পথে, ৮ আশ্বিন ১৩৪৩)

তাঁরই আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে
প্রকাশ পেতেছে কত রূপে কত বেশে—

(রূপান্তর)

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ ২।২।৯

বাহিরের একান্ত প্রভুত্বকে খর্ব করে যখন আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করলুম তখন অন্তরতম গুহার মধ্যে এ কী দেখি? এ তো জয়গর্ব নয়। এ তো কেবল আত্মশাসনের অতি-বিস্তারিত সুব্যবস্থা নয়। বাহিরের বন্ধনের স্থানে এ তো কেবল অন্তরের নিয়ম-বন্ধন নয়। শান্তদান্ত সমাহিত নির্মল চিদাকাশে এমন আনন্দ-জ্যোতি দেখলুম যা অন্তর এবং বাহির উভয়কেই উদ্ভাসিত করেছে, অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে যার মঙ্গলরশ্মিরাজি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তখন ভিতর বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। তখন জয় নয় তখন আনন্দ, তখন সংগ্রাম নয় তখন লীলা, তখন ভেদ নয় তখন মিলন, তখন আমি নয় তখন সব; —তখন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তখন ব্রহ্ম—তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তখন আত্মা পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা, অহংকারবিহীন প্রেম—তখন জ্ঞানভক্তিকর্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।

(তিনতলা, শান্তিনিকেতন, ১০ ফাল্গুন ১৩১৫)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥ ৩।১।১

যিনি এক, তিনি এই মানবসংসারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আছেন। জন্মমৃত্যুর যাতায়াত আমাদের চোখের উপর দিয়া কেবলই আবর্তিত হইতেছে, সুখ দুঃখ উঠিতেছে পড়িতেছে, পাপপুণ্য আলোকে ছায়ায় সংসারভিত্তি খচিত করিয়া দিতেছে—সমস্ত বিচিত্র, সমস্ত চঞ্চল—ইহারই অন্তরে নিরলংকার নিভৃত, সেখানে যিনি এক তিনিই বর্ত্তমান। এই অস্থির সমুদয়, যিনি স্থির তাঁহারই শান্তি-নিকেতন—এই পরিবর্তনপরম্পরা, যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ।..................

উপনিষদ এইরূপ কথাই একটি উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

দুই সুন্দর পক্ষী একত্র সংযুক্ত হইয়া এক বৃক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল আহার করিতেছে, অপরটি অনশনে থাকিয়া তাহা দেখিতেছে।

জীবাত্মা-পরমাত্মার এরূপ সাযুজ্য, এরূপ সারূপ্য, এরূপ সালোক্য, এত অনায়াসে, এত সহজ উপমায়, এমন সরল সাহসের সহিত আর কোথায় বলা হইয়াছে! জীবের সহিত ভগবানের সুন্দর সাম্য যেন কেহ প্রত্যক্ষ চোখের উপর দেখিয়া কথা কহিয়া উঠিয়াছে—সেইজন্য তাহাকে উপমার জন্য আকাশ-পাতাল হাতড়াইতে হয় নাই। অরণ্য-চারী কবি বনের দুটি সুন্দর ডানাওয়ালা পাখির মতো করিয়া সসীমকে ও অসীমকে গায়ে গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, কোনো প্রকাণ্ড উপমার ঘটা করিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্বকে বৃহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। দুটি ছোটো পাখি যেমন স্পষ্টরূপে গোচর, যেমন সুন্দরভাবে দৃশ্যমান, তাহার মধ্যে নিত্য পরিচয়ের সরলতা যেমন একান্ত, কোনো বৃহৎ উপমায় এমনটি থাকিত না। উপমাটি ক্ষুদ্র হইয়াই সত্যটিকে বৃহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে—বৃহৎ সত্যের যে নিশ্চিত সাহস তাহা ক্ষুদ্র সরল উপমাতেই যথার্থভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহারা দুটি পাখি, ডানায় ডানায় সংযুক্ত হইয়া আছে—ইহারা সখা, ইহারা এক বৃক্ষেই পরিষক্ত—ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা, আর-একজন সাক্ষী; একজন চঞ্চল, আর-একজন স্তব্ধ।

....

ঋষিকবির উপমার মধ্যে নিভৃত অরণ্যের একান্ত নির্জনতার ভাবটুকু রহিয়া গেছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন একাকীরূপেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে তাহাতে দেখিতে পাই যে, যে আমি ভোগ করিতেছি, ভ্রমণ করিতেছি, সন্ধান করিতেছি, সেই আমির মধ্যে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ স্তব্ধভাবে নিয়ত আবির্ভূত।

(মন্দির, ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩১০)

আমি যে একজন বিশেষ আমি। আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেষ

আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, বিশ্বনিয়মের উপরে নেই, এইজন্যেই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এইজন্যেই এই পরমাশ্চর্য আমির দিকেই তাকিয়ে উপনিষৎ বলে গিয়েছেন "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" বলেছেন, এই আমি আর তিনি, সমান বৃক্ষের ডালে দুই পাখির মতো, দুই সখা একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন।

(প্রেমের অধিকার, শান্তিনিকেতন, ১৭ পৌষ ১৩১৫)

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তারই চিরন্তন বন্ধু; প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে না দেখি। তোমদের ওই পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে, ততই তার কাব্য সংগীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।

(গুহাহিত, শান্তিনিকেতন, ২৩ চৈত্র ১৩১৬)

অসীমতা এবং সীমা, ইনি এবং এই, একেবারেই কাছাকাছি; দুই পাখি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ, অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ, সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি, অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি; উভয়ের উভয়কে নহিলে নয়।

মানুষ কখনো কখনো ঈশ্বরকে দূরে স্বর্গরাজ্যে সরাইয়া দিয়াছে। অমনি মানুষের ঈশ্বর ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই ভয়ংকরকে বশ করিবার জন্য ভয়গ্রস্ত মানুষ নানা মন্ত্রতন্ত্র আচারঅনুষ্ঠান পুরোহিত ও মধ্যস্থের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, মানুষ যখন তাঁহাকে অন্তরতর করিয়া জানিয়াছে তখন তাহার ভয় ঘুচিয়াছে, এবং মধ্যস্থকে সরাইয়া দিয়া প্রেমের যোগে তাঁহার সঙ্গে মিলিতে চাহিয়াছে।

(সীমা ও অসীমতা, পথের সঞ্চয়, ১৩১৯)

উপনিষদে লিখছে, এক ডালে দুই পাখি আছে, তার মধ্যে এক পাখি খায় আর-এক পাখি দেখে। যে পাখি দেখছে তারই আনন্দ বড়ো আনন্দ; কেন না, তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখি আছে। এক পাখির প্রয়োজন আছে আর-এক পাখির প্রয়োজন নেই। এক পাখি ভোগ করে আর-এক পাখি দেখে। যে পাখি ভোগ করে সে নির্মাণ করে, যে পাখি দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা, অর্থাৎ যেটা তৈরি হচ্ছে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য-কিছুর মাপে তৈরি করা—নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর, সৃষ্টি করা অন্য কোনো-কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না; সে হচ্ছে নিজেকে সর্জন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা। এইজন্যেই ভোগী পাখি যে-সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করছে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখির

উপকরণ হচ্ছে আমি-পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট্। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্ত্তব্যের দায়ও না।

পৃথিবীতে সব-চেয়ে বড়ো রহস্য—দেখবার বস্তুটি নয়, যে দেখে সেই মানুষটি। এই রহস্য আপনি আপনার ইয়ত্তা পাচ্ছে না, হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখতে চেষ্টা করছে। যা-কিছু ঘটছে এবং যা-কিছু ঘটতে পারে, সমস্তর ভিতর দিয়ে নিজেকে বাজিয়ে দেখছে।

এই-যে আমার এক আমি, এ বহুর মধ্য দিয়ে চ'লে চ'লে নিজেকে নিত্য উপলব্ধি করতে থাকে। বহুর সঙ্গে মানুষের সেই একের মিলনজাত রসের উপলব্ধিই হচ্ছে সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ, দৃষ্ট বস্তু নয়, দ্রষ্টা আমিই তার লক্ষ্য।

(জাপানযাত্রী, ২০ বৈশাখ ১৩২৩)

আমার অন্তরলোকে কোনো একটা অগমস্থানে একজন কেউ বাস করে, সে কোথা থেকে কথা কয়—সে কথার মূল্যও আছে, কিন্তু আমিই যে সে তা ভাবতেও পারিনে, আমার মধ্যে তার বাসা আছে এই পর্যন্ত। যে আমি প্রত্যক্ষগোচর সে নিতান্তই বাজে লোক; তাকে সহ্য করা শক্ত, বন্দনা করা দূরের কথা। তাকে কোনো রকম করে তফাতে সরিয়ে দিতে পারলে তবেই আমার অন্তরতর মানুষটির মান রক্ষা হয়। সেই চেষ্টায় আছি।

(পথে ও পথের প্রান্তে, ২ ডিসেম্বর ১৯২৬)

আমার নিজের মধ্যেই বড়ো আছে—যে দ্রষ্টা, আমার নিজের মধ্যে ছোটো হচ্ছে—যে ভোক্তা।

(পথে ও পথের প্রান্তরে, ৬ কার্ত্তিক ১৩৩৬)

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ ৩।১।৪

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ

ব্রহ্মবিদদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পরমাত্মায় তাঁদের ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্মও আছে।

এই শ্লোকটির প্রথমার্ধটুকু তুললেই কথাটার অর্থ স্পষ্টতর হবে।

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন—এঁকে যিনি জানেন তিনি এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম এই দুটো জিনিস একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের সচেষ্টতাকেই প্রাণের আনন্দ—প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি সৃষ্টির মধ্যে গতির দ্বারা আনন্দ ও আনন্দের দ্বারা গতি সঞ্চার করছেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না তো, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্মও করবেন।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী। তিনি তো শুধু ব্রহ্মকে জানেন তা নয়, তিনি যে ব্রহ্মকে বলেন। না বললে তাঁর আনন্দ বাঁধ মানবে কেন? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে "ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলতে চান না—তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান।

মানুষ ব্রহ্মকে কেমন করে বলে? সেতারের তার যেমন করে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির দ্বারা, স্পন্দনের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারাই বলে—সর্বতোভাবে গানকে প্রকাশের দ্বারাই সে নিজের সার্থকতা সাধন করে।

ব্রহ্ম, নিজেকে কেমন করে বলছেন? নিজের ক্রিয়ার দ্বারা অনন্ত আকাশকে আলোকে ও আকারে পরিপূর্ণ করে স্পন্দিত করে ঝংকৃত করে তিনি বলছেন—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—তিনি কর্মের মধ্যেই আপন আনন্দবাণী বলছেন, আপন অমৃত সংগীত বলছেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মবাদীও যখন ব্রহ্মকে বলবেন তখন আর কেমন করে বলবেন? তাঁকে কর্মের দ্বারাই বলতে হবে। তাঁকে ক্রিয়াবান হতে হবে।

সে কর্ম কেমন কর্ম? না, যে কর্ম দ্বারা প্রকাশ পায় তিনি "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ" পরমাত্মায় তাঁর ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ। যে কর্মে প্রকাশ পায় তাঁর আনন্দ নিজের স্বার্থসাধনে নয়, নিজের গৌরব বিস্তারে নয়। তিনি যে "নাতিবাদী"—তিনি পরমাত্মাকে ছাড়া নিজের কর্মে আর কাউকেই প্রকাশ করতে চান না।

তাই সেই "ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই সংগীত ধ্বনিত করে তুলছেন—শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। জগৎক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনক্রিয়া এক ছন্দে এক রাগিণীতে গান করছে।

অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটিই যে জীবনের কর্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে যাচ্ছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব সুন্দর আবর্ত্তন চলছে এবং সেই আবর্ত্তনবেগে নব নব মঙ্গললোকের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই আবর্ত্তনবেগে জ্যোতি উদ্দীপ্ত হচ্ছে, প্রেম উৎসারিত হয়ে উঠছে।

এমনি করে, যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণরূপে অর্থাৎ একই কালে আনন্দ ও কর্ম-রূপে প্রকাশমান সেই প্রাণকে ব্রহ্মবিৎ আপনার প্রাণের দ্বারাই প্রকাশ করেন।

সেইজন্যে আমার প্রার্থনা এই যে, হে প্রাণস্বরূপ, আমার সেতারের তারে যেন মরচে না পড়ে, যেন ধুলো না জমে—বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনাভিঘাতে সে দিনরাত বাজতে থাকুক—কর্মসংগীতে বাজতে থাকুক—তোমারই নামে বাজতে থাকুক। প্রবল আঘাতে মাঝে মাঝে যদি তার ছিঁড়ে যায় তো সেও ভালো কিন্তু শিথিল না হয়, মলিন না হয়, ব্যর্থ না হয়। ক্রমেই তার সুর প্রবল হ'ক, গভীর হ'ক, সমস্ত অস্পষ্টতা পরিহার করে সত্য হয়ে উঠুক—প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'ক—হে আবি তোমার আবির্ভাবের দ্বারা সে ধন্য হ'ক।

(প্রাণ, শান্তিনিকেতন, ২৯ পৌষ ১৩১৫)

উপনিষদে 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে বলেছেন? আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ, পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে অথচ সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই, এ কখনো হতেই পারে না—সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়—সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম। ব্রহ্মে যাঁর আনন্দ তিনি কর্ম না হলে বাঁচবেন কী করে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম করতেই হবে যে কর্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এই জন্য যিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আত্মরতিঃ, পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ, এবং তিনি আত্মক্রীড়ঃ, তাঁর সকল কাজই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে—তাঁর খেলা, তাঁর স্নান-আহার, তাঁর জীবিকা-অর্জন, তাঁর পর হিত-সাধন, সমস্তই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার। তিনি ক্রিয়াবান্, ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্মে প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলই কর্ম আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটো বড়ো সকল কাজেই সত্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

(কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

"প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ "এই যে প্রাণ সর্ব্বভূতস্থ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ইহাই জানিয়া জ্ঞানী অতিবাদী হন না।" এখানে অতিবাদী বলতে নিশ্চয়ই বোঝাচ্চে, সত্যকে অতিক্রম করে' যে কথা কয়।

(চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, ৮ই কার্ত্তিক ১৩২৫)

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ৩।২।৪

সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, দুঃখবাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়—ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়ত্বে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে। সেইজন্য উপনিষদ বলিয়াছেন —নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। এই আত্মা (জীবাত্মাই বল, পরমাত্মাই বল) ইনি বল-হীনের দ্বারা লভ্য নহেন।

সমগ্র শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার যত উপলক্ষ্য ঘটে, ততই আত্মাকে প্রকৃতভাবে লাভ করিবার উপায় হয়।

(মনুষ্যত্ব, ধর্ম, ১৩১০)

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না; কোনো মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে; যে-ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহার প্রকৃতিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

(পূর্ব ও পশ্চিম, সমাজ, ১৩১৫)

যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি, তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়—কেননা, নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ।

(আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪)

ভূমা—আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয়। ভূমা বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পুজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা। সেইজন্যেই কথিত আছে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। তারা সত্যকে অন্তরে পায় না যারা অন্তরে দুর্বল।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০ সাল)

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ এই বস্তুগত জগতেই আত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিজের শক্তির দ্বারাই জয় করে নিতে হবে—পাণ্ডার শরণ নিয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির আশা করব না। বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা নয় বীরযোগ্যা বসুন্ধরা। এই বসুন্ধরাকে নিজের বীর্য্য দিয়েই উদ্ধার করতে হবে। তোমরা আল্পনা কেটে লক্ষ্মীকে ডাকো লক্ষ্মী আসেন না—যাঁরা বীর্য্যের সহায়ে লক্ষ্মীকে আহ্বান করেন আজকের পৃথিবীতে তাঁরাই তো লক্ষ্মীকে পান।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ১১ অক্টোবর ১৯৩৩)

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥ ৩।২।৫

উপনিষদ বলেন, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি সর্বমেবাবিবেশ সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি। আমরা ধৈর্যলাভ করিলাম কিনা, অভয়লাভ করিলাম কিনা, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ হইল কিনা, আত্মবিস্মৃত মঙ্গলভাব আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইল কি না, পরনিন্দা আমাদের পক্ষে অপ্রিয় ও পরের প্রতি ঈর্ষার উদ্রেক আমাদের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয় হইল কি না, বৈষয়িকতার বন্ধন ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের প্রলোভন-পাশ ক্রমশ শিথিল হইতেছে কি না, এবং সর্বাপেক্ষা যাহাকে বশ করা দুরূহ সেই উদ্যত আত্মাভিমান বংশীরববিমুগ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রমে ক্রমে আপন মস্তক নত

করিতেছে কি না, ইহাই অনুধাবন করিলে আমরা যথার্থভাবে দেখিব, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, ব্রহ্মের দ্বারা নিখিল জগৎকে কতদূর পর্যন্ত সত্যরূপে আবৃত দেখিয়াছি।

(ধর্মপ্রচার, ধর্ম, ১৩১০)

আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কী তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি।

ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।

এই যে সর্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত অভ্যাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের আত্মা সর্বত্রই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই সে সর্বত্র প্রবেশ করে—সেই আত্মায় গিয়ে না পৌঁছোলে সে দ্বারে এসে ঠেকে—সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়, অমৃতং যদ্বিভাতি, অমৃতরূপে যিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌঁছোতে পারে না—সে আর সমস্তই দেখে কেবল আনন্দরূপমমৃতং দেখে না।

এই যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলছি এটা তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে তো এটা হবে না। চেতন ভাবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন তো আমাদের বুঝতে হবে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশ পথ খুলে যাচ্ছে আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্ছে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্ছে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে। আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, ক্রমেই তা স্বচ্ছ হয়ে তার ভিতর থেকে নিখিলের আলো ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হয়ে দেখা যাচ্ছে—আমি আমার দ্বারা কাউকে আচ্ছন্ন কাউকে বিকৃত করছি নে, আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্ছে।

(আত্মার দৃষ্টি, শান্তিনিকেতন)

সকল দ্বন্দ্বের সমাধানের মধ্যে উপনিষৎ সেই পরম পরিপূর্ণকে দেখেছেন বলেই সত্যের একদিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে তার অন্য দিকটাকে একেবারে নির্মূল করে দিতে চেষ্টা করেন নি। সেইজন্যে তিনি যেমন বলেছেন

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

অর্থাৎ

আত্মাতেই যিনি নিত্য স্থিতি করছেন তিনিই জানবার যোগ্য, তাঁর পর জানবার যোগ্য আর কিছুই নেই।

তেমনি আবার বলেছেন,—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

অর্থাৎ—

সেই ধীরেরা যুক্তাত্মা হয়ে সর্বব্যাপীকে সকল দিক হতেই লাভ করে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।

আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—নয়, কেবল আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়, সেই দেখা আবার সর্বত্রেই।

(ওঁ, শান্তিনিকেতন, ১৫ চৈত্র ১৩১৫)

আমাদের আসল জানবার বিষয়কে পাবার বিষয়কে যেমনি লাভ করি অমনি এই সংসারের বিচিত্রতা আর আমাদের বাঁধতে পারে না, ঠেকাতে পারে না, মারতে পারে না। তখন, পূর্ব্বে যা বিভীষিকা ছিল এখন সেইটেই সহজ হয়ে যায়—সংসারে তখন আমরা মুক্তভাবে আনন্দ পাই। সংসার তখন আমাদের অধিকার করে না, আমরাই সংসারকে অধিকার করি। তখন, পূর্বে পদে পদে আমাদের যে আক্ষেপ বিক্ষেপ যে-শক্তির অপব্যয় ছিল সেটা কেটে যায়।

সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন, তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব-মেবাবিশন্তি, সেই সর্বব্যাপীকে যাঁরা সকল দিক থেকেই পেয়েছেন তাঁরা ধীর হয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁরা ধৈর্য লাভ করেন, আর তাঁরা নানা বিষয় ও নানা ব্যাপারের মধ্যে কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়ান না, তাঁরা অপ্রগল্‌ভ অপ্রমত্ত ধীর হন। তাঁরা যুক্তাত্মা হন, সেই পরম একের সঙ্গে যোগযুক্ত হন। নিজেকে কোনো অহংকার কোনো আসক্তি দ্বারা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করেন না, একের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে বিশ্বের সমস্ত বহুর মধ্যে প্রবেশ করেন, সমস্ত বহু তখন তাঁদের পথ ছেড়ে দেয়।

সেই সকল ধীর সেই সকল যুক্তাত্মাদের প্রণাম করে তাঁদেরই পথ আমরা অনু-সরণ করব। সেই হচ্ছে একের সঙ্গে যোগের পথ, সেই হচ্ছে সকলের মধ্যেই প্রবেশের পথ, জ্ঞান প্রেম এবং কর্মের চরম পরিতৃপ্তির পথ।

(ধীর যুক্তাত্মা, শান্তিনিকেতন, ২২ চৈত্র ১৩১৫)

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করছে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভালো বীজটি জন্মায়; অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়। তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্ছে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে যে কাকে বোঝায় তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্রশাসনকে নিযুক্ত করছে।

ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করে-ছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি? বাইরে যদি মানুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় তা হলে মনের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন মানুষদের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?

....

তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না, যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত। সেই ঋষি তাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।

এর থেকেই দেখা যাচ্ছে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারিদিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে নি।

মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এইজন্যেই যে মানুষ বড়ো তা নয়। মানুষের মহত্ত্ব হচ্ছে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে। মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছোয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোট হ'ক বড়ো হ'ক, উচ্চ হ'ক নীচ হ'ক, শত্রু হ'ক মিত্র হ'ক সকলেই আমার আপন।

মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগস্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খৃীস্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন সূচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বল, মান বল যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি, তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেক স্বতন্ত্র বলে গর্ব হয়। সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা হয়। এর আর সীমা নেই —আরও বড়ো, আরও বড়ো, আরও বেশি, আরও বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকে চলতে থাকে, তার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলই স্থূল

হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না, সে আপনার বড়োত্বের মধ্যেই বন্দী। সে-ব্যক্তি মুক্তস্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান।

সেইজন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড়ো কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

......(খৃষ্ট) সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অদ্ভুত কথা অসংকোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথা বলিয়াছেন; যাহারা ধীর তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। ধীরাঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

(যিশুচরিত, খৃষ্ট, ২৫।১২।১০, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড)

যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার।

(অরবিন্দ ঘোষ, ২৯ মে ১৯২৮)

পরমার্থ শব্দের অর্থ আমি যতদূর জানি তাতে এই বুঝেছি যে ওটা স্বার্থ ও সমাজবিধির উপরে। যাঁরা পরমার্থ সাধন করেন তাঁদের কাছে স্বার্থ নেই সামাজিক বিধি বিধান নেই। কোনো মানুষকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন না ঘৃণা করেন না অস্পৃশ্য বলে বর্জন করেন না। তাঁদের শুচিবায়ুগ্রস্ত সাধনার সংকীর্ণ ক্ষেত্র কৃত্রিম প্রাচীরে ঘেরা নয়। তাঁরা নির্বিচারে সকল মানুষের আপন। তে **সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ** প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ **সর্বমেবা**বিশন্তি।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ৪ আগষ্ট ১৯৩২)

মানুষের সকল দুঃখের উপরকার কথা এই যে—মানুষ আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করছে আপন অসীমের দিকে, জ্ঞানে প্রেমে কর্মে বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে আপনার সকল মহৎ কীর্ত্তিতে তাঁর নিকটতর সামীপ্য পাবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বাড়িয়েছে যাঁকে তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কারকে পার হয়ে যে-জ্ঞানকে পায়, যাকে বলে বিজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার করবে, সেইজন্যে তা শ্রদ্ধেয়। তেমনি মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি সেই আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা-আমির কর্মই বন্ধন, সকল-আমির কর্ম মুক্তি। আমাদের বাংলাদেশের বাউল বলেছে—

মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।
একবার দিব্য চক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্ব ঠাঁই।

সেই মনের মানুষ সকল মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে

সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়। এই কথাই উপনিষদ বলেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

ছাত্র বহুদিন বহু প্রয়াসে অক্ষর শিখল, বানান শিখল, ব্যাকরণ শিখল, অনেক কাগজে অনেক আঁকাবাঁকা অসম্পূর্ণ নিরর্থক লেখা শিখল, উপকরণ ব্যবহার করল ও বর্জন করল বিস্তর; অবশেষে কবিরূপে যে-মুহূর্তে সে তার প্রথম কবিতাটি লিখতে পেরেছে সেই মুহূর্তে ঐ একটি লেখায় এতদিনকার পুঞ্জ পুঞ্জ বাক্যহীন উপকরণের প্রথম অর্থটুকু দেখা দিল। জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণ-কণায়, তার পরে জন্তুতে, তার পরে মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল তখন যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলে, যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা সর্বমেবাবিশন্তি—সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

সংপ্রাপৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥

সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকলের মধ্যে জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিরা প্রবেশ করেন। আমাদের শাস্ত্রমতে এই হচ্ছে মানুষের চরম সার্থকতা।

(ভারতপথিক রামমোহন, মাঘ ১৩৪৭)

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽ-
স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৩।২।৮

যুক্তিতর্কের যোগে বাহ্যজ্ঞানের বিষয়কে যেমন করে জানি এ তো তেমন করে জানা নয়, অন্তরে হওয়ার দ্বারা জানা। নদী সমুদ্রকে পায় যেমন ক'রে, প্রতিক্ষণেই সমুদ্র হতে হতে। এক দিকে সে ছোটো নদী, আর-এক দিকে সে বৃহৎ সমুদ্র। সেই হওয়া তার পক্ষে সম্ভব, কেন না সমুদ্রের সঙ্গে তার স্বাভাবিক ঐক্য। বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে সেই ঐক্য। জীবধর্ম যেন উঁচু পাড়ির মতো জন্তুদের চেতনাকে ঘিরে আটক করেছে। মানুষের আত্মা জীবধর্মের পাড়ির ভিতর দিয়ে তাকে কেবলই পেরিয়ে চলেছে, মিলেছে আত্মার মহাসাগরে, সেই সাগরের যোগে সে জেনেছে আপনাকে। যেমন নদী পায় আপনাকে যখন সে বৃহৎ জলরাশিকে আপন করে, নইলে সে থাকে বদ্ধ

হয়ে, বিল হয়ে, জলা হয়ে। তাই বাউল মানুষকে বলেছে, "তোরই ভিতর অতল সাগর।"

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০ সাল)

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারি দিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোতে মিশে আসি।
সূর্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা,
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি যত গান যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে—
মেশে আসি সেই সিন্ধু-'পরে।

(অনন্ত জীবন, প্রভাত সঙ্গীত, বৈশাখ ১২৯০)

আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই; তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা-কিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিমদেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।

(অগ্রসর হওয়ার আহ্বান, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ ১৩২০)

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
(শান্তিপাঠ)

হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া যেন ভাল করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি।.........
হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভাল করিয়া দেখি, পরের বচন দিয়া না দেখি।

(জাতীয় বিদ্যালয়, শিক্ষা, ভাদ্র ১৩১৩)

.........**একাত্মপ্রত্যয়সারং**.........**স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ॥ ৭**

আমার দেহ প্রাণ চৈতন্য বুদ্ধি হৃদয় সমস্তটা নিয়ে আমি একটি এক। এই যে সমগ্রতা সম্পূর্ণতা, এ একটি এক বস্তু বলেই নিজেকে জানে এবং নিজেকে ভালবাসে।

শুধু তাই নয় এইজন্য সর্বত্রই সে এককে সন্ধান করে এবং এককে পেলেই আনন্দিত হয়। বিচ্ছিন্নতা তাকে ক্লেশ দেয়—সে সম্পূর্ণতাকে চায়।

বস্তুত সে যা কিছু চায় তা কোনো-না-কোনো রূপে এই সম্পূর্ণতার সন্ধান। সে নিজের একের সঙ্গে চারিদিকের বহুকে বেঁধে নিয়ে ক্ষুদ্র এককে বৃহত্তর এক করে তুলতে চায়।

আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে এই যে ঐক্যের সম্পূর্ণতা লাভ করেছি এরই শক্তিতে আমরা জগতের আর সমস্ত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারি। আমরা সমাজকে এক বলে বুঝতে পারি, মানবকে এক বলে বুঝতে পারি, সমস্ত বিশ্বকে এক বলে বুঝতে পারি—এমন কি, সেই রকম এক করে যাকে না বুঝতে পারি তার তাৎপর্য পাই নে—তাকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধি কেবল হাতড়ে বেড়াতে থাকে।

অতএব আমরা যে পরম এককে খুঁজছি সে কেবল আমাদের নিজের এই একের তাগিদেই। এই এক নিজের ঐক্যকে সেই পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে মাঝখানে কিছুতেই থামতে পারে না।

আমরা সমাজকে যে এক বলে জানি সেই জানবার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের আত্মা—মানবকে এক বলে জানি সেই জানার ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা—বিশ্বকে যে এক বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা এবং পরমাত্মাকে যে অদ্বৈতম্ বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা। এইজন্যই উপনিষৎ বলেন, সাধক—আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—আত্মাতেই পরমাত্মাকে দেখেন। কারণ, আত্মাতে যে ঐক্য আছে সেই ঐক্যই পরম ঐক্যকে খোঁজে এবং পরম ঐক্যকে পায়। যে জ্ঞান তার নিজের ঐক্যকে আশ্রয় করে আত্মজ্ঞান হয়ে আছে সেই জ্ঞানই পরমাত্মার পরম জ্ঞানের মধ্যে চরম আশ্রয় পায়।

এইজন্যই পরমাত্মাকে "একাত্মপ্রত্যয়সারং" বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের প্রতি আত্মার যে একটি সহজ প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়েরই সার হচ্ছেন তিনি। আমাদের আত্মা যে স্বভাবতই নিজেকে এক বলে জানে সেই এক জানারই সার হচ্ছে পরম এককে জানা।

(শান্তিনিকেতন, আত্মপ্রত্যয়, ২১ চৈত্র ১৩১৫)

এই কথাটিকে আলোচনা করে কেবল কঠিন করে তোলা হচ্ছে। অথচ এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে সহজ কথা—একেবারে গোড়াকার প্রথম কথা এবং শেষের শেষ কথা। আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেয়েছি এবং এককেই আমরা বহুর মধ্যে সর্বত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন কি, শিশু যখন নানা জিনিসকে ছুঁয়ে শুঁকে খেয়ে দেখবার জন্যে চারিদিকে হাত বাড়াচ্ছে তখনও সে সেই এককেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরাও শিশুরই মতো নানা জিনিসকে ছুঁচ্ছি শুঁকছি মুখে দিচ্ছি, তাকে আঘাত করছি তার থেকে আঘাত পাচ্ছি, তাকে জমাচ্ছি এবং তাকে আবর্জনার মতো ফেলে দিচ্ছি। এই সমস্ত পরীক্ষা এই সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে সমস্ত দুঃখে সমস্ত লাভে আমরা সেই এককেই চাচ্ছি। আমাদের জ্ঞান একে পৌঁছোতে চায়, আমাদের প্রেম একে মিলতে চায়। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই।

(ধীর যুক্তাত্মা, শান্তিনিকেতন, ২২ চৈত্র ১৩১৫)

আনন্দ আপনাকে নানারূপে নানা কালে প্রকাশ করছেন, আমরা সেই নানা-রূপকেই কেবল দেখছি, কিন্তু আমাদের আত্মা দেখতে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোনো আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলই বস্তুর পর বস্তু, ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে ক্লিষ্ট করে আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজছে, আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজছে। নইলে সে কোনোখানেই বলতে পারছে না—ওঁ। বলতে পারছে না—হাঁ, পাওয়া গেল।

(ধীর যুক্তাত্মা, শান্তিনিকেতন, ২২ চৈত্র ১৩১৫)

আমরা যখন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুঁজে বেড়াই তখন চারিদিকে মাথা ঠুকতে থাকি উঁচট খেতে থাকি, তখন কত ছোট জিনিসকে বড়ো মনে করি, কত তুচ্ছ জিনিসকে বহুমূল্য বলে মনে করি, কত জিনিসকে আঁকড়ে ধরে বলি এই তো পেয়েছি। তার পরে দেখি মুঠার মধ্যেই সেটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়।

আসল কথা এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্ছি। কিন্তু যেমনি একটি আলো জ্বালা হয় অমনি এক মুহূর্তেই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—অমনি এত-দিনের এত খোঁজা এত মাথা ঠোকার পরে এক পলকেই জানতে পারি যে, যা-সমস্ত আমার হাতে ঠেকছিল তাই আমার প্রার্থনীয় জিনিস নয়। যে মা এই সমস্ত ঘরটি সাজিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন তিনিই আমার যথার্থ কামনার ধন। যেমনি আলোটি জ্বলল অমনি সব জিনিস ছেড়ে দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে তাঁর কাছে গেলুম।

অথচ মাকে পাবামাত্রই অমনি তাঁর সঙ্গে সব জিনিসকেই একত্রে পাওয়া গেল, কোনো জিনিস স্বতন্ত্র হয়ে আমার পথের বাধারূপে আমাকে আটক করলে না। মাকে জানবামাত্র মায়ের এই সাজানো ঘরটি আমারই হয়ে গেল। তখন ঘরের সমস্ত

আসবাব-পত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ হয়ে উঠল, তখন যে-জিনিসের ঠিক যে-ব্যবহার তা আমার আয়ত্ত হয়ে গেল, তখন জিনিষগুলো আমাকে অধিকার করল না, আমিই তাদের অধিকার করলুম।

তাই বলছিলুম কী জ্ঞানে কী প্রেমে কী কর্মে সেই এককে সেই আসল জিনিসটিকে পেলেই সমস্তই সহজ হয়ে যায়—জিনিসের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লাঘব হয়ে যায়। সাঁতারটি যেমনি জেনেছি অমনি অগাধ জলে বিহারও আমার পক্ষে যেন স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন অতল জলে ডুব দিলেও বিনাশে তলিয়ে যাই নে, আপনি ভেসে উঠি। এই সাঁতারটি না জানলেই জল প্রতি পদে আমাকে বাধা দেয় আমাকে মারতে চায়। যে জলে সঞ্চরণ সাঁতার জানলে আমার পক্ষে লীলা আমার পক্ষে আনন্দ, সাঁতার না জানলে সেই জলে সঞ্চরণই আমার পক্ষে দুঃখ আমার পক্ষে মৃত্যু। তখন অল্প জলেও হাত-পা ছুঁড়ে হাঁসফাঁস করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

(ধীর যুক্তাত্মা, শান্তিনিকেতন, ২২ চৈত্র ১৩১৫)

......আপনিকে মানুষ সহজে আপন করে তুলতে পারছে না, সেইজন্যে মানুষ সূত্রচ্ছিন্ন মালার মতো কেবলই খসে যাচ্ছে, ধুলোয় ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু, যে বিশ্ব-জগতে সে নিশ্চিত হয়ে বাস করছে সেই জগৎ তো মুহুর্মুহু এমন করে খসে পড়ছে না, ছড়িয়ে পড়ছে না।

অথচ এই জগৎটি তো সহজ জিনিষ নয়। এর মধ্যে যে-সকল বিরাট শক্তি কাজ করছে তাদের নিতান্ত নিরীহ বলা যায় না। আমাদের এতটুকু একটুখানি রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় যখন সামান্য একটা টেবিলের উপর দু-চার কণা গ্যাসকে অল্প একটু বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে তাদের লীলা দেখতে যাই তখন শঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়, তাদের গলাগলি জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি মারামারি যে কী অদ্ভুত এবং কী প্রচণ্ড তা দেখে বিস্মিত হই। বিশ্ব জুড়ে আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত এমন কত শত বাষ্প-পদার্থ তাদের কত বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে কী কাণ্ড বাধিয়ে বেড়াচ্ছে তা আমরা কল্পনা করতেও পারি নে। তার উপরে জগতের মূল শক্তিগুলিও পরস্পরের বিরুদ্ধ। আকর্ষণের উল্টো শক্তি বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগের উল্টো শক্তি কেন্দ্রাতিগ। এই-সমস্ত বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের প্রকাণ্ড লীলাভূমি এই-যে জগৎ এখানকার আলোতে আমরা অনায়াসে চোখ মেলেছি, এখানকার বাতাসে অনায়াসে নিশ্বাস নিচ্ছি, এর জলেস্থলে অনায়াসে সঞ্চরণ করছি। যেমন আমাদের শরীরের ভিতরটাতে কত রকমের কত কী কাজ চলছে তার ঠিকানা নেই, কিন্তু আমরা সমস্তটাকে জড়িয়ে একটি অখণ্ড স্বাস্থ্যের মধ্যে এক করে জানছি—দেহটাকে হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ক পাকযন্ত্র প্রভৃতির জোড়াতাড়া ব্যাপার বলে জানছি নে।

জগতের রহস্যাগারের মধ্যে শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত যেমনি জটিল ও ভয়ংকর হোক-না কেন, আমাদের কাছে তা নিতান্তই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ জগৎটা আসলে যে কী তা যখন সন্ধান করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করি তখন কোথাও আর তল পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে এক সময় বিজ্ঞান ঠিক করে রেখেছিল যে পরমাণুর পিছনে আর যাবার জো নেই—সেই-সকল সূক্ষ্মতম মূল-বস্তুর যোগ-বিয়োগেই জগৎ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু, বিজ্ঞানের সেই মূল-বস্তুর দুর্গও আজ আর টেঁকে না। আদি কারণের মহাসমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক-এক পা এগোচ্ছে ততই বস্তুত্বের কূলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে; সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত

আকার-আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে উঠছে।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যা একদিকে আমাদের ধারণার একেবারেই অতীত তাই আর-একদিকে নিতান্ত সহজেই আমাদের ধারণাগম্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই হচ্ছে আমাদের এই জগৎ। এই জগতে শক্তিকে শক্তিরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের জানতে হচ্ছে না; আমরা তাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জলস্থল, তরুলতা, পশুপক্ষী। জল মানে বাষ্পবিশেষের যোগবিয়োগ বা শক্তিবিশেষের ক্রিয়ামাত্র নয়—জল মানে আমারই একটি আপন সামগ্রী, সে আমার চোখের জিনিস, স্পর্শের জিনিস; সে আমার স্নানের জিনিস, পানের জিনিস; সে বিবিধ প্রকারেই আমার আপন। বিশ্বজগৎ বলতেও তাই। স্বরূপত তার একটি বালুকণাও যে কী তা আমরা ধারণা করতে পারি নে, কিন্তু সম্বন্ধত সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন।

যাকে ধরা যায় না সে আপনিই আমার আপন হয়ে ধরা দিয়েছে। এতই আপন হয়ে ধরা দিয়েছে যে দুর্বল উলঙ্গ শিশু এই অচিন্ত্য শক্তিকে নিশ্চিন্তমনে আপনার ধুলোখেলার ঘরের মতো ব্যবহার করছে, কোথাও কিছু বাধছে না।

জড়জগতে যেমন মানুষেও তেমনি। প্রাণশক্তি যে কী তা কেমন করে বলব। পর্দার উপর পর্দা যতই তুলব ততই অচিন্ত্য অনন্ত অনির্বচনীয়ে গিয়ে পড়ব। সেই প্রাণ একদিকে যত বড়ো প্রকাণ্ড রহস্যই হোক-না কেন, আর-এক দিকে তাকে আমরা কী সহজেই বহন করছি—সে আমার আপন প্রাণ। পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়কে ব্যাপ্ত করে প্রাণের ধারা এই মুহূর্তে অগণ্য জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, নূতন নূতন শাখাপ্রশাখায় ক্রমাগতই দুর্ভেদ্য নির্জনতাকে সজন করে তুলছে—এই প্রাণের প্রবাহের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহের তরঙ্গ কতকাল ধরে অহোরাত্র অন্ধকার থেকে সূর্যালোকে উঠছে এবং সূর্যালোক থেকে অন্ধকার নেবে পড়ছে। এ কী তেজ, কী বেগ, কী নিশ্বাস মানুষের মধ্যে আপনাকে উচ্ছ্বসিত, আন্দোলিত, নব নব বৈচিত্র্যে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে! যেখানে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে তার রহস্য চিরকাল প্রচ্ছন্ন হয়ে রক্ষিত সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই; আবার যেখানে দেশকালের মধ্যে তার প্রকাশ নিরন্তর গর্জিত উন্মথিত হয়ে উঠছে সেখানেও সে কেবল লেশমাত্র আমাদের গোচরে আছে, সমস্তটাকে একসঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু, এখানেই সে আছে, এখনই সে আছে, আমার হয়ে আছে। তার সমস্ত অতীতকে আকর্ষণ করে তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে বহন করে সে আছে। সেই অদৃশ্য অথচ দৃশ্য, সেই এক অথচ বহু, সেই বদ্ধ অথচ মুক্ত, সেই বিরাট মানবপ্রাণ—তার পৃথিবীজোড়া ক্ষুধাতৃষ্ণা, নিশ্বাসপ্রশ্বাস, শীতগ্রীষ্ম, হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন, শিরা-উপশিরায় রক্ত-স্রোতের জোয়ার-ভাঁটা নিয়ে দেশে দেশান্তরে বংশে বংশান্তরে বিরাজ করছে। এই অনির্বচনীয় প্রাণশক্তি তার অপরিসীম রহস্য নিয়েও সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে আপন হয়ে ধরা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

তাই বলছিলুম, অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মহাশক্তির যে অনির্বচনীয় ক্রিয়া চলছে তাই আমাদের কাছে জগৎরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দিয়েছে; তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার করছি তা নয়, তাদের ভালো-বাসছি, তাদের কোনো মতেই ছাড়তে চাই নে। তারা আমার এতই আপন যে তাদের যদি বাদ দিতে যাই তবে আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।

জগৎ সম্বন্ধে তো এইরকম সমস্ত সহজ, কিন্তু যেখানে মানুষ আপনি সেখানে সে এমন সহজে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তুলতে পারছে না। মানুষ আপনাকে এমন অখণ্ড-ভাবে সমগ্র ক'রে আপন ক'রে লাভ করছে না। যাকে মাঝখানে নিয়ে সবাই মানুষের এত আপন তাকেই আপন করে তোলা মানুষের পক্ষে কী কঠিন হয়েছে!

অন্তরে বাহিরে মানুষ নানাখানা নিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত; তারই মাঝখানে সে আপনাকে ধরতে পারছে না, চারিদিকে সে কেবল টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। কিন্তু আপনাকেই তার সব চেয়ে দরকার; তার যত কিছু দুঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না-পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলই মনে হয় এটা পাই নি, ওটা পাই নি; ততক্ষণ যা-কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেন না, যতক্ষণ আমরা আপনাকে না পাই ততক্ষণ নিত্যভাবে আমরা কোন জিনিসকেই পাই নে; এমন কোনো আধার থাকে না যার মধ্যে কোনো-কিছুকে স্থির-ভাবে ধরে রাখতে পারি। ততক্ষণ আমরা বলি সবই মায়া—সবই ছায়ার মতো চলে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আত্মাকে যখনই পাই, নিজের মধ্যে ধ্রুব এককে যখনই নিশ্চিত করে ধরতে পারি, তখনই সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে চারি দিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে। আপনাকে যখন পাই নি তখন যা-কিছু অসত্য ছিল আপনাকে পাবামাত্রই সেই-সমস্তই সত্য হয়ে ওঠে। আমার বাসনার কাছে প্রবৃত্তির কাছে যারা মরীচিকার মতো ধরা দিচ্ছে অথচ দিচ্ছে না, কেবলই এড়িয়ে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তারাই আমার আত্মাকে সত্যভাবে বেষ্টন করে আত্মারই আপন হয়ে ওঠে। এইজন্যে যে লোক আত্মাকে পেয়েছে জলে স্থলে আকাশে তার আনন্দ, সকল অবস্থার মধ্যেই তার আনন্দ; কেননা, সে আপনার অমর সত্যের মধ্যে সমস্তকেই অমর সত্য-রূপে পেয়েছে। সে কিছুকেই ছায়া বলে না, মায়া বলে না, কারণ তার কাছে জগতের সমস্ত পদার্থেরই সত্যই ধরা দিয়েছে। সে নিজে সত্য হয়েছে, এইজন্য তার কাছে কোনো সত্যই বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন স্খলিত নয়। এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে পাওয়া, আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতকগুলো বাসনা এবং কতকগুলো অনুভূতির স্তূপরূপে না জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বিষয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে না বেড়ানো এই হচ্ছে আত্মবোধের আত্মোপলব্ধির লক্ষণ।

পৃথিবী একদিন বাষ্প ছিল, তখন তার পরমাণুগুলো আপনার তাপের বেগে বিশিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন পৃথিবী আপনার আকার পায় নি, প্রাণ পায় নি, তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না, কিছুকেই ধরে রাখতে পারত না —তখন তার সৌন্দর্য ছিল না, সার্থকতা ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। যখন সে সংহত হয়ে এক হল তখনই জগতের গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মাণিক গেঁথে দিলে। আমাদের চিত্তও সেইরকম প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারিদিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাই নে, কিছুই দিই নে; যখনই সমস্তকে সংহত সংযত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনই আমি সত্য যে কী তা জানি, তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোটো বড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আত্মার সকল চিন্তা ও সকল কর্মের মধ্যেই একটি আত্মানন্দের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে। তখনই আমি আধ্যাত্মিক

ধ্রুবলোকে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভয় হই। তখন আমার সেই ভ্রম ঘুচে যায় যে আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে, মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান। তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত হয়ে আছে।

এই আমার সকলের চেয়ে সত্য আপনাটিকে নিজের ইচ্ছার জোরে আমাকে পেতে হবে—অসংখ্যের ভিড় ঠেলে টানাটানি কাটিয়ে এই আমার অত্যন্ত সহজ সমগ্রতাকে সহজ করে নিতে হবে। আমার ভিতরকার এই অখণ্ড সামঞ্জস্যটিকে কেবল জগতের নিয়মের দ্বারা ঘটবে না, আমার ইচ্ছার দ্বারা ঘটে উঠবে।

এইজন্যে মানুষের সামঞ্জস্য বিশ্বজগতের সামঞ্জস্যের মতো সহজ নয়। মানুষের চেতনা আছে, বেদনা আছে ব'লেই নিজের ভিতরকার সমস্ত বিরুদ্ধতাকে সে একেবারে গোড়া থেকেই অনুভব করে; বেদনার পীড়ায় সেগুলোই তার কাছে অত্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে; নিজের ভিতরকার এই-সমস্ত বিরুদ্ধতার দুঃখ তার পক্ষে এত একান্ত যে এতেই তার চিত্ত প্রতিহত হয়—কোনো একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে তার এই-সকল বিরুদ্ধতার বৃহৎ সমাধান আছে, সমস্ত দুঃখবেদনার একটি আনন্দ-পরিণাম আছে, এটা সে সহজে দেখতে পায় না। আমরা একেবারে গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছি যাতে আমার সুখ তাতেই আমার মঙ্গল নয়, যাকে আমি মঙ্গল বলে জানছি চারদিক থেকে তার বাধা পাচ্ছি। আমার শরীর যা দাবি করে, আমার মনের দাবি সকল সময় তার সঙ্গে মেলে না, আমি একলা যা দাবি করি আমার সমাজের দাবির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে, আমার বর্তমানের দাবি আমার ভবিষ্যতের দাবিকে অস্বীকার করতে চায়। অন্তরে বাহিরে এই-সমস্ত দুঃসহ বাধাবিরোধ ছিন্নবিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চলতে হচ্ছে। অন্তরে বাহিরে এই ঘোরতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতেই মানুষ আপনার অন্তরতম ঐক্যশক্তিকে প্রাণপণে প্রার্থনা করছে। যাতে তার এই-সমস্ত বিক্ষিপ্ততাকে মিলিয়ে এক করে দেবে, সহজ করে দেবে, তার প্রতি সে আপনার বিশ্বাসকে ও লক্ষকে কেবলই স্থির রাখবার চেষ্টা করছে। মানুষ আপনার অন্তর-বাহিরের এই প্রভূত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বৃহৎ ঐক্যসাধনের চেষ্টা প্রতিদিনই করছে। সেই চেষ্টাই তার জ্ঞান বিজ্ঞান সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্রনীতি। সেই চেষ্টাই তার ধর্মকর্ম পূজা-অর্চনা। সেই চেষ্টাই কেবল মানুষকে তার নিজের স্বভাব নিজের সত্য জানিয়ে দিচ্ছে। সেই চেষ্টা খানিকটা সফল হচ্ছে খানিকটা নিষ্ফল হচ্ছে, বারবার ভাঙছে বারবার গড়ছে—কিন্তু বারংবার এই-সমস্ত ভাঙাগড়ার মধ্যে মানুষ আপনার এই স্বাভাবিক ঐক্যচেষ্টার দ্বারাতেই আপনার ভিতরকার সেই এককে ক্রমশ সুস্পষ্ট করে দেখছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপারেও সেই মহৎ এক তার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সেই এক যতই স্পষ্ট হচ্ছে ততই মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে ভূমাকে আশ্রয় করছে।

তাই বলছিলুম, ঘুরে ফিরে মানুষ যা-কিছু করছে—কখনো বা ভুল করে কখনো বা ভুল ভেঙে—সমস্তর মূলে আছে এই আত্মবোধের সাধনা। সে যাকেই চাক-না সত্য করে চাচ্ছে এই আপনাকে, জেনে চাচ্ছে, না জেনে চাচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকে বিরাট ভাবে একটি জায়গায় মিলিয়ে জড়িয়ে নিয়ে আত্মার একটি অখণ্ড উপলব্ধিকে পেতে চাচ্ছে। সে একরকম করে বুঝতে পারছে কোনোখানেই বিরোধ সত্য নয়, বিচ্ছিন্নতা সত্য নয়, নিরন্তর অবিরোধের মধ্যে মিলে উঠে একটি বিশ্বসংগীতকে প্রকাশ করবার জন্যেই বিরোধের সার্থকতা—সেই সংগীতেই পরিপূর্ণ আনন্দ। নিজের

ইতিহাসে মানুষ সেই তানটাকেই কেবল সাধছে, সুরের যতই স্খলন হোক তবু কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছে না। উপনিষদের বাণীর দ্বারা সে কেবলই বলছে : তমেবৈকং জানীথ আত্মানম্। সেই এককে জানো, সেই আত্মাকে। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ। ইহাই অমৃতের সেতু।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

............শান্তং শিবমদ্বৈতম্............ ৭

উপনিষৎ বলিয়াছেন যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমৃত আনন্দ-রূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই সমস্ত রূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর-একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।

শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে তো প্রকাশ পাইতেই পারেন না;—এই যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলই ঘুরিতেছে, ইহার প্রচন্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়।

শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই, সেই কর্মক্লেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মঙ্গল সংসারের সমস্ত দুঃখ-তাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি ধর্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়?

অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কী করিয়া? আমাদের চিত্ত সংসারে আপনপরের ভেদবৈচিত্র্যের দ্বারা কেবলই আহত প্রতিহত হইতেছে; সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈত-রূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত তবে অদ্বৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন?

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

(দুঃখ, ধর্ম, ১৩১৪)

প্রকৃতির দিকে নিয়ম, আর আমাদের আত্মার দিকে আনন্দ। নিয়মের দ্বারাই নিয়মের সঙ্গে এবং আনন্দের দ্বারাই আনন্দের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে।

এইজন্যে যেদিকে আমি সর্বসাধারণের, যেদিকে আমি বিশ্বপ্রকৃতির, যেদিকে আমি মানবপ্রকৃতির, সেদিকে যদি আমি নিজেকে নিয়মের অনুগত না করি, তা হলে আমি কেবলই ব্যর্থ হই এবং অশান্তির সৃষ্টি করি। একটু ধূলিকণার কাছ থেকেও আমি

ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে পারি নে—তার নিয়ম আমি মানলে তবেই সে আমার নিয়ম মানে।

এইজন্যে আমাদের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম শিক্ষা এবং নিজেকে নিয়মের অনুগত করতে শেখা। এই শিক্ষার দ্বারাই আমরা সত্যের পরিচয় লাভ করি।

এই শিক্ষাটির পরিণাম যিনি, তিনিই হচ্ছেন, "শান্তম্"। যেখানেই নিয়মের ভ্রষ্টতা যেখানেই নিয়মের সঙ্গে নিয়মের যোগ হয়নি সেইখানেই অশান্তি। যেখানেই পরিপূর্ণ যোগ হয়েছে সেখানেই শান্তম্ যিনি, তাঁর পরিপূর্ণ উপলব্ধি।

প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ দেখতে পাই? তাঁর শান্তস্বরূপ। সেখানে, যারা ক্ষুদ্র করে দেখে তারা প্রয়াসকে দেখে, যারা বৃহৎ করে দেখে তারা শান্তিকেই দেখতে পায়। যদি নিয়ম ছিন্ন হত, যদি নিয়ম শাশ্বত এবং যথাতথ না হত, তা হলে মুহূর্ত্তের মধ্যে এই বিপুল বিশ্বশান্তি ধ্বংস হয়ে একটি অর্থহীন পরিমাণহীন প্রলয়ের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হত, তা হলে বিশ্বসংসারে বিরোধই জয়ী হয়ে তার নখদন্ত দিয়ে সমস্ত ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। কিন্তু চেয়ে দেখো, সূর্যনক্ষত্রলোকের প্রবল উত্তেজনার মধ্যে অটল নিয়মাসনে মহাশান্তি বিরাজ করছেন। সত্যের স্বরূপই হচ্ছে শান্তম্।

সত্য শান্তম্ বলেই শিবম্। শান্তম্ বলেই তিনি সকলকে ধারণ করেন, রক্ষা করেন, সকলেই তাঁতে ধ্রুব আশ্রয় পেয়েছে। আমরাও যেখানে সংযত না হয়েছি অর্থাৎ যেখানে সত্যকে জানি নি এবং সত্যের সঙ্গে সত্যরক্ষা করে চলি নি সেখানে আমাদের অন্তরে বাহিরে অশান্তি এবং সেই অশান্তিই অমঙ্গল—নিয়মের সঙ্গে নিয়মের বিচ্ছেদই অশিব!

যিনি শিবম্ তাঁর মধ্যেই অদ্বৈতম্ প্রকাশমান। সত্য যেখানে শিবস্বরূপ, সেই-খানেই তিনি আনন্দময় প্রেমময়, সেইখানেই তাঁর সকলের সঙ্গে মিলন। মঙ্গলের মধ্যে ছাড়া মিলন নেই—অমঙ্গলই হচ্ছে বিরোধ বিচ্ছেদের অপদেবতা।

একদিকে সত্য অন্যদিকে আনন্দ, মাঝখানে মঙ্গল। তাই এই মঙ্গলের মধ্যে দিয়েই আমাদের আনন্দলোকে যেতে হয়।

আমাদের দেশে যে তিন আশ্রম ছিল—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ, তা ঈশ্বরের এই তিন স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তস্বরূপ, শিবস্বরূপ, অদ্বৈতস্বরূপ।

ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জীবনে শান্তস্বরূপকে লাভ করলে তবে গৃহধর্মের মধ্যে শিব-স্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়—নতুবা গার্হস্থ্য অকল্যাণের আকর হয়ে ওঠে। সংসারে সেই মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করতে হলেই স্বার্থবৃত্তিসকল সম্পূর্ণ পরাহত হয় এবং যথার্থ মিলনের ধর্ম যে কিরূপ নির্মল আত্মবিসর্জনের উপরে স্থাপিত তা আমরা বুঝতে পারি। যখন তা সম্পূর্ণ বুঝি তখনই যিনি অদ্বৈতম্ সেই ঐক্যরূপী পরমাত্মার সঙ্গে সর্বপ্রকার বাধাহীন প্রেমের মিলন সম্ভবপর হয়। আরম্ভে সত্যের পরিচয়, মধ্যে মঙ্গলের পরিচয়, পরিণামে আনন্দের পরিচয়। প্রথমে জ্ঞান, পরে কর্ম, পরে প্রেম।

এইজন্যে যেমন আমাদের ধ্যানের মন্ত্র শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—তেমনি আমাদের প্রার্থনার মন্ত্র "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" অসত্য হতে সত্যে, পাপ হতে পুণ্যে এবং আসক্তি হতে প্রেমে নিয়ে যাও। তবেই হে প্রকাশ, তুমি আমার প্রকাশ হবে, তবেই হে রুদ্র, আমার জীবনে তুমি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ। জগৎপ্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজ-প্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী—এই বাণীটিকে জীবনে যেন সার্থক করতে পারি এই আমাদের প্রার্থনা হ'ক।

(তিন, শান্তিনিকেতন, ২১ পৌষ ১৩১৫)

তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তম্ বলতে এ বোঝায় না সেখানে গতির সংস্রব নেই। সকল বিরুদ্ধ গতিই সেখানে শান্তিতে ঐক্যলাভ করেছে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের গতি পরস্পরকে কাটতে চায় কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ গতিই তাঁর মধ্যে অবিরুদ্ধ বলেই তিনি শান্তম্। আমার স্বার্থ তোমার স্বার্থকে মানতে চায় না, তোমার স্বার্থ আমার স্বার্থকে মানতে চায় না, কিন্তু মাঝখানে যেখানে মঙ্গল সেখানে তোমার স্বার্থই আমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থই তোমার স্বার্থ। তিনি শিব, তাঁর মধ্যে সকলেরই স্বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে। তিনি অদ্বিতীয় তিনি এক। তার মানে, এ নয় যে, তবে এ সমস্ত কিছুই নেই। তার মানে, এই সমস্তই তাঁতে এক। আমি বলছি, আমি তুমি নয়, তুমি বলছ তুমি আমি নয়, এমন বিরুদ্ধ আমাকে-তোমাকে এক করে রয়েছেন সেই অদ্বৈতম্।

(ওঁ, শান্তিনিকেতন, ১৫ চৈত্র ১৩১৫)

আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি, কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তংশিবমদ্বৈতম্। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তম্, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে-সত্যসাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে —এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে, কখনোই প্রমত্ততার দিকে নয়।

(সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন)

তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্ছে—সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য এমন অপরিমেয়।

(সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন)

অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসংঘ দশদিকে ছুটিয়াছে, যিনি শান্তং তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্গা দিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু কিছুই ধ্বংস করিতেছে না, জগতের সমস্ত চেষ্টা স্ব স্ব স্থানে একমাত্র প্রবল কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য ঘটিয়া অনন্ত আকাশে এক বিপুল সৌন্দর্যের বিকাশ হইতেছে। কতই ওঠাপড়া কতই ভাঙাচোরা চলিতেছে, কত হানা-হানি কত বিপ্লব, তবু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অবিশ্রাম আঘাতচিহ্ন বিশ্বের চিরনূতন

মুখচ্ছবিতে লক্ষ্যই করিতে পারি না। সংসারের অনন্ত চলাচল অনন্ত কোলাহলের মর্মস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। যিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্ত্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের অন্তরাত্মাতেও সেই শান্তং যে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইবে কি উপায়ে? সেই শান্তস্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে কেমন করিয়া? তাঁহার শান্তরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ হইবে কবে?

আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্তস্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের অতিক্ষুদ্র অশান্তিতে জগতের কতখানি যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই? নিভৃত নদীতীরে প্রশান্ত সন্ধ্যায় আমরা দুজনমাত্র লোক যদি কলহ করি, তবে সায়াহ্নের যে অপরিমেয় স্নিগ্ধ নিঃশব্দতা আমাদের পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, দুটিমাত্র অতিক্ষুদ্র ব্যক্তির অতিক্ষুদ্র কণ্ঠের কলকলায় তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। আমার মনের এতটুকু ভয়ে জগৎচরাচর বিভীষিকাময় হইয়া উঠে, আমার মনের এতটুকু লোভে আমার নিকটে সমস্ত বৃহৎ সংসারের মুখশ্রীতে যেন বিকার ঘটে। তাই বলিতেছি, যিনি শান্তং, তাঁহাকে সত্যভাবে অনুভব করিব কি করিয়া, যদি আমি শান্ত না হই? আমাদের অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য কেবল নিজের তরঙ্গগুলোকেই বড়ো করিয়া দেখায়, তাহারই কল্লোল বিশ্বের অন্তরতম বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নানাদিকে আমাদের নানাপ্রবৃত্তি যে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে, আমাদের মনকে তাহারা একবার এ-পথে একবার ও-পথে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহাদের সকলকে দৃঢ়রশ্মিদ্বারা সংযত করিয়া সকলকে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অন্তঃকরণের মধ্যে কর্তৃত্বলাভ করিলে, চঞ্চল পরিধির মাঝখানে অচঞ্চল কেন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া নিজেকে স্থির করিতে পারিলে তবেই এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে যিনি শান্তং, তাঁহার উপাসনা তাঁহার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

জীবনের হ্রাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শান্তি বলিয়া কল্পনা করি। জীবনহীন শান্তি তো মৃত্যু, শক্তিহীন শান্তি তো লুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচল-প্রতিষ্ঠ আধারস্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে, তাহাই শান্তি; অদৃশ্য থাকিয়া সমস্ত সুরকে যিনি সংগীত, সমস্ত ঘটনাকে যিনি ইতিহাস করিয়া তুলিতেছেন, একের সহিত অন্যের যিনি সেতু, সমস্ত দিনরাত্রি-মাসপক্ষ-ঋতুসংবৎসর চলিতে চলিতেও যাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, তিনিই শান্তম্। নিজের সমস্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত না করিয়া ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে এই পরম শান্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ।

বাষ্পই যে রেলগাড়ী চালায়, তাহা নহে, বাষ্পকে যে স্থিরবুদ্ধি লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, সে-ই গাড়ী চালায়। গাড়ীর কলটা চলিতেছে, গাড়ীর চাকাগুলা ছুটিতেছে, তবুও গাড়ির মধ্যে গাড়ির এই চলাটাই কর্তা নহে, সমস্ত চলার মধ্যে অচল হইয়া যে আছে, যথেষ্ট পরিমাণ চলাকে যথেষ্ট পরিমাণ না-চলার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতিমুহূর্ত্তে স্থিরভাবে নিয়মিত করিতেছে, সেই কর্তা। একটা বৃহৎ কারখানার মধ্যে কোনো অজ্ঞ লোক যদি প্রবেশ করে, তবে সে মনে করে, এ একটা দানবীয় ব্যাপার; চাকার প্রত্যেক আবর্ত্তন, লৌহদণ্ডের প্রত্যেক আস্ফালন, বাষ্পপুঞ্জের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তাহার মনকে একেবারে বিভ্রান্ত করিতে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমস্ত নড়াচড়া-চলাফিরার মূলে একটি স্থির শান্তি দেখিতে পায়—সে জানে ভয়কে অভয়

করিয়াছে কে, শক্তিকে সফল করিতেছে কে, গতির মধ্যে স্থিতি কোথায়, কর্মের মধ্যে পরিণামটা কী। সে জানে এই শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে, তাহা শান্তি, সে জানে যেখানে এই শক্তির সার্থক পরিণাম, সেখানেও শান্তি। শান্তির মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য পাইয়া সে নির্ভয় হয়, সে আনন্দিত হয়।

এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, শান্তং তাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং, তিনিই শিবং। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দামশক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গললক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্‌গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মতো নিখিল-জগৎকে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর ধূলিকণাটুকুও লক্ষযোজনদূরবর্তী সূর্যচন্দ্রগ্রহতারার সঙ্গে নাড়ির যোগে যুক্ত। কেহ কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার এক বিরাট কলেবর রূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ-প্রত্যংশ তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই রক্ষণসূত্রে, একই পালনসূত্রে গ্রথিত। সেই রক্ষণী শক্তি সেই পালনী শক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; মৃত্যু তাহার একরূপ, ক্ষতি তাহার একরূপ, দুঃখ তাহার একরূপ; সেই মৃত্যু, ক্ষতি ও দুঃখের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ লাভক্ষতি সকলেরই মধ্যেই শিবং শান্তরূপে বিরাজমান। নহিলে এ-সকল ভার এক মুহূর্ত বহন করিত কে। নহিলে আজ যাহা সম্বন্ধবন্ধনরূপে আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে আঘাত করিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত। যাহা আলিঙ্গন, তাহাই যে পীড়ন হইয়া উঠিত। আজ সূর্য আমার মঙ্গল করিতেছে, গ্রহতারা আমার মঙ্গল করিতেছে, জল-স্থল-আকাশ আমার মঙ্গল করিতেছে, যে বিশ্বের একটি বালুকণাকেও আমি সম্পূর্ণ জানি না, তাহারই বিরাট প্রাঙ্গণে আমি ঘরের ছেলের মতো নিশ্চিন্ত মনে খেলা করিতেছি; আমিও যেমন সকলের, সকলেও তেমনি আমার—ইহা কেমন করিয়া ঘটিল? যিনি এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর, তিনি নিখিলের সকল আকর্ষণ সকল সম্বন্ধ সকল কর্মের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া সকলকে রক্ষা করিতে-ছেন। তিনি শিবম্।

এই শিবস্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই, তেমনি কর্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলকে কেহ পাইতে পারে না। ঔদাসীন্যে মঙ্গল নাই। কর্মসমুদ্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়। ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব দেবদৈত্যের সংঘাতের ভিতর দিয়া দুর্গম সংসারপথের দুরূহ বাধাসকল কাটাইয়া তবে সেই মঙ্গল-নিকেতনের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতে পারি—শুভ-কর্মসাধনদ্বারা সমস্ত ক্ষতিবিপদ ক্ষোভবিক্ষোভের ঊর্ধ্বে নিজের অপরাজিত হৃদয়ের মধ্যে মঙ্গলকে যখন ধারণ করিব, তখনই জগতের সকল কর্মের সকল উত্থানপতনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, তিনি রহিয়াছেন, যিনি শান্তং যিনি শিবম্। তখন ঘোরতর দুর্লক্ষণ দেখিয়াও ভয় পাইব না; নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আমাদের সমস্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দেখিব সেখানেও জানিব, তিনি রাখিয়াছেন, যিনি শিবম্।

তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক।

সংসারের সব-কিছুকে পৃথক করিয়া বিচিত্র করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু তো সংখ্যার অতীত এই বৈচিত্র্যের মহাসমুদ্রের মধ্যে আমরা পাগল হইয়া যাই নাই, আমরা তো চিন্তা করিতে পারিতেছি; অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপরিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে তো একটা ব্যবহারিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে তো প্রতি-মুহূর্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না, সমস্ত পৃথিবীকে তো আমরা একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে তো কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম, কত মানুষ; কত লক্ষকোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে; কিন্তু সে-বোঝার ভারে আমাদের হৃদয়মন তো একেবারে পিষিয়া যায় না। কেন যায় না? সমস্ত গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন, যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্। তাই সমস্ত ভার লঘু হইয়া গেছে। তাই মানুষের মন আপনার সকল বোঝা নামাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেকের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাঁহাকে, যিনি অদ্বৈতম্। আমাদের সকলকে লইয়া যদি এই এক না থাকিতেন, তবে আমরা কেহ কাহাকেও কিছুমাত্র জানিতাম কি? তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকারের আদানপ্রদান কিছুমাত্র হইতে পারিত কি? তবে আমরা পরস্পরের ভার ও পরস্পরের আঘাত এক মুহূর্তও সহ্য করিতে পারিতাম কি? বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বুদ্ধির শ্রান্তি দূর হইয়া যায়, পরের সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। বাস্তবিক প্রধানত আমরা যাহা-কিছু চাই তাহার লক্ষই এই ঐক্য। আমরা ধন চাই, কারণ, এক ধনের মধ্যে ছোটোবড়ো বহুতর বিষয়ে ঐক্যলাভ করিয়াছে; সেইজন্য বহুতর বিষয়কে প্রত্যহ পৃথকরূপে সংগ্রহ করিবার দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতা ধনের দ্বারাই দূর হয়। আমরা খ্যাতি চাই, কারণ, এক খ্যাতির দ্বারা নানা লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একেবারেই বাঁধিয়া যায়—খ্যাতি যাহার নাই, সকল লোকের সঙ্গে সে যেন পৃথক। ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, পার্থক্য যেখানে, মানুষের দুঃখ সেখানে, ক্লান্তি সেখানে; কারণ মানুষের সীমা সেখানেই। যে আত্মীয়, তাহার সঙ্গ আমাকে শ্রান্ত করে না; যে বন্ধু, সে আমার চিত্তকে প্রতিহত করে না; যাহাকে আমার নহে বলিয়া জানি, সেই আমাকে বাধা দেয়, সেই, হয় অভাবের, নয় বিরোধের কষ্ট দিয়া আমাকে কিছু-না-কিছু পীড়িত করে। পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবামাত্র যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

এই যিনি অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে। কারণ, সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য যে অদ্বৈতং, তাঁহাকেই দেখে। অন্যকে যখন আঘাত করিতে যাই, তখন সেই অদ্বৈতের উপলব্ধিকে হারাই, সেইজন্য তাহাতে দুঃখ দিই ও দুঃখ পাই; নিজের স্বার্থের দিকে যখন তাকাই, তখন সেই অদ্বৈতং প্রচ্ছন্ন হইয়া যান, সেইজন্যে স্বার্থসাধনার মধ্যে এত মোহ, এত দুঃখ।

জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে শান্তকে শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি

পর্যায় উপনিষদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রে কেমন নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখো।

প্রথমে শান্তম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্র শক্তি মানুষের চোখে পড়ে। যতক্ষণ শান্তিতে তাহার পর্যাপ্তি দেখিতে না পাই, ততক্ষণ পর্যন্ত কত ভয় কত সংশয় কত অমূলক কল্পনা। সকল শক্তির মূলে যখন অমোঘ নিয়মের মধ্যে দেখিতে পাই শান্তং তখন আমাদের কল্পনা শান্তি পায়। শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মস্বরূপ, তিনি শান্তম্। মানুষ আপন অন্তঃকরণের মধ্যেও প্রবৃত্তিরূপিণী অনেকগুলি শক্তি লইয়া সংসারে প্রবেশ করে; যতক্ষণ তাহাদের উপর কর্তৃত্বলাভ না করিতে পারে, ততক্ষণ পদে পদে বিপদ, ততক্ষণ দুঃখের সীমা নাই। অতএব এই সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবরণ করিয়া আনাই মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ। এই সাধনায় যখন সিদ্ধ হইব, তখন জলে-স্থলে আকাশে সেই শান্তস্বরূপকে দেখিব, যিনি জগতের অসংখ্য শক্তিকে নিয়মিত করিয়া অনাদি-অনন্ত-কাল স্থির হইয়া আছেন। এইজন্য আমাদের জীবনের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য—শক্তির মধ্যে শান্তিলাভের সাধনা।

পরে শিবম্। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম করা সহজ হয়। এইরূপে কর্ম যখন আরম্ভ করি, তখন নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই আত্মপরের সংস্রবেই যত ভালোমন্দ যত পাপপুণ্য যত আঘাত প্রতিঘাত। শান্তি যেমন শক্তিকে যথোচিতভাবে সংবরণ করিয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জন করিয়া দেয়, তেমনি সংসারে আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের অপরিসীম জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য স্থাপন করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জগৎপ্রকৃতির প্রলয়, মঙ্গল না থাকিলে মানবসমাজের ধ্বংস। শান্তকে শক্তিসংকুল জগতে উপলব্ধি করিতে হইবে, শিবকে সম্বন্ধসংকুল সংসারে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহার শান্তস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিবস্বরূপকে শুভকর্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে, প্রথমে ব্রহ্মচর্য, পরে গার্হস্থ্য,—প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্মের দ্বারা পরিপক্ব হওয়া। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্।

তারপরে অদ্বৈতম্। এইখানেই সমাপ্তি। শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা শিখিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও তো তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অদ্বৈতম্। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাহাই নির্বিকার আনন্দ। মঙ্গলকর্মের সাধনায় যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহংকারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতাদ্বারা ক্ষমার দ্বারা করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান। তখন মানবজীবন তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত পরিপূর্ণ;—কোথাও সে আর অসংগত অসমাপ্ত অর্থহীন নহে।

হে পরমাত্মন্, মানবজীবনের সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরে একটিমাত্র গভীরতম প্রার্থনা আছে, তাহা আমরা বুদ্ধিতে জানি বা না জানি, তাহা আমরা মুখে বলি বা না বলি, আমাদের ভ্রমের মধ্যেও আমাদের দুঃখের মধ্যেও আমাদের অন্তরাত্মা হইতে সে প্রার্থনা সর্বদাই তোমার অভিমুখে পথ খুঁজিয়া চলিতেছে। সে প্রার্থনা এই যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি। ফললাভের প্রত্যাশা সাহস করিয়া তোমাকে জানাইতে পারি না, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এইমাত্র যে, সমস্ত বিঘ্ন-বিক্ষেপ-বিকৃতির মধ্যেও এই প্রার্থনা যেন

সমস্ত শক্তির সহিত সত্যভাবে তোমার নিকট উপস্থিত করিতে পারি। অন্য সমস্ত বাসনাকে ব্যর্থ করিয়া, হে অন্তর্যামিন্, আমার এই প্রার্থনাকেই গ্রহণ করো যে, আমি কদাপি যেন জ্ঞানে কর্মে প্রেমে উপলব্ধি করিতে পারি, যে, তুমি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(শান্তং শিবমদ্বৈতম, ধর্ম, ১৩১৬)

শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—যিনি সমস্ত জগৎ জুড়ে অন্তরে বাহিরে চিরদিন আছেন, তাঁকেই চরম সত্য বলে জানলে সংসারের সমস্ত ক্ষোভের কারণগুলো মুহূর্তের মধ্যে অত্যন্ত ছোট হয়ে যায়।

(চিঠিপত্র, ৭ম খণ্ড, ২১ শ্রাবণ ১৩১৭)

'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' এ মন্ত্রও অনেক সময় আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে —কোনো সাংসারিক কারণে মন ক্ষুব্ধ হইলে বা কোনোপ্রকার ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কায় মন উদ্বিগ্ন হইলে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ মন্ত্র জপ করিয়া একটি গভীর শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে মন প্রবেশ করে। কখনো কখনো আমি গায়ত্রী মন্ত্রও ধ্যান করিয়া থাকি।

(চিঠিপত্র, সপ্তম খণ্ড, ১৮ই পৌষ ১৩১৭)

মনটিকে অনন্তের ধারণায় নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে আপনিই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—মন্ত্রসাধন ছাড়া তার অন্য কোন পথ আমি ত জানি নে। যখন একটু অবকাশ পাবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—শান্তম্ শিবমদ্বৈতং এই মন্ত্রটাকে মনের একেবারে তলা পর্যন্ত গ্রহণ করবার চেষ্টা কোরো—ঐ কথাগুলো যেন তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার নাড়ির মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে।

(চিঠিপত্র, সপ্তম খণ্ড, ৯ ফাল্গুন ১৩১৭)

মানুষের চারিদিকে ষড়্ রিপুর হানাহানি, তাণ্ডবলীলা চলেছে; কিন্তু এত বেসুর এসে কই এই একটি সুরকে তো লুপ্ত করতে পারলে না! সকল বিরোধ, সকল বিপ্লব, সকল যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে এই সুর বেজে উঠল : শান্তং শিবং অদ্বৈতং।

(অন্তরতর শান্তি, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ ১৩২১)

কাশ্মীরে এসে প্রত্যক্ষ হল আপন আলোয়—কেন আমার এই ক্রন্দন, আমি কি চাই। দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলে তুচ্ছতার আবরণে আবার হয়ত এই বোধটিকে হারিয়ে ফেলব। কিন্তু প্রতিদিনের চিন্তাধারা ও কাজকর্মের ফাঁকে এই যে মাঝে মাঝে সরে আসা, এতেই বন্ধনছিন্নতার শেষমুক্তিতে পোঁছে দেয়—সেই শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতমে। মুক্তির পথে প্রথমে আসেন শান্তম্; যে শান্তপ্রসন্নতা আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলে চিত্ত অধিকার করে তিনি সেই শান্তম্। তার পরের ধাপে শিবম্। তিনি হলেন পরম মঙ্গল, আত্মবিলোপের পরে প্রাণের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর জাগরণ। তারপরে অদ্বৈতম্; তিনিই অসীম প্রেম—সর্বজীবের ও সর্বব্যাপী পরমাত্মার একাত্ম অনুভূতি।

অবশ্য এই যে স্তরবিভাগ—এ শুধু মানবশাস্ত্রের বিচার। আলোর রশ্মির মতো

অখন্ডরূপেও এর আবির্ভাব হয়, আবার পাত্রভেদে ক্রমও বদল হয়। যেমন শিবম্ হয়তো শান্তমের আগে এলেন। কিন্তু এই কথাটি জানা যে চাই—শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতমে পৌঁছবার জন্যই আমাদের প্রাণের সাধন আর তারই জন্য যত অশ্রান্ত সংগ্রাম।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, ১২ অক্টোবর ১৯১৫
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমতী মলিনা রায়)

ধর্ম্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তম্, মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মত কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না। সেই অবস্থায় শিবম্, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্ছে প্রেম আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতম্। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়। সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে ত দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়।

(আত্মপরিচয়, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪)

আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ-উপলব্ধিই ধর্ম্মবোধ যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর-এক দিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর-এক দিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর-এক দিকে মুক্তি।' যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।

(আত্মপরিচয়, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪)

শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন : শান্তং শিবমদ্বৈতম্। অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব।...... ....যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সার্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্‌বোধন এনে দেবে না?

(শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, আশ্বিন ১৩২৮)

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একটি শুচিশুভ্র আসন পেতে রেখেছিলেন। তাতে সখ্যে ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বভুবনের লোক সমবেত হোক—এই আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেখানে বিরোধের অবকাশ নেই। কেননা আমন্ত্রণটী শান্তম্, শিবম্ ও অদ্বৈতমেরই নামে। সব সংগ্রামের মর্ম্মস্থলে বসে তিনি শান্ত, সব ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে প্রকাশিত তিনি

শিব, সমস্ত সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি এক ও অদ্বিতীয়। প্রাচীন ভারতে এই চিরন্তন সত্যটি তাঁরই নামে প্রচারিত হয়েছিল—

আত্মবৎ সর্বভূতানি য পশ্যতি, স পশ্যতি।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমতী মলিনা রায়)

যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের—ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। তখন অন্তঃপুরের অন্তরালে শান্তি এবং মাধুর্য্যেরই দরকার। বীজের দরকার মাটির বুকের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর পর্দ্দার আড়ালে শান্তিতে রস শোষণ করা। ঝড়বৃষ্টি-রৌদ্রছায়ার ঘাতপ্রতিঘাত তখন তার জন্যে নয়। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্মবোধের যে আভাস মেলে সে হচ্ছে বৃহতের আস্বাদনে। এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি কেবল শান্তম্, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যম্।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সে দিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়ো-আমির সঙ্গে আমরা মিলতে চাই। সেইখানে আমরা আমাদের বড়ো পিতাকে, সখাকে, স্বামীকে, কর্মের নেতাকে, পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমার ছোটো-আমিকে নিয়েই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করতে থাকে, দুঃখশোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে তাকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা দেখতে পাইনে। তখন প্রাণপণে কেবলই সঞ্চয় করি, ত্যাগ করবার কোনো অর্থ দেখি নে, ছোটো ছোটো ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জরিত হয়ে ওঠে.....................বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেদ করে দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন এখানে তাঁরই কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।

কিন্তু বিরোধ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই ঐক্যটি কী। সেই হচ্ছে শিবম্। এই-যে মঙ্গল এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুই ভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে, সুখদুঃখ, ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল সেটি এক, সেটি শান্তম্, সেখানে আলো-আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড়ো তীব্র। এইখানে 'মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ-শান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস।...........

অনন্ত আকাশে বিশ্ব-প্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল। এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন।...

রাত্রির প্রান্তে প্রভাতের যখন প্রথম সঞ্চার হয় তখন তার আভাসটা যেন কেবল অলংকার রচনা করতে থাকে। আকাশের কোণে কোণে মেঘের গায়ে গায়ে নানা রকম রং ফুটতে থাকে, গাছের মাথার উপরটা ঝিক্‌মিক্ করে, ঘাসের শিশিরগুলো ঝিল্‌-মিল্ করতে সুরু করে, সমস্ত ব্যাপারটা প্রধানত আলংকারিক। কিন্তু তাতে করে এটুকু বোঝা যায় যে রাতের পালা শেষ হয়ে দিনের পালা আরম্ভ হল। বোঝা যায় আকাশের অন্তরে অন্তরে সূর্যের স্পর্শ লেগেছে; বোঝা যায় সুপ্তরাত্রির নিভৃত গম্ভীর পরিব্যাপ্ত শান্তি শেষ হল, জাগরণের সমস্ত বেদনা সপ্তকে সপ্তকে মিড় টেনে এখনই অশান্ত সুরের ঝংকারে বেজে উঠবে। এমনি করে ধর্মবোধের প্রথম উন্মেষটা সাহিত্যের অলংকারেই প্রকাশ পাচ্ছিল, তা মানসপ্রকৃতির শিখরে শিখরে কল্পনার মেঘে মেঘে নানাপ্রকার রং ফলাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্য থেকে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল যে বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড শান্তি এবার বিদায় হল, নির্জনে অরণ্যে পর্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরোল, এবারে বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব।.................
....

কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা মানতেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

(আত্মপরিচয়, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪)

শিবম্ ও অদ্বৈতমের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছি, সেই কারণে আমরা দুঃখভোগ করছি।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২০)

আমাদের শিব হলেন প্রলয়ংকর শক্তির দেবতা। তাঁর অনুচরগুলি মৃত্যুরই দূত—অথচ তিনিই আবার শিবম্, পরম মঙ্গল। পাপকে অস্বীকার করা নয়, তার উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করাই হল পুণ্য। সৃষ্টির সকল বিরোধবৈষম্যের মধ্যে সুষম ছন্দ আসে শিবশংকরের পরম বিস্ময়কর নৃত্যের বশেই।

সত্যিকার শিক্ষা বলতে বুঝি এই জাদুশক্তির প্রেরণা-সৃষ্টিকারের মায়ামন্ত্রের স্পর্শ। শান্তি বা শৃঙ্খলা বাইরে থেকে যা চাপানো হয়, তা নেতিবাচক। শিবই হলেন শিক্ষাগুরু- ধ্বংসাত্মকতাকে ধ্বংস করার, বিষ পান করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই আছে।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০)

অতীতকাল ছিল মানবসাধারণের, ভবিষ্যৎ হল মহামানবের। আজও তা না মেনে এই বিশ্বকে আপন ভোগের অধিকারে আনার লোভে মানুষের লড়াইয়ের বিরাম নেই। তার উচ্চ কলরবে চতুর্দিক বধির; সৈন্যদলের পদধূলিভরে দিগ্বিদিক সমাচ্ছন্ন। তবু মহাকালের ইঙ্গিতে এই সমরবিদীর্ণ ধরিত্রীবক্ষেই শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতমের বেদী প্রস্তুত করতে হবে। হয়তো তাতে জনতার ব্যঙ্গবিদ্রূপই আমাদের সইতে হবে। তবু আমরা যে বিশ্বাস-ভরে এগিয়েছি, এই তথ্য টিকে থাকবে এবং লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেই ক্রমশ তা সত্য হয়ে ফুটে উঠবে।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ৩০ নভেম্বর ১৯২০)

পূর্বপুরুষের প্রজ্ঞার অধিকারে জানি জগতের সকল ক্ষণস্থায়ী পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বিধৃত করে রয়েছেন একম্ অদ্বৈতম্—দুই এর অন্তরে যে এক, সেই তিনি। পূর্ব ও পশ্চিমে যে দ্বৈতভাব—তার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন আছে মৈত্রীবন্ধন, তাই মিলনে এর পরিসমাপ্তি হবেই।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ৬ মে ১৯২১)

গৌরবভ্রষ্ট ভারতবর্ষ আজকের দিনে অজস্র বিক্ষিপ্ততার মধ্যেও তার অন্তরতলে অমৃতমন্ত্র ধারণ করে রেখেছে—শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

একদা এই ভারতের তপোবনচ্ছায়ে ধ্বনিত হয়েছিল সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে অদ্বিতীয় একের মিলনমন্ত্র। মানবসন্তান—যারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ভুলে গিয়ে আজ পরস্পর যুদ্ধরত—তাদের মিলনসাধনের জন্য সেই বাণী অপেক্ষা করে আছে।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ১৭ মে ১৯২১)

যে-মন্ত্র আমাদের অধ্যাত্মদৃষ্টিকে সর্বত্র প্রবেশের অধিকার দেয়, সে মন্ত্র ভারতেরই মন্ত্র। সে মন্ত্র হল শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ১৭ মে ১৯২১)

কোনো ফরাসি দার্শনিক অসীমের তিনটি ভাব নির্ণয় করেছেন—the true, the good, the beautiful. ব্রাহ্মসমাজে তারই একটি সংস্কৃত তর্জমা খুব চলতি হয়েছে—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। এমন কি, অনেকে মনে করেন, এটি উপনিষদের বাণী। উপনিষৎ সত্যের স্বরূপ যে ব্যাখ্যা করেছেন সে হচ্ছে, শান্তং শিবং অদ্বৈতম্। শান্তং হচ্ছে সেই সামঞ্জস্য, যার যোগে সমস্ত গ্রহতারা নিয়ে বিশ্ব শান্তিতে বিধৃত, যার যোগে কালের গতি চিরন্তন ধৃতির মধ্যে নিয়মিত; নিমেষা মুহূর্তাণ্যর্ধমাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।—শিবং হচ্ছে মানবসমাজের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য যা নিয়তই কল্যাণের মধ্যে বিকাশ লাভ করছে, যার অভিমুখে মানুষের চিত্তের এই প্রার্থনা যুগে যুগে সমস্ত বিরোধের মধ্য দিয়েও গূঢ়ভাবে ও প্রকাশ্যে ধাবিত হচ্ছে; অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়। আর, অদ্বৈতং হচ্ছে আত্মার মধ্যে সেই ঐক্যের উপলব্ধি যা বিচ্ছেদের ও বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে আনন্দে প্রেমে নিয়ত আত্মীয়তাকে ব্যাপ্ত করছে।

যাঁদের মন খৃষ্টিয়ানতত্ত্বের আবহাওয়াতে অত্যন্ত অভ্যস্ত তাঁরা উপনিষৎ সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে থাকেন, খৃষ্টিয়ান দার্শনিকদের নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে উপনিষদের বাণীকে কিছু-না-কিছু বদল করে চালিয়ে দেওয়া তাঁদের ভিতরকার ইচ্ছা। কিন্তু শান্তং শিবং অদ্বৈতম্ এই মন্ত্রটিকে চিন্তা করে দেখলেই তাঁরা এই আশ্বাস পাবেন যে, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভাবের কথা বলা হচ্ছে না, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য এইটেই তাৎপর্য। কারণ, বিপ্লব না থাকলে শান্তির কোনো মানেই নেই, মন্দ না থাকলে ভালো একটা শব্দমাত্র, আর বিচ্ছেদ না থাকলে অদ্বৈত নিরর্থক। তাঁরা যখন সত্যের ত্রিগুণাত্মক ধ্যানের মন্ত্রস্বরূপে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' বাক্যটি ব্যবহার করেন তখন

তাঁদের বোঝা উচিত যে, সত্যকে সত্য বলাই বাহুল্য এবং সুন্দর সত্যের একটা তত্ত্ব নয়, আমাদের অনুভূতিগত বিশেষণমাত্র, সত্যের তত্ত্ব হচ্ছে অদ্বৈত। যে-সত্য বিশ্বপ্রকৃতি লোকসমাজ ও মানবাত্মা পূর্ণ করে আছেন তাঁর স্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তাকল্পে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' মন্ত্রটি যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি তো আর কিছুই জানি নে। মানবসমাজে যখন শিবকে পাবার সাধনা করি তখন কল্যাণের উপলব্ধিকে শান্তং আর অদ্বৈতং এই দুই-এর মাঝখানে রেখে দেখি, অর্থাৎ ইংরাজীতে বলতে গেলে, ল এবং লভ্ এর পূর্ণতাই হচ্ছে সমাজের ওয়েল্‌ফেয়ার।

(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫)

......গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা; ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন।

(ভূমিকা, বনবাণী, ২৩ অক্টোবর ১৯২৬)

যে গুরু নিজেকে ভোলান না বলেই অন্যকে ভোলান না সে রকম গুরু নিতান্তই দুর্লভ, অথচ যদি তাঁদের দর্শন মেলে তাঁদের মত সুলভ কেউ না। যার দরকার আছে তাকে না দিয়ে তাঁরা থাকতেই পারেন না, নইলে তাঁরা অকৃতার্থ হন,—ভরা মেঘ মরুভূমিতেও জলবর্ষণ না করে থাকি্তে পারে না। সেই রকম গুরুই কতবার পৃথিবীতে এসেচেন, আর তাঁদের যা দেবার তা দিয়ে চলে গেছেন—না দিয়ে যাবার জো ছিল না। ভেবে দেখ, ভারতে এমন দিন ছিল যখন লিপি ছিল না, গ্রন্থ আকারে ভাব প্রকাশ করবার উপায় ছিল না—তবু যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা না দিয়ে যেতে পারেন নি। আমি ত তাঁদেরই এক একটি বাণীর মধ্যে গুরুর স্পর্শ পাই। আর কিছু না, সেই বাণী শান্ত হয়ে শুন্‌তে হয়—নিজের আত্মার বাণীর সঙ্গে তার সুর মিল করে তবে তাকে পাওয়া যায়। মন যখন শান্ত তখন একটিমাত্র শব্দই যথেষ্ট, "সত্যং"—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে,—শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং—কোথাও কিছু আর ফাঁক থাকে না—কেননা কোলাহলমুক্ত হলে এই ধ্বনি আপনার মধ্যেই শোনা যায়।

(চিঠিপত্র, সপ্তম খণ্ড, ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮)

মানবাত্মার মধ্যেও কত দীনতা, কত কলুষ, কত হিংসা দ্বেষ সর্বদাই প্রকাশ পাচ্ছে জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বাস আসে—এ-সমস্তকে অতিক্রম করে যিনি শিবং তিনি আছেন। মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে আমরা এই ইঙ্গিত পাই। যা-কিছু অশিব তাকে পরাভূত করে সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখে এসে মহাপুরুষের জীবন যখন দাঁড়ায়, আঘাত-অপমানের মাঝখানে কল্যাণের তপস্যাকে সার্থক করে, তখন সেই আশ্চর্য আবির্ভাবের সম্পূর্ণ যে অর্থ তাকে দেখি। প্রমাণ পাই যে, যুগে যুগে কলুষ ক্ষয় করছেন যিনি, অকল্যাণকে দুঃখের মধ্য দিয়ে কল্যাণে উত্তীর্ণ করছেন যিনি, তিনিই মহাপুরুষের বাণীর ভিতর দিয়ে বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে হৃদয়ের

সঙ্গে হৃদয়কে, জাতির সঙ্গে জাতিকে, ইতিহাসের বিপদসঙ্কুল বন্ধুর পথে একসূত্রে বেঁধে দিচ্ছেন, তখন জানি যে তাঁকে প্রণাম করার দিন উপস্থিত।

(ভারতপথিক রামমোহন, ৬ ভাদ্র ১৩৩৫)

আমাদের প্রাচীনতম সাধকরাও এই ঐক্যের বাণী চিরকালের মতো আমাদের দান করে গেছেন। তাঁরা বলেছেন শান্তং শিবমদ্বৈতং—যিনি অদ্বৈত, যিনি এক, তাঁর মধ্যেই মানুষের শান্তি, তাঁর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ।

(ভারতপথিক রামমোহন, ১১ মাঘ ১৩৩৫)

তিনি প্রশান্ত, তিনি কল্যাণহেতু,
তিনি এক, তিনি সবার মিলনসেতু।

(রূপান্তর)

অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেগের অভ্যাস মাদক সেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই-সকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়—ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্ত কথার মতো না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি।

(শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, ২৭ কার্ত্তিক ১৩০৯)

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্।
এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।
১।৪।৩

জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন, স্বাহা।

(নবযুগের উৎসব, শান্তিনিকেতন, ১৩১৫ সাল)

যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়—যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মননধারা। সে বলতে পেরেছিল, 'আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা', সকলে আসুক সকল দিক থেকে। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে', শুনুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্', আমি জানি—এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার। যে তারা জ্যোতিহীন তাকে নিখিল নক্ষত্রলোক স্বীকার করে না। প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে; বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে, আপনাকে দান করার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিঞ্চনরূপে অকিঞ্চিৎকর।

(সভাপতির অভিভাষণ, রামমোহন শতবার্ষিকী উৎসব,
ভারতপথিক রামমোহন রায়, ১৪ পৌষ ১৩৪০)

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে যে মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন সে মন্ত্র বহুদিন এ দেশে ধ্বনিত হয় নাই।........................
..........................যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। জল সকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারীগণ আমার নিকটে আসুন—স্বাহা।

(জাতীয় বিদ্যালয়, শিক্ষা, ভাদ্র ১৩১৩)

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতিহ্‌র্স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি।...........ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি।

১।৮

চিন্তার যতপ্রকার চিহ্ন আছে তন্মধ্যে ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার অনুগামী। কিন্তু ভাষারও সীমা আছে, বিশেষ অর্থের দ্বারা সে আকারবদ্ধ—সুতরাং ভাষা আশ্রয় করিলে চিন্তাকে ভাষাগত অর্থের চারিপ্রান্তের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়।

ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র—তাহার কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই ওঁ শব্দে ব্রহ্মের ধারণাকে কোন অংশেই সীমাবদ্ধ করে না—সাধনা দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে যতদূর জানিয়াছি যেমন করিয়াই পাইয়াছি এই ওঁ শব্দে তাহা সমস্তই ব্যক্ত করে—এবং ব্যক্ত করিয়াও সেইখানেই রেখা টানিয়া দেয় না। সঙ্গীতের স্বর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ওঁ শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের ব্রহ্ম-ধ্যানের মধ্যে একটি অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়তা অবতারণা করিয়া থাকে। বাহ্য প্রতিমা-দ্বারা আমাদের মানস ভাবকে খর্ব্ব ও আবদ্ধ করে—কিন্তু এই ওঁ ধ্বনির দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

সেইজন্য উপনিষদ বলিয়াছেন—ওমিতি ব্রহ্ম। ওম্ বলিতে ব্রহ্ম বুঝায়। ওমিতীদং সর্ব্বং, এই যাহা কিছু সমস্তই ওঁ। ওঁ শব্দ সমস্তকেই সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থ-বন্ধনহীন কেবল একটি সুগম্ভীর ধ্বনিরূপে ওঁ শব্দ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার ওঁ শব্দের একটি অর্থেও আছে—সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয় দান করে অথচ কোন সীমায় বদ্ধ করে না।

আধুনিক সমস্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্য ভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলিয়া থাকি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সেইখানে ওঁ শব্দের প্রয়োগ। হাঁ শব্দ ওঁ শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। উপনিষদও বলিতেছেন ওমিত্যেদ অনুকৃতিহ্‌র্স্ম—ওঁ শব্দ অনুকৃতিবাচক, অর্থাৎ ইহা কর বলিলে, ওঁ অর্থাৎ হাঁ বলিয়া সেই আদেশের অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ওঁ স্বীকারোক্তি।

এই স্বীকারোক্তি ওঁ, ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক শব্দরূপে গণ্য হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যানের কেবল এইটুকু মাত্র অবলম্বন—ওঁ, তিনি হাঁ। ইংরাজ মনীষী কার্লাইলও তাঁহাকে Ever-lasting Yay অর্থাৎ শাশ্বত ওঁ বলিয়াছেন। এমন প্রবল পরিপূর্ণ কথা আর কিছুই নাই, তিনি হাঁ, ব্রহ্ম ওঁ।

আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি সেই বুঝিয়া আত্মার মহত্ব। কেহ জগতের মধ্যে একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেহ মানকে, কেহ খ্যাতিকে। আদিম আর্য্যগণ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে ওঁ বলিয়া স্বীকার করিতেন, সেই দেবতার অস্তিত্বই তাঁহাদের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হইত। উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রহ্মই একমাত্র ওঁ, তিনিই চিরন্তন হাঁ, তিনিই Everlasting Yay। আমাদের আত্মার মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশকালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ। এই মহান্ নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী যে হাঁ, ওঁ ধ্বনি ইঁহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ছিল না, কোন চিহ্ন ছিল না—কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ওঁ। এই ধ্বনির সহায়ে ঋষিগণ উপাসনানিশিত আত্মাকে একাগ্রগামী

শরের ন্যায় ব্রহ্মের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রহ্মবাদী সংসারীগণ বিশ্বজগতের যাহা কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ বলিয়া সাম সকল গীত হইতে থাকে। ওঁ আনন্দ-ধ্বনি। ওঁ সঙ্গীত। তদ্দ্বারা প্রেম উদ্বেলিত ও ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ওঁ আনন্দ।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওঁ আদেশবাচক। ওঁ বলিয়া ঋত্বিক আজ্ঞা প্রদান করেন। সমস্ত সংসারের উপর আমাদের সমস্ত কর্ম্মের উপর মহৎ আদেশরূপে নিত্যকাল ওঁ ধ্বনিত হইতেছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং জগৎকে অতিক্রম করিয়া যিনি সকল সত্যের পরম সত্য—আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি সকল আনন্দের পরমানন্দ, এবং আমাদের কর্মসংসারে তিনি সকল আদেশের পরমাদেশ। তিনি ওঁ।

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ মাঘ ১৩০৭)

জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক্, তাহারই জয় হইবে; আমরা—যাহারা ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—'মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী-সামানা'। তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে; আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট-ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে : পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও। তিনি কহিবেন : ওঁ ইতি ব্রহ্ম।

(নববর্ষ, ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩০৯)

আমাদের যে মুক্তি, সে স্বভাবের দ্বারা হলেই সত্য হয়, অভাবের দ্বারা হলে হয় না। পূর্ণতার দ্বারা হলেই তবে সে সার্থক হয়, শূন্যতার দ্বারা সে শূন্য ফলই লাভ করে।

অতএব যিনি মুক্তস্বরূপ সেই ব্রহ্মের দিকে লক্ষ্য করো। তিনি না-রূপেই মুক্ত নন তিনি হাঁ-রূপেই মুক্ত। তিনি ওঁ; অর্থাৎ তিনি হাঁ।

(শক্তি, শান্তিনিকেতন, ২৮ পৌষ ১৩১৫)

ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষ্য হল মুক্তি। বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য নির্বাণ অর্থাৎ বিলুপ্তি। বলা যেতে পারে, এ দুটো নামে ভিন্ন, তবে একই জিনিস। কিন্তু নামের মধ্য দিয়েই আমরা মনের বিভিন্ন ভঙ্গী ও সত্যের বিশেষ বিশেষ রূপের পরিচয় পাই। মুক্তি আমাদের মনকে আকর্ষণ করে সত্যের অস্তিত্বের দিকে আর নির্বাণ করে তার বিপরীত দিকে।

ওঁ—অর্থাৎ শাশ্বত হাঁ—বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয় নি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, নাস্তিবাদের পথে, অস্তিত্বকে ধ্বংস করেই আমরা স্বাভাবিকভাবে সেই সত্যে পৌঁছব। সেইজন্য তাঁর দুঃখবাদ দুঃখনিবৃত্তির উপরই জোর দেয়, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা আনন্দকেই লাভ করতে চায়। অবশ্য তার পরিপূরক হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণের তপশ্চর্যারও প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মসাধনায় ব্রহ্মের উপলব্ধি সতত অন্তরে জাগ্রত রাখতে হয়, কেবলমাত্র চরম প্রাপ্তিতে নয়।

অতএব দেখতে পাই, বৌদ্ধযুগের জীবনচর্যার শিক্ষার পদ্ধতি ছিল বৈদিকযুগ থেকে স্বতন্ত্র। বৈদিকযুগের শিক্ষা ছিল জীবনের আনন্দকে পূতপবিত্র করে তোলা আর বৌদ্ধযুগের শিক্ষা ছিল আনন্দকেই সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দেওয়া। চির-কৌমার্যগ্রহণ এবং আরো নানারকমে জীবনকে অঙ্গহীন করা বৌদ্ধধর্মের অস্বাভাবিক কঠোর তপশ্চর্যার ফলেই আসে। কিন্তু তপোবনের ব্রহ্মচারীর জীবন মানুষের সামাজিক জীবনের বিরোধী নয়, বরঞ্চ তার সঙ্গে সমন্বয়পূর্ণ। আমাদের দেশের তানপুরার মতো সংগীতের মূল সুরগুলিকে সে ধরে রাখে, অসংগতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। তপোবনের আদর্শ আত্মার পূর্ণাঙ্গ সংগীতেই বিশ্বাস করে। তাই আত্মনিগ্রহ নয়, নির্দিষ্ট পথে চালিত করাই ছিল তার লক্ষ্য।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
(শ্রীমতী মলিনা রায়, ৫ মার্চ ১৯২১)

আমাদের সমস্ত মঙ্গল-অনুষ্ঠানে গ্রহণ করবার মন্ত্র হচ্ছে ওঁ—অর্থাৎ, হাঁ! তাজমহল হচ্ছে সেই নিত্য-উচ্চারিত ওঁ—নিখিলের সেই গ্রহণমন্ত্র মূর্তিমান। সাজাহানের সিংহাসনে সেই মন্ত্র পড়া হয় নি—একদিন তার যতই শক্তি থাক্-না কেন—সে তো 'না' হয়ে কোথায় তলিয়ে গেল। তেমনি কত কত বড়ো-বড়ো-নাম-ধারী 'না'এর দল আজ দম্ভ ভরে বিলুপ্তির দিকে চলেছে, তাদের কামানগর্জিত ও বন্দী-দের-শৃঙ্খল-ঝংকৃত কলরবে কান বধির হয়ে গেল, কিন্তু তারা মায়া, তারা নিজেরই মৃত্যুর নৈবেদ্য নিয়ে কালরাত্রি-পারাবারের কালীঘাটে সব যাত্রা করে চলেছে। কিন্তু ওই সাজাহানের কন্যা জাহানারার একটি কান্নার গান? তকে নিয়ে আমরা বলেছি, ওঁ!

(সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, বৈশাখ ১৩৩০)

বিশ্ব বলছে, ওঁ; বলছে, হাঁ; বলছে, অয়মহং ভোঃ, এই-যে আমি।................. সত্তাকে সত্তা বলেই যেখানে মানি সেখানে তার মধ্যে আমি সেই খুশিকেই দেখি যে-খুশি আমার নিজের মধ্যে চরমরূপে রয়েছে।

(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ৭ই অক্টোবর ১৯২৪)

আমাদের শাস্ত্রে মন্ত্রের আদিতে ওঁ, অন্তেও ওঁ। এই শব্দটিকেই পূর্ণের বাণী বলি। এই বাণী সত্যের অয়মহং ভো—কালের শঙ্খকুহরে অসীমের নিঃশ্বাস।

(অরবিন্দ ঘোষ, ২৯ মে ১৯২৮)

প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। ১।১১।১

তবে কি এই কথা বলিয়া মনকে বুঝাইতে হইবে যে, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্য-আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাঁহাদের নিকট ভালমন্দ সুন্দর কুৎসিৎ অন্তর বাহিরের ভেদ একেবারে ঘুচিয়া গেছে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদেরই জন্য? তাই যদি হইবে তবে ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে কেন অনুশাসন করিতেছেন প্রজা-তন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ, সন্তানসূত্র ছেদন করিবে না, অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

..............শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, গৃহী ব্যক্তিকে কেবল ভক্তিতে নহে, জ্ঞানে, কেবল জ্ঞানে নহে, কর্ম্মে, হৃদয়ে মনে এবং চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে। অতএব সংসারের মধ্যে থাকিয়া আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিব, অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব করিব এবং আমাদের সমুদয় কর্ম্ম তাঁহার সম্মুখে কৃত এবং তাঁহার উদ্দেশে সমর্পিত হইবে।

(ঔপনিষদ ব্রহ্ম, রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।
ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। ১।১১।১

সত্য হইতে স্খলিত হইবে না, ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবে না, কল্যাণ হইতে স্খলিত হইবে না, মহত্ত্ব হইতে স্খলিত হইবে না। ইহা যাঁহার অনুশাসন তিনিই ওঁ।

(ব্রহ্মমন্ত্র, রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ মাঘ ১৩০৭)

অতিথিদেবো ভব। ১।১১।২

আমাদের শাস্ত্রে বলে, অতিথিদেবো ভব। কেননা আমার ভোগ সকলের ভোগ, এই কথাটা অতিথিকে দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে, তার ঐশ্বর্যের সংকোচ দূর হয়। ব্যক্তিগত মানবের ঘরে সর্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে আসে অতিথি, তার গৃহসীমাকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। না নিয়ে গেলে সেটা রাজপ্রাসাদের পক্ষেও দীনতা। এই আতিথ্যের মধ্যে আছে সোঽহংতত্ত্ব—অর্থাৎ, আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলে আছি যিনি আমার এবং আমার অতিরিক্ত।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

অতিথির মধ্যে আছেন দেবতা।

(আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ বৈশাখ ১৩৪৭)

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। ১।১১।৩

উপনিষদে অনুশাসন আছে : শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রদ্ধার সহিত দিবে, অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না। কারণ, শ্রদ্ধার সহিত না দিলে যথার্থ জিনিস দেওয়াই যায় না, বরঞ্চ এমন একটা জিনিস দেওয়া হয় যাহাতে গ্রহীতাকে হীন করা হয়।

(ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩০৯)

আমাদের উপনিষদে আছে, “শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্।” অশ্রদ্ধার সহিত দান করিলে দানের প্রকৃত ফল লাভ হয় না।

(পটলডাঙা মল্লিক বাড়িতে ছাত্রগণের সভায় সভাপতির অভিভাষণ,
১০ কার্তিক ১৩১২)

যা প্রাণের জিনিস তাকে প্রথার জিনিস করে তোলায় যে কত বড়ো লোকসান সে কথা তো প্রতিদিন মনে পড়ে না। কিন্তু, আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণাকে তো ফাঁকি দিয়ে সারি নে। অন্নজলকে তো সত্যকারই অন্নজলের মতো ব্যবহার করে থাকি। কেবল আমার ভিতরকার এই-যে মানুষটি ধনে যাকে ধনী করে না, খ্যাতি প্রতিপত্তি যার ললাটে কোনো চিহ্ন দিতে পারে না, সংসারের ছায়ারৌদ্রপাতে যার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নির্ভর করে না, সেই আমার অন্তরতম চিরকালের মানুষটিকে দিনের পর দিন বস্তু না দিয়ে কেবল নাম দিয়ে বঞ্চনা করি; তাকে আমার মন না দিয়ে কেবল মন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে থাকি। সে যা চায় তা নাকি সকলের চেয়ে বড়ো; এইজন্যে সকলের চেয়ে শূন্য দিয়ে তাকে থামিয়ে রেখে অন্য সমস্ত প্রয়োজন সারবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াই।

আমাদের এই বাইরের মানুষের এই সংসারের মানুষের সঙ্গে সেই আমাদের অন্তরের মানুষের একটা মস্ত তফাত হচ্ছে এই যে, এই বাইরের লোকটাকে আমরা আদর করে বা অবজ্ঞা করে উপহারই দিই আর ভিক্ষাই দিই-না কেন সে সেটা পায়, আর সত্যকার ইচ্ছার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে যা না দিই সে আমার সেই অন্তরের মানুষটির কাছে গিয়েও পৌঁছে না।

সেইজন্যে দানের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে ‘শ্রদ্ধয়া দেয়ম্’, শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। কেননা, মানুষের বাহিরে ভিতরে দুই বিভাগ আছে, একটা বিভাগে অর্থ এসে পড়ে, আর একটা বিভাগে শ্রদ্ধা গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্য শ্রদ্ধা যদি না দিই, শুধু টাকাই দিই, তা হলে মানুষের অন্তরাত্মাকে কিছুই দেওয়া হয় না, এমন-কি, তাকে অপমানই করা হয়। তেমন দান কখনোই সম্পূর্ণ দান নয়; সুতরাং সে দান সংসারের দান হতে পারে, কিন্তু সে দান ধর্মের দান হতেই পারে না। দান যে আমরা কেবল পরকেই দিয়ে থাকি তা তো নয়।

বস্তুত, প্রতিমুহূর্তেই আমরা নিজেকে নিজের কাছে দান করছি; সেই দানের দ্বারাই আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানেন, প্রতি মুহূর্তেই আমরা আপনার মধ্যে আপনাকে দাহ করছি; সেই দাহ করাটাই আমাদের প্রাণক্রিয়া। এমনি করে আপনার কাছে আপনাকে সেই আহুতি-দান যখনই বন্ধ হয়ে যাবে তখনই প্রাণের আগুন আর জ্বলবে না, জীবনের প্রকাশ শেষ হয়ে যাবে। এই রকম মননক্রিয়াতেও নানাপ্রকার ক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই চিন্তাকে জাগাতে হয়। এইজন্যে নিজের প্রকাশকে জাগ্রত রাখতে আমরা অহরহ আপনার মধ্যে আপনার একটি যজ্ঞ করে আপনাকে যত পারছি ততই দান করছি। সেই দানের সম্পূর্ণতার উপরই আমাদের প্রকাশের সম্পূর্ণতা।

বাতি আপনাকে আপনি যে পরিমাণ দান করবে সেই পরিমাণে তার আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে পরিমাণে নিজের প্রতি তার দানের উপকরণ বিশুদ্ধ হবে সেই পরিমাণে তার শিখা ধূমশূন্য হতে থাকবে। নিজের প্রকাশযজ্ঞে আমাদের যে নিরন্তর দান সে সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে।

সে দান তো আমাদের চলছেই; কিন্তু কী দান করছি এবং সেটা পৌঁছচ্ছে

কোন্‌খানে সে তো আমাদের দেখতে হবে। সারাদিন খেটেখুটে বাহিরের জিনিস কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা কিছু পাচ্ছি সে আমরা কার হাতে এনে জমা করছি? সে তো সমস্তই দেখছি বাইরেই এসে জমছে। টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সে তো এই বাইরের মানুষের।

কিন্তু, নিজেকে এই-যে আমরা দান করছি, এই-যে আমার চেষ্টা, এই-যে আমার সমস্তই, এ কি পূর্ণ দান হচ্ছে। শ্রদ্ধার দান হচ্ছে? ধর্মের দান হচ্ছে? এতে করে আমরা বাড়াচ্ছি, কিন্তু বড়ো হতে পারছি কি। এতে করে আমরা সুখ পাচ্ছি, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি নে; এতে করে তো আমাদের প্রকাশ পরিপূর্ণ হতে পারছে না। মানুষ বললে যতখানি বোঝায় ততখানি তো ব্যক্ত হয়ে উঠছে না।

কেন এমন হচ্ছে। কেন না, এই দানে মস্ত একটা অশ্রদ্ধা আছে। এই দানের দ্বারা আমরা নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধা করে চলেছি। আমরা নিজের কাছে যে অর্ঘ্য বহন করে আনছি তার দ্বারাই আমরা স্বীকার করছি যে, আমার মধ্যে বরণীয় কিছুই নেই। আমাদের যে আত্মপূজা সে একেবারেই দেবতার পূজা নয়, সে অপদেবতার পূজা, সে অত্যন্ত অবজ্ঞার পূজা। আমাদের যা অপবিত্র তাই দিয়েও আমরা নৈবেদ্যকে ভরিয়ে তুলছি।

নিজেকে যে লোক কেবলই ধনমান জোগাচ্ছে সে লোক নিজের সত্যকে কেবলই অবিশ্বাস করছে; সে আপনার অন্তরের মানুষকে কেবলই অপমান করছে; তাকে সে কিছুই দিচ্ছে না, কিছু দেবার যোগ্যই মনে করছে না। এমনি করে সে নিজেকে কেবল অর্থই দিচ্ছে, কিন্তু শ্রদ্ধা দিচ্ছে না—এবং 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্' এই উপদেশ বাণীটিকে সকলের চেয়ে ব্যর্থ করছে নিজের বেলাতেই।

(পিতার বোধ, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩১৮)

বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া যখন দেশে ফিরিতেছিলাম দুই জন মিশনারি আমার পাছু ধরিয়াছিল। তাহাদের মুখ হইতে আমার দেশের নিন্দায় সমুদ্রের হাওয়া পর্যন্ত দূষিয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা নিজের স্বার্থ ভুলিয়া আমার দেশের যে কত অবিশ্রাম উপকার করিতেছে তাহার লম্বা ফর্দ আমার কাছে দাখিল করিত। তাহাদের ফর্দটি জাল ফর্দ নয়, অঙ্কেও ভুল নাই। তাহারা সত্যই আমাদের উপকার করে কিন্তু সেটার মতো নিষ্ঠুর অন্যায় আমাদের প্রতি আর কিছুই হইতে পারে না। তার চেয়ে আমাদের পাড়ায় গুর্খা ফৌজ লাগাইয়া দেওয়াই ভালো। আমি এই কথা বলি, কর্ত্তব্যনীতি সেখানে কর্ত্তব্যের মধ্যেই বদ্ধ, অর্থাৎ যেখানে তাহা অ্যাব্‌সট্রাক্‌শন্‌, সেখানে সজীব প্রাণীর প্রতি তাহার প্রয়োগ অপরাধ। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ং। কেননা দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিলিলে তবেই তাহা সুন্দর ও সমগ্র হয়।

(কবির কৈফিয়ত, সাহিত্যের পথে, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)

শাস্ত্র বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'; যা আমাদের শ্রেষ্ঠ তাই দেওয়াই শ্রদ্ধার দান—সে না কুঁড়ির দান, না ঝরা ফুলের।

(পঞ্চাশোধর্বম্, সাহিত্যের পথে, ফাল্গুন ১৩৩৬)

সকলের চেয়ে বড়ো দান যে শ্রদ্ধাদান, তার থেকে কোনো মানুষকে তিনি

(বুদ্ধদেব) বঞ্চিত করেন নি। যে দয়াকে, যে দানকে তিনি ধর্ম বলেছেন সে কেবল দূরের থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে অর্থ দান নয়, সে দান আপনাকে দান—যে দানধর্ম্মে বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'।

(বুদ্ধদেব, বৈশাখী পূর্ণিমা, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২)

ভিয়া দেয়ম্। ১।১১।৩

নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমান, পুণ্যাভিমান, ধনাভিমান প্রবেশ ক'রে দানকে অপমানকর অধর্মে পরিণত করতে পারে এই ভয়ের কারণ আছে; এই জন্যে উপনিষদ্ বলেন: ভিয়া দেয়ম্। ভয় ক'রে দেবে। যে ধর্মকর্মের দ্বারা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার আশঙ্কা আছে তাকেই ভয় করতে হবে।

(বুদ্ধদেব, বৈশাখী পূর্ণিমা, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২)

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।
২।১।৩
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৭)

(রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় যখন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে মুণ্ডকোপনিষৎ-এর "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই মন্ত্রেরও আলোচনা করিয়াছেন—সেইজন্য উপরে এই দুইটি মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।)

মৃত্যুপীড়িত আত্মার সেই অমৃতস্বরূপ কে?—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি।

সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম, যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

অতএব, যখন আমরা যথার্থরূপে তাঁহাকে চাই তখন ব্রহ্ম বলিয়াই তাঁহাকে চাই। তিনি যদি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ না হইতেন তবে এই অসৎ সংসার, এই অন্ধকার হৃদয়, এই মৃত্যুবীজসংকুল সুখসম্পদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে চাহিতাম না। কেন তবে আমরা তর্ক করিয়া থাকি যে, আমরা অপূর্ণ জীব এবং তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, অতএব তাঁহাকে আমরা পাইতেই পারি না। এবং সেইজন্য অসত্য অজ্ঞান এবং অন্তবিশিষ্ট আকারকে আমরা কেন তাঁহার স্থানে আরোপ করি? আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই পূর্ণস্বরূপকে আমাদের একান্তই চাই, আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র আনন্দ একমাত্র মুক্তি। আমরা অপূর্ণ

বলিয়াই আমরা অপূর্ণের পূজা করিব না; অপূর্ণের উপরে আমাদের অমর আত্মার, আমাদের অনন্ত জীবনের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিব না; আমরা এই অসৎ, এই অন্ধকার, এই মর্ত্যবিষয়পুঞ্জের মধ্যস্থলে 'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা' সাধনা করিতে থাকিব যতদিন না বলিতে পারি—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

(নিরাকার উপাসনা, পরিশিষ্ট, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড, মাঘ ১৩০৫)

ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেরই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে, তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনা-জালদ্বারা বিজড়িত নহে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

তিনিই সত্য, নতুবা এ জগৎ সংসার কিছুই সত্য হইত না। তিনিই জ্ঞান, এই যাহা-কিছু তাহা তাঁহারই জ্ঞান, তিনি যাহা জানিতেছেন তাহাই আছে, তাহাই সত্য। তিনি অনন্ত। তিনি অনন্ত সত্য, তিনি অনন্ত জ্ঞান।

এই বিচিত্র জগৎসংসারকে উপনিষদ্ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ্ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্ত্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকল-প্রকার জটিলতা সকলপ্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে?

(ধর্মের সরল আদর্শ, ধর্ম, ১৩০৯)

তিনি (উপনিষদের ব্রহ্ম) অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র—তিনি অন্তরতম, তিনি সুদূরতম। তাঁহার সত্যে আমরা সত্য, তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত।

(ধর্মের সরল আদর্শ, ধর্ম, ১৩০৯)

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন?

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।

(উৎসব, ধর্ম, ১৩১২)

সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ। আমরা তো লৌকিক ব্যাপারেই দেখিয়াছি অপূর্ণ সত্য অপরিস্ফুট। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, যে-সত্য আমরা যত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিব, তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম। উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোন আনন্দ নাই, তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে, কারণ তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদ্-

পর্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে, তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরও পরিপূর্ণ—তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। তৃণের সত্য তাহার নিকট ক্ষুদ্র সত্য অস্ফুট সত্য নয় বলিয়াই সে তাহার আনন্দ তাহার প্রেম উদ্বোধিত করে। যে মানুষের প্রকাশ আমার নিকট ক্ষুদ্র, আমার নিকট অস্ফুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ণ। যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্যের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই—কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট যে তাহাদের মঙ্গল চিন্তায় তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ।

(উৎসব, ধর্ম ১৩১২)

আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে? প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে। জগৎপ্রকাশে কোথাও দারিদ্র্য নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকু মাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের ঝরণা আকাশময় ঝরিয়া পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে বর্ণে-তাপে-প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রয়োজন যতটুকু, ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—ইহা অজস্র। বসন্তকালে লতাগুল্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া ফুল ফুটিয়া পাতা গজাইয়া একেবারে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়, আম্রশাখায় মুকুল ভরিয়া উঠিয়া তাহার তলদেশে অনর্থক রাশি রাশি ঝরিয়া পড়ে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে মেঘের মুখে যে কত পরিবর্ত্তমান বিচিত্র রঙের পাগলামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার কোন প্রয়োজন দেখি না—ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রভাতে পাখিদের শতশত কণ্ঠ হইতে উদ্গিরিত সুরের উচ্ছ্বাসে অরুণগগনে যেন চারিদিক হইতে গানের হোরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অকৃপণ,—সৌন্দর্যে-সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার আর অন্ত পায় না।

(উৎসব, ধর্ম, ১৩১২)

সৌন্দর্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্যকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ—ইহা প্রেমের ভাষা। ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত—কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহুল্যদানই আমার নিকট হইতে বাহুল্য প্রতিদান গ্রহণ করে——সেই যে বাহুল্য প্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহুল্য প্রতিদানটুকু লইয়া ফুলেরই বা কী, আর কাহারই বা কী। কিন্তু একদিকে এই বাহুল্য সৌন্দর্য, আর একদিকে এই বাহুল্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যোৎসব—ইহাই আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গলীলা।

(উৎসব, ধর্ম, ১৩১২)

যিনি আনন্দের প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে

প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি—উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্ধি দ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এই দিনে সে অনুভব করিবে, সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন —ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।

(উৎসব, ধর্ম, ১৩১২)

যে আনন্দ অন্তরীক্ষে অন্তহীন জ্যোতিষ্কলোকের শিখায় শিখায় নিরন্তর আন্দোলিত, আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে দীপমালা জ্বালাইয়া আমরা কি সেই আনন্দের তরঙ্গে আমাদের আনন্দকে সচেতনভাবে মিলিত করিয়াছি? আমাদের এই সংগীত-ধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে—যেখানে বিশ্বভুবনের সমস্ত সুর তাহার আপাতপ্রতীয়মান সমস্ত বিরোধ-বিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে?

(উৎসব, ধর্ম, ১৩১২)

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্‌। তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনন্ত। এই অনন্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে তিনি আপনাতে আপনি বিরাজিত। সেখানে আমরা তাঁহাকে কোথায় পাইব। সেখান হইতে যে বাক্যমন নিবৃত্ত হইয়া আসে।

কিন্তু উপনিষদ্‌ এ-কথাও বলেন যে, এই সত্যং জ্ঞানমনন্তম্‌ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অগোচর নহেন। কিন্তু তিনি কই প্রকাশ পাইতেছেন। কোথায়?

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি যে রসস্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।

কোথায় প্রকাশমান?—এ প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? যাহা অপ্রকাশিত, তাহার সম্বন্ধেই প্রশ্ন চলিতে পারে, কিন্তু যাহা প্রকাশিত, তাহাকে "কোথায়" বলিয়া কে সন্ধান করিয়া বেড়ায়?

প্রকাশ কোন্‌খানে? এই যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই যে প্রকাশ। এই যে সম্মুখে, এই যে পার্শ্বে, এই যে অধোতে, এই যে ঊর্ধ্বে—এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ যে আমার ইন্দ্রিয়মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। এই তো প্রকাশ, এ-ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?

এই যে যাহাকে আমরা প্রকাশ বলিতেছি, এ কেমন করিয়া হইল? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অমৃতে। আর তো কোনো কারণ থাকিতেই পারে না। তিনি আনন্দিত, সমস্ত প্রকাশ এই কথাই বলিতেছে। যাহা-কিছু আছে, এ-সমস্তই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ সুতরাং ইহার কিছুই অপ্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার আনন্দকে কে আচ্ছন্ন করিবে? এমন মহান্ধকার কোথায় আছে? ইহার কণাটিকেও ধ্বংস করিতে পারে, এমন শক্তি কার। এমন মৃত্যু কোথায়? এ যে অমৃত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কই? এই যে দশদিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি তো লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই; সেখানে কী ঐশ্বর্য, কী সৌন্দর্য। সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন—লোকে-লোকান্তরে সে-দান আর ধারণ করিতে পারিতেছে না—যুগে-যুগান্তরে তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না। কে বলে, তাঁহাকে দেখা যায় না; কে বলে, তিনি শ্রবণের অতীত; কে বলে, তিনি ধরা দেন না। তিনিই যে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সহস্র চক্ষু থাকিলেও যে দেখিয়া শেষ করিতে পারিতাম না, সহস্র কর্ণ থাকিলেও শোনা ফুরাইত কবে। যদি ধরিতেই চাও, তবে বাহু কতদূর বিস্তার করিলে সে-ধরার অন্ত হইবে। এ যে আশ্চর্য। মানুষজন্ম লইয়া এই নীল আকাশের মধ্যে কী চোখই মেলিয়াছি। এ কী দেখাই দেখিলাম। দুটি কর্ণপুট দিয়া অনন্ত রহস্য লীলাময় স্বরের ধারা অহরহ পান করিয়া যে ফুরাইল না। সমস্ত শরীরটা যে আলোকের স্পর্শে বায়ুর স্পর্শে স্নেহের স্পর্শে প্রেমের স্পর্শে কল্যাণের স্পর্শে বিদ্যুৎতন্ত্রীখচিত অলৌকিক বীণার মতো বারংবার স্পন্দিত-ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে। ধন্য হইলাম, আমরা ধন্য হইলাম—এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম—পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য অপরিমেয় প্রাচুর্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে তৃণের সঙ্গে কীটপতঙ্গের সঙ্গে গ্রহতারা-সূর্যচন্দ্রের সঙ্গে আমরা ধন্য হইলাম।

(আনন্দরূপ, ধর্ম, ১০১৩)

ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, ক্ষুদ্র অহমিকা দূর করিয়া তোমার নিজের অন্তঃকরণকে একবার আনন্দে জাগাইয়া তোলো—তবেই আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, আনন্দরূপে অমৃতরূপে যিনি চতুর্দ্দিকেই প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আনন্দময়ের উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে। কোনো ভয় কোনো সংশয় কোনো দীনতা মনের মধ্যে রাখিয়ো না; আনন্দে প্রভাতে জাগ্রত হও, আনন্দে দিনের কর্ম করো, দিবাবসানে নিঃশব্দ স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আনন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া দাও, কোথাও যাইতে হইবে না, কোথাও খুঁজিতে হইবে না, সর্ব্বত্রই যে আনন্দরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই আনন্দরূপের মধ্যে তুমি আনন্দলাভ করিতে শিক্ষা করো—যাহা-কিছু তোমার সম্মুখে উপস্থিত, পূর্ণ আনন্দের সহিত তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার সাধনা করো—

> সম্পদে সংকটে থাকো কল্যাণে
> থাকো আনন্দে নিন্দা অপমানে।
> সবারে ক্ষমা করি থাকো আনন্দে
> চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরস পানে।

নিজের এই ক্ষুদ্র চোখের দীপ্তিটুকু যদি আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি, তবে আকাশ-ভরা আলো তো আর দেখিতে পাই না; তেমনি আমাদের ছোটো মনের ছোটো ছোটো বিষাদ-অবসাদ-নৈরাশ্য-নিরানন্দ আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয়—আনন্দরূপমমৃতং

আমরা আর দেখিতে পাই না—নিজের কালিমাদ্বারা আমরা একেবারে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি, চারিদিকে কেবল ভাঙাচোরা কেবল অসম্পূর্ণতা কেবল অভাব দেখি;—কানা যেমন মধ্যাহ্নের আলোকে কালো দেখে, আমাদেরও সেই দশা ঘটে। একবার চোখ যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের মধ্যেও যদি সেই আনন্দ সপ্তকে-সপ্তকে বাজিয়া উঠে, যে-আনন্দে জগদ্ব্যাপী আনন্দের সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে সেখানে তাঁহাকেই দেখি,—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। বধে-বন্ধনে দুঃখে-দারিদ্র্যে অপকারে-অপমানেও তাঁহাকেই দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তখন মুহূর্তেই বুঝিতে পারি, প্রকাশমাত্রই তাঁহারই প্রকাশ—এবং প্রকাশ-মাত্রই আনন্দরূপমমৃতম্। তখন বুঝিতে পারি, যে আনন্দে আকাশে-আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ—সেই আনন্দে আমি কাহারও চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নই, আমি সকলেরই সমান, আমি জগতের সঙ্গে এক। সেই আনন্দে আমার ভয় নাই ক্ষতি নাই অসম্মান নাই। আমি আছি, কারণ আমাতে পরি-পূর্ণ আনন্দ আছেন, কে তাহার কণামাত্রও অপলাপ করিতে পারে? এমন কী ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে তাহার লেশমাত্র ক্ষুণ্নতা হইবে? তাই আজ আনন্দের দিনে, আজ উৎসবের প্রভাতে আমরা যেন সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারি—এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ—এবং প্রার্থনা করি, যেন সেই আনন্দের এমন একটু অংশ লাভ করিতে পারি, যাহাতে সমস্ত জীবনের প্রত্যেক দিনে সর্বত্র তাঁহাকেই স্বীকার করি, ভয়কে নয়, দ্বিধাকে নয়, শোককে নয়—তাঁহাকেই স্বীকার করি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তিনি প্রচুররূপে আপনাকে দান করিতেছেন, আমরা প্রচুররূপে গ্রহণ করিতে পারিব না কেন? তিনি প্রচুর ঐশ্বর্যে এই যে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, আমরা সংকুচিত হইয়া দীন হইয়া অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেই অবারিত ঐশ্বর্যের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? হাত বাড়াও। বক্ষকে বিস্তৃত করিয়া দাও। দুই হাত ভরিয়া চোখ ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া অবাধ আনন্দে সমস্ত গ্রহণ করো। তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি যে সর্বত্র হইতেই তোমাকে দেখিতেছে—তুমি একবার তোমার দুই চোখের সমস্ত জড়তা সমস্ত বিষাদ মুছিয়া ফেলো—তোমার দুই চক্ষুকে প্রসন্ন করিয়া চাহিয়া দেখো, তখনই দেখিবে, তাঁহারই প্রসন্নসুন্দর কল্যাণমুখ তোমাকে অনন্তকাল রক্ষা করিতেছে—সে কী প্রকাশ, সে কী সৌন্দর্য, সে কী প্রেম, সে কী আনন্দ-রূপমমৃতম্। যেখানে দানের লেশমাত্র কৃপণতা নাই সেখানে গ্রহণে এমন কৃপণতা কেন? ওরে মূঢ়, ওরে অবিশ্বাসী, তোর সম্মুখেই সেই আনন্দমুখের দিকে তাকাইয়া সমস্ত প্রাণমনকে প্রসারিত করিয়া পাতিয়া ধর্—বলের সহিত বল্—'অল্প নহে, আমার সবই চাই। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। তুমি যতটা দিতেছ, আমি সমস্তটাই লইব। আমি ছোটোটার জন্য বড়োটাকে বাদ দিব না, আমি একটার জন্য অন্যটা হইতে বঞ্চিত হইব না, আমি এমন সহজ ধন লইব, যাহা দশদিক ছাপাইয়া আছে, যাহার অর্জনে আনন্দ, রক্ষণে আনন্দ, যাহার বিনাশ নাই, যাহার জন্য জগতে কাহারও সঙ্গে বিরোধ করিতে হয় না। তোমার যে প্রেম নানা দেশে, নানা কালে, নানা রসে, নানা ঘটনায় অবিশ্রাম আনন্দে-অমৃতে বিকাশিত, কোথাও যাহার প্রকাশের অন্ত নাই, তাহাকেই একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন প্রেম তোমার প্রসাদে আমার অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠুক।

যেখানে সমস্তই দেওয়া হইতেছে, সেখানে কেবল পাওয়ার ক্ষমতা হারাইয়া যেন

কাঙালের মতো না ঘুরিয়া বেড়াই। যেখানে আনন্দরূপমমৃতং তুমি আপনাকে স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছ, সেখানে চিরজীবন আমার এমন বিভ্রান্তি না ঘটে যে, সর্বদাই সর্বত্রই তোমাকে দেখিয়াও না দেখি এবং কেবল শোকদুঃখ শ্রান্তিজরা বিচ্ছেদ-ক্ষতি লইয়া হাহাকার করিতে করিতে সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাই।

(আনন্দরূপ, ধর্ম, ১৩১৩)

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালু-তটের নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্য দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে—তখন কী বলিব, এ কী হইতেছে। নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই তো সব বলা হইল না—এমন কি, কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য শক্তি ও আশ্চর্য সৌন্দর্যের কী বলা হইল। সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে সেই অপরূপ রূপকে, সেই ধ্বনিহীন সংগীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। এ তো কেবলমাত্র জল ও মাটি—"মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ"—কিন্তু যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কী। তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে কশাহত কালোঘোড়ার মসৃণ চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে পরপারের স্তব্ধ তরু-শ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার পর সেই জলস্থল—আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধুলো এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ যে অপরূপের দর্শন। এই তো রস। ইহা তো শুধু বীণার কাঠ ও তার নহে ইহাই বীণার সংগীত। এই সংগীতেই আনন্দের পরিচয় সেই আনন্দরূপমমৃতম্।

আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে কতদূরেই ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্য সাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।

(দুঃখ, ধর্ম, ১৩১৪)

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্যসহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।

(দুঃখ, ধর্ম, ১৩১৪)

আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে তুমি স্পষ্ট করে দেখো, তুমি নির্মল হয়ে দেখো, পদ্ম যে-রকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো। কাকে দেখবে। তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না

তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারিদিকেই রূপ—কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাই নে, ভেবেও পাই নে। রূপের ঝরণা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনন্তরূপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। আজ যা দেখছি, এই যে চারিদিকে আমার যে-কেউ আছে যা-কিছু আছে এদের একদিন যে কেমন করে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারিনে —কিন্তু এটুকু জানি আমাদের এই চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আনছে তা এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয়নি। এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দরূপ সে-দেখা এখনও আমাদের দেখা হয়নি—মানুষের মুখে যে তাঁর অমৃতরূপ সে-দেখার এখনও অনেক বাকি—"আনন্দ-রূপমমৃতং" এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেইদিনেই তারা সার্থক হবে। সেইদিনই তাঁর সেই পরমসুন্দর প্রসন্নমুখ তাঁর দক্ষিণং মুখং একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাবে। তখনই সর্বত্রই নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে,—তখন ওষধিবনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না—তখন আমরা সত্য করে বলতে পারব, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

(দেখা, শান্তিনিকেতন, ৪ঠা পৌষ ১৩১৫)

এই বিশ্বসংসারে এমন কিছু নেই, একটি কণাও নেই যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন কিন্তু তবু তিনি দ্রষ্টা—কিছুর দ্বারা তিনি অধিকৃত নন। এই জগৎ তাঁরই বটে, তিনি এর সর্বত্রই আছেন বটে কিন্তু তবু তিনি এর অতীত হয়ে আছেন।

আমাদের অন্তরাত্মাকেও সেই রকম করেই জানবে—সংসার তাঁর, শরীর তাঁর, বুদ্ধি তাঁর, হৃদয় তাঁর। এই সংসারে, শরীরে, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়েই আছেন কিন্তু তবু আমাদের অন্তরাত্মা এই সংসার, শরীর, বুদ্ধি ও হৃদয়ের অতীত। তিনি দ্রষ্টা। এই যে-আমি সংসারে জন্মলাভ করে বিশেষ নাম ধরে নানা সুখদুঃখ ভোগ করছে এই তাঁর বহিরংশকে তিনি সাক্ষীরূপেই দেখে যাচ্ছেন। আমরা যখন আত্মবিৎ হই, এই অন্তরাত্মাকে যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন আমরা নিজের নিত্য স্বরূপকে নিশ্চয় জেনে সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে থেকেও সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে যাই, নিজের জীবনকে সংসারকে দ্রষ্টারূপে জানি।

এমনি করে সমস্ত কর্ম থেকে, সংসার থেকে, সমস্ত ক্ষোভ থেকে বিবিক্ত করে আত্মাকে যখন বিশুদ্ধ স্বরূপে জানি তখন দেখতে পাই তা শূন্য নয়, তখন নিজের অন্তরে সেই নির্মল নিস্তব্ধ পরম ব্যোমকে সেই চিদাকাশকে দেখি যেখানে—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নিহিতং গুহায়াং। নিজের মধ্যে সেই আশ্চর্য জ্যোতির্ময় পরম কোষকে জানতে পারি যেখানে সেই অতি শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি বিরাজমান।

(দ্রষ্টা, শান্তিনিকেতন, ৬ ফাল্গুন ১৩১৫)

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওয়া পরিসমাপ্ত হয়ে আছে। আমরা যেমন যেমন বুদ্ধিতে হৃদয়ে উপলব্ধি করছি তেমনি তেমনি তাঁকে পাচ্ছি—এ হতেই পারে না। অর্থাৎ যেটা ছিল না সেইটেকে আমরা গড়ে তুলছি। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা আমাদের নিজের এই ক্ষুদ্র হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টি করছি এ ঠিক নয়। এই সম্বন্ধ যদি আমাদেরই দ্বারা গড়া হয় তবে তার উপরে আস্থা রাখা চলে না, তবে সে আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। আমাদের মধ্যেই একটি নিত্যধাম আছে। সেখানে দেশকালের রাজত্ব নয়, সেখানে ক্রমশ সৃষ্টির পালা নেই। সেই অন্তরাত্মার নিত্যধামে পরমাত্মার পূর্ণ আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হয়েই আছে। তাই উপনিষৎ বলছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্বানি কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতো।

সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যোম যে পরম ব্যোম যে চিদাকাশ অন্তরাকাশ সেইখানে আত্মার মধ্যে যিনি সত্যজ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে গভীরভাবে অবস্থিত জানেন তাঁর সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন এ কথা বলবার কোনো মানে নেই। তিনি আমাদেরই অন্তরাকাশে আমাদেরই অন্তরাত্মায় সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে সুগভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইটি ঠিকমতো জানলে বাসনায় আমাদের আর বৃথা ঘুরিয়ে মারে না পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে আমরা স্থির হতে পারি।

(পরিণয়, শান্তিনিকেতন, ৯ ফাল্গুন ১৩১৫)

এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানারকম করে পাচ্ছি—সুখেদুঃখে, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকান্তরে। বধূ যখন সেই কথাটা ভালো করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না—সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং হয়ে অন্তরাত্মাকে চিরদিনের মতো গ্রহণ করে আছেন, সংসারে তাঁরই আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি—সংসারে তাঁরই প্রেমের লীলা। এইখানেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের চিরযোগ —আনন্দের অমৃতের যোগ। এইখানেই আমাদের সেই বরকে, সেই চিরপ্রাপ্তকে, সেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্যে দিয়ে, পাওয়া-না-পাওয়ার বহুতর ব্যবধান-পরম্পরার ভিতর দিয়ে নানারকমে পাচ্ছি;—যাঁকে পেয়েছি, তাঁকেই আবার হারিয়ে হারিয়ে পাচ্ছি, তাঁকেই নানা রসে পাচ্ছি। যে বধূর মূঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে, এই রস যে বুঝেছে, সেই আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে দেখেনি—বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে সে যেখানে তার রাণীর পদ সেখানে দাসী হয়ে থাকে। ভয়ে মরে, দুঃখে কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

দৌর্ভিক্ষ্যাং যাতি দৌর্ভিক্ষ্যং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ম্।

(পরিণয়, শান্তিনিকেতন, ৯ ফাল্গুন ১৩১৫)

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। চিত্ত যখন সেই বিষয়ের ভিতরে

বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে তখন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তি বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দরূপে সর্ব্বত্রই প্রকাশ পায়। তখন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—এই মন্ত্রের অর্থ বুঝতে পারি। যা-কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সমস্তই সেই আনন্দরূপ সেই অমৃতরূপ। কোনো বস্তুই তখন আমি প্রকাশ হচ্ছি বলে আর অহংকার করে না প্রকাশ হচ্ছেন কেবল আনন্দ কেবল আনন্দ। সেই প্রকাশের মৃত্যু নেই। মৃত্যু অন্য সমস্তের কিন্তু সেই প্রকাশই অমৃত।

(বৈরাগ্য, শান্তিনিকেতন, ১৫ ফাল্গুন ১৩১৫)

বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি কেবল যে সত্যের সত্য ও মঙ্গলের মঙ্গলরূপে আছে তা নয় সেই শক্তি অপরিমেয় আনন্দরূপে বিরাজ করছে। এই বিশ্বের সমগ্রতাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে এবং প্রেমের দ্বারা আলিঙ্গন করে রয়েছেন। তাঁর সেই জ্ঞান এবং সেই প্রেম চিরনির্ঝরধারারূপে জীবাত্মার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কোনোদিন সে আর নিঃশেষ হল না।

এইজন্যেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে মিলন, সে জ্ঞান প্রেম কর্মের মিলন। সেই মিলনই আনন্দের মিলন। সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলতে গেলে সম্পূর্ণতার দ্বারাই মিলতে হবে—তবেই আমাদের যা কিছু আছে সমস্তই চরিতার্থ হবে।

(সমগ্র এক, শান্তিনিকেতন, ১৯ চৈত্র ১৩১৫)

মনটিকে অনন্তের ধারণায় নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে আপনিই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—মন্ত্রসাধন ছাড়া তার অন্য কোনো পথ আমি ত জানি নে। যখন একটু অবকাশ পাবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—শান্তম্ শিবমদ্বৈতং এই মন্ত্রটাকে মনের একেবারে তলা পর্যন্ত গ্রহণ করবার চেষ্টা কোরো—ঐ কথাগুলো যেন তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার নাড়ির মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে।

(চিঠিপত্র, সপ্তম খণ্ড, ৯ ফাল্গুন ১৩১৭)

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই কথাই সত্য, এবং এই সত্যেই আমি সত্য; ধনজন-মানের দ্বারা আমি সত্য নই। আমি সত্যলোকে জ্ঞানলোকে বাস করি, আমি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত। আমার প্রতিদিনের ব্যবহারে আমি এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন এখনও করতে পারছি নে; তবু মানুষকে এক দিকে আকাশে মাথা তুলে এবং এক দিকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলতে হবে যে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই কথাই সত্য। এই সত্য, এই সত্য, এই সত্য—প্রতিদিন বলতে হবে; বিমুখ মনকেও বলাতে হবে; ক্ষীণ কণ্ঠকেও উচ্চারণ করাতে হবে। নিয়ত বলতে বলতে আমরা যে সত্যলোকে বাস করছি এই বোধটি ক্রমশই আমাদের কাছে সহজ হয়ে আসবে। তখন অর্ধচেতন অবস্থায় দিন কাটবে না, তখন বারবার ধুলোর উপর পড়ে পড়ে যাব না, তখন আলোর দিকে আকাশের দিকে মাথা তুলে চলতে শিখব; তখন বাইরের সমস্ত বস্তুকেই আমার আত্মার চেয়ে বড়ো করে জানব না, এবং প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনাকেই প্রকৃত আত্মপরিচয় বলে মনে করব না।

ব্রহ্মকে সহজ করে জানবার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি; সেই শক্তি আমাদের আছে; জানতে পারছি নে বলে সে শক্তিকে কখনোই অস্বীকার করব না। বারবার তাঁকে ডাকতে হবে, বারবার তাঁকে বলতে হবে—এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি। এই

তুমি আমার সম্মুখেই, এই তুমি আমার অন্তরেই। এই তুমি আমার প্রতিমুহূর্তে, এই তুমি আমার অনন্ত কালে। বলতে বলতে তার নামে আমার সমস্ত শরীর বাজতে থাকবে, আমার মন বাজতে থাকবে, আমার বাহির বাজতে থাকবে, আমার সংসার বাজতে থাকবে। আমার চিত্ত বলবে সত্যং, আমার বিশ্বচরাচর বলবে সত্যং। ক্রমে আমার প্রতিদিনের প্রত্যেক কর্ম বলতে থাকবে সত্যং। বেহালা যন্ত্র যতই পুরাতন হয় ততই তার মূল্য বেশি হয় তার কারণ, অনেকদিন থেকে সুর বাজতে বাজতে বেহালার কাষ্ঠ ফলকের পরমাণুগুলি সুরের ছন্দে ছন্দে সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন সুরকে আর সে বাধা দেয় না। সেই রকম আমরা প্রতিদিন তাঁকে যতই ডাকতে থাকি ততই আমাদের শরীর মনের সমস্ত অণুপরমাণু তাঁর সত্য নামে এমন সত্য হয়ে উঠতে থাকে যে বাজতে আর দেরি হয় না, কোথাও কিছুমাত্র আর বাধা দেয় না।

এই সত্যনাম মানুষের সমস্ত শরীরে মনে, মানুষের সমস্ত সংসারে, সমস্ত কর্মে, একতান আশ্চর্য স্বরসম্মিলনে বিচিত্র হয়ে বেজে উঠবে বলে বিশ্বমহাসভার সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী একাগ্রভাবে অপেক্ষা করে রয়েছে। সমস্ত গ্রহনক্ষত্র. সমস্ত উদ্ভিদ্ পশু-পক্ষী মানুষের লোকালয়ের দিকে কান পেতে রয়েছে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের চিত্ত দিয়ে তাঁর অমৃতরস আস্বাদন করে মানুষের কণ্ঠে তাঁকে সমস্ত আকাশে ঘোষণা করে দেব এরই জন্যে বিশ্বপ্রকৃতি যুগযুগান্তর ধরে তার সভা রচনা করছে। বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণু এই সুরের স্পন্দনে পুলকিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। এখনই তোমরা জেগে ওঠো, এখনই তোমরা তাঁকে ডাকো—এই বনের গাছপালার মধ্যে তার মাধুর্য শিউরে উঠতে থাকবে, এই তোমাদের সামনেকার পৃথিবীর মাটির মধ্যে আনন্দ সঞ্চারিত হতে থাকবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকা-গৃহে অনেকদিন ধরে চন্দ্র সূর্য তারার মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ। নিজের উদরপূরণ এবং স্বার্থসাধনের জন্য নয়। এই কথা প্রত্যহ মনে রেখে নিখিল জগতের সাধনাকে আমরা আপনার সাধনা করে নেব। আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখব, জানব, সত্যে সঞ্চরণ করব এবং অসঙ্কোচে ঘোষণা করব : তুমিই সত্য।

(সত্য হওয়া, শান্তিনিকেতন, পৌষ ১৩১৯)

এই জগতে কেবল আমরা যা চোখে দেখছি কানে শুনছি তাতেই আমাদের চরম তৃপ্তি হচ্ছে না। আমরা কাকে দেখতে চাচ্ছি একেবারে সমস্ত মন সমস্ত হৃদয় মেলে দিয়ে? আমাদের মনে হচ্ছে যেন আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়ে, আমাদের যা-কিছু আছে তার সমস্তকে দিয়ে, যেন আমরা কাকে দেখতে পাব। আমাদের সেই সমস্তটিকে এখনও মেলা হয়নি—আমাদের চক্ষু মন হৃদয় সমস্তকে একটি উন্মীলিত শতদলের মতো একেবারে এক করে খুলে দেওয়া হয়নি। সেইজন্যে হাজার হাজার বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে একটার পর আর-একটাকে দেখে চলেছি, কিন্তু যাকে নিয়ে এই সমস্ত বস্তুই বাস্তব সেই অখণ্ড সত্যকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি নে।

কিন্তু, জগতে কেবল আমরা বস্তুকে দেখব না, সত্যকে দেখব, এই একটি নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে গভীর করে জাগছে। এই যেমন মাটি জল

আলো আমরা চোখ মেলে সহজে দেখছি তেমনি এই সমস্ত দেখার মধ্যে এমনি সহজেই সত্যকে দেখব, এই ইচ্ছা আমাদের সকল ইচ্ছার মূলে নিত্য নিয়ত রয়েছে।

শাবক পাখির যখন চোখ ফোটে নি, যখন আলো যে কী সে জানেও না, তখন তার প্রাণের মূলে সেই আলো দেখবার বাসনা নিহিত হয়ে কাজ করছে। যতক্ষণ সে আলো দেখে নি ততক্ষণ সে জগৎকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটু একটু করে জানছে; সমস্তকে এক মুহূর্তে এক আলোতে একযোগে জানা যে কাকে বলে তা সে বোঝেও না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই বিশ্বের জ্যোতিতেই যে তার চোখের জ্যোতির সার্থকতা এই তত্ত্বটি তার অন্ধতার অন্ধকারে তার মুদ্রিত চোখের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

তেমনি আমার মধ্যে যে এক সত্য আছে যাকে অবলম্বন করে আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা পরস্পর গ্রথিত হয়ে একটি অর্থ লাভ করে, সেই আমার মধ্যেকার সত্য বিশ্বের সত্যকে আপনার চরম সত্য বলে সর্বত্র অতি সহজে উপলব্ধি করবে, এই আকাঙ্ক্ষাটি তার মধ্যে অহরহ গূঢ়ভাবে রয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষাটির গভীর ক্রিয়া-ফলে আমাদের আত্মার মুদ্রিত চোখ একদিন ফুটবে; সেদিন আমরা যেদিকে চাব কেবল খণ্ড বস্তুকে দেখব না, অখণ্ড সত্যকে দেখব।

যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকেই সকলের চেয়ে সহজে দেখা এই হচ্ছে আমাদের সকল দেখার চরম সাধনা। সেই দেখাটি খুলবে, সেই চোখটি ফুটবে, এইজন্যেই তো রোজ আমরা দুবেলা তাঁর নাম করছি, তাঁকে প্রণাম করছি। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, তাঁর দিকে মুখ তুলতে তুলতে, ভিতরের সেই শক্তি ক্রমে জাগ্রত হবে, বাধা কেটে যেতে থাকবে, আত্মার চোখ খুলে যাবে। যেমনি খুলে যাবে অমনি আর তর্ক নয়, যুক্তি নয়, কিছু নয়—অমনি সহজে দেখা, অমনি আমার মনের আনন্দের সংগে সেই আকাশ-ভরা আনন্দের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকা, অমনি আমার সমস্ত শরীরে তাঁর স্পর্শ, সমস্ত মনে তাঁর অনুভূতি। অমনি তখনই অতি সহজে উপলব্ধি যে, তাঁরই আনন্দে আলোক আমার চোখের তারায় আলো হয়ে নাচছে, তাঁরই আনন্দে বাতাস আমার দেহের মধ্যে প্রাণ হয়ে বয়ে যাচ্ছে। অমনি জানতে পারা যায় যে, এই পৃথিবীর মাটি আমাকে ধরে আছে এ কথাটি সত্য নয়, তিনি আমাকে ধরে আছেন; এই সংসার আমার আশ্রয় এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমার আশ্রয়। তখন এ কথা বুঝতে কিছু বিলম্ব হবে না যে, আলোক আছে বলে দেখছি তা নয়, তিনি আমার অন্তরে বাহিরে সত্য হয়ে আছেন বলেই সমস্ত জিনিসের সংগে আমার দেখার যোগ হচ্ছে তাঁর শক্তিতেই তাঁকে দেখছি; তাঁরই ধী দিয়ে তাঁকে ধ্যান করছি; তাঁরই সুরে আমার কণ্ঠ তাঁরই নাম করছে; তাঁরই আনন্দে আমি তাঁর স্মরণে আনন্দ পাচ্ছি।

তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা জান বা না জান তোমাদের গভীর আত্মার পরম চাওয়ার ধন হচ্ছেন তিনি। আমাদের এই আমি সেই পরম আমির মুখোমুখি হয়ে না বসতে পারলে কখনোই তার প্রেম চরিতার্থ হবে না। আর-সমস্তকে সে ধরছে ছাড়ছে হারাচ্ছে; তাই সে এমন একটি আমিকে আপনার প্রত্যক্ষ বোধে চাচ্ছে যার মধ্যে সে চিরন্তনরূপে সম্পূর্ণরূপে আছে; অন্য জিনিসের মতো যাকে ধরতে হয় না, ছুঁতে হয় না, রাখতে হয় না। আমাদের এই ভিতরকার একলা আমি সেই-যে তার পরম সাথিকে সাক্ষাৎ করে জানতে চায় তার কান্না কি শুনতে পাচ্ছ না। তাকে আর তুমি পদে পদে ব্যর্থ করো না, তার কান্না থামাও। তোমার আপনাকে তুমি আপনি সার্থক করবার জন্য এস এস, প্রতিদিন সাধনায় বসো। সকালে ঘুম ভেঙেই প্রথম কথা যেন মনে পড়ে তিনি আছেন, আমি তাঁর মধ্যে আছি। যদি অর্ধরাত্রে জেগে ওঠ তবে

একবার চোখ চেয়ে দেখে মনকে এই কথাটি বলিয়ে নিয়ো যে, তিনি তাঁর সমস্ত লোকলোকান্তরকে নিয়ে অন্ধকারকে পরিপূর্ণ করে নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আমি তাঁর মধ্যেই আছি। মধ্যাহ্নে কাজ যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে তোমাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে তখন মুহূর্ত কালের জন্যে আপনাকে থামিয়ে এই কথাটি বলো, তুমি আছ, আমি তোমার মধ্যে আছি। এমনি করেই সকল সময়ে সকল দেখার মধ্যে সত্যকে দেখা সহজ হয়ে যাবে। প্রতিদিন উপাসনায় যখন তাঁর কাছে বসবে মনকে বিমুখ হতে দিয়ো না। তিনি আছেন, তাঁরই সামনে এসে বসেছি, এই সহজ কথাটি যেন এক মুহূর্তেই মন সহজ করে বলতে পারে; যেন এক নিমেষেই একেবারে তোমার মাথা তাঁর পায়ের কাছে এসে ঠেকে। প্রথম কিছুদিন মন চঞ্চল হতে পারে; কিন্তু প্রতিদিন বসতে বসতে ক্রমেই বসা সত্য হয়ে উঠবে, ক্রমেই তাঁর কাছে পেঁছিতে আর দেরি হবে না।

(সত্যকে দেখা, শান্তিনিকেতন, মাঘ ১৩১৯)

আমাদের লৌকিক বন্ধুকে আমরা অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করছি বটে, তবু সীমার মধ্যেই তার প্রকাশ; নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই থাকত না। অতএব, অসীম ব্রহ্মকে আমাদের নিজের উপকরণ দিয়ে নিজের কল্পনা দিয়ে আগে নিজের মতো গড়ে নিতে হবে, তার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলতে পারে—এমন কথা বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু, আমার বন্ধুকে যেমন আমার নিজের হাতে গড়তে হয়নি এবং যদি গড়তে হত তাহলে কখনো তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না—বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমার চেষ্টা আমার কল্পনা নিরপেক্ষ—তেমনি অনন্ত স্বরূপের প্রকাশও তো আমার সংগ্রহ-করা উপকরণের অপেক্ষা করেনি; তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করছেন। যখনই তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন তখনই তিনি আপনাকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েছেন, তাঁকে রচনা করবার বরাত তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ-আভা তো আমারই, বনের শ্যামল শোভা তো আমারই—ফুল যে ফুটেছে সে কার কাছে ফুটেছে। ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সংগীত উঠেছে সে সংগীত কার জন্যে। আর, এই তো রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর-দক্ষিণ-হস্ত-ধরা বন্ধু, এই তো ঘরে বাইরে যাদের ভালোবেসেছি সেই আমার প্রিয়জন; এদের মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্ছে, এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতের পাতা আসন। এই আকাশে নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর বিচিত্র আল্‌পনা-আঁকা বরণবেদিটির উপরে আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করছেন।

এই সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে, অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্‌ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন্‌ দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব। সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির ভরে দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েছেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা? তাঁরই এই আপন আনন্দ-নিকেতনের প্রাঙ্গণে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে অহোরাত্র খেলা করলুম, তবু এইখানে এই সমস্তর মাঝখানে আমাদের হৃদয় যদি জাগল না, আমরা তাঁকে যদি ভালোবাসতে না পারলুম, তবে জগৎজোড়া এই আয়োজনের দরকার কী ছিল। তবে কেন এই

আকাশের নীলিমা, অমারাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই-সমস্ত তারার চুমকি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিণে হাওয়াকে উতলা করে তোলে। তবে তো বলতে হয় সৃষ্টি বৃথা হয়েছে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বলতে হয় যেখানে তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচে না; মা যে অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, আর ধুলোবালি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজে রচনা করেছে তাইতে তার পেট ভরবে।

না, এ কেবল সেই-সকল দুর্বল উদাসীনদের কথা যারা পথে চলবে না এবং দূরে বসে বসে বলবে পথে চলাই যায় না। একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা আবৃত্তি করে পড়ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কী বলেছে, তার থেকে তুমি কী বুঝলে। সে বললে, সে কথা তো আমাদের মাষ্টার-মশায় বলে দেয়নি। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেছে যে কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাষ্টারমশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে, কেবল এই কথাটি বোঝায়নি যে, রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয়, মাষ্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর-একটা কথা বসানো, 'সুশীতল' শব্দের জায়গায় 'সুস্নিগ্ধ' শব্দ প্রয়োগ করা। এ পর্যন্ত মাষ্টার তাকে ভরসা দেয়নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেছে। যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানেও বুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয়নি। এইজন্যে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না। সেও বলে আমি বুঝিনে, আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ শহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েছে সেখানে ভূগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'নদী জিনিসটা কী—তুমি কখনো কি দেখেছ', সে বললে, 'না'। ভূগোলের নদী জিনিসটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেছে; এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয়নি যে, যে নদী দুইবেলা সে চক্ষে দেখেছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে, সেই নদীই তার ভূগোল বিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এক্‌জামিন-পাশের নদী।

তেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাষ্টারমশায়রা কোনোমতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয় না যে, অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এইজন্যে অনন্তস্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর ভরে পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারি নি, দেখতে পেলুম না। ওরে, বোঝবার আছে কী? এই-যে এষঃ, এই-যে এই। এই-যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই-যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয় বীণায় তাঁর হাত পড়ছে, এই-যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রং ধরে উঠেছে, কত মধু ভরে উঠেছে; এই-যে দুঃখরূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে পরম কল্যাণ আমাদের জীবনের সিংহদ্বারে এসে আঘাত করছেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠছে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; আর ওই-যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর পন্থায় যাত্রা করেছে, তাঁর বিদ্যুৎশিখাময়ী কষা মাঝে মাঝে আকাশে ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠছে—এই তো এষঃ, এই তো এই। সেই এইকে সমস্ত জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতিদিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি

এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে নিজের কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি—সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, সেই শান্তং শিবমদ্বৈতং, সেই কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, সেই-যে এক অনেকের প্রয়োজন গভীরভাবে পূর্ণ করছেন, সেই-যে অন্তহীন জগতের আদি-অন্তে পরিব্যাপ্ত সেই-যে মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে—পিতা, মাতা, বন্ধু—সেখান থেকে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোটো করে আপন হাতে আপনার মতো ক'রে গড়েছি তখন কী যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না। যখন আমরা বলেছি 'আমাদের পরম ধনকে সহজ করবার জন্যে ছোটো করব', তখনই আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি। তখন টুকরো কেবলই হাজার টুকরো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর আসতে চায় নি; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে; কৃত্রিম বিভীষিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেছে; বীভৎস প্রথা ও নিষ্ঠুর আচার সহজেই ধর্মসাধনা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছে। আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুর-চারিণী ভীরু রমণীর মতো স্বাধীন বিচারের প্রশস্ত রাজপথে বেরোতে কেবলই ভয় পেয়েছে। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে, অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখলে নয়। থামার সীমাই হচ্ছে আমাদের মৃত্যু; আরোর পরে আরোই হচ্ছে আমাদের প্রাণ—সেই আমাদের ভূমার দিকটি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সে দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়, সেই দিক নিয়ত সাধনার দিক। সেই মুক্তির দিককে মানুষ যদি আপন কল্পনার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে, আপনার দুর্বলতাকেই লালন করে ও শক্তিকে অবমানিত করে, তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

এমনি করে মানুষ যখন সহজ করবার জন্যে আপনার পূজাকে ছোটো করতে গিয়ে পূজনীয়কে এক প্রকার বাদ দিয়ে বসে তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর-এক বিপদে গিয়ে পড়ে—আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে সেখানে আমাদের পূজা পৌঁছতে পারে না, অথবা পৌঁছতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায় যে, অসীমকে কেবলমাত্র ছোটো করলেও যেমন তাঁকে মিথ্যা করা হয় তেমনি তাঁকে কেবলমাত্র বড়ো করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়; তাঁকে শুধু ছোটো করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড়ো করে আমাদের শুষ্কতা।

অনন্তং ব্রহ্ম, অনন্ত বলেই ছোটো হয়েও বড়ো এবং বড়ো হয়েও ছোটো। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন এবং অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এইজন্যে মানুষ যেখানে মানুষ, সেখানে তো তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনিই আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করেছেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার একসুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করছেন, আমাদের কথা শুনছেন এবং শোনাচ্ছেন; এইখানেই সেই পুণ্যলোক, সেই স্বর্গলোক, যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সর্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানবসম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে তবে সে

শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি যখনই এ কথা সত্য হয়েছে তখনই এ কথাও সত্য—অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এইজন্যে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। এক দিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর-এক দিকে অন্য আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; এক দিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর-এক দিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুইই আছে;

(ছোটো ও বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ই মাঘ ১৩২০)

মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে অসংখ্য। এই অসংখ্যের সঙ্গে একলা মানুষ পেরে উঠবে কেন। সে কত জায়গায় হাতজোড় করে দাঁড়াবে। সে কত পূজার অর্ঘ্য কত বলির পশু সংগ্রহ করে মরবে। তাই মানুষ অসংখ্যের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কত ওঝা ডেকেছে কত যাদুমন্ত্র পড়েছে তার ঠিক নেই।

একদিন সাধক দেখতে পেলেন, যা-কিছু টুকরো টুকরো হয়ে দেখা দিচ্ছে তাদের সমস্তকে অধিকার করে এবং সমস্তকে পেরিয়ে আছে **সত্যং**। অর্থাৎ, যা-কিছু দেখছি তাকে সম্ভব করে আছে একটি না-দেখা পদার্থ।

কেন, তাকে দেখিনে কেন। কেননা, সে যে কিছুর সঙ্গে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেবার নয়। সমস্ত স্বতন্ত্রকে আপনার মধ্যে ধারণ করে সে যে এক হয়ে আছে। সে যদি হত 'একটি', তা হলে তাকে নানা বস্তুর এক প্রান্তে কোনো একটা জায়গায় দেখতে পেতুম। কিন্তু সে যে হল 'এক', তাই তাকে অনেকের অংশ করে বিশেষ করে দেখবার জো রইল না।

এত বড়ো আবিষ্কার মানুষ আর কোনো দিন করেনি। এটি কোনো বিশেষ সামগ্রীর আবিষ্কার নয়, এ হল মন্ত্রের আবিষ্কার। মন্ত্রের আবিষ্কারটি কী। বিজ্ঞানে যেমন অভিব্যক্তিবাদ—তাতে বলছে জগতে কোনো জিনিস একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে শুরু হয় নি, সমস্তই ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে। এই বৈজ্ঞানিক মন্ত্রটিকে মানুষ যতই সাধন ও মনন করছে ততই তার বিশ্ব-উপলব্ধি নানা দিকে বেড়ে চলেছে।

মানুষের অনেক কথা আছে যাকে জানবামাত্রই তার জানার প্রয়োজনটি ফুরিয়ে যায়, তারপরে সে আর মনকে কোনো খোরাক দেয় না। রাত পোহালে সকাল হয় এ কথা বার বার চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু, যেগুলি মানুষের অমৃতবাণী সেইগুলিই হল তার মন্ত্র। যতই সেগুলি ব্যবহার করা যায় ততই তাদের প্রয়োজন আরও বেড়ে চলে। মানুষের সেই রকম একটি অমৃতমন্ত্র কোনো-এক শুভক্ষণে উচ্চারিত হয়েছিল : **সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।**

কিন্তু, মানুষ সত্যকে কোথায় বা অনুভব করলে। কোথাও কিছুই তো স্থির হয়ে নেই, দেখতে দেখতে এক আর হয়ে উঠছে। আজ আছে বীজ, কাল হল অঙ্কুর, অংকুর থেকে হল গাছ, গাছ থেকে অরণ্য। আবার সেই সমস্ত অরণ্য স্লেটের উপর ছেলের হাতে আঁকা হিজিবিজির মতো কতবার মাটির উপর থেকে মুছে মুছে যাচ্ছে। পাহাড়-পর্বতকে আমরা বলি ধ্রুব; কিন্তু সেও যেন রঙ্গমঞ্চের পট, এক-এক অঙ্কের পর তাকে কোন্ নেপথ্যের মানুষ কোথায় যে গুটিয়ে তোলে দেখা যায় না। চন্দ্র সূর্য তারাও যেন আলোকের বুদ্বুদের মতো অন্ধকার সমুদ্রের উপর ফুটে ফুটে

ওঠে, আবার মিলিয়ে মিলিয়ে যায়। এইজন্যেই তো সমস্তকে বলি সংসার, আর সংসারকে বলি স্বপ্ন, বলি মায়া। সত্য তবে কোন্‌খানে।

সত্যের তো প্রকাশ এমনি করেই, এই চিরচঞ্চলতায়। নৃত্যের কোনো একটি ভঙ্গিও স্থির হয়ে থাকে না, কেবলই তা নানাখানা হয়ে উঠছে। তবু যে দেখেছে সে আনন্দিত হয়ে বলচে 'আমি নাচ দেখছি'। নাচের সমস্ত অনিত্য ভঙ্গিই তালে মানে বাঁধা একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকে প্রকাশ করছে। আমরা নাচের নানা ভঙ্গিকেই মুখ্য করে দেখছি নে; আমরা দেখছি তার সেই সত্যটিকে, তাই খুশি হয়ে উঠছি। যে ভাঙা গাড়িটা রাস্তার ধারে অচল হয়ে পড়ে আছে সে আপনার জড়ত্বের গুণেই পড়ে থাকে; কিন্তু যে গাড়ী চলছে তার সারথি, তার বাহন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার চলবার পথ, সমস্তেরই পরস্পরের মধ্যে একটি নিয়তপ্রবৃত্ত সামঞ্জস্য থাকা চাই, তবেই সে চলে। অর্থাৎ, তার দেশকালগত সমস্ত অংশপ্রত্যংশকে অধিকার করে, তাদের যুক্ত ক'রে তাদের অতিক্রম করে যদি সত্য না থাকে তবে সে গাড়ি চলে না।

যে ব্যক্তি বিশ্বসংসারে এই কেবলই বদল হওয়ার দিকেই নজর রেখেছে সেই মানুষই হয় বলছে 'সমস্তই স্বপ্ন' নয় বলছে 'সমস্তই বিনাশের প্রতিরূপ—অতি ভীষণ'। সে হয় বিশ্বকে ত্যাগ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে নয় ভীষণ বিশ্বের দেবতাকে দারুণ উপচারে খুশি করবার আয়োজন করছে। কিন্তু, যে লোক সমস্ত তরঙ্গের ভিতরকার ধারাটি, সমস্ত ভঙ্গির ভিতরকার নাচটি, সমস্ত সুরের ভিতরকার সংগীতটি দেখতে শুনতে পাচ্ছে সেই তো আনন্দের সঙ্গে বলে উঠছে সত্যং। সেই জানে, বৃহৎ ব্যবসা যখন চলে তখনই বুঝি সেটা সত্য, মিথ্যা হলেই সে দেউলে হয়ে অচল হয়। মহাজনের মূলধনের যদি সত্য পরিচয় পেতে হয় তবে যখন তা খাটে তখনই তা সম্ভব। সংসারের সমস্ত-কিছু চলছে বলেই সমস্ত মিথ্যা, এটা হল একেবারেই উল্‌টো কথা। আসল কথা সত্য বলেই সমস্ত চলছে। তাই আমরা চারি-দিকেই দেখছি সত্তা আপনাকে স্থির রাখতে পারছে না, সে আপনার কূল ছাপিয়ে দিয়ে অসীম বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে।

এই সত্য পদার্থটি, যা সমস্তকে গ্রহণ করে অথচ সমস্তকে পেরিয়ে চলে, তাকে মানুষ বুঝতে পারলে কেমন করে। এ তো তর্ক করে বোঝবার জো ছিল না; এ আমরা নিজের প্রাণের মধ্যেই যে একেবারে নিঃসংশয় করে দেখেছি। সত্যের রহস্য সব চেয়ে স্পষ্ট করে ধরা পড়ে গেছে তরুলতায় পশুপাখিতে। সত্য যে প্রাণস্বরূপ তা এই পৃথিবীর রোমাঞ্চরূপী ঘাসের পত্রে পত্রে লেখা হয়ে বেরিয়েছে। নিখিলের মধ্যে যদি একটি বিরাট প্রাণ না থাকত তবে এই জগৎজোড়া লুকোচুরি খেলায় সে তো একটি ঘাসের মধ্যেও ধরা পড়ত না।

এই ঘাসটুকুর মধ্যে আমরা কী দেখছি। যেমন গানের মধ্যে আমরা তান দেখে থাকি। বৃহৎ অঙ্গের ধ্রুপদ গান চলছে; চৌতালের বিলম্বিত লয়ে তার ধীর মন্দ গতি; যে ওস্তাদের মনে সমগ্র গানের রূপটি বিরাজ করছে মাঝে মাঝে সে লীলাচ্ছলে এক-একটি ছোটো ছোটো তানে সেই সমগ্রের রূপটিকে ক্ষণেকের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। মাটির তলে জলের ধারা রহস্যে ঢাকা আছে, ছিদ্রটি পেলে সে উৎস হয়ে ছুটে বেরিয়ে আপনাকে অল্পের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। তেমনি উদ্ভিদে পশুপাখিতে প্রাণের যে চঞ্চল লীলা ফোয়ারার মতো ছুটে ছুটে বেরোয় সে হচ্ছে অল্প পরিসরে নিখিল সত্যের প্রাণময় রূপের পরিচয়।

এই প্রাণের তত্ত্বটি কী তা যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করে তবে কোনো সংজ্ঞার দ্বা..। তাকে আটে ঘাটে বেঁধে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারি এমন সাধ্য আমাদের নেই। পৃথিবীতে তাকেই বোঝানো সব চেয়ে শক্ত যাকে আমরা সব চেয়ে সহজে বুঝেছি। প্রাণকে বুঝতে আমাদের বুদ্ধির দরকার হয় নি, সেইজন্যে তাকে বোঝাতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। আমাদের প্রাণের মধ্যে আমরা দুটি বিরোধকে অনায়াসে মিলিয়ে দেখতে পাই। একদিকে দেখি আমাদের প্রাণ নিয়ত চঞ্চল; আর-এক দিকে দেখি সমস্ত চাঞ্চল্যকে ছাপিয়ে, অতীতকে পেরিয়ে, বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে প্রাণ বিস্তীর্ণ হয়ে বর্তে আছে। বস্তুত সেই বর্তে থাকার দিকেই দৃষ্টি রেখে আমরা বলি আমরা বেঁচে আছি। এই একই কালে বর্তে না থাকা, এবং বর্তে থাকা, এই নিত্য চাঞ্চল্য এবং নিত্য স্থিতির মধ্যে ন্যায় শাস্ত্রের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে তা ন্যায়শাস্ত্রেই আছে— আমাদের প্রাণের মধ্যে নেই।

যখন আমরা বেঁচে থাকতে চাই তখন আমরা এইটেই তো চাই। আমরা আমাদের স্থিতিকে চাঞ্চল্যের মধ্যে মুক্তি দান করে এগিয়ে চলতে চাই। যদি আমাদের কেউ অহল্যার মতো পাথর করে স্থির করে রাখে তবে বুঝি যে সেটা আমাদের অভিশাপ। আবার যদি আমাদের প্রাণের মুহূর্ত্তগুলিকে কেউ চক্মকি-ঠোকা স্ফুলিঙ্গের মতো বর্ষণ করতে থাকে তা হলে সে প্রাণকে আমরা একখানা করে পাইনে বলে তাকে পাওয়াই হয় না।

এমনি করে প্রাণময় সত্যের এমন একটি পরিচয় নিজের মধ্যে অনায়াসে পেয়েছি যা অনির্বচনীয় অথচ সুনিশ্চিত, যা আপনাকে আপনি কেবল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলেছে, যা অসীমকে সীমায় আকারবদ্ধ করতে করতে এবং সীমাকে অসীমের মধ্যে মুক্তি দিতে দিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এর থেকেই নিখিল সত্যকে আমার নিখিলের প্রাণ-রূপে জানতে পারছি। বুঝতে পারছি এই সত্য সকলের মধ্যে থেকেই সকলকে অতিক্রম করে আছে বলে বিশ্বসংসার কেবলই চলার দ্বারাই সত্য হয়ে উঠছে। এইজন্য জগতে স্থিরত্বই হচ্ছে বিনাশ, কেননা স্থিরত্বই হচ্ছে সীমায় ঠেকে যাওয়া। এইজন্যেই বলা হয়েছে: যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে।

তবে কি সমস্তই প্রাণ। আর, অপ্রাণ কোথাও নেই? অপ্রাণ আছে, কেননা দ্বন্দ্ব ছাড়া সৃষ্টি হয় না। কিন্তু, সেই অপ্রাণের দ্বারা সৃষ্টির পরিচয় নয়। প্রাণটাই হল মুখ্য, অপ্রাণটা গৌণ।

আমরা চলবার সময় যখন পা ফেলি তখন প্রত্যেক পা ফেলা একটা বাধায় ঠেকে। কিন্তু চলার পরিচয় সেই বাধায় ঠেকে যাওয়ার দ্বারা নয়, বাধা পেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা। নিখিল সত্যেরও একদিকে বাধা, আর-এক দিকে বাধামোচন। সেই বাধামোচনের দিকেই তার পরিচয়; সেই দিকেই সে প্রাণস্বরূপ; সেই দিকেই সে সমস্তকে মেলাচ্ছে এবং চালাচ্ছে।

যেদিন এই কথাটি আমরা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পেরেছি সে দিন আমাদের ভয়ের দিন নয়, ভিক্ষার দিন নয়; সে দিন কোনো উচ্ছৃঙ্খল দেবতাকে অদ্ভুত উপায়ে বশ করবার দিন নয়। সেদিন বিশ্বের সত্যকে আমারও সত্য বলে আনন্দিত হবার দিন।

সেদিন পূজারও দিন বটে। কিন্তু, সত্যের পূজা তো কথার পূজা নয়। কথায় ভুলিয়ে সত্যের কাছে তো বর পাবার জো নেই। সত্য প্রাণময়, তাই প্রাণের মধ্যেই সত্যের পূজা। আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি মানুষ সত্যের বর পাচ্ছে, তার দৈন্য দূর হচ্ছে,

তার তেজ বেড়ে উঠছে। কোথায় দেখেছি। যেখানে মানুষের চিত্ত অচল নয়, যেখানে তার নব নব উদ্‌যোগ, যেখানে সামনের দিকে মানুষের গতি, যেখানে অতীতের খোঁটায় সে আপনাকে আপাদমস্তক বেঁধেছেঁদে স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে আপনার এগোবার পথকে সকল দিকে মুক্ত রাখবার জন্যে মানুষ সর্বদাই সচেতন। জ্বালানি কাঠ যখন পূর্ণতেজে জ্বলে না তখন সে ধোঁয়ায় কিংবা ছাইয়ে ঢাকা পড়ে। তেমনি দেখা গেছে, যে জাতি আপনার প্রাণকে চলতে না দিয়ে কেবলই বাঁধতে চেয়েছে তার সত্য সকল দিক থেকেই ম্লান হয়ে এসে তাকে নির্জীব করে; কেননা সত্যের ধর্ম জড়ধর্ম নয়, প্রাণধর্ম—চলার দ্বারাই তার প্রকাশ।

নিজের ভিতরকার বেগবান প্রাণের আনন্দে মানুষ যখন অক্লান্ত সন্ধানের পথে সত্যের পূজা বহন করে তখনই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তারও সৃষ্টি চারিদিকে বিচিত্র হয়ে ওঠে; তখন তার রথ পর্ব্বত লঙ্ঘন করে, তার তরণী সমুদ্র পার হয়ে যায়, তখন কোথাও তার আর নিষেধ থাকে না। তখন সে নূতন নূতন সংকটের মধ্যে ঘা পেতে থাকে বটে, কিন্তু নুড়ির ঘা খেয়ে ঝরণার কলগান যেমন আরও জেগে ওঠে তেমনি ব্যাঘাতের দ্বারাই বেগবান প্রাণের মুখে নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। আর, যারা মনে করে স্থির হয়ে থাকাই সত্যের সেবা, চলাই সনাতন সত্যের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাদের অচলতার তলায় ব্যাধি দারিদ্র্য অপমান অব্যবস্থা কেবলই জমে ওঠে, নিজের সমাজ তাদের কাছে নিষেধের কাঁটা খেত, দূরের লোকালয় তাদের কাছে দুর্গম। নিজের দুর্গতির জন্যে তারা পরকে অপরাধী করতে চায়, এ কথা ভুলে যায় যে যে-সব দড়িদড়া দিয়ে তারা সত্যকে বন্দী করতে চেয়েছিলো সেইগুলো দিয়ে তারা আপনাকে বেঁধে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

যদি জানতে চাই মানুষের বুদ্ধি শক্তিটা কী, তবে কোন্‌খানে তার সন্ধান করব। যেখানে মানুষের গণনাশক্তি চিরদিন ধরে পাঁচের বেশি আর এগোতে পারলে না সেইখানে? যদি জানতে চাই মানুষের ধর্ম কী, তবে কোথায় যাব। যেখানে সে ভূত-প্রেতের পূজা করে, কাষ্ঠ্র লোষ্ট্রের কাছে নরবলি দেয় সেইখানে? না। সেখানে নয়। কেননা, সেখানে মানুষ বাঁধা পড়ে আছে। সেখানে তার বিশ্বাসে তার আচরণে সম্মুখীন গতি নেই। চলার দ্বারাই মানুষ আপনাকে জানতে থাকে, কেননা **চলাই সত্যের ধর্ম।** যেখানে মানুষ চলার মুখে, সেইখানেই আমরা মানুষকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই—কেননা মানুষ সেখানে আপনাকে বড়ো করে দেখায়—যেখানে আজও সে পেঁছয়নি সেখানটিকেও সে আপনার গতিবেগের দ্বারা নির্দেশ করে দেয়। তার ভিতরকার সত্য তাকে চলার দ্বারাই জানাচ্ছে যে, সে যা তার চেয়ে সে অনেক বেশি।

তবেই দেখতে পাচ্ছি সত্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি জানা লেগে আছে। আমাদের যে বিকাশ সে কেবল হওয়ার বিকাশ নয়, যে জানার বিকাশ। হতে থাকার দ্বারা চলতে থাকার দ্বারাই আপনাকে আমরা জানতে থাকি।

সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্ঞান লেগে রয়েছে, সেইজন্যেই মন্ত্রে আছে : সত্যং জ্ঞানং। অর্থাৎ, সত্য যার বাহিরের বিকাশ জ্ঞান তার অন্তরের প্রকাশ। যে সত্য কেবলই হয়ে উঠছে মাত্র অথচ সেই হয়ে ওঠা আপনাকেও জানছে না, কাউকে কিছু জানাচ্ছেও না, তাকে আছে বলাই যায় না। আমার মধ্যে জ্ঞানের আলোটি যেমনি জ্বলে অমনি যা-কিছু আছে সমস্ত আমার মধ্যে সার্থক হয়। এই সার্থকতাটি বৃহৎভাবে বিশ্বের মধ্যে নেই, অথচ খণ্ডভাবে আমার মধ্যে আছে, এমন কথা মনে করতে পারে নি বলেই মানুষ বলেছে : সত্যং জ্ঞানং। সত্য সর্বত্র, জ্ঞানও সর্বত্র। সত্য কেবলই জ্ঞানকে

ফল দান করছে, জ্ঞান কেবলই সত্যকে সার্থক করছে—এর আর অবধি নেই। এ যদি না হয় তবে অন্ধ সৃষ্টির কোনো অর্থই নেই।

(একটি মন্ত্র, শান্তিনিকেতন, ১৫ মাঘ ১৩২০)

যেমন প্রদীপের মুখের ছোটো শিখাটি বিশ্বব্যাপী উত্তাপেরই অঙ্গ তেমনি আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের অঙ্গ, তেমনি আমার জানাও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

মানুষ পৃথিবীর এক কোণে বসে যুক্তির দাঁড়ি পাল্লায় সূর্যকে ওজন করছে এবং বলছে, 'আমার জ্ঞানের জোরেই বিশ্বের রহস্য প্রকাশ হচ্ছে।' কিন্তু এ জ্ঞান যদি তারই জ্ঞান হত তবে এটা জ্ঞানই হত না; বিরাট জ্ঞানের যোগেই সে যা-কিছু জানতে পারছে। মানুষ অহংকার করে বলে 'আমার শক্তিতেই আমি কলের গাড়ি চালিয়ে দূরত্বের বাধা কাটাচ্ছি'; কিন্তু তার এই শক্তি যদি বিশ্বশক্তির সঙ্গে না মিলত তা হলে সে এক পাও চলতে পারত না।

সেইজন্যে যেদিন মানুষ বললে সত্যং সেইদিনই একই প্রাণময় শক্তিকে আপনার মধ্যে এবং আপনার বাহিরে সর্বত্র দেখতে পেলে। যেদিন বললে জ্ঞানং সেইদিন সে বুঝলে যে, সে যা-কিছু জানছে এবং যা-কিছু ক্রমে জানবে সমস্তই একটি বৃহৎ জানার মধ্যে জাগ্রত রয়েছে। এইজন্যই আজ তার এই বিপুল ভরসা জন্মেছে যে, তার শক্তির এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র কেবলই বেড়ে চলবে, কোথাও সে থেমে যাবে না। এখন সে আপনারই মধ্যে অসীমের পথ পেয়েছে, এখন তাকে আর যাগযজ্ঞ জাদুমন্ত্র পৌরোহিত্যের শরণ নিতে হবে না। এখন তার প্রার্থনা এই—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।

অসত্যের জড়তা থেকে চিরবিকাশমান সত্যের মধ্যে আমাকে নিয়ত চালনা করো, অন্ধকার হতে আমার জ্ঞানের আলোক উন্মীলিত হতে থাক্।

আমাদের মন্ত্রের শেষ বাক্যটি হচ্ছে: অনন্তং ব্রহ্ম। মানুষ আপনার সত্যের অনুভবে সত্যকে সর্বত্র দেখছে, আপনার জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানকে সর্বত্র জানছে, তেমনি আপনার আনন্দের মধ্যে মানুষ অনন্তের যে পরিচয় পেয়েছে তারই থেকে বলছে 'অনন্তং ব্রহ্ম'।

কোথায় সেই পরিচয়। আমাদের মধ্যে অনন্ত সেখানেই, যেখানে আমরা আপনাকে দান করে আনন্দ পাই। দানের দ্বারা যেখানে আমাদের কেবলমাত্র ক্ষতি সেইখানেই আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের সীমা, সেখানে আমরা কৃপণ। কিন্তু, দানই যেখানে আমাদের লাভ, ত্যাগই যেখানে আমাদের পুরস্কার, সেখানেই আমরা আমাদের ঐশ্বর্যকে জানি, আমাদের অনন্তকে পাই। যখন আমাদের সীমারূপী অহংকেই আমরা চরম বলে জানি তখন কিছুই আমরা ছাড়তে চাই নে, সমস্ত উপকরণকে তখন দুহাতে আঁকড়ে ধরি—মনে করি বস্তুপুঞ্জের যোগেই আমরা সত্য হব, বড়ো হব। আর, যখনই কোনো বৃহৎ প্রেম বৃহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে তখনই আমাদের কৃপণতা কোথায় চলে যায়! তখন আমরা রিক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠি, মৃত্যুর দ্বারা অমৃতের আস্বাদ পাই। এইজন্য মানুষের প্রধান ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈরাগ্যে, আসক্তিতে নয়, আমাদের সমস্ত নিত্যকীর্তি বৈরাগ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত।

(একটি মন্ত্র, শান্তিনিকেতন, ১৫ মাঘ ১৩২০)

আমাদের সমস্ত মন্ত্রটি একবার দেখে নিই : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

অনন্ত ব্রহ্মের সীমারূপটি হচ্ছে সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্য নিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে, সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে। তার উত্তর এই যে, সত্যের সীমা আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। এইজন্যই সত্য গতিমান্। সত্য আপনার গতির দ্বারা কেবলই আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরিয়ে চলতে থাকে, কোনো সীমায় এসে একেবারে ঠেকে যায় না। সত্যের এই নিরন্তর প্রকাশর মধ্যে আত্মদান করে অনন্ত আপনাকেই জানছেন, এইজন্যই মন্ত্রের একপ্রান্তে সত্যং আর-এক প্রান্তে অনন্তং ব্রহ্ম—তারই মাঝখানে জ্ঞানং।

এই কথাটিকে বাক্যে বলতে গেলেই স্বতোবিরোধ এসে পড়ে। কিন্তু, সে বিরোধ কেবল বাক্যেরই। আমরা যাকে ভাষায় বলি সীমা সেই সীমা ঐকান্তিকরূপে কোথাও নেই, তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম সেই অসীমও ঐকান্তিকভাবে কোথাও নেই, তাই অসীম কেবলই সীমায় রূপগ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন। সত্যও অসীমকে বর্জন করে সীমায় নিশ্চল হয়ে নেই, অসীমও সত্যকে বর্জন করে শূন্য হয়ে বিরাজ করছেন না। এইজন্য ব্রহ্ম সীমা এবং সীমাহীনতা দুইয়েরই অতীত, তাঁর মধ্যে রূপ এবং অপরূপ দুইই সংগত হয়েছে।

তাঁকে বলা হয়েছে 'বলদা', তাঁর বল তাঁর শক্তি বিশ্বসত্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে; আবার আত্মদা, সেই সত্যের সঙ্গে সেই শক্তির সঙ্গে তাঁর আপনার বিচ্ছেদ ঘটেনি—সেই শক্তির যোগেই তিনি আপনাকে দিচ্ছেন। এমনি করেই সসীম অসীমের, অরূপ সরূপের, অপরূপ মিলন ঘটে গেছে। সত্যং এবং অনন্তং অনির্বচনীয় রূপে পরস্পরের যোগে একই কালে প্রকাশমান হচ্ছে। তাই অসীমের আনন্দ সসীমের অভিমুখে, সসীমের আনন্দ অসীমের অভিমুখে। তাই ভক্ত ও ভগবানের আনন্দমিলনের মধ্যে আমরা সসীম ও অসীমের এই বিশ্বব্যাপী প্রেমলীলার চিররহস্যটিকে ছোটোর মধ্যে দেখতে পাই। এই রহস্যটি রবিচন্দ্রতারার পর্দার আড়ালে নিত্যকাল চলেছে; এই রহস্যটিকে বুকের ভিতরে নিয়ে বিশ্বচরাচর রসবৈচিত্র্যে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সত্যের সঙ্গে অনন্তের এই নিত্য যোগ লোকস্থিতির শান্তিতে, সমাজস্থিতির মঙ্গলে ও জীবাত্মা-পরমাত্মার একাত্ম মিলনে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ রূপে প্রকাশমান হয়ে উঠছে। এই শান্তি জড়ত্বের নিশ্চল শান্তি নয়, সমস্ত চাঞ্চল্যের মর্ম-নিহিত শান্তি; এই মঙ্গল দ্বন্দ্ববিহীন নির্জীব মঙ্গল নয়, সমস্ত দ্বন্দ্বমন্থনের আলোড়ন-জাত মঙ্গল; এই অদ্বৈত একাকারত্বের অদ্বৈত নয়, সমস্ত বিরোধবিচ্ছেদের সমাধান-কারী অদ্বৈত। কেননা, তিনি 'বলদা আত্মদা'; সত্যের ক্ষেত্রে শক্তির মধ্য দিয়েই তিনি কেবলই আপনাকে দান করছেন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—এই মন্ত্রটি তো কেবলমাত্র ধ্যানের বিষয় নয়, এটিকে প্রতিদিনের সাধনায় জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

সেই সাধনাটি কী। আমাদের জীবনে সত্যের সঙ্গে অনন্তের যে বাধা ঘটিয়ে বসেছি, যে বাধা-বশত আমাদের জ্ঞানের বিকার ঘটছে, সেইটে দূর করে দিতে থাকা।

এই বাধা ঘটিয়েছে আমাদের অহং। এই অহং আপনার রাগদ্বেষের লাগাম এবং চাবুক নিয়ে আমাদের জীবনটাকে নিজের সুখদুঃখের সংকীর্ণ পথেই চালাতে চায়। তখন আমাদের কর্মের মধ্যে শান্তকে পাই নে, আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে শিবের অভাব

ঘটে এবং আত্মার মধ্যে অদ্বৈতের আনন্দ থাকে না। কেননা, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম; অনন্তের সঙ্গে যোগে তবেই সত্য জ্ঞানময় হয়ে ওঠে, তবেই আমাদের জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিক হয়। যাদের জীবন বেগে চলছে, অথচ কেবলমাত্র আপনাকেই কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের সেই চলা সেই বলক্রিয়া কলুর বলদের চলার মতো; তা স্বাভাবিক নয়, তা জ্ঞানময় নয়।

আবার, যারা জীবনের সত্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে অনন্তকে কর্মহীন সন্ন্যাসের মধ্যে উপলব্ধি করতে কিংবা ভাবরসের মাদকতায় উপভোগ করতে চায় তাদেরও এই ধ্যানের কিংবা রসের সাধনা বন্ধ্যা। তাদের চেষ্টা হয় শূন্যকেই দোহন করতে থাকে নয় নিজের কল্পনাকেই সফলতা বলে মনে করে। যাদের জীবন সত্যের চিরবিকাশ-পথে চলছে না, কেবল শূন্যতাকে বা রসভোগবিহ্বল নিজের মনটাকেই বারে বারে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের সেই অন্ধ সাধনা হয় জড়ত্ব নয় প্রমত্ততা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই মন্ত্রটিকে যদি গ্রহণ করি তবে আমাদের মনকে প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য ও অহংকারের ঔদ্ধত্য থেকে নির্মুক্ত করবার জন্যে একান্ত চেষ্টা করতে হবে —তা না হলে আমাদের কর্মের কলুষ এবং জ্ঞানের বিকার কিছুতেই ঘুচবে না। আমাদের যে অহং আজ মাথা উঁচু করে আমাদের সত্য এবং অনন্তের মধ্যে ব্যবধান জাগিয়ে অজ্ঞানের ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সে যখন প্রেমে বিনম্র হয়ে তার মাথা নত করতে পারবে তখন আমাদের জীবনে সেই অহংই হবে সসীম ও অসীমের মিলনের সেতু; তখন আমাদের জীবনে তারই সেই নম্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন সুখদুঃখের চাঞ্চল্য আমাদের অভিভূত করবে তখন এই শান্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মান অপমান তরঙ্গদোলায় আমাদের ক্ষুব্ধ করতে থাকে তখন এই মঙ্গলমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম। যখন কল্যাণের আহ্বানে দুর্গম পথে প্রবৃত্ত হবার সময় আসবে তখন এই অভয়মন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন বাধা প্রবল হয়ে উঠে সেই পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে তখন এই শক্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মৃত্যু এসে প্রিয়বিচ্ছেদের ছায়ায় আমাদের জীবনযাত্রার পথকে অন্ধকারময় করে তুলবে তখন এই অমৃতমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আমাদের জীবনগত সত্যের সঙ্গে আনন্দময় ব্রহ্মের যোগ পূর্ণ হতে থাক্; তা হলেই আমাদের জ্ঞান নির্মল হয়ে আমাদের সমস্ত ক্ষোভ হতে, মত্ততা হতে, অবসাদ হতে রক্ষা করবে। নদী যখন চলতে থাকে তখন তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন একটি কলসংগীত বাজে, আমাদের জীবন তেমনি প্রতিক্ষণেই মুক্তির পথে সত্য হয়ে চলুক, যাতে তার চলার সঙ্গে সঙ্গে এই অমৃত বাণীটি সংগীতের মতো বাজতে থাকে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যিনি বিশ্বরূপে আপনাকে দান করছেন তাঁকে প্রতিদানরূপে আত্মনিবেদন করব, সেই নিত্য মালা-বদলের আনন্দমন্ত্রটি হোক : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

(একটি মন্ত্র, শান্তিনিকেতন, ১৫ মাঘ ১৩২০)

জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাষ্ঠ বস্তু—গাছ নয়, তার রস টানিবার ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয়, বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে-একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ—তাহা একই কালে বস্তুময় শক্তিময় সৌন্দর্যময়। গাছ যে আনন্দ দেয় সে এইজন্যই। এইজন্যই গাছ বিশ্বপৃথিবীর

ঐশ্বর্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার কোনো বিচ্ছেদ নাই। এইজন্যই গাছপালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়—ছুটির সত্যরূপটি দেখিতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয়। বস্তুত তাহা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাজের সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দরূপ, সৌন্দর্যরূপ। তাহা কাজ বটে কিন্তু তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম একসঙ্গেই।

সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে আসিয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া গেছে। তার প্রধান কারণ, মানুষের নিজের একটা ইচ্ছা আছে, জগতের লীলার সঙ্গে সে সমান তালে চলে না; বিশ্বের তালটা সে আজও সম্পূর্ণ কায়দা করিতে পারিল না। কথায় কথায় তাল কাটিয়া যায়। এইজন্য নিজের সৃষ্টিকে সে টুকরা টুকরা করিয়া ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে তাহাকে কোনো প্রকারে তালে বাঁধিয়া লইতে চায়। কিন্তু তাহাতে পুরা সংগীতের রস ভাঙিয়া যায় এবং সেই টুকরাগুলার মধ্যেও তাল রক্ষা হয় না। ইহাতে মানুষের প্রায় সকল কাজেই যোঝাযুঝিটাই সব চেয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে।

(কবির কৈফিয়ত, সাহিত্যের পথে, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)

কলকাতা থেকে ফিরে আবার আমি নিজের মধ্যেই ফিরে এসেছি। প্রতিবারেই যেন নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করি। শহরে ভিড়ের মধ্যে আমরা জীবনের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়ে ফেলি। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানকার সব কিছু আমাকে ক্লান্ত করে। তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্তরের যা সত্য তা সেখানে হারিয়ে যায়। আমাদের হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে প্রিয়তম আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। তাঁর কাছে বার বার ঘুরে ঘুরে না এলে বস্তুর দৌরাত্ম্য অসহ্য হয়ে ওঠে। অন্তর যেন জানে তার অতল অন্তঃস্তরেই লুকানো রয়েছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। হৃদয়ের কৃপণতা দূর করতে হলে এই অসংশয় বিশ্বাস চাই।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমতী মলিনা রায়,
৩ ফেব্রুয়ারী ১৯১৬)

তিনি 'সত্যম্', এক মহান্ সত্যতা; তিনি 'জ্ঞানম্', তাঁর মধ্যে সকল জ্ঞাতার জ্ঞান রয়েছে, সুতরাং সকল জানার মধ্যে তিনি নিজেকে জানেন;

(May 1917এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The Second Birth; অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোঁজামিলন দিয়ে একটা ঘর-গড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুললে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এক সময়ে মানুষ ঘরে বসে ঠিক করেছিল যে, পৃথিবী একটা পদ্মফুলের মতো—তার কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্বতটি যেন বীজকোষ—চারিদিকে এক-একটি পাপড়ির মতো এক-একটি মহাদেশ প্রসারিত। এরকম কল্পনা করবার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, সত্যের একটি সুষমা আছে—সেই সুষমা না থাকলে সত্য আপনাকে

আপনি ধারণ করে রাখতে পারে না। এ কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে এবং অতিক্রম করে—শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষকে পান করে তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে পৃথিবীটি বস্তুত যেমন, অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘর-গড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশি, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করিনে।

(আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড,
আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪)

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। ইহুদী পুরাণে আছে—মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে, না জয় করতে পেরেছি সে স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়—তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

....

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ ঘটল। সত্যমিথ্যা-ভালোমন্দ-জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা-দুঃখ-বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই-সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায়? অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে, সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে—জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে—অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্তরূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়।

(আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড,
আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪)

পাপতাপ সুখদুঃখের দ্বারা তরঙ্গায়িত এই সংসারের মধ্যেই সেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং'কে জীবনে পাওয়া যায়—

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৬ই মাঘ ১৩২৮)

উপনিষৎ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন—সত্যম্ জ্ঞানম্ এবং অনন্তম্। চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় করে মানব-আত্মারও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে। তার একটি হল আমরা আছি, আর-একটি আমরা জানি; আর-একটি কথা তার সঙ্গে আছে, তাই নিয়েই আজকের সভায় আমার আলোচনা। সেটি হচ্ছে, আমরা ব্যক্ত করি। ইংরেজিতে বলতে গেলে বলা যায়—I am, I know, I express। মানুষের এই তিন দিক এবং এই তিন নিয়েই একটি অখণ্ড সত্য। সত্যের এই তিন ভাব আমাদের নানা কাজে ও প্রবর্তনায় নিয়ত উদ্যত করে। টিঁকতে হবে তাই অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই, স্বাস্থ্য চাই। এই নিয়ে তার নানা রকমের সংগ্রহ রক্ষণ

ও গঠনকার্য। 'আমি আছি' সত্যের এই ভাবটি তাকে নানা কাজ করায়। এই সঙ্গে আছে 'আমি জানি'। এরও তাগিদ কম নয়। মানুষের জানার আয়োজন অতি বিপুল আর তা কেবলই বেড়ে চলেছে, তার মূল্য মানুষের কাছে খুব বড়ো। এই সঙ্গে মানবসত্যের আর-একটি দিক আছে 'আমি প্রকাশ করি'। 'আমি আছি' এইটি হচ্ছে ব্রহ্মের সত্য-স্বরূপের অন্তর্গত, 'আমি জানি' এটি ব্রহ্মের জ্ঞান-স্বরূপের অন্তর্গত, 'আমি প্রকাশ করি' এটি ব্রহ্মের অনন্ত-স্বরূপের অন্তর্গত।

'আমি আছি' এই সত্যকে রক্ষা করাও যেমন মানুষের আত্মরক্ষা, তেমনি 'আমি জানি' এই সত্যকে রক্ষা করাও মানুষের আত্মরক্ষা, কেন না মানুষের স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞান-স্বরূপ। অতএব মানুষ যে কেবলমাত্র জানবে কী দিয়ে, কী খাওয়ার দ্বারা আমাদের পুষ্টি হয়, তা নয়। তাকে নিজের জ্ঞান-স্বরূপের গরজে রাত্রির পর রাত্রি জিজ্ঞাসা করতে হবে মঙ্গলগ্রহে যে চিহ্নজাল দেখা যায় সেটা কী—জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হয়ত তাতে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অত্যন্ত পীড়িত হয়। অতএব মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তার জ্ঞানময় প্রকৃতির সঙ্গে সংগত করে জানাই ঠিক জানা, তার প্রাণময় প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত যুক্ত করে জানা ঠিক জানা নয়।

আমি আছি, আমাকে টি‘কে থাকতে হবে, এই কথাটি যখন সংকীর্ণ সীমায় থাকে তখন আত্মরক্ষা বংশরক্ষা কেবল আমাদের অহংকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে মানুষ বলে যে, অন্যের টি‘কে থাকার মধ্যেই আমার টি‘কে থাকা সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয়, সেই পরিমাণে 'আমি আছি' এবং 'অন্য-সকলে আছে' এই ব্যবধানটা তার ঘুচে যায়। এই অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য, সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। টি‘কে থাকার অসীমতা-বোধকে অর্থাৎ, 'আপনার থাকা অন্যের থাকার মধ্যে' এই অনুভূতিকে মানুষ নিজেরই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনিক ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার সেবায় ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।

পূর্বে বলেছি, কেবলমাত্র নিজে নিজে একান্ত টি‘কে থাকবার ব্যাপারেও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে জ্ঞানের দীপ্তি নেই। জ্ঞানের রাজ্যে যেখানে অসীমের প্রেরণা সেখানে মানুষের শিক্ষার কত উদ্যোগ, কত পাঠশালা, কত বিশ্ববিদ্যালয়, কত বীক্ষণ, কত পরীক্ষণ, কত আবিষ্কার, কত উদ্ভাবনা। সেখানে মানুষের জ্ঞান সর্ব-জনীন ও সর্বকালীন হয়ে মানবাত্মার সর্বত্র প্রবেশের অধিকারকে ঘোষণা করে। এই অধিকারের বিচিত্র আয়োজন বিজ্ঞানে দর্শনে বিস্তৃত হতে থাকে কিন্তু তার বিশুদ্ধ আনন্দরসটি নানা রচনায় সাহিত্যে ও আর্টে প্রকাশ পায়।

তবেই একটা কথা দেখছি যে পশুদের মতো মানুষেরও যেমন নিজে টি‘কে থাকবার ইচ্ছা প্রবল, পশুদের মত মানুষেরও যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কৌতূহল সর্বদা সচেষ্ট, তেমনি মানুষের আর-একটি জিনিস আছে যা পশুদের নেই, সে ক্রমাগতই তাকে কেবলমাত্র প্রাণধারণের সীমার বাইরে নিয়ে যায়। এইখানেই আছে প্রকাশতত্ত্ব।

প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই, সেখানে সে যা আনে তাই খায়। যাকে নিজেই সম্পূর্ণ শোষণ করে নিয়ে নিঃশেষ না

করতে পারি তাই নিয়েই তো প্রকাশ। লোহা গরম হতে হতে যতক্ষণ না দীপ্ত তাপ পর্যন্ত যায় ততক্ষণ তার প্রকাশ নেই। আলো হচ্ছে তাপের ঐশ্বর্য। মানুষের যে-সকল ভাব স্বকীয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হয়ে না যায়, যার প্রাচুর্য্যকে আপনার মধ্যেই আপনি রাখতে পারে না, যা স্বভাবতই দীপ্যমান, তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব। টাকার মধ্যে এই ঐশ্বর্য আছে কোন্‌খানে। যেখানে সে আমার একান্ত প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যেখানে সে আমার পকেটের মধ্যে প্রাচ্ছন্ন নয়, যেখানে তার সমস্ত রশ্মিই আমার কৃষ্ণবর্ণ অহংটার দ্বারা সম্পূর্ণ শোষিত না হয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই তার মধ্যে অশেষের আবির্ভাব এবং এই অশেষই নানা রূপে প্রকাশমান। সেই প্রকাশের প্রকৃতিই এই যে, আমরা সকলেই বলতে পারি—'এ যে আমার'। সে যখন অশেষকে স্বীকার করে তখনই সে কোনো-একজন অমুক বিশেষ লোকের ভোগ্যতার মলিন সম্বন্ধ হতে মুক্ত হয়। অশেষের-প্রসাদ-বঞ্চিত সেই বিশেষ ভোগ্য টাকার বর্বরতায় বসুন্ধরা পীড়িতা। দৈন্যের ভারের মতো আর ভার নেই। টাকা যখন দৈন্যের বাহন হয় তখন তার চাকার তলায় কত মানুষ ধূলিতে ধূলি হয়ে যায়। সে দৈন্যেরই নাম প্রতাপ, তা আলোক নয়, তা কেবলমাত্র দাহ—সে যার, কেবলমাত্র তারই; এইজন্যে তাকে অনুভব করা যায়, কিন্তু স্বীকার করা যায় না। নিখিলের সেই স্বীকার করাকেই বলে প্রকাশ।

(সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, বৈশাখ ১৩৩০)

মানবীয় সত্যকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। সেই তিন বিভাগের শাশ্বত ভিত্তি সন্ধান করতে গেলেই উপনিষদের বাণীকে আশ্রয় করা ছাড়া আমাদের পক্ষে আর-কোনো উপায় নেই।

(গ্রন্থপরিচয়, সাহিত্যের পথে, বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১)

ব্রহ্মকে যে অনন্তস্বরূপ বলা হয়েছে মানুষের মধ্যে তারও পরিচয় আছে। এই পরিচয়ের দ্বারা মানুষ আপনার প্রয়োজনের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়।

(গ্রন্থপরিচয়, সাহিত্যের পথে, বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১)

আপনাদের মধ্যে কোনো কোনো পরিহাসরসিকের মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন দেখছি—তবু উপনিষদের বাণী আমি এড়াতে পারলেম না। উপায় যে নেই। বহু শতাব্দীর এই-সব মহামন্ত্র, ভারতবর্ষের সমস্ত ভাব ও সাধনার বীজমন্ত্র, আজও যে এরা আমার প্রাণের আশ্রয়। সেই উপনিষদ্‌ ব্রহ্মের আর-একটি স্বরূপের উল্লেখ করে বলেছেন—অনন্তম্‌।

(গ্রন্থপরিচয়, সাহিত্যের পথে, বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১)

আমাদের উপাসনায় ধ্যানের যে মন্ত্র আমরা ব্যবহার করি—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং —সেই মন্ত্রের গভীর অর্থ হচ্ছে এই যে, চোখের দেখায় সত্যকে পাওয়া যায় না। মানুষের আত্মা নিজের জানবার ধর্ম দিয়েই সত্যের স্বরূপকে দেখে। চোখের দেখা বিচ্ছিন্ন, আত্মার দেখা ঐক্যে বাঁধা। ইন্দ্রিয়বোধ সেই একের বোধ নয়। আত্মা নিজের মধ্যে দেশকালের ভূমিকায় দেশ ও কালকে, সমগ্রভাবে অখণ্ডভাবে বিশ্ব-জগতের ঐক্যসূত্রটিকে, আবিষ্কার করার দ্বারাই সত্যকে উপলব্ধি করে। চোখ দিয়ে যখন

অসীমতাকে দেখতে যাই তখন আয়তনের মধ্যে সংখ্যার মধ্যে তাকে খুঁজি। এমন করে বাহিরের দিক থেকে অসীমের সত্যকে পাওয়া যায় না। যত ছোট আয়তনের মধ্যেই হোক না কেন, পরিপূর্ণতাকে যখন আত্মার দৃষ্টি দিয়ে দেখি তখন পাই অনন্ত সত্যকে। শিবকে অশিবের মধ্যে দেখা—সেও হচ্ছে আত্মার দেখা।

(ভারতপথিক, রামমোহন রায়, ৬ ভাদ্র ১৩৩৫)

আমাদের একটি পরম সৌভাগ্য এই ছিল যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের মহোচ্চ আদর্শ একদিকে আমাদের দেশে যেমন বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল তেমনি আর একদিকে তাহাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ আমাদের দেশে যেমন সহজ হইয়াছিল জগতের আর কোথাও তেমন ছিল না। একদিন আমাদের দেশের সাধকেরা ব্রহ্মকে যেমন আশ্চর্য্য উদার করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন আর কোনো দেশেই দেখে নাই। তাঁহাদের সেই ব্রহ্মোপলব্ধি একেবারে মধ্যাহ্নগগনের সূর্য্যের মতো অত্যুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, দেশকালপাত্রগত সংস্কারের লেশমাত্র বাষ্প তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই মধ্যে মানবচিত্তের এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির বার্ত্তা এমন সুগভীর রহস্যময় বাণীতে অথচ এমন শিশুর মতো অকৃত্রিম সরল ভাষায় উপনিষদ্ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে? আজ মানুষের বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান যতদূরই অগ্রসর হইতেছে, সেই সনাতন ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে তাহার অন্তরে বাহিরে কোনো বাধাই পাইতেছে না। তাহা মানুষের সমস্ত জ্ঞানভক্তিকর্ম্মকে পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, কোথাও তাহাকে পীড়িত করে না, সমস্তকেই সে উত্তরোত্তর ভূমার দিকেই আকর্ষণ করিতে থাকে, কোথাও তাহাকে কোনো সাময়িক সঙ্কোচের দোহাই দিয়া মাথা হেঁট করিতে বলে না।

(ধর্মের নবযুগ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

তাঁহারা কিছু মাত্র হাতে রাখিয়া কথা বলেন না, মানুষকে খাটো মনে করিয়া সত্যকে তাহার কাছে খাটো করিয়া ধরেন না—তাঁহারা অসত্যের আস্ফালনকে একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া বলেন, সত্যমেব জয়তে—এবং সংসারকেই যে-সকল লোক অহোরাত্র সত্য বলিয়া পাক খাইয়া ফিরিতেছে, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য। যাহাকে চোখে দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, যাহাকে জ্ঞানের শেষ বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি সত্যকে তাহার চেয়েও তাঁহারাই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন মানুষের মধ্যে যাঁহারা বড়ো হইয়া জন্মিয়াছেন।

(ধর্ম্মের অধিকার, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

উপনিষদের একটি মন্ত্র আছে—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। বিশ্ববিধাতার একটা রূপ আছে যা কেবলমাত্র সত্য, অর্থাৎ আছে ছাড়া তার অন্য বাণী নেই। তার পরবর্ত্তী কথা হচ্ছে জ্ঞানং—সে কেবলমাত্র হওয়া নয়। সত্যবোধের উপরে জ্ঞানের উপলব্ধিতে মনুষ্যত্বের বড়ো পদবী লাভ হল। সেই জ্ঞানকে যেখানে অবজ্ঞা করা হয়েছে, বুদ্ধির মোহমুক্ত বহুধা শক্তিকে প্রয়োগ না ক'রে মানবত্বকে যেখানে অস্বীকার করেছি, সেইখানে আমাদের অকৃতার্থতা। জ্ঞানের সোপান দিয়ে উপনীত হই পরমাত্মায়, কৃত্রিম কর্মের পথে নয়। তাঁর সামীপ্যে সর্বমানবের মিলন। ব্রহ্মকে উপনিষদ-কথিত বাণীতে

উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বসত্যকে স্বীকার ক'রে জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যে পেঁছিতে হবে।

(ভারতপথিক রামমোহন, মাঘ ১৩৪৭)

সত্যরূপেতে আছেন সকল ঠাঁই,
জ্ঞানরূপে তাঁর কিছু অগোচর নাই,
দেশে কালে তিনি অন্তহীন অগম্য .
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম।

(রূপান্তর, পৃঃ ৫)

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন॥ ২।৪

আমাদের ব্রহ্ম—রসো বৈ সঃ। তিনি রসস্বরূপ। আমাদের ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। এই আনন্দ সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাদের বাঁচিয়া আনন্দ। এইজন্য পুষ্পে আনন্দ, সমীরণে আনন্দ। এইজন্য পুত্রের মুখ দেখিয়া আনন্দ, বন্ধুর মিলনে আনন্দ, নরনারীর প্রেমে আনন্দ। এইজন্যই, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। এই আনন্দকে পাইলে ভয় থাকে না, আনন্দের অবসান থাকে না।

(রামমোহন রায়, চারিত্রপূজা, মাঘ ১২৯১)

যাঁহারা বলেন আমরা সেই ভূমা স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারি না সেইজন্য তাঁহাতে আমাদের স্থিতি, আমাদের শান্তি নাই তাঁহারা উপনিষৎ কথিত পরম সত্য হইতে স্খলিত হইতেছেন—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না তাঁহাতেই আমাদের পরম আনন্দ, আমাদের অনন্ত অভয়।

(ঔপনিষদ ব্রহ্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

আমাদের মধ্যে তাঁহার অক্ষয় আনন্দ যদি স্তব্ধ গভীরভাবে অন্তরে উপভোগ করি—তবে সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া অভিভূত হইব না—কারণ ঘটনাবলী তাহার সুখদুঃখ বিরহমিলন লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু লইয়া আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে ও অপসারিত হইয়া যায়। বৃহত্তম বিপদই বা কতদিনের, মহত্তম দুঃখই বা কতখানি, দুঃসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কতটুকু হরণ করে—তাঁহার আনন্দ থাকে; দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃত্যু সেই আনন্দেরই রহস্য। এই রহস্য ভেদ না করিতে পারি নাই পারিলাম—আমাদের বোধশক্তিতে এই

শাশ্বত আনন্দ এত বিপরীত আকারে এত বিবিধভাবে কেন প্রতীয়মান হইতেছে তাহা নাই জানিলাম—কিন্তু ইহা যদি নিশ্চয় জানি এক মুহূর্ত্ত সর্বত্র সেই পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকিলে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ছায়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়—যদি জানি,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দাং প্রয়ন্ত্যাভিসংবিশন্তি।

তবে—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোনো অবস্থাতেই আর ভয় পাওয়া যায় না।

(নববর্ষ, ধর্ম, ১৩০৯)

জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। সে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক্, তাহারই জয় হইবে; আমরা—যাহারা ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—

'মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী-সমানা'।

তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে; আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট-ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে : পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।

তিনি কহিবেন :
ওঁ ইতি ব্রহ্ম।
তিনি কহিবেন :
ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
তিনি কহিবেন :
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

(নববর্ষ, ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩০৯)

মানুষের মধ্যেও যখন আমাদের সত্য প্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অন্ত থাকে না—এমন স্থলে ব্রহ্মের কথা কী বলব? সেই কথায় উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন

ব্রহ্মের আনন্দ ব্রহ্মের প্রেম যিনি জেনেছেন তিনি কোনোকালেই আর ভয় পান না।

(পাওয়া, শান্তিনিকেতন, ২৫ পৌষ ১৩১৫)

উপনিষৎ বলেচেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচই ভয় পান না।

সেই ব্রহ্মের আনন্দকে কোথায় দেখব, তাকে জানব কোনখানে? অন্তরাত্মার মধ্যে।

আত্মাকে একবার অন্তর-নিকেতনে, তার নিত্যনিকতনে দেখো—যেখানে আত্মা বাহিরের হর্ষশোকের অতীত, সংসারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত, সেই নিভৃত অন্তরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখো—দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ নিশি-দিন আবির্ভূত হয়ে রয়েছে এক মুহূর্ত্ত তার বিরাম নেই। পরমাত্মা এই জীবাত্মায় আনন্দিত। যেখানে সেই প্রেমের নিরন্তর মিলন সেইখানে প্রবেশ করো, সেইখানে তাকাও। তা হলেই ব্রহ্মের আনন্দ যে কী, তা নিজের অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করবে, এবং তা হলেই কোনোদিন কিছু হতেই তোমার আর ভয় থাকবে না।

ভয় তোমার কোথায়? যেখানে আধিব্যাধি জরা-মৃত্যু বিচ্ছেদ-মিলন, যেখানে আনাগোনা, যেখানে সুখদুঃখ। আত্মাকে কেবলই যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখ—যদি তাকে কেবলই কার্য থেকে কার্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাক, তাকে বিচিত্রের সংগে চঞ্চলের সংগেই একেবারে জড়িত মিশ্রিত করে এক করে জান, তা হলেই তাকে নিতান্ত দীন করে মলিন করে দেখবে, তাহলেই তাকে মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত দেখে কেবলই শোক করতে থাকবে, যা সত্য নয় স্থায়ী নয় তাকেই আত্মার সংগে জড়িত করে সত্য বলে স্থায়ী বলে ভ্রম করবে এবং শেষকালে সে-সমস্ত যখন সংসারের নিয়মে খসে পড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন আত্মারই ক্ষয় হচ্ছে বিনাশ হচ্ছে—এমনি করে বারংবার শোকে নৈরাশ্যে দগ্ধ হতে থাকবে। সংসারকেই তুমি ইচ্ছা করে বড় পদ দেওয়াতে সংসার তোমার দত্ত সেই জোরে তোমার আত্মাকে পদে পদে অভিভূত পরাস্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মাকে অন্তরধামে নিত্যের মধ্যে ব্রহ্মের মধ্যে দেখো তা হলেই হর্ষশোকের সমস্ত জোর চলে যাবে। তা হলে ক্ষতিতে, নিন্দাতে, পীড়াতে, মৃত্যুতে কিসেই বা ভয়? জয়ী, আত্মা জয়ী। আত্মা ক্ষণিক সংসারের দাসানুদাস নয়—আত্মা অনন্তে অমরতায় প্রতিষ্ঠিত। আত্মায় ব্রহ্মের আনন্দ আবির্ভূত। সেইজন্য আত্মাকে যাঁরা সত্যরূপে জানেন তাঁরা ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্রহ্মের আনন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা—ন বিভেতি কদাচন।

(নিত্যধাম, ৭ ফাল্গুন ১৩১৫)

আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয় সে না পেতেও চায়। এইজন্যেই সংসারের সমস্ত দৃশ্যস্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে কেবলই পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চিরদিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি।

যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই আমার না-পাওয়া ব্রহ্মের আনন্দে আমি সমস্ত ক্ষুদ্র ভয় হতে যে রক্ষা পেতে পারি।

(পাওয়া ও না-পাওয়া, শান্তিনিকেতন, ৪ বৈশাখ ১৩১৬)

আনন্দ সহজ না হলে পাওয়া যায় না। উপনিষদে বলে—মন বাক্য তাঁকে না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু তাঁর আনন্দ যে পেয়েছে তার আর ভয় নেই। তাঁকে দেখা উৎসবের মধ্যে দেখা; জ্ঞানে নয়, তর্কের মধ্যে নয়। আনন্দের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুই পাবার উপায় নেই।

(আবির্ভাব, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ ১৩২১)

সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। ২।৬

এক বলিলেন বহু হইব, এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল, আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এই কথা বলে।

একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই—বহুর পরিচয়, যেখানে ভেদ; এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল।

(ছবির অঙ্গ, বিচিত্র প্রবন্ধ, আষাঢ় ১৩২২)

সকল সৃষ্টির মূলে একটা দ্বৈততত্ত্ব আছে। মানুষের সংসার রচনার গোড়ায় দুই জীবনের গ্রন্থিবন্ধন চাই। উপনিষদে আছে—এক বললেন আমি বহু হব, তার থেকে বিশ্বসৃষ্টি। মানুষের জীবনে বহু বললে আমি এক হব তার থেকে মানুষের সমাজ, দুই বললে আমি এক হব তার থেকে মানুষের সংসার। তার পর থেকে সুখে দুঃখে ভালোয় মন্দয় বৈচিত্র্যের আর অন্ত নেই। আমি পূর্ব্বে লিখেছি সৃষ্টির মূলে দ্বৈত-তত্ত্ব, কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ নয়—দ্বৈত এবং অদ্বৈতের সমন্বয়েই সৃষ্টি।

(পথে ও পথের প্রান্তে, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯২৯)

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন বহু হব—সৃষ্টির মূলবাণী এই।

কিন্তু, এই বলার মধ্যেই আছেন দুই—যিনি বললেন আর যিনি শুনলেন, সৃষ্টি-কর্ত্তার নিজের অন্তরেই এই বলিয়ে আর এই শুনিয়ে, দুপারে দুজন—মাঝখানে সৃষ্টিরচন।

(গ্রন্থপরিচয়, সাহিত্যের পথে, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন : বহু হব। নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। একেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাই অবসাদ।

(সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে, ভাদ্র ১৩৪০)

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। ২।৬

তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর

সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর-এক দিক দিয়া বলা হইয়াছে

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এতবড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়ো, তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্য রচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

(দুঃখ, ধর্ম, ১৩১৪)

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—অর্থাৎ, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু জন্মিতেছে—এ কথা যেমন সত্য, 'স তপোঽতপ্যত', অর্থাৎ, তপস্যা হইতে দুঃখ হইতেই সমস্ত-কিছু সৃষ্ট হইতেছে, এ কথা তেমনি সত্য।

(জলস্থল, পথের সঞ্চয়, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)

মানুষের সকল শিক্ষারই মূলে সংযমের সাধনা। মানুষ আপনার চেষ্টাকে সংযত করিতে শিখিলেই তবে চলিতে পারে, ভাবনাকে বাঁধিতে পারিলে তবেই ভাবিতে পারে। সেই কারুকরই সুনিপুণ যে লোক কর্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে এবং মানিয়াছে। সেই লোকই নিজের জীবনকে সুন্দর করিতে পারিয়াছে যে তাহাকে সংযত করিয়াছে। এবং সতী স্ত্রী যেমন সতীত্বের সংযমের দ্বারাই আপনার প্রেমের পূর্ণ চরিতার্থতাকে লাভ করে, তেমনি যে মানুষ পবিত্রচিত্ত, অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছাকে সত্য সীমায় বাঁধিয়াছে, সেই তাঁহাকে পায় যিনি সাধনার চরম ফল, যিনি পরম আনন্দস্বরূপ।

এই ধর্মকে বন্ধনরূপে দুঃখরূপে স্বীকার করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে, ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের মত দুর্গম। সে পথ যদি অসীমবিস্তৃত হইত তবে সকল মানুষই যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারিত, কাহারও কোথাও কোনো বাধাবিপত্তি থাকিত না। কিন্তু, সে পথ সুনিশ্চিত নিয়মের সীমায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এইজন্যই তাহা দুর্গম। ধ্রুবরূপে এই সীমা-অনুসরণের কঠিন দুঃখকে মানুষের গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ, এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দ প্রকাশমান হইতেছে। এইজন্যই উপনিষদে আছে, তিনি তপস্যার দুঃখের দ্বারাই এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

(সীমা ও অসীমতা, পথের সঞ্চয়)

অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ-সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে একই কালে একদিকে আনন্দের দ্বারা অন্য দিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলই রসে মজে থাকতে হবে না—জ্ঞানে বুঝতে হবে,

কর্মে পেতে হবে. তাঁকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ একদিকে বলেছে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করছেন, আবার আর-এক দিকে বলেছে: স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যার দ্বারা যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করেছেন। এই দুইই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করছেন, তিনি তপস্যাদ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেছেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরছি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।

(ছোটো ও বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' সৃষ্টিকর্ত্তা তপস্যা করছেন, তপস্যা করে সমস্ত সৃজন করছেন। প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্ত্তন। সৃষ্টি-কর্ত্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেন না মানুষও সৃষ্টিকর্ত্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে এই তার বড়ো পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্ছে তপস্বী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে।

(বিশ্বভারতী, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড,
৪ ভাদ্র ১৩২৯)

সৃষ্টি মানে উৎসৃষ্টি, যা সকল ব্যয়কে অতিক্রম করে দানরূপে থেকে যায়।

(ভারতপথিক রামমোহন, ১১ মাঘ ১৩৩৫)

সৃষ্টির সঙ্গে দুঃখ আছে, তাই উপনিষদে আছে, স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং-কিঞ্চ—তিনি তাপে তপ্ত হয়ে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেচেন।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ২১ আগষ্ট ১৯৩১)

'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই, প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথি মিলেছে, কেন না ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখতপস্যায় রত; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে।

প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরতপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই— ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে; রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা; তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে, পাপের মধ্যে দিয়ে, যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে, তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত-কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।

(আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪)

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
এষ হ্যেবানন্দায়তি। ২।৭

ব্রহ্মকে পাইয়া কি আমাদের হৃদয়ের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না? আমাদের ব্রহ্ম কি কেবলমাত্র নীরস দর্শনশাস্ত্রের ব্রহ্ম? তাহা যদি হইত তবে কি ঋষিরা তাঁহাদের সমস্ত জীবন এই ব্রহ্মেতে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদের সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ এই ব্রহ্মে গিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইত? প্রেমের ঈশ্বর কি বিদেশী ধর্মে আছে, আমাদের ধর্মে নাই? না, তাহা নয়। আমাদের ব্রহ্ম—রসো বৈ সঃ। তিনি রসস্বরূপ। আমাদের ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। এই আনন্দ সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাদের বাঁচিয়া আনন্দ। এইজন্য পুষ্পে আনন্দ, সমীরণে আনন্দ। এইজন্য পুত্রের মুখ দেখিয়া আনন্দ, বন্ধুর মিলনে আনন্দ, নরনারীর প্রেমে আনন্দ। এই জন্যই, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। এই আনন্দকে পাইলে ভয় থাকে না, আনন্দের অবসান থাকে না। এত পাইয়াও কি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট থাকে? এমন অসীম আনন্দের আকর ঋষিরা আবিষ্কার করিয়াছেন ও আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তবে কিসের জন্য অন্যত্র যাইব? ঋষিদের উপার্জিত, ভারতবর্ষীয়দের

উপার্জিত, আমাদের উপার্জিত এই আনন্দ আমরা পৃথিবীময় বিতরণ করিব।...... আমাদের ব্রহ্ম যেমন নিকট হইতে নিকটতর, আত্মা হইতেও আত্মীয়তর, এমন আর কোনো দেশের ঈশ্বর নহেন।

(রামমোহন রায়, চারিত্রপূজা, মাঘ ১২৯১)

কেই বা শরীর চেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন।

মহাকাশ পূর্ণ করিয়া নিরন্তর সেই আনন্দ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই আমরা প্রতিক্ষণে নিশ্বাস লইতেছি, আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রাণধারণ করিতেছি—

(ধর্মের সরল আদর্শ, ধর্ম, ১৩০৯)

আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আনন্দিত তাই আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, আমার রক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরঙ্গিত। তিনি আনন্দিত তাই সূর্যলোকের বিরাট যজ্ঞহোমে অগ্নি-উৎস উৎসারিত; তিনি আনন্দিত তাই পৃথিবীর সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া তৃণদল সমীরণে কম্পিত হইতেছে; তিনি আনন্দিত তাই গ্রহে নক্ষত্রে আলোকের অনন্ত উৎসব। আমার মধ্যে তিনি আনন্দিত তাই আমি আছি—তাই আমি গ্রহ-তারকার সহিত লোক লোকান্তরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—তাঁহার আনন্দে আমি অমর, সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার সমান মর্যাদা।

(নববর্ষ, ধর্ম, ১৩০৯)

তাঁহার প্রতি নিমেষের ইচ্ছাই আমাদের প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্ব, ...আমাদের মধ্যে তাঁহার অক্ষয় আনন্দ যদি স্তব্ধ গভীরভাবে অন্তরে উপভোগ করি—তবে সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া অভিভূত হইব না—কারণ ঘটনাবলী তাহার সুখদুঃখ বিরহমিলন লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু লইয়া আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে ও অপসারিত হইয়া যায়। বৃহত্তম বিপদই বা কতদিনের, মহত্তম দুঃখই বা কতখানি, দুঃসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কতটুকু হরণ করে—তাঁহার আনন্দ থাকে; দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃত্যু সেই আনন্দেরই রহস্য। এই রহস্য ভেদ না করিতে পারি নাই পারিলাম—আমাদের বোধশক্তিতে এই শাশ্বত আনন্দ এত বিপরীত আকারে এত বিবিধভাবে কেন প্রতীয়মান হইতেছে তাহা নাই জানিলাম—কিন্তু ইহা যদি নিশ্চয় জানি **এক মুহূর্ত সর্বত্র সেই পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকিলে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ছায়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়**—যদি জানি,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

তবে—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোনো অবস্থাতেই আর ভয় পাওয়া যায় না।

(নববর্ষ, ধর্ম, ১৩০৯)

যিনি নানাস্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন,

যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণ করতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম।

(উৎসব, ধর্ম, ১৩১২)

সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্যকারণ-পরম্পরা, সে-কথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে—কিন্তু, সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।

তিনিই রস; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।

(সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য, পৌষ ১৩১৩)

জগৎসংসার ও মানবসংসারে একটা সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বরের সত্যরূপ জ্ঞানরূপ জগতের নানা কাজে প্রকাশ পাইতেছে, আর তাঁহার আনন্দরূপ জগতের নানা রসে প্রত্যক্ষ হইতেছে। কাজের মধ্যে তাঁহার জ্ঞানকে আয়ত্ত করা শক্ত—রসের মধ্যে তাঁহার আনন্দকে অনুভব করায় জটিলতা নাই। কারণ, রসের মধ্যে তিনি যে নিজেকে প্রকাশই করিতেছেন।

মানুষের সংসারেও আমাদের জ্ঞানশক্তি কাজ করিতেছে, আমাদের আনন্দশক্তি রসের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। কাজের মধ্যে আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি, আর রসের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি। আত্মরক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, আর আত্ম-প্রকাশ আমাদের প্রয়োজনের বেশী।

(বিশ্বসাহিত্য, সাহিত্য, ১৩১৩)

পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধে নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয়? রসো বৈ সঃ। তিনিই যে রসস্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই তো তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেইজন্যই জগতের প্রকাশ আনন্দরূপমমৃতং—ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃতরূপ।

সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ-জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্ব্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেইজন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

(দুঃখ, ধর্ম, ১৩১৪)

কে যেন বিশ্বমহোৎসবের এই নীলাকাশের মহাপ্রাঙ্গণে অপূর্ণতার পাত পাড়িয়া গিয়াছেন—সেইখানে আমরা পূর্ণতার ভোজে বসিয়া গিয়াছি। সেই পূর্ণতা কত বিচিত্ররূপে এবং কত বিচিত্র স্বাদে ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে অভাবনীয় ও অনির্বচনীয় চেতনার বিস্ময়ে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

এমন নহিলে **রসস্বরূপ** রস দিবেন কেমন করিয়া। এই রস অপূর্ণতার সুকঠিন দুঃখকে কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়া উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে। এই দুঃখের সোনার পাত্রটি কঠিন বলিয়াই কি ইহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া এতবড়ো রসের ভোজকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; না, পরিবেষণের লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিব, হ'ক হ'ক কঠিন হ'ক কিন্তু ইহাকে ভরপুর করিয়া দাও, আনন্দ ইহাকে ছাপাইয়া উঠুক?

(দুঃখ, ধর্ম, ১৩১৪)

পরমাগতির কথা স্মরণ করেই উপনিষৎ বলেছেন "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—কেই বা কোনপ্রকারের কিছুমাত্র চেষ্টা করত যদি আকাশ পরিপূর্ণ করে সেই আনন্দ না থাকতেন। সেই আনন্দই বিশ্বকে অনন্তগতি দান করে রয়েছেন--আকাশপূর্ণ সেই আনন্দ আছেন বলেই আমার চোখের পাতাটি আমি খুলতে পারছি।

(এপার ওপার, শান্তিনিকেতন, ১২ পৌষ ১৩১৫)

হৃদয় আপনাকে জানে বলেই নিশ্চয় জানে তার একটি পরিপূর্ণ কৃতার্থতা অনন্তের মধ্যে আছে। ইচ্ছা কেবল তার দিকেই আছে তা নয়, অন্যদিকেও আছে-- অন্যদিকে না থাকলে সে নিমেষকালও থাকত না—এতটুকু কণামাত্রও থাকত না যাতে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপে প্রাণের ক্রিয়াটুকুও চলতে পারে। সেইজন্যেই উপনিষৎ এত জোর করে বলেছেন, "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়তি" কেই বা শরীরের চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণধারণ করত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকতেন—ইনিই আনন্দ দেন।

(প্রার্থনার সত্য, শান্তিনিকেতন, ২০ পৌষ ১৩১৫)

এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একান্ত সহজ হয়ে আসে যে, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। আমার শরীর মনের তুচ্ছতম চেষ্টাটিও থাকত না যদি আকাশপরিপূর্ণ আনন্দ না থাকতেন, তাঁরই আনন্দ, শক্তি-রূপে ছোটো বড়ো সমস্ত ক্রিয়াকেই চেষ্টা দান করছে। আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তাঁরই দানে এই জ্ঞানটিকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ করে তুলতে হবে এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য।

(আত্মসমর্পণ, শান্তিনিকেতন, ১৮ চৈত্র ১৩১৫)

পিতার দিক থেকে কেবল যে আমাদের দিকে প্রাণ প্রবাহিত হচ্ছে তা নয়। তাঁর দিক থেকে আমাদের দিকে অবিশ্রাম প্রেম সঞ্চারিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কেবল যে একটা চেষ্টা আছে গতি আছে তা নয়, একটা আনন্দ আছে। আমরা কেবল বেঁচে আছি কাজ করছি নয়, আমরা রস পাচ্ছি। আমাদের দেখায় শোনায়, আহারে বিহারে, কাজে কর্মে, মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকার যোগে নানা সুখ নানা প্রেম।

এই রসটি কোথা থেকে পাচ্ছি? এইটিই কি আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন? এটা কেবল আমার এই একটি ছোটো কারখানাঘরের সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে তৈরী হচ্ছে?

তা নয়। বিশ্বভুবনের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত। জলে স্থলে আকাশে তিনি আনন্দময়। তাঁর সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে তিনি নিয়তই প্রেরণ করছেন, সেইজন্যেই আমি বেঁচে থেকে আনন্দিত, কাজ করে আনন্দিত, জেনে আনন্দিত, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আনন্দিত। তাঁরই প্রেমের তরঙ্গ আমাকে কেবলই স্পর্শ করছে, আঘাত করছে, সচেতন করছে।

এই যে অহোরাত্র সেই ভূমার প্রেম নানা বর্ণে গন্ধে গীতে নানা স্নেহে সখ্যে শ্রদ্ধায় জোয়ারের বেগের মতো আমাদের মধ্যে এসে পড়ছে, এই বোধের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেন আমরা বলি, ওঁ পিতা নোঽসি। কেবলই তিনি প্রাণে ও প্রেমে আমাকে ভরে দিচ্ছেন, এই অনুভূতিটি যেন আমরা না হারাই। এই অনুভূতি যাঁদের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল তাঁরাই বলেছেন—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষোহ্যেবানন্দয়াতি। কেই বা কিছুমাত্র শরীর চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করত। আকাশে যদি আনন্দ না থাকতেন। এই আনন্দই সকলকে আনন্দ দিচ্ছেন।

(প্রাণ ও প্রেম, শান্তিনিকেতন, ২৮ চৈত্র ১৩১৫)

প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতরো অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন। তাঁরা এই আকাশের দিকেই চোখ তুলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—কেই বা শরীর-চেষ্টা করত কেই বা জীবনধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির মধ্যে রয়েছে। সেই পবিত্র ধূলিকে মাথায় নিয়ে, হে সর্বব্যাপী পরমানন্দ, তোমাকে সর্বত্র স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হ'ক। যাক সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে যাক। দেশের মধ্যে এই আনন্দবোধের বন্যা এসে পড়ুক। সেই আনন্দের বেগে মানুষের সমস্ত ঘরগড়া ব্যবধান চূর্ণ হয়ে যাক, শত্রু মিত্র মিলে যাক, স্বদেশ বিদেশ এক হ'ক।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

যাঁরা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা তো কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেন নি। কোন প্রেমের সুগন্ধ বসন্তবাতাস তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্ত্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভূতি তা রসময় অনুভূতি। বলেছেন রসো বৈ সঃ—সেইজন্যেই জগৎ জুড়ে এত রূপ, এত রং, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

হে অনির্বচনীয় অনন্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখলে সমস্ত চিত্ত একেবারে সকলের নিচে নত হয়ে পড়ে। বলে, দাও দাও, আমাকে তোমার ধূলার মধ্যে তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। দাও আমাকে রিক্ত করে কাঙাল করে, তারপরে দাও আমাকে রসে

ভরে দাও। চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারও চেয়ে কিছুমাত্র বড়ো হতে। তোমার যে রস হাট বাজারে কেনবার নয়, রাজভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাখবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্যে আপনাকে আর ধরে রাখতে পারছে না, চারিদিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তোমার যে-রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে, যে-রসে সকল দুঃখ, সকল বিরোধ, সকল কাড়াকাড়ির মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালোবাসার অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে না ফুরিয়ে যাচ্ছে না—মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায় মাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে, পুত্রে কন্যায়, বন্ধুবান্ধবে নানাদিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্ছে, সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ যে-অমৃত তারই একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও। তারপর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুজ ঘাসপাতার সঙ্গে আমার প্রাণকে সরস করে মিলিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি। যদি তোমারই সেই তোমার-সকলের মাঝখানেই গরিব হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুশি হয়ে যে-জায়গাটিতে কারও লোভ নেই সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমমুখশ্রীর চিরপ্রসন্ন আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে থাকি। হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে সত্য করে জানিয়ে দেবে যে, রিক্ততার প্রার্থনাই তোমার কাছে চরম প্রার্থনা। আমার সমস্তই নাও, সমস্তই ঘুচিয়ে দাও, তা হলেই তোমার সমস্তই পাব, মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অন্তরের ভিতর থেকে বলতে না পারব, রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি—তিনিই রস, যা কিছু আনন্দ সে এই রসকে পেয়েই।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি এ-কথা বুঝেছেন—ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়—শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায়, কেননা সমস্ত রসের সার তিনি : রসো বৈ সঃ।

(সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন)

উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলিতে চান জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই। আমরা তো ঐগুলোর উপরেই বেশি করিয়া জোর দিতে চাই, নহিলে মানুষের চেতনা হইবে কেমন করিয়া।

উপনিষৎ ইহার উত্তর দিয়াছেন—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেই-বা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত (অর্থাৎ কেই-বা দুঃখদ্বন্দ্ব লেশমাত্র স্বীকার করিত) আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে ততখানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব দুঃখ তো আছেই, কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে। নহিলে কিছুই থাকিত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার কর তখন আনন্দকে বাদ দাও, কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া

হয় না। অতএব তোমরা যখন বল হানাহানি করিতে করিতে যাহা টিঁকিল তাহাই সৃষ্টি, সেটা একটা অবচ্ছিন্ন কথা, ইংরেজিতে যাহাকে বলে অ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্‌শন্‌; আর আনন্দ হইতেই সমস্ত হইতেছে ও টিঁকিতেছে, এইটেই হইল পুরা সত্য।

(কবির কৈফিয়ত, সাহিত্যের পথে, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)

আমাদের জীবনও তো নানা বিক্ষেপে পরিপূর্ণ। কিন্তু মোটের উপর জীবন কি একটি উৎসব নয়? এর উৎসবে আকাশে কত আলো জ্বলছে, পৃথিবীতে ঋতুর পর ঋতু কত ফুলকাটা আস্তরণ বিছিয়েছে! মন যে নানা চিন্তায় এবং শক্তি যে নানা কর্মে ধাবিত হয়েছে তার গৌরব তার আনন্দ কি কম? তার পরে সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের নানা অভিজ্ঞতায় নিজের চৈতন্যকে যে নানা রঙে রাঙিয়ে দেখা গেল সেও তো আমাদের উৎসবেরই অঙ্গ।

যে মানুষ এই জীবন-উৎসবের মূল সুর থেকে দুঃখ বিপদ আঘাত ক্ষতিকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে তাকেই আর সব-কিছু হতে বড়ো করে দেখেছে তাকেও জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে জীবননাট্যের শেষে যখন মৃত্যুর যবনিকা পড়ল তখন কি সকল দুঃখ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল না? দুঃখ তাপ আমাদের কল্পনায় যখন চির-স্থায়িত্বের ভান করে তখনই সে বিভীষিকা; কিন্তু তার পরে দিনের শেষে? তখন তার চিহ্নই বা কই, তার বেদনাই বা কোথায়?

এই উপলব্ধির শুধু মূল্য নয়, এর একটা নিগূঢ় আনন্দ আছে; সে কথা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি মানুষ সাহিত্যে সংগীতে চিত্রকলায় এই-সমস্ত বেদনাকে নানা রসে নানা রূপে স্থায়ী করে তুলছে। তার কারণ, মানুষ জানে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ একটা বড়ো উৎসবেরই পালা—তার কোনোটাই নিজের মধ্যেই একান্ত এবং বিচ্ছিন্ন নয়, সমস্তটা জড়িয়ে একটা মস্ত প্রকাশ।

জীবনের সেই মূলগত ঐক্যকে সমগ্রতাকে সংশ্লিষ্টভাবে যিনি উপলব্ধি করলেন তিনিই তাকে পুরোপুরি ভোগ করলেন। যে মানুষ আমোদে-প্রমোদে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াল কিম্বা দুঃখশোকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল, সে পেলে না।

জীবনের সেই আনন্দময় ঐক্যকে কে স্পষ্ট করে দেখতে পায়? যে আপনার জীবনের অর্থকে একটি পরমানন্দময় একের মধ্যে গভীরভাবে জেনেছে। সেই তো জোরের সঙ্গে বলতে পারে—

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ

'কোনো জায়গায় কোনো গতি বা প্রাণক্রিয়া কিছুমাত্র থাকত না, আকাশে যদি আনন্দ না থাকত।'

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩২৬)

এই সংসারে একটা জিনিস অস্বীকার করতে পারি নে যে, আমরা বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্ব বিশ্বনিয়মের দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এ-সমস্ত নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেই হবে, নইলে নিষ্কৃতি নেই। নিয়মকে যে পরিমাণে জানি ও মানি সেই পরিমাণেই স্বাস্থ্য পাই, সম্পদ পাই, ঐশ্বর্য পাই। কিন্তু জীবনে একটা সত্য আছে যা এই নিয়মের মধ্যে আপনাকে দেখতে পায় না। কেননা, নিয়মের মধ্যে পাই বন্ধন, আত্মার মধ্যে চাই সম্বন্ধকে। বন্ধন এক-তরফা, সম্বন্ধে দুই পক্ষের সমান যোগ। যদি বলি বিশ্বব্যাপারে আমার আত্মার কোন অসীম

সম্বন্ধের ক্ষেত্র নেই, শুধু কতকগুলি বাহ্যসম্পর্কসূত্রেই সে ক্ষণকালের জন্য জড়িত —তা হলে জানব তার মধ্যে যে-একটি গভীর ধর্ম আছে নিখিলের মধ্যে তার কোনো নিত্যকালীন সাড়া নেই। কেননা, তার মধ্যে যা আছে তা কেবল সত্তার নিয়ম নয়, সত্তার আনন্দ। এই যে তার আনন্দ এ কি কেবল সংকীর্ণভাবে তারই মধ্যে। অসীমের মধ্যে কোথাও তার প্রতিষ্ঠা নেই? এর সত্যটা তা হলে কোন্‌খানে। সত্যকে আমরা একের মধ্যে খুঁজি। হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল, গাছ থেকে ফল পড়ল, পাহাড়ের উপর থেকে ঝরণা নীচে নেমে এল, এ-সমস্ত ঘটনাকে যেই এক তত্ত্বের মধ্যে দেখতে পেলে অমনি মানুষের মন বললে 'সত্যকে দেখেছি'। যতক্ষণ এই ঘটনাগুলি আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ আমাদের কাছে তারা নিরর্থক। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন, তথ্যগুলি বহু, কিন্তু তারা সত্য হয়েছে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে।

এই তো গেল বস্তুরাজ্যের নিয়মক্ষেত্র, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের আনন্দক্ষেত্রে কি এই ঐক্যতত্ত্বের কোন স্থান নেই।

আমরা আনন্দ পাই বন্ধুতে, সন্তানে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে। এগুলি ঘটনার দিক থেকে বহু, কিন্তু কোনো অসীম সত্যে কি এদের চরম ঐক্য নেই। এ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক দেন না, দেন সাধক। তিনি বলেন, 'বেদাহমেতম্, আমি যে এঁকে দেখেছি, **রসো বৈ সঃ**, তিনি যে রসের স্বরূপ—তিনি যে পরিপূর্ণ আনন্দ।' নিয়মের বিধাতাকে তো পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ঋষি যাঁকে বলছেন 'স নো বন্ধুর্জনিতা', কে সেই বন্ধু, কে সেই পিতা। যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি 'হৃদা মনীষা মনসা' সকল বন্ধুর ভিতর দিয়ে সেই এক বন্ধুকে, সকল পিতার মধ্য দিয়ে সেই এক পিতাকে দেখছেন। বৈজ্ঞানিকের উত্তরে প্রশ্নের যেটুকু বাকি থাকে তার উত্তর তিনিই দেন। তখন আত্মা বলে, 'আমার জগৎকে পেলুম, আমি বাঁচলুম।'

(মানবসম্বন্ধের দেবতা, খৃষ্ট; রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬)

আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন, সাধনায় জ্ঞান ও কর্মই যথেষ্ট। কিন্তু, বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েছেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা-কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখনই প্রাণ আসে; তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়; সৌন্দর্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।

(জাভাযাত্রীর পথ, যাত্রী, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৭)

ব্রহ্ম তো কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন—রসো বৈ সঃ—তিনি আনন্দরূপং অমৃতরূপং। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং এষোঽস্য পরম আনন্দঃ ইঁনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ব্রহ্মজ্ঞানকে তো আমরা ধর্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না— ব্রহ্মজ্ঞানী তো ব্রহ্মের ভক্ত নহেন। রস ছাড়া তো আর কিছুই মিলাইতে পারে না ভক্তি ছাড়া আর তো কিছুই বাঁধিতে পারে না। জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের এক তারের সঙ্গে আর এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না—মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটে না।

ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই।

(ধর্মের নবযুগ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

বাহির হইতে প্রাণের ভিতর-বাড়িতে গিয়া যখন প্রবেশ করি তখন কেবল একটি কথা বলি, প্রাণের আনন্দে মানুষ বাঁচিয়া আছে আর কিছু বলিবার দরকার হয় না। এই প্রাণের আনন্দেই আমরা নিঃশ্বাস লইতেছি, খাইতেছি, দেহরচনা করিতেছি, বাড়িতেছি। বাঁচিয়া থাকিব এই প্রবল আনন্দময় ইচ্ছাতেই আমাদের সমস্ত শক্তি সচেষ্ট হইয়া বিশ্বময় ছুটিয়া চলিতেছে। প্রাণের আনন্দেই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; প্রাণের নিগূঢ় আনন্দে প্রাণীরা জগতের নানা স্পর্শের তানে আপনার স্নায়ুর তারগুলিকে কেবলিই বিচিত্রতর করিয়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। বাঁচিয়া থাকিতে চাই এই ইচ্ছা সন্তানসন্ততিকে জন্ম দিতেছে, রক্ষা করিতেছে, চারিদিকের পরিবেষ্টনের সঙ্গে উত্তরোত্তর আপনার সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য সাধন করিতেছে।

এমন কি, বাঁচিয়া থাকিব এই আনন্দেই জীব মৃত্যুকেও স্বীকার করিতেছে। সে লড়াই করিয়া প্রাণের আনন্দকেই প্রাণ দিতেছে। কর্ম্মী মৌমাছিরা আপনাকে অঙ্গহীন করিতেছে কেন? সমস্ত মৌচাকের প্রজাদের প্রাণের সমগ্রতার আনন্দ তাহাদিগকে ত্যাগ-স্বীকারে প্রবৃত্ত করিতেছে। দেশের জন্য মানুষ যে অকাতরে যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে তাহার মূলে এই প্রাণেরই আনন্দ। সমস্ত দেশের প্রাণকে সে বড়ো করিয়া জানিতে চায়—সেই ইচ্ছার জোরেই সেই আনন্দের শক্তিতেই সে আপনাকেও বিসর্জন করিতে পারে।

তাই আমি বলিতেছিলাম মূলে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে দেখা যায় প্রাণের আনন্দই বাঁচিয়া থাকিবার নানা শক্তিকে নানা দিকে প্রেরণ করে। শুধু তাই নয়, সেই নানা শক্তি নানা দিক হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই আনন্দেই ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহারই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। প্রাণের এই শক্তি যেমন প্রাণের ব্যাপ্তির দিক, প্রাণের এই আনন্দ তেমনি প্রাণের সমাপ্তির দিক।

যেমন গানের তান। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, তান জিনিষটা একটা নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে; তাহার মধ্যে তালমানলয় রহিয়াছে; তাহার মধ্যে স্বরবিন্যাসের অতি কঠিন নিয়ম আছে; সেই নিয়মের মূলে স্বরতন্ত্রের গণিতশাস্ত্রসম্মত একটা দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে; শুধু তাই নয়, যে কণ্ঠ বা বাদ্যযন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া এই তান চলিতেছে তাহারও নিয়মের শেষ নাই, সেই নিয়মগুলি কার্যকারণের বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলাকে আশ্রয় করিয়া কোন্ অসীমের মধ্যে যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কেহ কিনারা পায় না। অতএব বাহিরের দিক হইতে যদি কেহ বলে এই তানগুলি অন্তহীন নিয়মশৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়াই বিস্তীর্ণ হইতেছে তবে সে একরকম করিয়া বলা যায় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে আসল কথাটি বাদ পড়িয়া যায়। মূলের কথাটি এই যে, গায়কদের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে সেই আনন্দ দুর্ব্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ।

গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুত এই তানগুলি বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহারা

মূল হইতে বাহির হইতে থাকে কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে।

(ধর্মের অর্থ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

সমস্ত মানবসমাজে সৌন্দর্যসৃষ্টির কাজে মানুষের যত প্রভূত শক্তির প্রয়োগ হচ্ছে এমন অল্প বিষয়েই। অথচ, জীবনধারণে এর প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন আত্মিক। অর্থাৎ, এর দ্বারা বাইরের জিনিসকে পাইনে, অন্তরের থেকে দীপ্তিমান হই, পরিতৃপ্ত হই। এই পরিতৃপ্ত হওয়ার দ্বারা যাঁকে জানি তাঁকে বলি, রসো বৈ সঃ।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

উপনিষদ বলেছেন, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। একটা কীটও প্রাণের ইচ্ছা করত কিসের জোরে যদি প্রাণের আনন্দ সমস্ত আকাশে না থাকত। দেশলাইয়ের মুখে একটি শিখা এক মুহূর্তের জন্যেও জ্বলে কী ক'রে, যদি সমস্ত আকাশে তার সত্য ব্যাপ্ত না থাকে। প্রাণের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির একটি অন্তরতর অর্থ পাওয়া গেল, সেই অর্থকে বলি ইচ্ছা। জড় মূক হয়ে ছিল, এই ইচ্ছার ভাষা জানাতে পারে নি; প্রাণ এসে ইচ্ছার বার্তা প্রকাশ করলে। যে বার্তা গভীরে নিহিত ছিল তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয় সম্বন্ধের ঐক্য তত্ত্ব; যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠছে—বলে উঠছে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টানবে, এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে; যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।

(অবতরণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড)

সদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। সদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। ২।৭

যখন সাধক সেই অদৃশ্যে, অশরীরে, নির্ব্বিশেষে, নিরাধারে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি—

কিন্তু যখন তিনি ইহাতে লেশমাত্র অন্তর অর্থাৎ দূরত্ব স্থাপন করেন তখন তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। সেই অদৃশ্যকে দৃশ্য, অশরীরকে শরীরী, নির্ব্বিশেষকে সবিশেষ এবং নিরাধারকে আধারবিশিষ্ট করিলে ব্রহ্মের সহিত দূরত্ব স্থাপন করা হয় এবং তখন আমাদের আত্মার অভয় প্রতিষ্ঠা চূর্ণ হইয়া যায়।

(ঔপনিষদ ব্রহ্ম. রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ২।৮।১

সূর্য্যচন্দ্র এমনি ঠিক নিয়মে উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, যে, মনে হচ্ছে তারা যেন ভয়ে চলছে, পাছে এক পল-বিপলেরও ত্রুটি ঘটে। বাতাসকে বাইরে থেকে যতই স্বাধীন বলে মনে হয়, যারা ভিতরকার খবর রাখে তারা জানে, ওর মধ্যেও পাগলামি কিছুই নেই—সমস্তই নিয়মে বাঁধা। এমন-কি, পৃথিবীতে সব চেয়ে খামখেয়ালি বলে যাকে মনে হয় সেই মৃত্যু, যার আনাগোনার কোনো খবর পাইনে বলে যাকে হঠাৎ ঘরের দরজার সামনে দেখে আমরা চমকে উঠি, তাকেও জোড়হাতে নিয়ম পালন করে চলতে হয়—একটুও পদস্খলন হবার জো নেই।

মনে কোরো না এই গূঢ় খবরটা কেবল বৈজ্ঞানিকের কাছেই ধরা পড়েছে। তপোবনের ঋষি বলেছেন : ভীষাস্মাদ্‌বাতঃ পবতে। তাঁর ভয়ে, তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে বাতাস বইছে; বাতাসও মুক্ত নয়। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে কেবল যে অগ্নি চন্দ্র সূর্য চলছে তা নয়, স্বয়ং মৃত্যু, যে কেবল বন্ধন কাটাবার জন্যেই আছে, যার নিজের কোনো বন্ধন আছে ব'লে মনেও হয় না, সেও অমোঘ নিয়মকে একান্ত ভয়ে পালন করে চলছে।

(কর্ম্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ২।৯

আমাদের উপাস্য দেবতাকেও যখন কেবলমাত্র মনুষ্যের গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে বদ্ধ করিয়া না দেখি, তাঁহাকে আমাদের ধারণার অতীত বলিয়া জানি, যখন ঋষিদের মুখে শুনি—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন

অর্থাৎ মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে সেই আনন্দকে সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি কাহা হইতেও ভয় পান না—তখনি আমাদের বদ্ধ হৃদয় মুক্তির

আশ্বাস লাভ করিতে থাকে। বাক্য মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে তিনি যে আমাদের পক্ষে শূন্যস্বরূপ তাহা নহে, তিনিই আনন্দ!

(সাকার ও নিরাকার, আধুনিক সাহিত্য, ১৩০৫)

কোনো স্বভাবভক্ত যখন মূর্ত্তিপূজার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি আপন অসামান্য প্রতিভাবলে মূর্ত্তিকে অমূর্ত্ত করিয়া দেখিতে পারেন; তাঁহার প্রত্যক্ষবর্তী কোনো সীমা তাঁহাকে অসীমের নিকট হইতে কাড়িয়া রাখিতে পারে না; তাঁহার চক্ষু যাহা দেখে তাঁহার মন তাহাকে বিদ্যুদ্‌বেগে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়; বাহিরের উপলক্ষ্য তাঁহার নিকট কেবল অভ্যাসক্রমে থাকে মাত্র, তাহাকে দূর করিবার কোনো প্রয়োজন হয় না; বিশ্বসংসারই তাঁহার নিকট রূপক, প্রতিমার তো কথাই নাই; যে-লোকের অক্ষরজ্ঞান আছে সে যেমন অক্ষরকে অক্ষররূপে দেখে না, সে যেমন কাগজের উপর যখন 'গা' এবং 'ছ' দেখে তখন ক্ষুদ্র গয়ে আকার ছ দেখে না কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনশ্চক্ষে শাখাপল্লবিত বৃক্ষ দেখিতে পায়, তেমনি তিনি সম্মুখে স্থাপিত বস্তুকে দেখিয়াও দেখিতে পান না, মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তঃকরণে সেই অমূর্ত্ত আনন্দ উপলব্ধি করেন, যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। কিন্তু এই ইন্দ্রজাল অসামান্য প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য। সে প্রতিভা চৈতন্যের ছিল, রামপ্রসাদ সেনের ছিল।

আবার প্রকৃতিভেদে কোনো কোনো স্বভাবভক্ত লোক প্রচলিত মূর্ত্তি দ্বারা ঈশ্বরের পূজাকে আত্মাবমাননা এবং এবং পরমাত্মাবমাননা বলিয়া অভ্যাসবন্ধন ছেদন করিয়া আত্মার মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করেন। মহম্মদ এবং নানক তাহার দৃষ্টান্ত।

(সাকার ও নিরাকার, আধুনিক সাহিত্য, আশ্বিন ১৩০৫)

অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখশোকের নির্ব্বাপণ সহজ নহে। কিন্তু যদি সহজ না হয় তবে দুঃখ নির্ব্বাপণের, মুক্তিলাভের অন্য যে কোন উপায় আরও কঠিন—কঠিন কেন অসাধ্য। স্বতঃপ্রবাহিত অগাধ স্রোতস্বিনীর মধ্যে অবগাহন স্নান যদি কঠিন হয় তবে স্বহস্তে ক্ষুদ্রতম কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে অবতরণ আরও কত কঠিন—তাই বা কেন, নিজর ক্ষুদ্র কলস-পরিমিত জল নদী হইতে বহন করিয়া স্নান করা সেও দুরূহতর। যখন ব্রহ্মকে অরূপ অনন্ত অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জানি তখনি তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন অতি সহজ হয়—তখনি তাঁহার দ্বারা পরিপূর্ণরূপে পরিবৃত্ত হইয়া আমাদের আমাদের ভয় দুঃখ শোক সর্ব্বাংশে দূর হইয়া যায়। এইজন্যই উপনিষদে আছে—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন,

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতেও ভয় পান না। অতএব ব্রহ্মের সেই বাক্য-মনের অগোচর অনন্ত পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের ভয় দুঃখ নিঃশেষে নিরস্ত হয়। তাঁহাকে বিশ্বজগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বাঙ্‌মনোগোচর ক্ষুদ্র করিয়া খণ্ড করিয়া দেখিলে আমরা সেই পরম অভয়, সেই ভূমা আনন্দ লাভ করিতে পারি না।

(ঔপনিষদ ব্রহ্ম, রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

যাহা নিতান্ত সহজেই পাওয়া যায়, সহজে ব্যতীত আর-কোনো উপায়ে যাহা পাওয়া যায় না, নিজর প্রভূত চেষ্টার দ্বারাতেই তাহাকে একেবারে দুর্লভ করিয়া তোলা হয়। বেষ্টন করিয়া লইয়া সংসারের আর-সমস্ত পাওয়াকে আমরা পাইতে পারি,—কেবল ধর্মকে, ধর্মের অধীশ্বরকে বেষ্টন ভাঙিয়া দিয়া আমরা পাই। সংসারের লাভের পদ্ধতিদ্বারা সংসারের অতীতকে পাওয়া যায় না। বস্তুত যেখানে আমরা না পাইবার আনন্দের অধিকারী, সেখানে পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আমরা হারাই মাত্র। সেইজন্য ঋষি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

(ধর্মের সরল আদর্শ, ধর্ম, ১৩০৯)

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

এই পৃথিবীতে যেখানে প্রবল দুর্বলকে পীড়ন করিতেছে, যেখানে ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যু প্রতিদিনের ঘটনা, বিপদ যেখানে অদৃশ্য থাকিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমাদের প্রতীক্ষা করে এবং প্রতিকারের উপায় যেখানে অধিকাংশস্থলে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, সেখানে মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে মস্তক তুলিয়া এ কী কথা বলিয়াছে যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন! আজ আমরা দুর্বল মানুষের মুখের এই প্রবল অভয়বাণী লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। সহস্রশীর্ষ ভয়ের করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে, ব্রহ্ম আছেন, ভয় নাই—অদ্য আপনাকে সেই মানুষের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব লাভ করিব।

(উৎসবের দিন, ধর্ম, ১৩১১)

আজ প্রভাতের এই মুহূর্তে পৃথিবীর অর্ধভূখণ্ডে নবজাগ্রত সংসারে কর্মের কী তরঙ্গই জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত প্রবল প্রয়াস এই সমস্ত বিপুল উদ্যোগে যত পুঞ্জ-পুঞ্জ সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদ্ গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে দূরে-দূরান্তরে হিল্লোলিত-ফেনায়িত হইয়া উঠিতেছে, সমস্তই কেবল তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার আনন্দ, ইহাই জানিয়া পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়ের কর্মকলরবের সংগীতকে একবার স্তব্ধ হইয়া অধ্যাত্মকর্ণে শ্রবণ করো—তারপরে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া বলো—সুখে দুখে তাঁহারই আনন্দ, লাভে-ক্ষতিতে তাঁহারই আনন্দ, জন্মে-মরণে তাঁহারই আনন্দ,—সেই "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

(আনন্দরূপ, ধর্ম, ১৩১৩)

আমাদের উপনিষৎ বলেছেন আমরা তাঁর কাছে যেতেও পারি নে আবার তাঁর কাছে যেতেও পারি তাঁকে পাইও না, তাঁকে পাইও। যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। এমন অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে তো এমন সুস্পষ্ট করে আর কোথাও শোনা যায়নি।

শুধু বাক্য ফেরে না মনও তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে—এ একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না। তবেই তো যাঁকে একেবারেই জানা যায় না তাঁকে এমনি জানা যায় যে আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা? আনন্দের জানা। প্রেমের জানা। এ হচ্ছে সমস্ত জানাকে লঙ্ঘন করে জানা। প্রেমের মধ্যেই না জানার সঙ্গে জানার ঐকান্তিক বিরোধ নেই। স্ত্রী তার স্বামীকে জ্ঞানের পরিচয়ে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ না জানতে পারে কিন্তু প্রেমের জানায় আনন্দের জানায় এমন করে জানতে পারে যে, কোনো জ্ঞানী তেমন করে জানতে পারে না। প্রেমের ভিতরকার এই এক অদ্ভুত রহস্য যে, যেখানে এক দিকে কিছুই জানিনে সেখানে অন্য দিকে সম্পূর্ণ জানি। প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে—তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই।

(সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫)

যিনি হৃদয় দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন, তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য প্রকাশ করতে চায় তখন বার বার ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা—মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে; সে গণ্ডির মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে এ কথা কাউকে বলে না যে, 'তুমি দুর্বল, তোমার সাধ্য নেই,' কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়—আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত ক'রে এতই নিবিড় ক'রে দেখে যে, সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য ব'লে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না—পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হোক-না, এই পরম লাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন, তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন—আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট, তাঁরাই পদে পদে ভেদবিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না-এর দিক থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক থেকে নয়—এইজন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্বাসিত করে রেখে দেন।

(সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ ১৩১৯)

ওই-যে কার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ এমন নিতান্ত সহজ সুরে বলে উঠেছে : রসো বৈ সঃ। কবির কাব্যে তিনি যে অনন্ত রস দেখতে পাচ্ছেন। জগতের নিয়ম তো তাঁর কাছে আপনার বন্ধনের রূপ দেখাচ্ছে না। তিনি যে একেবারে নিয়মের চরমকে দেখে আনন্দে

বলে উঠেছেন : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। জগতে তিনি ভয়কে দেখছেন না, আনন্দকেই দেখছেন। সেইজন্যেই বলছেন : আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি সর্বত্র জানতে পেরেছেন তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না।

(কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

উপনিষৎ বলেছেন তিনি আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, তাই একেবারেই রসরূপে আনন্দরূপে তাঁকে অব্যবহিত করে পাই, আর-কিছুতে পাবার জো নেই—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

বাক্যমন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর-কিছুতেই ভয় থাকে না।

এই সহজ বোধটি হচ্ছে প্রকাশ—এ জানা নয়, সংগ্রহ করা নয়, জোড়া দেওয়া নয়, আলো যেমন একেবারে প্রকাশ হয় এ তেমনি প্রকাশ। প্রভাত যখন হয়েছে তখন আলোর খোঁজে হাটে বাজারে ছুটতে হবে না, জ্ঞানীর দ্বারে ঘা মারতে হবে না—যা-কিছু বাধা আছে সেইগুলো কেবল মোচন করতে হবে—দরজা খুলে দিতে হবে, তা হলেই আলো একেবারে অখণ্ড হয়ে প্রকাশ পাবে।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

আনন্দ সহজ না হলে পাওয়া যায় না। উপনিষদে বলে—মন বাক্য তাঁকে না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু তাঁর আনন্দ যে পেয়েছে তার আর ভয় নেই। তাঁকে দেখা উৎসবের মধ্যে দেখা; জ্ঞানে নয়, তর্কের মধ্যে নয়। আনন্দের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুই পাবার উপায় নেই।

(আবির্ভাব, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ ১৩২১)

অখণ্ড একের মূর্ত্তি যে আকারেই থাক্-না, অসীমকেই প্রকাশ করে; এইজন্যই সে অনির্বচনীয়, মন এবং বাক্য তার কিনারা না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে।

(তথ্য ও সত্য, সাহিত্যের পথে, ভাদ্র ১৩৩১)

যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞা নির্ণয় চলে; কিন্তু যা সীমার বাইরে, যাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাই নে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ্ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁকে না পাই মনে, না পাই বচনে; তাঁকে যখন পাই আনন্দবোধে তখন আর ভাবনা থাকে না।

(সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যের পথে, শ্রাবণ ১৩৩৪)

অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। ৩।১

ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য

কোনো দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ ভাবে বুঝি ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনোই তাহাকে ঠিক সেরূপ ভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনোই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে—যে ইচ্ছা পাইতে পারে না, যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন; সমস্ত সংসার বিসর্জন দিয়া, সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া, নিভৃত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর-কোনো জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এইজন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা-অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব?

....

প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই, সার্বভৌমিকতা আপনিই তাহার মধ্যে বিরাজ করিবে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর তেমনি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর, যেমন তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর তেমনি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর, তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা তেমনি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি, তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন, এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেমনি ব্রহ্মই ভারতবর্ষের সাধনা-লব্ধ চিরন্তন আশ্রয়; জিহোবা গড্ অথবা আল্লা সেরূপ নহেন।

(ভারতপথিক রামমোহন, ৫ মাঘ ১২৯১)

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ৩।২

ব্রহ্মকে পাওয়া বলতে যদি একটা কোনো চিন্তায় মনকে বসানো বা একটা কোনো ভাবে মনকে রসিয়ে তোলা হত তা হলে কোনো কথাই ছিল না—কিন্তু ব্রহ্মকে পাওয়া তো অমন একটি ছোটো ব্যাপার নয়। তার জন্যে শিক্ষা হল কই? তার জন্যে সমস্ত চিত্তকে একমনে নিযুক্ত করলুম কই? তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানতে চাও, এই যে উপদেশ সে-উপদেশের মতো তপস্যা হল কই।

কেবল কি নিয়মিত সময়ে তাঁর নাম করা নাম শোনাই তপস্যা? জীবনের অল্প একটু উদ্বৃত্ত জায়গা তাঁর জন্যে ছেড়ে দেওয়াই কি তপস্যা? সেইটুকু মাত্র ছেড়ে দিয়েই তুমি রোজ তার হিসেব নিকেশ করে নেবার তাগাদা কর। বল যে, এই তো উপাসনা করছি কিন্তু ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন? এত সস্তায় কোন্ জিনিসটা পেয়েছ?

কেবল পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার উপযুক্ত হবার জন্যে কী তপস্যাই

না করতে হয়েছে? বাপ মার কাছে শিক্ষা, প্রতিবেশীর কাছে শিক্ষা, বন্ধুর কাছে শিক্ষা, শত্রুর কাছে শিক্ষা, ইস্কুলে শিক্ষা, আপিসে শিক্ষা; রাজার শাসন, সমাজের শাসন, শাস্ত্রের শাসন। সেজন্য ক্রমাগতই প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়েছে, ব্যবহারকে সংযত করতে হয়েছে, ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হয়েছে। এত করেও পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হয়ে উঠি নি,—কত অসতর্কতা কত শৈথিল্যবশত কত অপরাধ করি তার ঠিক নেই। তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের সমাজ সাধনা চলেইছে।

সমাজবিহারের জন্য যদি এত কঠিন ও নিরন্তর সাধনা তবে ব্রহ্মবিহারের জন্য বুঝি কেবল মাঝে মাঝে নিয়মমত দুই চারিটি কথা শুনে বা দুই চারিটি কথা বলেই কাজ হয়ে যাবে।

এরকম আশা যদি কেউ করে তবে বোঝা যাবে সে-ব্যক্তি মুখে যাই বলুক, সাধনার লক্ষ্য যেখানে সে স্থাপন করেছে সেটা একটা ছোটো জায়গা। সে জায়গায় এমন কিছু নেই যা তোমার সমস্ত সংসারের চেয়েও বড়ো—বরং এমন কিছু আছে যার চেয়ে তোমার সংসারের অধিকাংশ জিনিসই বড়ো।

এইটি মনে রাখতে হবে প্রতিদিন সকল কর্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে মনটিকে হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অনুকূল করে তুলতে হবে।

সমাজের জন্য আমাদের এই শরীর মন হৃদয়কে আমরা তো একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। শরীরকে সমাজের উপযোগী সাজ করতে অভ্যাস করিয়েছি—শরীর সমাজের উপযোগী লজ্জাসংকোচ করতে শিখেছে। তার হাত পা চাহনি হাসি সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শায়েস্তা হয়ে এসেছে। সভাস্থলে স্থির হয়ে বসতে তার আর কষ্ট হয় না, পরিচিত ভদ্রলোক দেখলে হাসিমুখে শিষ্ট সম্ভাষণ করতে তার আর চেষ্টা করতে হয় না। সমাজের সঙ্গে মিলে থাকবার জন্যে বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা অনেক ভালোলাগা মন্দলাগা অনেক ঘৃণা ভয় এমন করে গড়ে তুলতে হয়েছে যে, সেগুলি শারীরিক সংস্কারে পরিণত হয়েছে; এমন কি, সেগুলি আমাদের সহজ সংস্কারের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে। এমনি করে কেবল শরীর নয় হৃদয় মনকে প্রতিদিন সমাজের ছাঁচে ফেলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে।

ব্রহ্মবিহারের জন্যও শরীর মন হৃদয়কে সকল দিক দিয়েই সকল প্রকারেই নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে। যদি প্রশ্ন করবার কিছু থাকে তবে এইটিই প্রশ্ন করবার যে, আমি কি সেই চেষ্টা করছি? আমি কি ব্রহ্মকে পেয়েছি, সে প্রশ্ন এখন থাক্।

প্রথমে শরীরটাকে তো বিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। আমাদের চোখ মুখ হাত পাকে এমন করতে হবে যে, পবিত্র সংযম তাদের পক্ষে একেবারে সংস্কারের মতো হয়ে আসবে। সম্মুখে যেখানে লজ্জার বিষয় আছে সেখানে মন লজ্জা করবার পূর্বে চক্ষু আপনি লজ্জিত হবে—যে-ঘটনায় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে সেখানে মন বিবেচনা করবার পূর্বে বাক্য আপনি ক্ষান্ত হবে, হাত পা আপনি স্তব্ধ হবে। এর জন্যে মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের চেষ্টার প্রয়োজন। তনুকে ভাগবতী তনু করে তুলতে হবে— এ তনু তপোবনের সঙ্গে কোথাও বিরোধ করবে না, অতি সহজেই সর্বত্রই তাঁর অনুগত হবে।

প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংযত করে আমাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করতে হবে, অর্থাৎ ভগবানের যে-ইচ্ছা সর্বজীবের মধ্যে প্রসারিত, নিজের রাগ-দ্বেষ লোভ-ক্ষোভ ভুলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ

দিতে হবে। সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যহই আমাদের ইচ্ছাকে অল্প অল্প করে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হতে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মকে পাব। এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যদি বলি যে দূর লক্ষ্য স্থানে পৌঁছোচ্ছি না কেন সে যেমন অসংগত বলা, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে স্বার্থবেষ্টনের কেন্দ্রে অচল হয়ে বসে কেবলমাত্র জপতপের দ্বারা ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন, এ প্রশ্নও তেমনি অদ্ভুত।

(সাধন, ১০ চৈত্র ১৩১৫)

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। ৩।৬

ভালোবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনো অর্থই থাকে না। বিশ্বজগতে সর্বব্যাপী আকর্ষণ শক্তি যেমন, ছোট বড় সর্বত্রই তার যেমন কাজ, অন্তর জগতে সেই রকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণেই আমরা বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য ও হৃদয়ের মধ্যে প্রেম অনুভব করি; জগতের ভিতরকার সেই অনন্ত আনন্দের ক্রিয়া আমাদের মনের ভিতরেও কার্য করে। আমরা সেটাকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তবে তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে আমরা কেন আনন্দ পাই তার একটি মাত্র সদুত্তর হচ্ছে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

(ছিন্নপত্র, ১৩ আগষ্ট ১৮৯৪)

সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্বাপেক্ষা সরল, সর্বাপেক্ষা সহজ। ব্রহ্মের এই ভাব গ্রহণ করিবার জন্য কিছু কল্পনা করিতে হয় না, কিছু রচনা করিতে হয় না, দূরে যাইতে হয় না, দিনক্ষণের অপেক্ষা করিতে হয় না,—হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবল-মাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয় উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।

আমি একদা একখানি নৌকায় একাকী বাস করিতেছিলাম। একদিন সায়াহ্নে একটি মোমের বাতি জ্বালাইয়া পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শ্রান্ত হইয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম, অমনি এক মুহূর্তেই পূর্ণিমার চন্দ্রালোক চারিদিকের

মুক্ত বাতায়ন দিয়া আমার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিল। আমার স্বহস্তজ্বালিত একটি-মাত্র ক্ষুদ্র বাতি এই আকাশপরিপ্লাবী অজস্র আলোককে আমার নিকট হইতে অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপরিমেয় জ্যোতিঃসম্পদ লাভ করিবার জন্য আমাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই, কেবল সেই বাতিটি এক ফুৎকারে নিবাইয়া দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে কী পাইলাম। বাতির মতো কোনো নাড়িবার জিনিস পাই নাই—সিন্দুকে ভরিবার জিনিস পাই নাই—পাইয়াছিলাম আলোক আনন্দ সৌন্দর্য শান্তি। যাহাকে সরাইয়াছিলাম, তাহার চেয়ে অনেক বেশি পাইয়াছিলাম—অথচ উভয়কে পাইবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

(ধর্মের সরল আদর্শ, ধর্ম, ১৩০৯)

এই যে যাহা-কিছু হইয়াছে, ইহা সমস্তই আনন্দ হইতেই জাত। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগৎ আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে, প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণ সত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ, জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপের উপলব্ধি। জগৎ আছে—এটুকু সত্য কিছুই নহে, কিন্তু জগৎ আনন্দ—এই সত্যই পূর্ণ।

(উৎসব, ধর্ম, ১৩১২)

আনন্দ থেকেই এই যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্ছে না—সেই স্বয়ম্ভূ সেই স্বতউৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।

(প্রেম, শান্তিনিকেতন)

বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানা প্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এই সীমা প্রকৃতি কোথাও থেকে মাথায় করে এনেছে তা তো নয়। তার ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে—নতুবা, ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এইজন্যেই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন—কেবল-মাত্র ইচ্ছার দ্বারা, আনন্দের দ্বারা। সেই কারণেই উপনিষৎ বলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" সেইজন্যেই বলেন "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর যা কিছু রূপ তা আনন্দরূপ—অর্থাৎ মূর্তিমান ইচ্ছা—ইচ্ছা আপনাকে সীমায় বেঁধেছে, রূপে বেঁধেছে।

(পার্থক্য, শান্তিনিকেতন, ২৩ পৌষ ১৩১৫)

আমাদের দেশের জ্ঞানীসম্প্রদায় কর্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াকেই তাঁরা মুক্তি বলেন। এইজন্য কর্মক্ষেত্র প্রকৃতিকে তাঁরা ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এইজন্য ব্রহ্মকেও তাঁরা নিষ্ক্রিয় বলেন এবং যা কিছু জাগতিক ক্রিয়া, একে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্তু উপনিষৎ বলেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম।

যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, যাঁর দ্বারা জীবন ধারণ করছে, যাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করছে তাঁকে জানতে ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এই সকল কর্মের দ্বারা বন্ধ?

এক দিকে কর্ম আপনিই হচ্ছে, আর-এক দিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোন যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরা বলতে পারি নে, তেমনি তাঁর কর্ম মাকড়সার জালের মতো শামুকের খোলার মতো তাঁর নিজেকে বন্ধ করছে এ কথাও বলা চলে না।

এইজন্যই পরক্ষণে ব্রহ্মবাদী বলছেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হইতে সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।

কর্ম দুই রকমের হয়—এক অভাবের থেকে হয়, আর প্রাচুর্য থেকে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে হয় বা আনন্দ থেকে হয়।

প্রয়োজন থেকে অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।

এইজন্য আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া—আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তি দান করতে থাকে। সেইজন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্মের দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যে তিনি আনন্দ এইজন্য তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্তস্বরূপ।

(কর্ম,শান্তিনিকেতন, ২৭ পৌষ ১৩১৫)

আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামুক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কী? পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই। পরমাত্মার স্বভাব কী? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন।

তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থই হচ্ছে বিসর্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যতা নেই। আনন্দের ধর্মই হচ্ছে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জন করা। আমরাও তা জানি। আমাদের আনন্দ আমাদের প্রেম বিনা কারণে আত্মবিসর্জনেই আপনাকে চরিতার্থ করে। এইজন্যেই উপনিষৎ বলেন—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেই আনন্দময়ের স্বভাবই এই।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি সাধর্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুশি নয় সে দিয়ে খুশি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মতো জেগে ওঠে তা হলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না। যখন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি, দেব, তখনই আমাদের আনন্দের দিন। তখনই সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়, সমস্ত তাপ শান্ত হয়ে যায়।

(স্বভাবকে লাভ, শান্তিনিকেতন, ৫ চৈত্র ১৩১৫)

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ আপনাকে নানা রূপে নানা

কালে প্রকাশ করছেন, আমরা সেই নানা রূপকেই কেবল দেখছি, কিন্তু আমাদের আত্মা দেখতে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোনো আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলই বস্তুর পর বস্তু, ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে ক্লিষ্ট করে আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজছে, আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজছে। নইলে সে কোনোখানেই বলতে পারছে না—ওঁ। বলতে পারছে না—হাঁ, পাওয়া গেল।

(ধীর যুক্তাত্মা, শান্তিনিকেতন, ২২ চৈত্র ১৩১৫)

উপনিষৎ বলছেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবরে জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন-যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তার পরে কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছৃত হয়ে উঠুক না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রেই তার লীলা চলছে—তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

(চির নবীনতা, শান্তিনিকেতন)

জগতে আনন্দযজ্ঞে তাঁর যে নিমন্ত্রণ আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি তাকে আমাদের কেউ কেউ স্বীকার করতে চাচ্ছে না। তারা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করে দেখেছে। তারা বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সমস্তই কেবল নিয়ম। তারা বলছে ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে—দেখছি যা-কিছু সব নিয়মেই চলেছে, এর মধ্যে আনন্দ কোথায়? তারা আমাদের উৎসবের আনন্দরব শুনে দূরে বসে মনে মনে হাসছে।......................ভয়েই সমস্ত চলছে, কোথাও একটু ফাঁক নেই। তবে আর আনন্দের কথাটা কেন? যেখানে কারখানা-ঘরে আগাগোড়া কল চলছে সেখানে কোনো পাগল আনন্দের দরবার করতে যায় না।

বাঁশিতে তবু তো আজ আনন্দের সুর উঠেছে, এ কথা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষকে তো মানুষ এমন করে ডাকে, বলে, চল্ ভাই, আনন্দ করবি চল্। এই নিয়মের রাজ্যে এমন কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হয় কেন।

সে দেখতে পাচ্ছে, নিয়মের কঠিন দণ্ড একেবারে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে যে লতাটি উঠেছে তাতে কি আমরা কোনো ফুল ফুটতে দেখি নি? দেখি নি কি কোথাও শ্রী এবং শান্তি, সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য? দেখছি নে কি প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য, বৈচিত্র্যের অজস্রতা?

নিশ্বের নিয়ম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই চরমরূপে প্রচার করছে না—একটি অনির্বচনীয়ের পরিচয় তাকে চারিদিকে আচ্ছন্ন করে প্রকাশ পাচ্ছে। সেইজন্যেই যে উপনিষৎ একবার বলেছেন 'অমোঘ শাসনের ভয়ে যা-কিছু সমস্ত চলেছে' তিনি আবার

বলেছেন : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ থেকেই এই যা-কিছু সমস্ত জন্মাচ্ছে। যিনি আনন্দস্বরূপ, মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশ-কালে আপনাকে প্রকাশ করছেন।

কবির মুক্ত আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করবার বেলায় ছন্দের বাঁধন মানে। কিন্তু, যে লোকের নিজের মনের মধ্যে ভাবের উদ্বোধন হয় নি সে বলে, এর মধ্যে আগাগোড়া কেবল ছন্দের ব্যায়ামই দেখছি। সে নিয়ম দেখে, নৈপুণ্য দেখে, কেন না সেইটেই চোখে দেখা যায়; কিন্তু যাকে অন্তর দিয়ে দেখা যায় সেই রসকে সে বোঝে না, সে বলে রস কিছুই নেই। সে মাথা নেড়ে বলছে, সমস্তই যন্ত্র, কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

কিন্তু, ওই-যে কার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ এমন নিতান্ত সহজ সুরে বলে উঠেছে : রসো বৈ সঃ। কবির কাব্যে তিনি যে অনন্ত রস দেখতে পাচ্ছেন। জগতের নিয়ম তো তার কাছে আপনার বন্ধনের রূপ দেখাচ্ছে না। তিনি যে একেবারে নিয়মের চরমকে দেখে আনন্দে বলে উঠেছেন : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। জগতে তিনি ভয়কে দেখছেন না, আনন্দকেই দেখছেন।

(কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

বিশ্বজগতেও আমরা কেবলই পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু উৎপন্ন হইতেছে? অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু-উৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না?

(যাত্রার পূর্বপত্র, পথের সঞ্চয়, আষাঢ় ১৩১৯)

জগতে শক্তির লড়াইটাকেই প্রধান করিয়া দেখা অবচ্ছিন্ন দেখা—অর্থাৎ, গানকে বাদ দিয়া সুরের কসরৎকে দেখা। আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সব চেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

(কবির কৈফিয়ত, সাহিত্যের পথে, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)

আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে-আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে, তাকে অস্বীকার করে নয়।

(আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪)

কবির বীণায় বরাবর বাজিবে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হইবে না : Truth is beauty, beauty truth। ইহাতে আপিস আদালত কলেজ লাঠি-হাতে তাড়া করিয়া আসিলেও সকল কোলাহলের উপরও এই সুর বাজিবে—সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের আলোক-বীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে—আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—যাহা-কিছু সমস্তই

পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধুলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার দিকে নহে।

(কবির কৈফিয়ৎ, সাহিত্যের পথে, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)

জগৎ জুড়ে মানুষের দুঃখ, আমার মনও বিষণ্ণ। গান দিয়ে এই দুঃখকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে বিশ্বাত্মার অতল গভীরতা থেকে চির আনন্দের বাণীটি তুলে এনে যদি পৃথিবীর ক্রোধজর্জর বা লজ্জাভারাবনত মানুষগুলিকে শুনিয়ে বলতে পারতুম— 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' এই যে প্রকাশমান জগৎ, এ আর কিছুই নয়, তাঁর অন্তহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দেই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, ৬ মে ১৯২১; অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমতী মলিনা রায়)

সর্বমানবের ত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা জন্মেছি। ব্রহ্ম যিনি, সৃষ্টির মধ্যেই আপনাকে উৎসর্গ করে তাঁর আনন্দ তাঁর সেই ত্যাগের ক্ষেত্রে জীবসকল জীবিত থাকে, এবং তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করে ও বিলীন হয়—এ যেমন অধ্যাত্মলোকের কথা, তেমনি চিত্ত-লোকেও মানুষ মহামানবের ত্যাগের লোকে জন্মলাভ করেছে ও সঞ্চরণ করছে, এই কথা উপলব্ধি করতে হবে; তবেই আনুষঙ্গিক শিক্ষাকে আমরা পূর্ণতা ও সর্বাঙ্গীণতা দান করতে পারব।

(বিশ্বভারতী, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড. ৯ পৌষ ১৩৩৯)

ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা-মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে—ইতিহাসের অতীতে সে, মানবের আত্মার কেন্দ্রস্থলে। আমাদের উপনিষদে এ কথা জেনেছিল এবং সেই উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব।

(সাহিত্যের স্বরূপ, মে ১৯৪১)

ঐতরেয়োপনিষৎ

আবিরাবীর্ম এধি (শান্তিপাঠ)

বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয়ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়।—বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল—তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে, এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। মাতাকে যদি কেবলই উপদেশ দিতে হয় যে, তুমি ছেলের কাজে অনবধান হইয়ো না, তোমাকে এই করিতে হইবে, তোমাকে এই করিতে হইবে না, তবে উপদেশের আর অন্ত থাকে না—কিন্তু যদি বলি তুমি ছেলেকে ভালোবাসো, তবে দ্বিতীয় কোনো কথাই বলিতে হয় না, সমস্ত সরল হইয়া আসে। ফলত সেই ভালোবাসা ব্যতিরেকে মাতার কর্ম সম্ভবপর হইতেই পারে না। তেমনি যদি বলি, **অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ হউক,** তবে পাপ সম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলিতে হয় না। পাপের দিক হইতে যদি দেখি, তবে জটিলতার অন্ত নাই—তাহা ছেদন করিয়া, দাহন করিয়া, নির্মূল করিয়া কেমন করিয়া যে বিনাশ করিতে হয়, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না—সেদিক হইতে দেখিতে গেলে ধর্মকে বিরাট বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয়—কিন্তু আনন্দময়ের দিক হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ পাপ কুহেলিকার মতো অন্তর্হিত হয়। পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করিয়া, দুর্গম করিয়া ধর্মকে দুর্বল করিয়াছে।

(ধর্মের সরল আদর্শ, ধর্ম, ১৩০৯)

হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। অন্তরে বাহিরে তুমি উদ্ভাসিত হইলেই, প্রবৃত্তির দাসত্ব জগতের দৌরাত্ম্য কোথায় চলিয়া যায়—তখন তোমার মধ্যে সমস্ত দেশকালের একটি অনবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য একটি পরিপূর্ণ সমাপ্তি দেখিয়া সুগভীর শান্তির মধ্যে আমরা নিমগ্ন ও নিস্তব্ধ হইয়া যাই। তখন, যে চেষ্টাহীন বলে সমস্ত জগৎ সহজে বিধৃত তাহা আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, যে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যে নিখিল ভুবন পরস্পর গ্রথিত তাহা আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়। তখন আমি যে তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি এ-কথা মনে থাকে না—তোমার সমস্ত জগতের একসঙ্গে তুমিই আমাকে লইতেছ এই কথাই আমার মনে হয়।

সেই স্বপ্রকাশ যতদিন না আমাদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিবেন ততদিন যেন নিজের ভিতর হইতে তাঁহার দিকে বাহির হইবার একটা দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সেই পথ দিয়া প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া আসিতে পারি। আমাদের জীবনের একটা দিনের সহিত আর-একটা দিনের যে বন্ধন সে যেন শুধু

স্বার্থের বন্ধন না হয়, জড় অভ্যাস-সূত্রের বন্ধন না হয়—একটা বৎসরের সহিত আর-একটা বৎসরকে যেন প্রাত্যহিক নিবেদনের দ্বারা তাঁরই সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি। এমন কোন সূত্রে যেন মানবজীবনের দুর্লভ মুহূর্ত্ত-গুলিকে না বাঁধিতে থাকি যাহা মৃত্যুর স্পর্শমাত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

(নববর্ষ, ধর্ম, ১৩০৯)

তুমি তো স্বপ্রকাশ, আপনা-আপনি প্রকাশিত আছই, এখন, আমার কাছে প্রকাশিত হও, এই আমার প্রার্থনা। তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই, আমার পক্ষে সেই প্রকাশ উপলব্ধির সুযোগ বাকি আছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখিব, ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণ প্রকাশ হইলেও আমার কাছে দেখা দিবে না। সূর্য তো আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হইয়াই আছেন, এখন আমারই কেবল চোখ খুলিবার, জাগ্রত হইবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোখ খুলিবার ইচ্ছা হয়, আমরা চোখ খুলি, তখন সূর্য আমাদিগকে নূতন করিয়া কিছু দেন না, তিনি যে আপনাকে আপনি দান করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতে পারি।

(প্রার্থনা, ধর্ম, ১৩১১)

এই প্রার্থনা করো, 'আবিরাবীর্ম এধি'—হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। আমার নিকটে প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশ আমাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত মানবের নিকট সহজে দীপ্যমান হইয়া উঠিবে—এইরূপে আমার জীবন সমস্ত মানবের নিত্য-জীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকিবে, আমার এই কয়দিনের মানবজন্ম চিরদিনের জন্য সার্থক হইবে।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১১)

হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও।

হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও—এ প্রকাশ তো সহজ নহে। এ যে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মানুষের জ্ঞানে মানুষের কর্মে মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই।

(দুঃখ, ধর্ম, ১৩১৪)

হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও তা হলেই আমার সমস্ত প্রেম সার্থক হবে। আবীরাবীর্ম এধি—হে আবিঃ হে প্রকাশ, তুমি তো চিরপ্রকাশ, কিন্তু তুমি একবার আমার হও, আমার হয়ে প্রকাশ পাও—আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হ'ক।

(প্রার্থনা, শান্তিনিকেতন, ২রা পৌষ ১৩১৫)

হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলো--আমার আর কিছুই বাকি রেখো না, কিছুই না, অহংকারের লেশমাত্র না। আমাকে একেবারেই তুমিময় করে তোলো। কেবলই তুমি, তুমি, তুমিময়। কেবলই তুমিময় জ্যোতি, কেবলই তুমিময় আনন্দ।

(প্রার্থনা, শান্তিনিকেতন, ১৪ ফাল্গুন ১৩১৫)

হে স্বপ্রকাশ, আত্মা যেন নিজের সকল প্রকাশের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশ করে; নিজের অহংকেই প্রকাশ না করে; মানবজীবনকে একেবারে নিরর্থক করে না দেয়।
(আত্মার প্রকাশ, শান্তিনিকেতন, ৮ই চৈত্র ১৩১৫)

মানুষের নানা জাতি আজ নানা অবস্থার মধ্যে আছে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ এক রকমের নয়। তাদের ইতিহাস বিচিত্র, তাদের সভ্যতা ভিন্ন রকমের। কিন্তু, যে জাতি যে রকম পরিণতিই পাক-না কেন, সকলেই কোনো-না-কোনো আকারে আপনার চেয়ে বড়ো আপনাকে চাচ্ছে। এমন একটি বড়ো যা তার সমস্তকে আপনার মধ্যে অধিকার করে সমস্তকে বাঁধবে, জীবনকে অর্থদান করবে। যা সে পেয়েছে, যা তার প্রতিদিনের, যা নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হচ্ছে, যা তার কেনা-বেচার সামগ্রী, তা নিয়ে তো তাকে থাকতেই হয়। সেই সঙ্গে, যা তার সমস্তের অতীত, যা তার দেখাশোনা খাওয়াপরার চেয়ে বেশী, যা নিজেক অতিক্রম করবার দিকে তাকে টানে, যা তাকে দুঃসাধ্যের দিকে আহ্বান করে, যা তাকে ত্যাগ করতে বলে, যা তার পূজা গ্রহণ করে, মানুষ তাকেই আপনার মধ্যে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে। তাকেই আপনার সমস্ত সুখ-দুঃখের চেয়ে বড়ো বলে স্বীকার করছে। কেন না, মানুষ জানছে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সেই দিকেই; তার প্রতিদিনের খাওয়া-পরা আরাম-বিরামের দিকে নয়। সেই দিকেই চেয়ে মানুষ দু হাত তুলে বলছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। সেই দিকে চেয়েই মানুষ বুঝতে পারছে যে, তার মনুষ্যত্ব তার প্রতি-দিনের তুচ্ছতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার প্রবৃত্তির আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করতে হবে; তাকে যুক্ত করতে হবে। সেইদিকে চেয়েই মানুষ একদিকে আপনার দীনতা আর-এক দিকে আপনার সুমহৎ অধিকারকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে এবং সেইদিকে চেয়েই মানুষের কণ্ঠ চিরদিন নানা ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। প্রকাশ চায়, মানুষ প্রকাশ চায়; ভূমাকে আপনার মধ্যে দেখতে চায়; তার পরম-আপনকে আপনার মধ্যে পেতে চায়। এই প্রকাশ তার আহার-বিহারের চেয়ে বেশি, তার প্রাণের চেয়ে বেশি। এই প্রকাশই তার প্রাণের প্রাণ, তার মনের মন। এই প্রকাশই তার সমস্ত অস্তিত্বের পরমার্থ।

মানুষের জীবনে এই ভূমার উপলব্ধিকে পূর্ণতর করবার জন্যেই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কী সেটা তাঁরাই প্রকাশ করতে আসেন। এই প্রকাশ সর্ব্বাঙ্গীণ রূপে কোনো ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এমন কথা বলতে পারি নে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁদের কাজ। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ কেবলই সুগম করে দিচ্ছেন, সমস্ত গানটাকে তার সমস্ত তালে লয়ে জাগাতে না পারলেও তাঁরা মূল সুরটিকে কেবলই বিশুদ্ধ করে তুলছেন —সেই সুরটি তাঁরা ধরিয়ে দিচ্ছেন।

যিনি ভক্ত তিনি অসীমকে মানুষের মধ্যে ধরে মানুষের আপন সামগ্রী করে তোলেন। আমরা আকাশে সমুদ্রে পর্বতে জ্যোতিষ্কলোকে, বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়ম-তন্ত্রের মধ্যে, অসীমকে দেখি; কিন্তু সেখানে আমরা অসীমকে আমার সমস্ত দিয়ে দেখতে পাই নে। মানুষের মধ্যে যখন অসীমের প্রকাশ দেখি তখন আমরা অসীমকে আমার সকল দিক দিয়েই দেখি এবং যে দেখা সকলের চেয়ে অন্তরতম সেই দেখা দিয়ে

দেখি। সেই দেখা হচ্ছে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছাকে দেখতে পাওয়া। জগতের নিয়মের মধ্যে আমরা শক্তিকে দেখতে পাই; কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে দেখতে গেলে ইচ্ছার মধ্যে ছাড়া আর কোথায় দেখব? ভক্তের ইচ্ছা যখন ভগবানের ইচ্ছাকে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে প্রকাশ করতে থাকে তখন যে অপরূপ পদার্থ দেখি জগতে সে আর কোথায় দেখতে পাব? অগ্নি জল বায়ু সূর্য তারা যত উজ্জ্বল যত প্রবল যত বৃহৎ হোক এই প্রকাশকে সে তো দেখাতে পারে না। তারা শক্তিকে দেখায়, কিন্তু শক্তিকে দেখানোর মধ্যে একটা বন্ধন একটা পরাভব আছে। তারা নিয়মকে রেখামাত্র লঙ্ঘন করতে পারে না। তারা যা তাদের তাই হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই, কেননা তাদের লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। এমনতরো জড়-যন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছার আনন্দ পূর্ণভাবে প্রকাশ হতে পারে না।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এই ইচ্ছার জায়গাটাতে আপনার সর্বশক্তিমত্তাকে সংহরণ করেছেন—এইখানে তাঁর থেকে তাকে কিছু পরিমাণ স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন; সেই স্বাতন্ত্র্যে তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন না। কেননা, সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রটুকুতে দাসের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ নয়, সেখানে প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ের মিলন। সেইখানেই সকলের চেয়ে বড়ো প্রকাশ—ইচ্ছার প্রকাশ, প্রেমের প্রকাশ। সেখানে আমরা তাঁকে মানতেও পারি, না মানতেও পারি; সেখানে আমরা তাঁকে আঘাত দিতে পারি। সেখানে আমরা ইচ্ছাপূর্বক তাঁর ইচ্ছাকে গ্রহণ করব, প্রীতির দ্বারা তাঁর প্রেমকে স্বীকার করব—সেই একটি মস্ত অপেক্ষা একটি মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবল-মাত্র এই ফাঁকটুকুতেই সর্বশক্তিমানের সিংহাসন পড়ে নি। কেননা, এইখানে প্রেমের আসন পাতা হবে।

এই যেখানে ফাঁক রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য অন্যায় পাপ মলিনতার অবকাশ ঘটেছে; কেননা, এইখান থেকেই তিনি ইচ্ছা করেই একটু সরে গিয়েছেন। এইখানে মানুষ এতদূর পর্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে, আমরা সংশয়ে পীড়িত হয়ে বলে উঠি জগদীশ্বর যদি থাকতেন তবে এমনটি ঘটতে পারত না; বস্তুত সে জায়গায় জগদীশ্বর আচ্ছন্নই আছেন, সে জায়গা তিনি মানুষকেই ছেড়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর নিয়ম একেবারে চলে গেছে তা নয়; কিন্তু মা যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে চলতে শেখবার সময় তার কাছে থাকেন অথচ তাকে ধরে থাকেন না, তাকে খানিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন, এও সেই রকম। মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্রটুকুতে তিনি আছেন, অথচ নেই। এইজন্য সেই জায়গাটাতে আমরা এত আঘাত করছি, আঘাত পাচ্ছি, ধুলোয় আমাদের সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠছে, সেখানে আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর অন্ত নেই, সেইখানেই আমাদের যত পাপ। সেইখান থেকেই মানুষের এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠছে: আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। বৈদিক ঋষির ভাষায় এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশে পথ চলতে চলতে শোনা যায় এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো অক্ষরবোধ হয় নি। সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরলচিত্তের সরল সুরের সারি গান: মাঝি, তোর বইঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না! তোমার হাল তুমি ধরো, এই তোমার জায়গায় তুমি এস, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না। আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখো না। হে প্রকাশ, সেখানে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

এত বাধা বিরোধ, এত অসত্য, এত জড়তা, এত পাপ কাটিয়ে উঠে তবে ভক্তের

মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। জড়জগতে তাঁর প্রকাশের যে বাধা নেই তা নয়; কারণ, বাধা না হলে প্রকাশ হতেই পারে না। জড়জগতে তাঁর নিয়মই তাঁর শক্তিকে বাধা দিয়ে তাকে প্রকাশ করে তুলছে; এই নিয়মকে তিনি স্বীকার করেছেন। আমাদের চিত্তজগতে যেখানে তাঁর প্রেমেরে মিলনকে তিনি প্রকাশ করবেন সেখানে সেই প্রকাশের বাধাকে তিনি স্বীকার করেছেন, সে হচ্ছে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। এই বাধার ভিতর দিয়ে যখন প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়—যখন ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা, প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ মিলে যায়, তখন ভক্তের মধ্যে ভগবানের এমন একটি আবির্ভাব হয় যা আর কোথাও হতে পারে না।

এইজন্যই আমাদের দেশে ভক্তের গৌরব এমন করে কীর্ত্তন করেছে যা অন্যদেশে উচ্চারণ করতে লোকে সংকোচ বোধ করে। যিনি আনন্দময়, আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, সেই প্রকাশে যাঁর আনন্দ, তিনি তাঁর সেই আনন্দকে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে প্রকাশ করেন ভক্তের জীবনে। এই প্রকাশের জন্যে তাঁকে ভক্তের ইচ্ছার অপেক্ষা করতে হয়; এখানে জোর খাটে না। রাজার পেয়াদা প্রেমের রাজ্যে পা বাড়াতে পারে না। প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি নেই। এইজন্যে ভক্ত যেদিন আপনার অহংকারকে বিসর্জন দেয়, ইচ্ছা করে আপনার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, সেইদিন মানুষেরর মধ্যে তাঁর আনন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন। সেইজন্যেই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নিত্য-নিত্যই তাঁর সৌন্দর্যের লিপি এসে পেঁাচচ্ছে, তাঁর রসের আঘাত কত রকম করে আমাদের চিত্তে এসে পড়ছে—এবং ঘুম থেকে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বিপদ মৃত্যু দুঃখ শোক ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন; সেইজন্যেই আমাদের চিত্তও সকল বিস্মৃতি সকল অসাড়তার মধ্যেও গভীরতরভাবে সেই প্রকাশকে চাচ্ছে। বলছে : আবিরাবীর্য এধি।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম প্রার্থনা : আবিরাবীর্য এধি। হে আবিঃ, হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। মানুষের যা দুঃখ সে অপ্রকাশের দুঃখ—যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি এখনও তার মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছেন না; তার হৃদয়ের উপর অনেকগুলো আবরণ রয়ে গেছে; এখনও তার মধ্যে বাধা-বিরোধের সীমা নেই; এখনও সে আপনার প্রকৃতির নানা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারছে না; এখনও তার একভাগ অন্য ভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তার স্বার্থের সঙ্গে পরমার্থের মিল হচ্ছে না, এই উচ্ছৃংখলতার মধ্যে যিনি আবিঃ তাঁর আবির্ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না; ভয় দুঃখ শোক অবসাদ অকৃতার্থতা এসে পড়ছে—যা গিয়েছে তার জন্যে বেদনা যা আসবে তার জন্য ভাবনা চিত্তকে মথিত করছে, আপনার অন্তর বাহির সমস্তকে নিয়ে জীবন প্রসন্ন হয়ে উঠছে না। এইজন্যেই মানুষের প্রার্থনা : রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা করো। যেখানে সেই আবিঃ'র আবির্ভাব সম্পূর্ণ নয় সেখানে প্রসন্নতা নেই; যে দেশে সেই আবিঃ'র আবির্ভাব বাধাগ্রস্ত সেই দেশ থেকে প্রসন্নতা চলে গেছে; যে গৃহে তাঁর আবির্ভাব প্রতিহত সেখানে ধনধান্য থাকলেও শ্রী নেই; যে চিত্তে তাঁর প্রকাশ সমাচ্ছন্ন যে চিত্ত দীপ্তিহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, সে কেবল স্রোতের শৈবালের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। এইজন্যে যে-কোনো প্রার্থনা নিয়েই মানুষ ঘুরে বেড়াক-না কেন তার আসল প্রার্থনাটি হচ্ছে : আবিরাবীর্য এধি। হে প্রকাশ,

সমস্তর মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক। এইজন্যে মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড়ো কান্না পাপের কান্না। সে যে আপনার সমস্তটাকে নিয়ে সেই পরম-একের সুরে মিলতে পারছে না, সেই অমিলের বেসুর সেই পাপ তাকে আঘাত করছে। মানুষের এক ভাগ নানা দিকে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার একটা অংশ যখন তার অন্য সকল অংশকে ছাড়িয়ে গিয়ে উৎপাতের আকার ধারণ করছে, তখন সে নিজেকে সেই পরম-একের শাসনে বিধৃত দেখতে পাচ্ছে না; তখন সেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় কেঁদে উঠে সে বলছে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে আর আঘাত কোরো না, আঘাত কোরো না। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো, তোমার সঙ্গে আমার সমগ্রকে মিলিয়ে দাও—তা হলেই আমার আপনার মধ্যে আমার মিল হবে, সকলের মধ্যে আমার মিল হবে, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হবে, জীবনের মধ্যে সমস্ত রুদ্রতা প্রসন্নতায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩১৭)

ভোগের সুখ তো আমি চাই নে—যারা দাসী তাদের সেই সুখের বেতন দিয়ো। আমি যে তোমার পত্নী; আমি তোমার বিশ্বের সমস্ত দুঃখের ভার তোমার সঙ্গে বহন করব। সেই দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই দুঃখকে উত্তীর্ণ হব। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ অখণ্ড মিলনে সম্পূর্ণ হবে। সেইজন্যেই, আমি বলছি নে, আমাকে সুখ দাও, আমি বলছি : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩১৭)

নিজের অন্তর-বাহিরের সঙ্গে দিনরাত্রি লড়াই করতে করতে এ কথা আর-কেউ বলছে না 'আবিরাবীর্ম এধি'। তোমার বিচ্ছেদবেদনা বহন করে জগতে আর-কেউ এমন করে কাঁদছে না যে 'মা মা হিংসীঃ'। তোমার পশুপক্ষীরা বলছে : আমার ক্ষুধা দূর করো, আমার শীত দূর করো, আমার তাপ দূর করো। আমরাই বলছি : বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো। কেন বলছি। নইলে, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হয় না। সেই মিলন না হওয়ার যে দুঃখ সে দুঃখ কেবল আমার নয়, সে দুঃখ অনন্তের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এইজন্যে, মানুষ যে দিকেই ঘুরুক, যাই করুক, তার সকল চেষ্টার মধ্যেই সে চিরদিন এই সাধনার মন্ত্রটি বহন করে নিয়ে চলেছে : আবিরাবীর্ম এধি। এ তার কিছুতেই ভোলবার নয়। আরাম-ঐশ্বর্যের পুষ্পশয্যার মধ্যে শুয়েও সে ভুলতে পারে না। দুঃখযন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়েও সে ভুলতে পারে না। প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, তুমি আমার হও, আমার সমস্তকে অধিকার করে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত সুখদুঃখের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত পাপকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে তুমি আমার হও। সমস্ত অসংখ্য লোকলোকান্তর যুগযুগান্তরের উপরে নিস্তব্ধ বিরাজমান যে পরম-এক তুমি, সেই মহা-এক তুমি, আমার মধ্যে আমার হও।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩১৭)

আবিরাবীর্ম এধি। যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি আমার মধ্যে, আমারই সীমার মধ্যে,

প্রকাশিত হউন—ইহাই আমাদের সত্য প্রার্থনা। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা করি তবে সেই অসীমের প্রকাশকে বাধা দিব।

(সীমার সার্থকতা, পথের সঞ্চয়, ১৩১৯)

তুমি আবিঃ, প্রকাশই তোমার স্বভাব; বিনাশের মধ্যে তোমার আনন্দ আপনাকে বিলুপ্ত করে না, বিকাশের মধ্যে দিয়ে তোমার আনন্দ আপনাকে বিস্তার করে। তোমার সেই পরমানন্দের বিকাশ আমাদের জীবনে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, আমাদের গৃহে সমাজে দেশে, বাধামুক্ত হয়ে প্রসারিত হোক, জয় হোক তোমার!

(একটি মন্ত্র, শান্তিনিকেতন, ১৫ মাঘ ১৩২০)

বেদে ঈশ্বরের একটি নাম 'আবিঃ'; অর্থাৎ, আবির্ভাবই তাঁহার স্বভাব, সৃষ্টিতে তিনি আপনাকে প্রকাশ করছেন সেই তাঁর ধর্ম। ভারতবর্ষের ঋষিরা দেখেছেন, জলে স্থলে শূন্যে সেই তাঁর নিরন্তর আনন্দধারা।

(খৃষ্টধর্ম, রচনাবলী সপ্তবিংশ খন্ড, পৌষ ১৩২১)

আসলে মানুষের গলদটা এইখানে যে. পনেরো-আনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করিতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী সেখানে তার কাজ যতই কঠিন হোক সেখানেই তার আনন্দ; মা যেখানে মা সেখানে তার ঝঞ্চাট যত বেশিই হোক-না সেখানেই তার আনন্দ। কেননা পূর্বেই বলিয়াছি. যথার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মতো অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে। তাই কার্লাইল প্রতিভাকে উল্টা দিক দিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন, অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকেই বলে প্রতিভা।......

আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই যে. আবিরাবীর্ম এধি। হে আবি, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ। তোমার রূপই আনন্দরূপ। সেই আনন্দরূপ গাছের চেলাকাঠ নহে, তাহা গাছ। তার মধ্যে হওয়া এবং করা একই।

(কবির কৈফিয়ত, সাহিত্যের পথে, জৈষ্ঠ ১৩২২)

'আবিরাবীর্ম এধি'—হে প্রকাশস্বরূপ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক। ....প্রকাশ হচ্ছে আপনাকে দান। আপনাকে দিতে গিয়ে তবে আপনাকে প্রকাশ করি, আপনাকে জানতে পাই। আপনাকে দেওয়া এবং আপনাকে জানা এক-সঙ্গেই ঘটে। নির্বাপিত প্রদীপ আপনাকে দেয় না, তাই আপনাকে পায় না। যে মানুষ নিজেকে সঞ্চয় ক'রে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সেই প্রচ্ছন্ন, সেই অবরুদ্ধ; যে মানুষ নিজেকে দান ক'রে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সেই প্রকাশিত, সেই মুক্ত।

সওগাদ, তার উপরে নানা রঙের চিত্র-করা রুমাল ঢাকা। যতক্ষণ রুমাল আছে ততক্ষণ দেওয়া হয় নি, ততক্ষণ সমস্ত জিনিষটা আমার নিজের দিকেই টানা। ততক্ষণ মনে হয়েছে, ঐ রুমালটাই মহামূল্য। ততক্ষণ আসল জিনিষের মানে পাওয়া গেল না, তার দাম বোঝা গেল না। যখন দান করবার সময় এল, রুমাল যখন খোলা গেল, তখনই আসলের সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় হল. সব সার্থক হল।

আমাদের আত্মনিবেদন যখন পূর্ণ হয় তখনই নিজেকে সম্পূর্ণ পাই। নইলে আমার আপন-নামক যে বিচিত্র ঢাকাখানা আছে সেইটেই চরম বলে বোধ হয়, সেইটেকেই

কোনরকমে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা মনে জাগতে থাকে। সেইটে নিয়েই যত ঈর্ষা, যত ঝগড়া, যত দুঃখ। যারা মূঢ় তারা সেইটেরই রঙ দেখে ভুলে যায়। নিজের যেটা সত্য রূপ সেইটেই হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের রূপ।

(বিশ্বভারতী, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ বৈশাখ ১৩৩০)

আমরা অকিঞ্চন হলেও তবু আমাদের কণ্ঠ থেকে সকল মানুষের জন্য এই প্রার্থনা ধ্বনিত হোক।

আনন্দস্বরূপ, তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক।

(বিশ্বভারতী, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ৭ পৌষ ১৩৩০)

'আবিরাবীর্ম এধি'—আমার অপ্রকাশের অস্বচ্ছতার মধ্যেই তোমার প্রকাশ উজ্জ্বল হোক।

(ভারতপথিক রামমোহন রায়, ৬ ভাদ্র ১৩৩৫)

বেদে অনন্তস্বরূপকে বলেছেন আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর প্রকাশ আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। তাঁর কাছে মানুষের প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম এধি —হে আবিঃ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক। অর্থাৎ, আমার আত্মায় অনন্তস্বরূপের প্রকাশ চাই। জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমার অভিব্যক্তি অনন্তের পরিচয় দেবে, এতেই আমার সার্থকতা। আমাদের চিত্তবৃত্তি থেকে, ইচ্ছাশক্তি থেকে, কর্মোদ্যম থেকে, অপূর্ণতার আবরণ ক্রমে ক্রমে মোচন ক'রে অনন্তের সঙ্গে নিজের সাধর্ম্য প্রমাণ করতে থাকব এই হচ্ছে মানুষের ধর্মসাধনা।

অন্য জীবজন্তু যেমন অবস্থায় সংসারে এসেছে সেই অবস্থাতেই তাদের পরিণাম। অর্থাৎ, প্রকৃতি তাদের প্রকাশ করেছে এবং সেই প্রকৃতির প্রবর্তনা মেনেই তারা প্রাণ-যাত্রা নির্বাহ করে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু নিজের ভিতর থেকে নিজের অন্তরতর সত্যকে নিরন্তর উদ্‌ঘাটিত করতে হবে নিজের উদ্যমে—মানুষের এই চরম অধ্যবসায়। সেই আত্মোপলব্ধ সত্যেই তার প্রকাশ, প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত প্রাণযাত্রায় নয়। তাই তার দুরূহ প্রার্থনা এই যে, সকল দিকেই অনন্তকে যেন প্রকাশ করি।

(পল্লীসেবা, পল্লীপ্রকৃতি, ফাল্গুন ১৩৩৭)

বৈদিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলেছে আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ।............মানুষের স্বভাবও তাই—আত্মাকে প্রকাশ। বাইরে থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার দ্বারাই প্রাণী আপনাকে রক্ষা করে, বাইরে আপনাকে উৎসর্গ করার দ্বারাই আত্মা আপনাকে প্রকাশ করে। এইখানে প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে সে আপনাকে ঘোষণা করে।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে-পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যত-কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের

আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে-বিক্ষিপ্ত আপনা-হারা মানুষের বিলাপ গান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারীর মুখে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম—

তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে, আবিরাবীর্ম এধি—পরম মানবের বিরাট-রূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

আমার মতে সমস্ত প্রার্থনার মূল কথাটা হচ্ছে 'আবিরাবীর্ম এধি'। তিনি তো স্বপ্রকাশ, নিজেকে সর্বত্রই প্রকাশিত রেখেছেন; কিন্তু সেটা আমাকে কোনো সান্ত্বনা দেয় না, যদি না সেই প্রকাশকে আমি দেখতে পাই আপন অন্তরের মধ্যে। অসত্যের মাঝখানে থেকে সত্যের মহিমা বুঝবো কেমন করে? অন্ধকার ভেদ করে আলোর জন্যে এই কান্না মেটাবে কে? মৃত্যুর অন্তরে যে অমৃতলোক, সেই লোকে উত্তীর্ণ হবো কোন্ শক্তিতে? এ সবই সম্ভব হয় যদি সেই 'আবিঃ'কে আপনার অন্তরের মধ্যে অনুভব করি।

(বাইশে শ্রাবণ, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশ)

আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সেই পূর্ণতা বস্তুর নয়, সে আত্মার; তাই তাকে স্পষ্ট জানতে গেলে বস্তুগত আয়োজনকে লঘু করতে হয়।

(আত্মপরিচয়, ১ বৈশাখ ১৩৪৭)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে। ১।৬

জীবাত্মা এই সংসারে আসে অনাসক্তরূপে। অনাসক্তরূপেই সে যায়। হংস যেমন দেখা যায় কোন্ মানসলোক হতে আসে আবার সময় হলে সেই মানসলোকেই ফিরে যায় —তেমনি। হংসেরা নদীর চরে থাকে। বাসা বাঁধে না। কখন যে তাদের উড়ে যেতে হবে তারও তো কোনো ঠিকানা নেই। তাই আত্মাকে বলে হংস। মুক্ত সাধকদের নাম তাই হংস বা পরমহংস। সাধনার জন্য সংসারে থাকলেও তাঁরা বাসা বাঁধেন না। মানস লোকের ডাকের জন্য তাঁরা প্রতীক্ষা করে থাকেন। এই সংসারে যদিও তাঁদের নানারূপে মলিন জলে বিচরণ করতে হয়, তবু তাঁদের শুভ্র নির্মল পাখা তাতে কখনও সিক্ত বা মলিন হয় না। তাঁরা নাকি আবার নীরটুকু বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু নিতে জানেন।

আমার জীবনের বহুকাল পদ্মার চরে কেটেচে। হংসদের মতিগতি আমার জানা। কাজেই আমি বলতে পারি, আত্মাকে হংস বলাতে চমৎকার করে সত্যটি বোঝানো হয়েচে।

ঐ হংস চিরদিন একস্থানে বাস করে না। গতির দ্বারাই সে আপনাকে সদা মুক্ত রাখে। এই গতিটি হারালেই হংসের হংসত্ব গেল।

(ক্ষিতিমোহন সেনের বলাকা-কাব্য-পরিক্রমায় উদ্ধৃত কবির বচন।)

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। ১।১২

আত্মাতেই যিনি নিত্য স্থিতি করছেন তিনিই জানবার যোগ্য, তাঁর পর জানবার যোগ্য আর কিছুই নেই।

(ওঁ, শান্তিনিকেতন, ১৫ চৈত্র ১৩১৫)

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ ২।১৭

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে

করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ, এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

(শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খন্ড, ২৭ কার্তিক ১৩০৯)

চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড় উদ্ভিদ্ চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজ বটুগণ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।

অগ্নি বায়ু জল স্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শিক্ষা।

(শিক্ষা সমস্যা, শিক্ষা, আষাঢ় ১৩১৩)

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এ-কথাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এইজন্য এই মন্ত্র আমাদের কাছে অনাবশ্যক ঠেকে। অর্থাৎ এই মন্ত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না।

অথচ এ-কথাও সত্য যে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি না কেন, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—এ আমাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়—আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারি নে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এ আমাদের শোনা কথা মাত্র। শোনা কথা পুরাতন হয়ে যায় মৃত হয়ে যায়। এ-কথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্তু এ-কথা যাঁরা কানে শুনে বলেন নি—যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্রটিকে যাঁরা দেখেছেন তবে বলতে পেরেছেন—তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাণীকে অন্যমনস্ক হয়ে শুনলে চলে না। এ বাক্য যে কতখানি সত্য তা আমরা যেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করি।

যে জিনিসকে আমরা সর্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন সাধন হয়, আমাদের কাছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিসটা যে কেবল নিজে ক্ষুদ্র তা নয় যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমন কি, যে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের শামিল হয়ে ওঠে। কেরানি তার আফিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার কাছে সৈন্যেরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্নের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বললেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি এ কথা অত্যন্ত করে

জানেন যে সেই দেশ থেকে তাঁদের নানাপ্রকার সুবিধা ঘটছে, তবে সেই দেশকে তাঁরা সুবিধার কঠিন জড় আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন—প্রয়োজন-সম্বন্ধের অতীত যে চিত্ত তাকে তাঁরা দেখতে পারেন না।

জগৎকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এইজন্য তার জলস্থল-বাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি—তাদের আমরা অহংকৃত হয়ে ভৃত্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা যন্ত্র হয়ে ওঠে।

এই অবজ্ঞার দ্বারা আমরা নিজেকেই বঞ্চিত করি। যাকে আমরা বড়ো করে পেতুম তাকে ছোটো করে পাই, যাতে আমাদের চিত্ত পরিতৃপ্ত হত তাতে আমাদের কেবল পেট ভরে মাত্র।

যাঁরা জলস্থলবাতাসকে কেবল প্রতিদিনের ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ সংকীর্ণ করে দেখেন নি, যাঁরা নিত্য নবীন দৃষ্টি ও উজ্জ্বল জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা বিশ্বকে অন্তরের মধ্যে সমাদৃত অতিথির মতো গ্রহণ করেছেন এবং চরাচর সংসারের মাঝখানে জোড়-হস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

তাঁদের উচ্চারিত এই সজীব মন্ত্রটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে ঈশ্বর যে সর্ব-ব্যাপী এই জ্ঞানকে সর্বত্র সার্থক করো। যিনি সর্বত্র প্রত্যক্ষ, তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি সর্বত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক।

বোধশক্তিকে আর অলস রেখো না, দৃষ্টির পশ্চাতে সমস্ত চিত্তকে প্রেরণ করো। দক্ষিণে বামে, অধোতে ঊর্ধ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে চেতনার দ্বারা চেতনার স্পর্শলাভ করো। তোমার মধ্যে অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে সেই ধীশক্তির যোগে ভূর্ভুবঃ-স্বর্লোকে সর্বব্যাপী ধীকে ধ্যান করো—নিজের তুচ্ছতা দ্বারা অগ্নি জলকে তুচ্ছ ক'রো না। সমস্তই আশ্চর্য, সমস্তই পরিপূর্ণ। নমোনমঃ, নমোনমঃ—সর্বত্রই মাথা নত হ'ক হৃদয় নম্র হ'ক এবং আত্মীয়তা প্রসারিত হয়ে যাক। যাকে বিনামূল্যে পেয়েছ তাকে সচেতন সাধনার মূল্যে লাভ করো, যে অজস্র অক্ষয় সম্পদ বাহিরে রয়েছে তাকে অন্তরে গ্রহণ করে ধন্য হও।

য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—পূর্বছত্রে আছে যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তার পরে আছে যিনি ওষধিতে বনস্পতিতে তাঁকে বারবার নমস্কার করি।

হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষ হয়ে গেছে—তিনি বিশ্ব-ভুবনেই আছেন—তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোটো করে ওষধি বনস্পতির নাম করা হল।

বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন এ কথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি, এ-কথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে-ঋষি বলেছেন তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন সে-ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের দ্বারা পান নি দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে-নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান, তিনি যে-ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ ছিল, তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গভীর

গম্ভীর কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্যোদয়—সে-কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভুবনে আছেন এ-কথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না—কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন এই বনস্পতিতে আছেন।

(বিশ্বব্যাপী, শান্তিনিকেতন, ৫ মাঘ ১৩১৫)

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্তস্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কি না সে-কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্তস্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এত দূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।

....

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নি ও জলের কোন বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই। ধান, গম, যব প্রভৃতি যে সমস্ত ওষধি কেবল কয়েক মাসের মতো পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য যেমন আছেন, আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করছে তার মধ্যেও তিনি তেমনই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়, নমোনমঃ; তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার; সর্বত্রই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য—তাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

ব্রহ্মের উপলব্ধি বলতে যে কী বোঝায় উপনিষদের একটি মন্ত্রে তার আভাস আছে—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী এই মোটা কথাটা বলে নিষ্কৃতি পাওয়া নয়। এটি কেবল জ্ঞানের কথামাত্র নয়; এ একটি পরিপূর্ণ বোধের কথা। অগ্নি জল তরুলতাকে আমরা

ব্যবহারের সামগ্রী বলেই জানি, এইজন্য আমাদের চিত্ত তাদের নিতান্ত আংশিক ভাবেই গ্রহণ করে; আমাদের চৈতন্য সেখানে পরম চৈতন্যকে অনুভব করে না। উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনাকে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে আহ্বান করছে। জড়ে জীবে নিখিলভুবনে ব্রহ্মকে এই-যে উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, এ ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্বত্র জানা নয়—সর্বত্র নমস্কার করা, বোধের সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারকে বিশ্বভুবনে প্রসারিত করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই বোধের রসই হচ্ছে ভক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই রসের বিচ্ছেদ না রাখা, সমস্তকে ভক্তির দ্বারা চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা, জীবনের এমন পরিপূর্ণতা জগদ্‌বাসের এমন সার্থকতা আর কী হতে পারে!

(ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা, শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩১৮)

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে,
যিনি সকল ভুবনতলে,
যিনি বৃক্ষে যিনি শস্যে,
তাঁহারে নমস্কার—
তাঁরে নমি নমি বার বার।

(রূপান্তর)

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে,
বনস্পতি-ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য।

(৫৭ সংখ্যক কবিতা, নৈবেদ্য, আষাঢ় ১৩০৮)

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। ২।৫
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ৩।৮
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। ৩।১০

একদিন বহু সহস্র বৎসর পূর্বে সরস্বতীকূলে কোন্‌-এক নিস্তব্ধ তপোবনে কোন্‌-এক বৈদিক মহর্ষি ধ্যানাসনে বসিয়া উদাত্ত স্বরে গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল, তোমরা শ্রবণ করো—আমি সেই তিমিরাতীত মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

(ভারতপথিক রামমোহন রায়, আশ্বিন ১৩০৩)

চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতে প্রশ্ন উঠিয়াছিল—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ—যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, এমন যে নিত্য পরব্রহ্ম, তাঁহাকে আমরা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে থাকিয়া লাভ করিতে পারি কি না? তপোবনের অরণ্যচ্ছায়াতলে সেদিন তাহার এক সুগম্ভীর উত্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং,

আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

তাঁহাকে পাওয়া যায় কি না এ প্রশ্নের ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সরল উত্তর আর কী হইতে পারে যে, আমি তাঁহাকে পাইয়াছি। যিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, যিনি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন, ইহাই আমাদের আশার কথা। ইহার উপরে আর তর্ক নাই। তর্কের দ্বারা যদি কেহ প্রমাণ করিত যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তবে তর্কের দ্বারা তাহার খণ্ডন সম্ভব হইতে পারিত, কিন্তু অনেক সহস্র বৎসর পূর্বে নির্জন ধ্যানাসন হইতে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মবাদী মহর্ষি বিশ্বলোককে আহ্বানপূর্বক এই এক মহাসাক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং,

আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

সেই সত্যবাণী আজিও সমস্ত দেশকালকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত তর্কসংশয়কে অভিভূত করিয়া দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণের নিকট উত্থিত হইতেছে।

অদ্যকার ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে এ তর্ক উঠিয়া থাকে যে, নিরাকার ব্রহ্মকে কি পাওয়া যাইতে পারে? প্রাচীন ভারতের মহাসাক্ষ্যবাণী আজিও লয়প্রাপ্ত হয় নাই; সেই প্রশান্ত তপোভূমি হইতে অমৃত আশ্বাসবাক্য আজিও আমাদের বিক্ষুব্ধ কর্মভূমিতে আসিয়া উপনীত হইতেছে—এই অনিত্য সংসারের রূপ-রস-গন্ধ-ব্যূহ ভেদ করিয়া স্বাধীন আত্মার সনাতন জয়শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছে, ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্—ব্রহ্মবিৎ পরম পুরুষকে পাইয়া থাকেন—তবু আমরা প্রশ্ন তুলিয়াছি নিরাকার পরব্রহ্মকে কি পাওয়া যায়? অদ্য তেমন সবল গভীর কণ্ঠে, তেমন সরল সতেজচিত্তে এমন সুস্পষ্ট উত্তর কে দিবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং,

আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

আজ সেই প্রশ্নের উত্তরে কেবল সংশয়ধূলিসমাচ্ছন্ন তর্ক উঠিয়াছে—ইহা কি কখনো সম্ভব হয়? নিরাকার পরব্রহ্মকে কি কখনো পাওয়া যাইতে পারে?

কিন্তু পাওয়া কাহাকে বলে?

আমরা কোন্ জিনিষটাকে পাই? যে-সকল পদার্থকে আমরা পাইয়াছি বলিয়া কল্পনা করি তাহাদের উপরে আমাদের কতটুকু অধিকার? আলোককে আমরা চোখে

দেখি মাত্র, তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না, তবু বলি আলোক পাইলাম; উত্তাপকে আমরা স্পর্শ দ্বারা জানি কিন্তু চোখে দেখিতে পাই না, তবু বলি আমরা উত্তাপ লাভ করিলাম। গন্ধকে আমরা দেখিও না স্পর্শও করি না তবু গন্ধ আমরা যে পাই ইহাতে কোন সংশয় বোধ করি না।

দেখা যাইতেছে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য পাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। কোনোটা দৃষ্টিতে পাই, কোনোটা স্পর্শে পাই, কোনোটা কর্ণে শুনি, কোনোটা ঘ্রাণে লাভ করি, কোনোটা-বা দুই-তিন ইন্দ্রিয়শক্তির একত্রযোগেও পাইয়া থাকি। সংগীতকে কেহ যদি চক্ষু দিয়া পাইবার চেষ্টা করে তবে সে চেষ্টাকে বাতুলতা বলিবে এবং পুষ্পকে কেহ যদি গানের মতো লাভ করিবার ইচ্ছা করে তবে সে ইচ্ছা নিতান্তই ব্যর্থ হয়।

কেবল তাহাই নহে। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি সীমাবদ্ধ, এইজন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা কোনো বস্তুকে যতটুকু পাই তাহাও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। আমরা যখন কোনো বস্তুর এক পিঠ দেখি তখন অন্য পিঠ দেখিতে পাই না, যখন বাহিরটা দেখি তখন ভিতরটা আমাদের অগোচর থাকে। অধিকক্ষণ কিছু অনুভব করিতে গেলে আমাদের ইন্দ্রিয় ক্লান্ত, আমাদের স্নায়ুশক্তি অসাড় হইয়া আসে।

কিন্তু তথাপি জড়বস্তুসকলকে আমরা পাইলাম বলিয়া সন্তুষ্ট আছি; এবং যে বস্তুকে যে উপায়ে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাওয়া সম্ভব সেই উপায়ে সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি।

লৌকিক বস্তু সম্বন্ধেই যখন এরূপ, তখন নিরাকার ব্রহ্মকে পাওয়ারই কি কোনো বিশেষত্ব নাই? তাঁহাকে চোখে দেখিলাম না বলিয়াই কি তাঁহাকে পাইলাম না।

এ-কথা আমরা কেন না মনে করি যে, স্বরূপতই তিনি যখন চোখে দেখার অতীত তখন তাঁহাকে চোখে দেখার চেষ্টা করাই মূঢ়তা। আমরা যদি আলোককে সংগীতরূপে ও সংগীতকে গন্ধরূপে পাইবার কল্পনাকেও দুরাশা বলিয়া জ্ঞান করি তবে নিরাকারকে সাকার রূপে লাভ না করিলে তাঁহাকে লাভ করাই হইল না এ কথা কেমন করিয়া মনে স্থান দিই?

আমরা যখন টাকা হাতে পাই তাহাকে কি আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে তুলিয়া রাখিতে পারি? যে-ব্যক্তি তাহাকে অত্যন্ত নিজের করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে সে তাহাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে, লোহার সিন্দুকে পুরিয়া রাখে, নিজের করিতে গিয়া নিজের কাছ হইতে দূরেই তাহাকে রাখিতে হয়। কিন্তু একান্ত চেষ্টাতেও সে টাকাকে কৃপণ আপনার অন্তরের মধ্যে রাখিতে পারে না; বাহিরের টাকা বাহিরেই পড়িয়া থাকে এবং মৃত্যুকালে ধূলির সহিত তাহার কোনো প্রভেদ থাকে না। কৃপণ তবুও তো জানে টাকা আমার, টাকা আমি পাইয়াছি। বাহিরের ধনকে অন্তরে না পাইয়াও আমরা তাহাকে পাইলাম বলিয়া স্বীকার করি; আর যিনি আমাদের একমাত্র অন্তরের ধন, যিনি অন্তরের অন্তরতম, তাঁহাকে বস্তুরূপে মূর্ত্তিরূপে মনুষ্যরূপে বাহিরে না পাইলে কি আমাদের পাওয়া হইল না?

(নিরাকার উপাসনা, পরিশিষ্ট, আধুনিক সাহিত্য, মাঘ ১৩০৫)

মন আপনার স্বাভাবিকধর্মবশতই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে—সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম

ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায়, তখন এক মুহূর্তেই বলিয়া উঠে—আমি অমৃতকে পাইয়াছি—বলিয়া উঠে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অন্ধকারের পরে আমি এই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।

(প্রাচীন ভারতের একঃ, ধর্ম, ১৩০৮)

একদা কত সহস্র-বৎসর পূর্বে মানুষ এই কথা বলিয়াছে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি জ্যোতির্ময়, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্ত্তী।

এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ইহাই আমাদের জানা আবশ্যক যে, কোথায় আমাদের খাদ্য, কোথায় আমাদের খাদক, কোথায় আমাদের আরাম, কোথায় আমাদের ব্যাঘাত—কিন্তু এই সমস্ত জানাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষ চিররহস্য অন্ধকারের এ কোন্ পরপারে, এ কোন্ জ্যোতির্লোকে কিসের প্রত্যাশায় চলিয়া গেছে। মানুষ এই যে তাহার সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অভ্যন্তরেও সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছে, আজ আমরা মানুষের সেই আশ্চর্য জ্ঞানের গৌরব লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। যে জ্ঞানের শক্তি কোনো সংকীর্ণতা কোন নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না, যে জ্ঞানের শক্তি কেবলমাত্র মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সীমাহীনের মধ্যে পরম সাহসের সহিত আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া দেয়, যে তেজস্বী জ্ঞান আপন শক্তিকে কোনো প্রয়োজনসাধনের উপায়রূপে নহে, পরন্তু চরমশক্তিরূপেই অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর—মনুষ্যত্বের মধ্যে অদ্য আমরা সেই জ্ঞান সেই শক্তিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব।

(উৎসবের দিন, ধর্ম, ১৩১১)

'ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তির আর কোনো উপায় নাই।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১১ মাঘ ১৩১১)

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোনো—আমি জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে না। মহান্তম্ পুরুষং—মহান্ পুরুষকে মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর তো

দরজা বন্ধ করে থাকতে পারেন না; এক মুহূর্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন—সে মূর্খই হ'ক আর পণ্ডিতই হ'ক, সে রাজচক্রবর্ত্তী হ'ক আর দীন দরিদ্রই হ'ক—অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্ত্তা এসে পেঁৗছেছিল, সেদিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জানতেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন;

(নবযুগের উৎসব, শান্তিনিকেতন)

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; জলস্থল-আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন; ঊর্ধ্বপূর্ণং মধ্যপূর্ণমধঃপূর্ণং দেখেছিলেন। সেদিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—বেদাহং। আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেইদিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতযজ্ঞে সর্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহংকার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে-দিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সংকুচিত হয় নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্ব-সংগীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

(নবযুগের উৎসব, শান্তিনিকেতন)

যে বলতে পেরেছে—বেদাহং, আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তাকে বলতেই হবে—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

(নবযুগের উৎসব, শান্তিনিকেতন)

বেদাহমেতং, আমি এঁকে জেনেছি। কাকে জেনেছ? আদিত্যবর্ণং—জ্যোতির্ময়কে জেনেছি যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ময়? কই তাঁকে তো আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখছি নে। না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের [illegible] চাপা দিয়ে রাখ নি। তাঁকে দেখছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে অর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরর দরজা বন্ধ করে দিয়েছ, সে যে অন্ধকার। নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না। সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার। সেখানে দ্বারে একজন ভয়ংকর 'না' বসে আছে, সে বলছে, না না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও। সে বলছে কান বন্ধ করো পাছে মন্ত্র কানে যায়, দূরে বসো পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলো না পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত 'না' দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছি নে। কিন্তু—বেদাহমেতং। আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের; যাঁকে জানলে আর কাউকে [illegible] রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না; যাঁকে জানলে নিম্নদেশ যেমন জলসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাসসকলকে স্বভাবতই

আহ্বান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করার অধিকার জন্মে, তাঁকেই জেনেছি।

(নবযুগের উৎসব, শান্তিনিকেতন)

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলেন, একসূর্য উদয় হচ্ছেন, এবার ছোটো ছোটো অসংখ্য প্রদীপ নেবাও। এই মন্ত্র কোনো এক-ঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো তুমি জাগ্রত হও। শৃণ্বন্তু বিশ্বে। হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো। পূর্বগগনের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং, আমি জানতে পারছি। তমসঃ পরস্তাৎ, অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জানতে পারছি। নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জানতে পারে তেমনি করে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

(নবযুগের উৎসব, শান্তিনিকেতন)

যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড়ো করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া।

(যিশুচরিত, খৃষ্ট, রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ২৫ ডিসেম্বর ১৯১০)

আমরা পশুরই মতো আহার-বিহারে রত, আপন আপন ভাগ নিয়ে আমাদের টানাটানি, তবু তারই মধ্যেই 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্', আমরা সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি—সমস্ত মানুষের হয়ে এই কথাটি স্বীকার করবার জন্যেই উৎসবের আয়োজন। অথচ আমরা যে সুখসম্পদের কোলে বসে আরামে আছি, তাই আনন্দ করছি, তা নয়। দ্বারে মৃত্যু এসেছে, ঘরে দারিদ্র্য; বাইরে বিপদ, অন্তরে বেদনা; মানুষের চিত্ত সেই ঘন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেছে ঃ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন।

(ছোটো ও বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

হৃদয়কে একান্ত করে অনন্তের দিকে পেতে ধরা মানুষের মধ্যেও দেখেছি, সেইখানেই তো ওই বাণী উঠেছে : বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আমি সেই মহান্ পুরুষকে দেখেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। এ তো তর্কযুক্তির কথা হল না; চোখ যেমন করে আপনার পাতা মেলে দেখে এ যে তেমনি করে জীবন মেলে দেখা।

(ছোটো ও বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

মৃত্যুর সাক্ষ্য চারিদিকে, অথচ মানুষ বলে উঠেছে ঃ ওগো শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং।

আমি তাঁকে জেনেছি এই বার্তা যাঁরা বলেছেন তাঁরা সে কথা বলবার আরম্ভে সম্বোধনেই আমাদের কী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন 'তোমরা দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র—তোমরা সংসারবাসী মৃত্যুর পুত্র নও'! জগতের মৃত্যুর বাঁশির ভিতর দিয়ে এই অমৃতের সংগীত যে প্রচারিত হচ্ছে এ সংগীত তো পশুরা শুনতে পায় না। তারা খেয়ে দেয়ে ধুলোয় কাদায় লুটিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। অমৃতের সংগীত যে তোমরাই শোনবার অধিকারী। কেন। তেমরা যে মৃত্যুর অধীন নও, তোমরা মৃত্যুর একটানা পথেই চলছ না—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

তোমরা যে ধামে রয়েছ, যে লোকে বাস করছ, সে কোন্ লোক। তোমরা কি এই পৃথিবীর ধুলোমাটিতেই রয়েছ যেখানে সমস্ত জীর্ণ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। না, তোমরা দিব্যলোকে বাস করছ, অমৃতলোকে বাস করছ। এই কথা মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ বলছে, সমস্ত সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে মানুষ বলছে। এ কথা সে মরতে মরতে বলছে। এই মাটির ওপর মাটির জীবের সঙ্গে বাস করে বলছে ঃ তোমরা এই মাটিতে বাস করছ না, তোমরা দিব্যধামে বাস করছ।

সেই দিব্যধামের আলো কোথা থেকে আসে। তমসঃ পরস্তাৎ। তমসার পরপার থেকে আসে। এই মৃত্যুর অন্ধকার সত্য নয়, সত্য সেই জ্যোতি যা যুগে যুগে মোহের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আসছে। যুগে যুগে মানুষ অজ্ঞানের ভিতর থেকে জ্ঞানকে পাচ্ছে, যুগে যুগে মানুষ পাপকে মলিনতাকে বিদীর্ণ করে পুণ্যকে আহরণ করছে। বিরোধের ভিতর দিয়ে সত্যকে পাচ্ছে, এ ছাড়া সত্যকে পাবার আর-কোন উপায় মানুষের নেই। যারা মনে করছে এই জ্যোতিই অসত্য, এই দিব্যধামের কথা কল্পনা মাত্র, তাদের কথা যদি সত্য হত তবে মাটিতে মানুষ একদিন যেমন জন্মেছিল ঠিক তেমনিই থাকত, তার আর কোন বিকাশ হত না। মানুষের মধ্যে অমৃত রয়েছে বলেই না মৃত্যুকে ভেদ করে সেই অমৃতের প্রকাশ হচ্ছে। ফোয়ারা যেমন, তার ছোটো একটুখানি ছিদ্রকে ভেদ করে ঊর্ধ্বে আপনার ধারাকে উৎক্ষিপ্ত করে, তেমনি এই মৃত্যুর সংকীর্ণ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে অমৃতের উৎস উঠছে। যাঁরা এটা দেখতে পেয়েছেন তাঁরা ডাক দিয়ে বলেছেন ঃ ভয় করো না, অন্ধকার সত্য নয়, মৃত্যু সত্য নয় তোমাদের অমৃতের অধিকার। মৃত্যুর কাছে দাসখত লিখে দিয়ো না; যদি প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ কর তবে এই অমৃতত্বের অধিকারকে যে অপমানিত করবে। কীট যেমন করে ফুলকে খায় তেমনি করে প্রবৃত্তি যে একে খেতে থাকবে। তিনি নিজে বলেছেন : তোরা অমৃতের পুত্র, আমার মতন তোরা। আর আমরা সে কথা প্রতিদিন মিথ্যা করব?

ভেবে দেখো, মানুষকে কি অমৃতের পুত্র করে তোলা সহজ। মানুষের বিকাশে যত বাধা ফুলের বিকাশে তত বাধা নেই। সে যে খোলা আকাশে থাকে; সমস্ত আলোকের ধারা বাতাসের ধারা নিয়ত সেই আকাশ ধুয়ে দিচ্ছে—সে বাতাসে তো বিষের বাষ্প জমা হয়ে তাকে বিষাক্ত করছে না, মুহূর্তে মুহূর্তে আকাশ-ভরা প্রাণ তাকে প্রক্ষালন করে দিচ্ছে, তাকে কোথাও জমতে দিচ্ছে না। মানুষের মুশকিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে; কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে জমিয়ে তুলেছে। সে বলে, 'আকাশের আলোকে আমি বিশ্বাস করব না, আমার ঘরের মাটির দীপকে আমি বিশ্বাস করব; আলোক

নতুন, কিন্তু আমার ওই দীপ সনাতন।' তার শয়নগৃহে বিষাক্ত বাতাস জমা হয়ে রয়েছে; সেইটেতেই সে পড়ে থাকতে চায়, কেননা, সে যে হল তার সঞ্চিত বাতাস, সে নতুন বাতাস নয়। ঈশ্বরের আলো ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে নতুনকে আনে সেই নতুনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই সে পুজো করে।

এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়। তবে মুক্তি। তখন কান্নায় আকাশ ছেয়ে যায়, কিন্তু সেই কান্নার ধারা নইলে উত্তাপ দূর হবে কেমন করে।

চিরদিন এমনি করে সত্যের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে মানুষ। মানুষের নিজের হাতের গড়া জিনিসের উপর মানুষের বড়ো মোহ; সেইজন্য মানুষ নিজের হাতেই নিজে মার খায়। মানুষ নিজের হাতে নিজেকে মারবার গদা তৈরি করে। সেইজন্য আজ সেই নিজের হাতের গড়া গদার আঘাতে রাজ্য-সাম্রাজ্যের সমস্ত সীমা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি আজ বলছে, 'ধর্মবুদ্ধির কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, আমি গায়ের জোরে সব কেড়েকুড়ে নেব।' সংসারের পোষ্যপুত্র যারা তারা সংসারের ধর্ম গ্রহণ করে; সে ধর্ম—যে সবল সে দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করবে। কিন্তু, মানুষ যে সংসারের পুত্র নয়, সে যে অমৃতের পুত্র; সেইজন্য তাকে নিজের গদা দিয়ে স্বার্থের ধর্ম, যা তার পরধর্ম, তাকে ধূলিসাৎ করতে হবে। এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই হবে। যা জমিয়েছে তাকে চিরকালই আঁকড়ে ধরে রাখবে এ কেমন মমতা। যেমন দেহের প্রতি আমাদের মমতা। আমরা কি হাজার চেষ্টা করলেও দেহকে রাখতে পারি। যতই কেঁদে মরি-না কেন, যতই বলি-না কেন যে তার সঙ্গে অনেক দিন ধরে আমার সম্বন্ধ—তাকে রাখতে পারব না, কারণ তাকে রক্ষা মানেই মৃত্যুকে ধরে রাখা। আমাদের যে দেহকে ত্যাগ করে মৃত্যুকেই মারতে হয়। তেমনি বাপ-পিতামহ থেকে যা চলে আসছে, যা জমে রয়েছে, তাকে চিরকাল ধরে রাখবার ইচ্ছাও মৃত্যুকে ধরে রাখবার ইচ্ছামাত্র। দেহকে রাখতে পারলুম না, পুরাতনকেও রাখতে পারব না।

ইতিহাসবিধাতা তাই বললেন নতুন হতে হবে। কামানের গর্জনে আজ সেই বাণী শুনতে পাচ্ছি—নতুন হতে হবে। জাতীয়তার আদর্শকে নিয়ে য়ুরোপ এতকাল ধরে তার প্রতাপকে অভ্রভেদী করে তুলেছে। ছোটো জাহাজ ছিল, তারপর বড়ো জাহাজ, তারপর বড় জাহাজ থেকে আরও বড়ো জাহাজ। কামান ছোটো ছিল, তা থেকে আরও বড়ো কামান গড়ে তুলে য়ুরোপ তার মারণ-অস্ত্র সব এতকাল বসে শানিয়েছে। জলে স্থলে এই-সব ব্যাপার করে তুলে তার তৃপ্তি হল না; আকাশে পর্যন্ত মারবার যন্ত্র তাকে তৈরী করতে হল। নিজের প্রতাপকে এমনি করে অভ্রভেদী করে সে দুর্বলকে টিপে তার রক্ত পান করবে, এমন কথা কি সে বলতে পারে। মানুষ মানুষকে খেয়ে বাঁচবে, এই হবে? ইতিহাসবিধাতা তাই হতে দেবেন? না। তিনি কামানের গর্জনের ধ্বনির ভিতর দিয়ে বলেছেন নতুন হতে হবে। য়ুরোপে নতুন হবার সেই ডাক উঠেছে।

সেই আহ্বান আমাদের মধ্যে নেই? আমরাই জরাজীর্ণ হয়ে থাকব? ইতিহাস-

বিধাতা কি আমাদেরই আশা ত্যাগ করেছেন। দুর্গতির পর দুর্গতি, দুঃখের পর দুঃখ দিয়ে তিনি আমাদের দেশকে বলছেন, 'না হয়নি, তোমাদেরও হয়নি, নতুনকে লাভ অমৃতকে লাভ হয়নি। তুমি যে আবর্জনাস্তূপ জমিয়েছ তা তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে নি। আমি অনন্ত প্রাণ, আমায় বিশ্বাস করো। বীর পুত্র, দুঃসাহসিক পুত্র সব, বেরিয়ে পড়ো,—এই বাণী কি আসে নি। এ কথা তিনি শোনেন নি?—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামবাসী। তোমাদের এই অন্ধকারে মধ্যে সেই পরপার থেকে আলোক আসছে। সেইখান থেকে যে আলোক আসছে তাতে জাগ্রত হও; বসে বসে চকমকি ঠুকলে দিনকে সৃষ্টি করতে পারবে না। সেই আলোকে যে নব নব দিন অমৃতের বার্তা নিয়ে আসছে। নব নব লীলায় সব নূতন নূতন হয়ে উঠছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে আনন্দ আসছে, রক্তস্রোতের উপর জীবনের শ্বেত শতদল ভেসে উঠছে।

সেই অমৃতের মধ্যে ডুব দাও, তবেই হে বৃদ্ধ, কাননে যে ফুল এইমাত্র ফুটেছে তুমি তার সমবয়সী হবে; আজ ভোরে পূর্বাশার কোলে যে তরুণ সূর্যের জন্ম হয়েছে, হে প্রবীণ, তোমার বয়স তার সঙ্গে মিলবে। বেরিয়ে এস সেই আনন্দলোকে, সেই মুক্তির ক্ষেত্রে। ভেঙে ফেলো বাধাবিপত্তিকে, নিত্য নূতনের অমৃতলোকে বেরিয়ে এস। সেই অমৃতসাগরের তীরে এসে অকূলের হাওয়া নিই, সত্যকে দেখি। সত্যকে নির্মুক্ত আলোকের মধ্যে দেখি। সেই সত্য যা নিশীথের সমস্ত তারকার প্রদীপমালা সাজিয়ে আরতি করছে, সেই সত্য যা সূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সাক্ষীর মতো সমস্ত দেখছে। নব নব নবীনতার সেই জ্ঞানময় সত্য যার মধ্যে প্রাণের বিরাম নেই, জড়তার লেশ নেই, যার মধ্যে সমস্ত চৈতন্য পরিপূর্ণ।

ওরে সংকীর্ণ ঘরের অধিবাসী, ঘরের দরজা ভেঙেচুরে ফেলে দাও। আমরা উৎসবের দেবতাকে দর্শন করে মনুষ্যত্বের জয়তিলক এঁকে নেব, আমরা নূতন বর্ম পরিধান করব। আমাদের সংগ্রাম মৃত্যুর সঙ্গে। নিন্দা-অবমাননাকে তুচ্ছ করে অসত্যের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে সেই যুদ্ধ করবার অধিকার তিনি দিয়েছেন। এই অভয়বাণী আমরা পেয়েছি—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

এই কথা বলবার দিন আজ এই ভারতবর্ষেরই এসেছে। আজ প্রতাপে মদোন্মত্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে—আমরা যত ছোটো হই সেই বল সংগ্রহ করব যাতে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, না, এ নয়, তোমরা দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।

যে ধনমান পায়নি সেই জোরের সঙ্গে বলতে পারে : আমি সত্যকে পেয়েছি; আমার ঐশ্বর্য নেই, গৌরব নেই, আমার দারিদ্র্য-অবমাননার সীমা নেই, কিন্তু আমার এমন অধিকার রয়েছে যার থেকে আমায় কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। আমাদের আর-কিছু নেই বলেই এ কথা আমাদের মুখে যেমন শোনাবে এমন আর কারও মুখে নয়। পৃথিবীর মধ্যে লাঞ্ছিত আমরা, আমরা বলব আমরা অমৃতের পুত্র—এবং আমরাই বলছি যে তোমরাও অমৃতের পুত্র। আজ উৎসবের দিনে এই সুরটি

আমাদের কানে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশের অপমান দারিদ্র্য অত্যন্ত স্বচ্ছ, সেইজন্যই সত্য আমাদের কাছে প্রকাশ পেতে বাধা পাবে না, সে একেবারে নগ্ন হয়ে দেখা দেবে। পাথরের হর্ম্য গড়ে তুলে আমরাও আকাশের আলোককে নিরুদ্ধ করব না, আমাদের নিরাশ্রয় দীনের কণ্ঠে বড়ো মধুর সুরে বাজবে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

(অমৃতের পুত্র, শান্তিনিকেতন, ১০ মাঘ ১৩২১)

পাখি যেমন অন্ধকারের প্রান্তে জ্যোতির স্পর্শমাত্রে অকারণ আনন্দে গেয়ে ওঠে, তেমনি যেদিন পরম জ্যোতি তাকে স্পর্শ করেন সেদিন মানুষও গেয়ে ওঠে। সেদিন সে বলে : আমি অমৃতের পুত্র। সে বলে : বেদাহমেতং, আমি পেয়েছি। সেই পাওয়ার জোরে নিজের মধ্যে সেই অমৃতকে অনুভব করে ভয়কে সে আর ভয় করে না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না, বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে : আমার পথ সামনে, আমি পিছু হটব না, আমার পরাজয় নেই— রুদ্র, তোমার প্রসন্নতা অন্তহীন।

(আরো, শান্তিনিকেতন, মাঘ ১৩২১)

'আমি আছি' এই কথাটা গলির মধ্যে, ঘরবাড়ির মধ্যে, ভারি ভেঙেচুরে বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। এই কথাটাকে এই সমুদ্রের উপর, আকাশের উপর, সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দেখলে তবে তার মানে বুঝতে পারি; তখন আবশ্যককে ছাড়িয়ে, অনাবশ্যককে পেরিয়ে, আনন্দলোকে তার অভ্যর্থনা দেখতে পাই; তখন স্পষ্ট করে বুঝি, ঋষি কেন মানুষদের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে' আহ্বান করেছিলেন।

(জাপানযাত্রী, ১৩২৩)

'পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাৎ'—সেই মহান্ পুরুষ অন্ধকারের পারে যিনি জ্যোতির্ময়—তাঁর জয় ভারতেরই জয়। আমাদের যুদ্ধ এই অন্ধকারেরই বিরুদ্ধে। মানবসত্তায় অনন্ত জ্যোতিস্বরূপের প্রকাশ আমাদের সাধনলক্ষ্য। এক-একটি ব্যক্তিবিশেষে নয়, সমগ্র মানবজাতির অখণ্ড সমন্বয়ের মধ্যেই তার পরিচয়। যে অহ-মিকার অন্ধকার দূর করতে হবে, তা হল জাতিগত অহমিকা।

(রবীন্দ্র-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, ১৩ই মার্চ ১৯২১,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমতী মলিনা রায়)

ধনবানের ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্তু সত্যবানের সত্য বিশ্বের। সত্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিমন্ত্রণ-প্রচার আছেই। ঋষি যখনই বুঝলেন 'বেদাহমেতম্'—আমি একে জেনেছি, তখনই তাঁকে বলতে হল, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা সকলে শুনে যাও।

(বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৩০; রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তবিংশ খণ্ড)

'বেদাহম্'—জেনেছি। 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—অন্ধকারেরই ওপার থেকে দেখেছি জ্যোতির রূপ। তাই অন্ধকারকে আর ভয় করি নে। যে অন্ধকার নিজেদের

ছোটো গণ্ডির মধ্যেই আমাদের ছোটো পরিচয়ে আবদ্ধ করে তাকে স্বীকার করি নে। যে আলো সকলের কাছে আমাদের প্রকাশ করে এবং সকলকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমরা তারই অভিনন্দন করি।

(বিশ্বভারতী, ৭ পৌষ ১৩৩০ ; রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তবিংশ খণ্ড)

চিরকালের ঐশ্বর্য যখন তার কাছে প্রকাশ পায় তখন মানুষ বড়ো করে বলতে চায় 'আমি পেয়েছি'। একথা সে বলতে চায় সকল দেশকে, সকল কালকে, কেননা পাওয়া তার একলার নয়। ঋষি একদিন বিশ্বকে বলেছিলেন, 'পেয়েছি, জেনেছি, বেদাহং।' ঋষি সেই সঙ্গেই বলেছেন, 'আমার পাওয়া তোমাদের সকলের পাওয়া, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।' এই বাণীই উৎসবের বাণী। মানুষের উৎসবে চিরন্তন কালের আনন্দ ও আহ্বান।

(ভারতপথিক রামমোহন, ১১ মাঘ ১৩৩৫)

মানুষের মধ্যে এই যে একটি অপরিমেয়তা আছে যাহা তাহার সীমাকে কেবলি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহাই কি তাহার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে? মানুষ যেদিন নিজের মধ্যে আপনার এই সত্য পরিচয় জানিতে পারে সেই দিনই সে ক্ষুদ্রতার জাল ছেদন করিবার শক্তি পায়, সেই দিনই সে উপস্থিত স্বার্থকে লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করে না, সেই দিনই সে চিরন্তন মঙ্গলকেই আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লয়। যে মহাপুরুষেরা মানুষকে সত্য করিয়া চিনিয়াছেন তাঁহারা তো আমাদের মর্ত্ত্য বলিয়া জানেন না, তাঁহারা আমাদের ডাক দিয়া বলেন, তোমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

(নামকরণ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

সাধকেরা আপনারাই বলিয়াছেন তাঁহাকে পাইবার পথ, "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" অর্থাৎ এটা কোনো মতেই পঠন পাঠনের ব্যাপার নহে। কিন্তু কেমন করিয়া সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলব্ধিতে গিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষ আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন, বেদাহমেতং, আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি, তাঁহারা বলেন, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারাই অমৃত হ'ন। কেমন করিয়া যে তাঁহারা ইঁহাকে জানেন সে অভিজ্ঞতা এতই অন্তরতম যে, তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই গোচর নহে।

(ধর্মশিক্ষা, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

যে ব্যক্তি বড়ো তিনি সমস্ত বাধাকে ছাড়াইয়া একেবারেই সত্যকে দেখিতে পান। এইজন্য ছোটোর সঙ্গে বড়োর কথার একেবারে এতই বৈপরীত্য। এইজন্য সকলেই যখন একবাক্যে বলিতেছে আমরা কেবল অন্ধকার দেখিতেছি তখনো তিনি জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ— অন্ধকারকে ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকেই জানিতেছি যিনি মহান্ পুরুষ, যিনি জ্যোতির্ময়।

(ধর্মের অধিকার, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

ধর্ম কেবলি মানুষকে বলিতেছে, তুমি অমৃতের পুত্র, ইহাই সত্য; ব্যবহারতঃ মানুষের স্খলন পদে পদে হইতেছে তবু ধর্ম তাহার সত্য পরিচয়কে উচ্চে ধরিয়া রাখিতেছে; মানুষ বলিতে যে কতখানি বুঝায় ধর্ম তাহা কোনমতেই মানুষকে ভুলিতে দিবে না; ইহাই তাহার সর্ব্বপ্রধান কাজ।

(ধর্মের অধিকার, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩০৫)

সত্য যদি নিতান্তই আত্মতৃপ্তির উপকরণমাত্র হোত তবে যে অভ্যাসের মধ্যে যে সুখ পায় তাই নিয়েই তাকে থাকতে বলা যেত। সত্যের সঙ্গে ব্যবহারে তৃপ্তি গৌণ, মুক্তি মুখ্য—যে ক্ষুদ্রতার আবরণ থেকে মুক্তি হলে নিজেদের স্পষ্ট করে জানি অমৃতস্য পুত্রাঃ সেই মুক্তি—তার সাধনায় দুঃখ আছে।

(চিঠিপত্র নবম খণ্ড, ২০ জুলাই ১৯৩১)

যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্য-প্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদবিভেদ তার ভেসে যায়—যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান মনন-ধারা। সে বলতে পেরেছিল 'আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা', সকলে আসুক সকল দিক থেকে। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে', শুনুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্' আমি জানি—এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার। যে তারা জ্যোতিহীন তাকে নিখিল নক্ষত্রলোক স্বীকার করে না। প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে; বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে, আপনাকে দান করার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিঞ্চনরূপে অকিঞ্চিৎকর।

(সভাপতির অভিভাষণ, রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উৎসব,
ভারতপথিক রামমোহন, ১৪ পৌষ ১৩৪০)

সকল দিকেই শুনছি জনগণের অন্তর্যামী মহান পুরুষ তামসিকতার বন্দীশালায় শৃঙ্খলে দিয়েছেন ঝংকার, তাঁর প্রকাশের তপোদীপ্তি জ্বলে উঠেছে তমসঃ পরস্তাৎ। রব উঠেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে—শোনো, বিশ্বজন, তাঁর আহ্বান শোনো, যে-আহ্বানে ভয় যায় ছুটে, স্বার্থ হয় লজ্জিত, মৃত্যুঞ্জয় শঙ্খধ্বনি ক'রে ওঠেন মৃত্যুদুঃখবন্ধুর অমৃতের পথে।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

সেই আশা-পথের পথিক আমরা, নূতন প্রভাতের উদ্‌বোধনমন্ত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে গান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রদ্ধায় আছে অপরাজেয় বীর্য, নাস্তিবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

(বিশ্বভারতী, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ৮ শ্রাবণ ১৩৪৭)

'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।'
(৬০ সংখ্যক কবিতা, নৈবেদ্য, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩০৮)

প্রাচীন ভারতের মানুষের মন কর্মকান্ড থেকে যেই এল জ্ঞানকান্ডে, সঙ্গে সঙ্গে এল সৃষ্টির যুগ। মানুষের আচারকে লঙ্ঘন করে আত্মাকে ডাক পড়ল। সেই আত্মা যন্ত্রচালিত কর্মের বাহন নয়, আপন মহিমাতে সে সৃষ্টি করে। সেই যুগে মানুষের জাগ্রত চিত্ত ব'লে উঠেছিল, চিরন্তনের মধ্যে বেঁচে ওঠাই হল বেঁচে যাওয়া; তার উল্টাই মহতী বিনষ্টি। সেই যুগের বাণী ছিল—'য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।'
(অরবিন্দ ঘোষ, ২৯ মে ১৯২৮)

......জ্ঞানজগৎও একটা গন্ডি। তারও পরে অধ্যাত্মজগৎ।...সেখানকার সত্য আরও বিরাট। যাঁরা একটার পর একটা গন্ডি পার হয়ে ক্রমাগতই এগিয়ে চলতে পারেন তাঁরাই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন—
অমৃতাস্তে ভবন্তি।
(ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং
পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্‌। ৩।৯

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।
(প্রাচীন ভারতের "একঃ", ধর্ম, ১৩০৮)

নদী যেমন নানা বক্রপথে সরল পথে, নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া, নানা নির্ঝর ধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, নানা বাধা-বিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহাসমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়—মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলই এক হইতে আর একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ড-খণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যুবিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া, অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া, পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল? ভয়াতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বজ্র-মেঘের মধ্যে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছিল?

এমন সময়ে সেই অন্তবিহীন পথপরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ দিশাহারা পথিক শুনিতে

পাইল—পথের প্রান্তে ছায়া-নিবিড় তপোবনের গম্ভীরমন্ত্রে এই বার্ত্তা উদ্‌গীত হইতেছে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।

(প্রাচীন ভারতের "একঃ" ধর্ম, ১৩০৮)

শিশির-নিষিক্ত শীতের প্রত্যূষে পূর্বদিকে যখন অরুণবর্ণ. লঘুবাষ্পাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আসন্ন জাগরণের একটি অখন্ড শান্তি বিরাজমান,—যখন মনে হয়, যেন জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, এখনও সেই বিশ্বগেহিনী তাঁহার বিপুলগৃহের অসংখ্য জীবপালনকার্য আরম্ভ করেন নাই, তিনি যেন, দিবসারম্ভে ওংকারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগন্মন্দিরের উদ্‌ঘাটিত স্বর্ণ-তোরণদ্বারে ব্রহ্মান্ডপতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন—তখন যদি চিন্তা করিয়া দেখি, তবে প্রতীতি হইবে, সেই নির্জন নিঃশব্দ নীহারমণ্ডিত প্রান্তরের মধ্যে প্রয়াসের অন্ত নাই। প্রত্যেক তৃণদলের অণুতে অণুতে জীবনের বিচিত্র চেষ্টা নিরন্তর, প্রত্যেক শিশিরের কণায় কণায় সংযোজন-বিয়োজন-আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য বিশ্রামবিহীন। অথচ এই অশ্রান্ত অপরিমেয় কর্মব্যাপারের মধ্যে শান্তিসৌন্দর্য অচল হইয়া আছে। অদ্য এই মুহূর্তে এই প্রকান্ড পৃথিবীকে যে প্রচন্ড-শক্তি প্রবলবেগে শূন্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে শক্তি আমাদের কাছে কথাটিমাত্র কহিতেছে না, শব্দটিমাত্র করিতেছে না। অদ্য এই মুহূর্তে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত মহাসমুদ্রে যে লক্ষ-লক্ষ তরঙ্গ সগর্জন তান্ডব নৃত্য করিতেছে, শতসহস্র নদনদীনির্ঝরে যে কল্লোল উঠিতেছে, অরণ্যে-অরণ্যে যে আন্দোলন, পল্লবে-পল্লবে যে মর্মর ধ্বনি, আমরা তাহার কী জানিতেছি। বিশ্বব্যাপী যে মহাকর্মশালায় দিবারাত্রি লক্ষ কোটি জ্যোতিষ্কদীপের নির্বাণ নাই, তাহার অনন্ত কলরব কাহাকে বধির করিয়াছে,—তাহার প্রচন্ড প্রয়াসের দৃশ্য কাহাকে পীড়িত করিতেছে? এই কর্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যখন বৃহদ্‌ভাবে দেখি, তখন দেখি, তাহা চিরদিন অক্লান্ত অক্লিষ্ট প্রশান্তসুন্দর—এত কর্মে এত চেষ্টায় এত জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখায় সে চিন্তিত চিহ্নিত ভারাক্রান্ত হয় নাই। চিরদিনই তাহার প্রভাত কী সৌম্যসুন্দর, তাহার মধ্যাহ্ন কী শান্ত গম্ভীর, তাহার সায়াহ্ন কী করুণ-কোমল, তাহার রাত্রি কী উদার-উদাসীন। এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি এবং সৌন্দর্য এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সংগীত কী করিয়া সম্ভবপর হইল? ইহার এক উত্তর এই যে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন, সেই এক।

সেইজন্যই বৈচিত্র্যও সুন্দর এবং বিশ্বকর্মের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজমান।

(প্রাচীন ভারতের "একঃ" ধর্ম, ১৩০৮)

গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারিদিককে কী নিভৃত এবং নিজেকে কী একাকী বলিয়া মনে হয়। অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া

হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্কলোকের অনন্ত জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। এ কী অপরূপ আশ্চর্য, অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জনতা। কত জ্যোতির্ময় এবং কত জ্যোতিহীন মহাসূর্যমণ্ডল, কত অগণ্য যোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্পসংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি-উচ্ছ্বাস—তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে—একান্ত নির্জনে রহিয়াছি—শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই। এমন সম্ভব হইল কী করিয়া? ইহার কারণ—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

নইলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত-ঘূর্ণিত, তাহা কী ভয়ংকর। বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি একসূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তি সকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত হইয়া না থাকে, তবে তাহা কী করাল, তবে বিশ্বসংসার কী অনির্বচনীয় বিভীষিকা। তবে আমরা দুর্ধর্ষ জগৎপুঞ্জের মধ্যে কাহার বলে এত নিশ্চিন্ত হইয়া আছি? এই মহা-অপরিচিত, যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কাহার বিশ্বাসে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মত অনুভব করিতেছি। এই যে আসনের উপর আমি এখনই বসিয়া আছি, ইহার মধ্যে সংযোজন-বিয়োজনের যে মহাশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা এই আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যলোক-নক্ষত্রলোক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-অখণ্ড ভাবে চলিয়া গেছে, তাহা যুগযুগান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোক-লোকান্তরকে পিণ্ডীকৃত-পৃথককৃত করিতেছে, আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভয়ে আরামে বসিয়া আছি তাহার ভীষণ সত্তাকে জানিতেও পারিতেছি না—সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না। ইহার মধ্যে আমরা খেলিতেছি, গৃহনির্মাণ করিতেছি—এ আমাদের কে? ইহাকে প্রশ্ন করিলে এ কোনোই উত্তর দেয় না। ইহা দিকে-দিকে আকাশ হইতে আকাশান্তরে নিরুদ্দেশ হইয়া শতধা-সহস্রধা চলিয়া গেছে—এই মূক মূঢ় মহাবহুরূপীর সঙ্গে কে আমাদের এমন প্রিয়, পরিচিত, আত্মীয়-সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন? তিনি—যিনি,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

এই এককে আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর এবং বিশ্বের শক্তির মধ্যে শান্তিস্বরূপে দেখিতেছি, তেমনি মানুষের সংসারের মধ্যে সেই স্তব্ধ একের ভাবটি কী? সেই ভাবটি মঙ্গল। এখানে আঘাতপ্রতিঘাতের সীমা নাই, এখানে সুখদুঃখ বিরহমিলন বিপৎসম্পদ লাভক্ষতিতে সংসারের সর্বত্র সর্বক্ষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য এই সংগ্রামের মধ্যে সেই এক নিয়ত স্তব্ধ হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্যে নানা বিরোধ বিদ্বেষের মধ্যেও পিতামাতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সহিত দূর, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্তেই গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ঐক্যজাল আমরা ক্ষণিকের আক্ষেপে যতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছি, ততই তাহা আপনি জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। যেমন খণ্ডভাবে আমরা জগতের মধ্যে অসংখ্য কদর্যতা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমস্ত জগৎ মহাসৌন্দর্যে প্রকাশিত—তেমনি খণ্ডভাবে সংসারে পাপতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত সংসার অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলসূত্রে চিরদিন ধৃত হইয়া আছে। ইহার অংশের মধ্যে কত অশান্তি কত অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তবু দেখি, ইহার সমগ্রের মঙ্গল-আদর্শ কিছুতে নষ্ট হয় না। সেইজন্য মানুষ সংসারকে এমন সহজে আশ্রয় করিয়া আছে। এত বৃহৎ লোকসংঘ, এত অসংখ্য অনাত্মীয়, এত প্রবল

স্বার্থসংঘাত, তবু এ সংসার রমণীয়, তবু ইহা আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে না। ইহার দুঃখতাপও মহামঙ্গল সঙ্গীতের একতানে অপূর্ব ছন্দে মিলিত হইয়া উঠিতেছে—কেন না,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আমরা আমাদের জীবনকে প্রতিক্ষণে খন্ড খন্ড করি বলিয়াই সংসারতাপ দুঃসহ হয়। সমস্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাকে সেই মহান একের মধ্যে গ্রথিত করিতে পারিলে সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে তাঁহার দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে কোন্ বাধায় আমার অধীরতা, কোন্ বিঘ্নে আমার নৈরাশ্য, কোন্ লোকের কথায় আমার ক্ষোভ, কোন্ ক্ষমতায় আমার অহংকার, কোন্ বিফলতায় আমার গ্লানি! তাহা হইলেই আমার সকল কর্মের মধ্যেই ধৈর্য ও শান্তি, সকল হৃদ্‌বৃত্তির মধ্যেই সৌন্দর্য ও মঙ্গল উদ্ভাসিত হয়, দুঃখতাপ পুণ্যে বিকশিত এবং সংসারের সমস্ত আঘাতবেদনা মাধুর্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তখন সর্বত্র সেই স্তব্ধ একের মঙ্গলবন্ধন অনুভব করিয়া সংসারে দুঃখের অস্তিত্বকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা বলিয়া গণ্য করি না—দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে,অভাবের মধ্যে নতমস্তকে তাঁহাকেই স্বীকার করি—যাঁহার মধ্যে যুগযুগান্তর হইতে সমস্ত জগৎসংসারের সমস্ত দুঃখতাপের সমস্ত তাৎপর্য অখন্ড মঙ্গলে পরিসমাপ্ত হইয়া আছে।

(প্রাচীন ভারতের "একঃ", ধর্ম, ১৩০৮)

উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

যিনি এক, তিনি আকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন।... যিনি এক, তিনি এই মানবসংসারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আছেন। জন্মমৃত্যুর যাতায়াত আমাদের চোখের উপর দিয়া কেবলই আবর্তিত হইতেছে, সুখদুঃখ উঠিতেছে পড়িতেছে, পাপপুণ্য আলোকে ছায়ায় সংসারভিত্তি খচিত করিয়া দিতেছে—সমস্ত বিচিত্র, সমস্ত চঞ্চল—ইহারই অন্তরে নিরলংকার নিভৃত; সেখানে যিনি এক তিনিই বর্তমান। এই অস্থির-সমুদয়, যিনি স্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন—এই পরিবর্তনপরম্পরা, যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ।

(মন্দির, ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩১০)

আজ বর্ষশেষের এই রাত্রিতে তোমার বন্ধ ঘরের জানলা থেকে জগতের সেই যাওয়ার পথটার দিকেই মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখো। কিছুই থাকছে না, সবই চলেছে, এইটিই লক্ষ্য করো। মন শান্ত ক'রে, হৃদয় শুদ্ধ করে, এই দিকে দেখতে দেখতেই দেখবে—এই-সমস্ত যাওয়া সার্থক হচ্ছে এমন একটি 'থাকা' স্থির হয়ে আছে। দেখতে পাবে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

সেই এক যিনি, তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন।

জীবন যতই এগোচ্ছে ততই দেখতে পাচ্ছি সেখানেও সেই এক যিনি, তিনি সমস্ত যাওয়া-আসার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন। নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে, ঝরে গেছে, যা দিতে হয়েছে, তার হিসাব রাখতে কে পারে। তা অনেক, তা অসংখ্য।

কিন্তু এই-সমস্ত গিয়ে, সমস্ত দিয়ে, যাঁকে পাচ্ছি তিনি এক। 'গেছে গেছে' এ কথাটা যতই কেঁদে বলি-না কেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন—এই কথাটাই সকল কান্না ছাপিয়ে জেগে উঠছে। সব গেছে এই শোক যেখানে জাগছে সেখানে ভালো করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজমান।

যেখানে যা-কিছু সমস্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই গভীর নিঃশেষতার মধ্যে আজ বর্ষশেষের দিনে মুখ তুলে তাকাও, দেখো : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। চিত্তকে নিস্তব্ধ করো; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশের চন্দ্রতারা স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অণুপরমাণুর অবিরাম নৃত্য একেবারে থেমে যাবে। দেখবে বিশ্বজোড়া ক্ষয়মৃত্যু এক জায়গায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কলশব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই, সেখানে জন্ম-মরণ এই নিঃশব্দ সংগীতে বিলীন হয়ে রয়েছে : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

(বর্ষশেষ, শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮)

আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। শুনেছিলেন : যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

(ভূমিকা, বনবাণী, ২৩ অক্টোবর, ১৯২৬)

•

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥ ৩।১০

হঠাৎ মনে হইতে পারে ব্রহ্ম হইতে অনেক অল্পে, পরিমিত আকারবদ্ধ আয়ত্তগম্য পদার্থে আমাদের মত স্বল্পশক্তি জীবের সুখে চলিয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহা চলে না। ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং—যিনি উত্তরতর অর্থাৎ সকলের অতীত, যাঁহাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, যিনি অশরীর, রোগশোক রহিত—য এতদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি, যাঁহারা ইঁহাকেই জানেন তাঁহারাই অমর হন—অথ ইতরে দুঃখমেব অপিযন্তি, আর সকলে কেবল দুঃখই লাভ করেন।

(ঔপনিষদব্রহ্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ,
দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ॥ ৩।১১

সর্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্বব্যাপী এইজন্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা, বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলই আঘাত পেতে থাকব,—কেবলই অপমান কেবলই ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে কিন্তু তার একটিমাত্র কারণ এই যে, সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি "সর্বগতঃ শিবঃ", যিনি "সর্বভূতগুহাশয়ঃ" যিনি "সর্বানুভূঃ"। তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবে না তা হলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল। যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তা হলে আমি বলব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয়—এই শিক্ষা দেবার জন্যই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। যে হেতু ভগবান সর্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন, সেইজন্যেই তিনি শিব। সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্যবন্ধনে। আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্তে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েছে পুণ্য। সেই পুণ্য আর যাই হোক সে শিব নয়। সেই সমাজবিধি আত্মার ধর্মকে পীড়িত করে। স্বলক্ষণন্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। আত্মার লক্ষণকে যে জানে সেই মুনি, সেই শ্রেষ্ঠ। আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে-শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

৫ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্। ৩।১৫

ভবিষ্যৎ কাল অসীম, অতীত কালও তাই। এই দুই দিকে মানুষের মন প্রবল-ভাবে আকৃষ্ট। পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্। যা ভূত, যা ভাবী, এই সমস্তই সেই পুরুষ। মানুষ ভাবতে ভালোবাসে, কোনো-এক কালে তার শ্রেষ্ঠতার আদর্শ পূর্বেই বিষয়ীকৃত। তাই প্রায় সকলজাতীয় মানুষের পুরাণে দেখা যায় সত্যযুগের কল্পনা অতীত কালে। সে মনে করে, যে আদর্শের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ, কোনো-এক দূরকালে তা পরিপূর্ণ অখণ্ড বিশুদ্ধ আকারে। সেই পুরাণের বৃত্তান্তে

মনুষের এই আকাঙ্ক্ষাকাটি প্রকাশ পায় যে, অনাদিতে যা প্রতিষ্ঠিত অসীমে তাই প্রমাণিত হতে থাকবে। যে গানটি পূর্বেই সম্পূর্ণ রচিত, গাওয়ার দ্বারাই সেটা ক্রমশ প্রকাশমান, এও তেমনি। মনুষ্যত্বের আদর্শ এক কোটিতে সমাপ্ত, আর-এক কোটিতে উপলভ্যমান। এখনকার দিনে মানুষ অতীত কালে সত্যযুগকে মানে না, তবু তার সকলপ্রকার শ্রেয়োনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে অনাগতকালে সত্যযুগের প্রত্যাশা। কোনো ব্যক্তি নাস্তিক হতে পারে কিন্তু সেই নাস্তিক যাকে সত্য ব'লে জানে দূরদেশে, ভাবীকালে, সেও তাকে সার্থক করবার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অগোচর ভবিষ্যতেই নিজেকে সত্যতররূপে অনুভব করে ব'লেই তার প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানকে বিসর্জন দেওয়া সে ক্ষতি মনে করে না।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ৩।১৬

আমাদের ভৌতিক দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। পৃথিবীর মাটি জল বাতাস উত্তাপ, পৃথিবীর ওজন আয়তন গতি, সমস্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যে এই শরীর; কোথাও তার সঙ্গে এর একান্ত ছেদ নেই। বলা যেতে পারে, পৃথিবী মানুষের পরম দেহ; সাধনার দ্বারা, যোগবিস্তারের দ্বারা এই বিরাটকে মানুষ আপন করে তুলছে, বড়ো দেহের মধ্যে ছোটো দেহকে প্রসারিত করছে, বিশ্বভৌতিক শক্তিকে আয়ত্ত করে পরিমিত দেহের কর্মশক্তিকে পরিপূর্ণ করছে, চোখ স্পষ্টতর ক'রে দেখছে সুদূরস্থ মহীয়ান ও নিকটস্থ কনীয়ানকে; দুই হাত পাচ্ছে বহুসহস্র হাতের শক্তি, দেশের দূরত্ব সংকীর্ণ হয়ে আমাদের দেহের নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। একদিন সমস্ত ভৌতিক শক্তি দেহশক্তির পরিশিষ্ঠ হয়ে উঠবে, মানুষের এই সংকল্প।

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

এই বাণীকে নিজের মধ্যে সার্থক করবে—সেই স্পর্দ্ধা নিয়ে মানুষ অগ্রসর। একেবারে নতুন-কিছু উদ্ভাবন করবে তা নয়, নিজের দেহশক্তির সঙ্গে বিরাট ভৌতিক শক্তির সংযোগকে উত্তরতর করে তুলবে।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্ ৩।১৭

যিনি আমাদের দর্শনশাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপসম্বন্ধে বলা হয়েছে, সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। অর্থাৎ, মানুষের বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়ের যত-কিছু গুণ তার আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থই এই যে, মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এ ছাড়া

অন্য জগৎ যদি থাকে তা হলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।

(মানুষের ধর্ম ১৩৪০)

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ৪।১

উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইজন্যে কেবলই বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। তিনি এক, এবং তাঁর কোন বর্ণ নেই অথচ বহুশক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রয়োজনসকল বিধান করছেন। যিনি এক তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজন-সকল বিধান করতে যান। তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।

(সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫)

যখন আমরা জাগ্রত থাকি তখন আমাদের শক্তির সঙ্গে শক্তির লীলা ঘটে। বিশ্বকর্মার বিশ্বকর্মের সঙ্গে আমাদের কর্মের যোগসাধন হয়। যিনি "বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি"—তাঁরই সেই বহুবিভক্ত শক্তির বিচিত্র প্রবাহ-পথে আমাদের চেষ্টাকে চালন করে আমরা শক্তির আশ্চর্য গতিসকল আবিষ্কার করে আনন্দিত হই। এক সময়ে যেখানে মনে করেছিলুম শক্তির শেষ, চলতে গিয়ে দেখতে পাই সেখান থেকে পথ আবার একটা নূতন বাঁক নিয়েছে;—এমনি করে জগদ্ব্যাপারের সেই বহুধাশক্তির মধ্যে নিজের শক্তিকেও বহুধা করে দিয়ে তার সঙ্গে সকল দিকে সমান শক্তিলাভ করবার জন্যে আমাদের চিত্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

(রাত্রি, শান্তিনিকেতন, ১৪ পৌষ ১৩১৫)

("শক্তিযোগাৎ" শক্তি যোগের দ্বারা। শক্তি একটি যোগ। এই যোগের দ্বারাই ঈশ্বর সীমাদ্বারা পৃথক্‌কৃত প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন—নিয়মের সীমারূপ পার্থক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর শক্তি দেশের সঙ্গে দেশান্তরের, রূপের সঙ্গে রূপান্তরের, কালের সঙ্গে কালান্তরের বহুবিচিত্রসংযোগ সাধন করে এক অপূর্ব্ব বিশ্বকাব্য সৃজন করে চলেছে।

এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকাল স্বরূপ খণ্ডকালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণামবাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্ত্তিমান করছেন—জগৎ-রচনায় করছেন, মানব-সমাজের ইতিহাসে করছেন।)

(পার্থক্য, শান্তিনিকেতন, ২৩ পৌষ ১৩১৫)

আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ, এবং—বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি, সর্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না; আমরা তারাই যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক এক অদ্বিতীয় এক। তবে আমরা আর স্থানীয় ধর্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকব কেমন করে। আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব।

(নবযুগের উৎব, শান্তিনিকেতন)

যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্তে মুহূর্তেই তিনি সৃষ্টি করছেন, নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ-কথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলই একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে এ-কথা ঠিক নয়। জগৎকে কেউ বহন করছে না, জগৎকে কেবলই সৃষ্টি করা হচ্ছে। যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমিষেই আরম্ভ হচ্ছে। সেই প্রথমের সংস্রব কোন মতেই ঘুচছে না। এইজন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনও প্রথম, গোড়াতেও নবীন, এখনও নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ—বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হতে হবে, আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পেঁছয়, প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে, এবং সেই জন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে। আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না, আমাদের চিত্ত বারংবার সেই মূলে ফিরে আসবে, সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বারবার অনুভব করে নেবে, তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

(চিরনবীনতা, শান্তিনিকেতন)

তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

য একঃ, যিনি এক; অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই, বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ যিনি সমস্তের শেষে—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূর নিকট, আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

য একঃ, যিনি এক—অবর্ণঃ, যাঁর জাতি নেই—বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজনসকল বিধান করছেন—বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি—স দেবঃ, সেই দেবতা। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন। এই মঙ্গললোকে স্বার্থবুদ্ধি নয়, বিষয়বুদ্ধি নয়, এখানে

আমাদের পরস্পরের যে যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

(জন্মোৎসব, শান্তিনিকেতন, ২৫ বৈশাখ ১৩১৭)

ব্রহ্মও তো আপনার আনন্দকে......প্রকাশ করছেন; তিনি 'বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি'। তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করছেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন তো তিনি নিজেই, তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলই নানা আকারে দান করেছেন। কাজ করছেন, তিনি কাজ করছেন—নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কী করে। তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবল উৎসর্গ করছে, সেই তো তাঁর সৃষ্টি।

আমাদেরও সার্থকতা ওইখানে, ওইখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তি-যোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলই দান করতে হবে। বেদে তাঁকে 'আত্মদা বলদা' বলেছে, তিনি যে কেবল আপনাকে দিচ্ছেন তা নয়, তিনি আমাদের সেই বল দিচ্ছেন যাতে করে আমরাও তাঁর মতো আপনাকে দিতে পারি। সেইজন্যে, বহুধা শক্তির যোগে যিনি আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন ঋষি তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছেন : স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি যেন আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজনটা মেটান,' আমাদের সঙ্গে শুভবুদ্ধির যোগ সাধন করেন। অর্থাৎ শুধু এ হলে চলবে না যে, তাঁর শক্তিযোগে তিনি কেবল আপনি কর্ম করে আমাদের অভাব মোচন করবেন; আমাদের শুভবুদ্ধি দিন, তা হলে আমরাও তাঁর সঙ্গে মিলে কাজ করতে দাঁড়াব, তা হলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হবে। শুভবুদ্ধি হচ্ছে সেই বুদ্ধি যাতে সকলের স্বার্থকে আমারই নিহিতার্থ বলে জানি, সেই বুদ্ধি যাতে সকলের কর্মে আপন বহুধা শক্তি প্রয়োগ করাতেই আমার আনন্দ। এই শুভবুদ্ধিতে যখন আমরা কাজ করি তখন আমাদের কর্ম নিয়মবদ্ধ কর্ম, কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম নয়—আত্মার তৃপ্তিকর কর্ম, কিন্তু অভাবতাড়িতের কর্ম নয়—তখন আমাদের কর্ম দশের অন্ধ অনুকরণ নয়, লোকাচারের ভীরু অনুবর্ত্তন নয়। তখন, যেমন আমরা দেখছি 'বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ', বিশ্বের সমস্ত কর্ম তাঁতেই আরম্ভ হচ্ছে এবং তাঁতেই এসে সমাপ্ত হচ্ছে, তেমনি দেখতে পাব আমার সমস্ত কর্মের আরম্ভে তিনি এবং পরিণামেও তিনি—তাই আমার সকল কর্মই শান্তিময়, কল্যাণময়, আনন্দময়।

(কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

মানুষের বহুধা শক্তি, সেই শক্তির যোগে নিহিতার্থকে কেবলই উদ্‌ঘাটিত করতে হবে—মানুষ কোথাও থামতে পারে না।

(অরবিন্দ ঘোষ, ২৯ মে ১৯২৮)

সেই সব রিপুকেই আমরা পাপ বলি যাতে করে বিশ্বাত্মার সঙ্গে আমাদের জীবাত্মার সম্বন্ধ বিকৃত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুর দ্বারা আমরা নিজের অহংসীমার মধ্যে বদ্ধ হই। আত্মা তাতে আপন ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়। কেননা আত্মার ধর্মই হচ্ছে নিজের সত্যকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা। ভৌতিক জগতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যেমন বিশ্বশক্তির সঙ্গে আমাদের শক্তিকে যোগযুক্ত করে, বিশ্বনিয়মের দ্বারা আমাদের সকল কর্মকে নিয়মিত করে, খেয়ালের দ্বারা নয়, অন্ধ

সংস্কারের দ্বারা নয়—তেমনি আমাদের অন্তরাত্মায় যে কল্যাণবৃত্তি আছে সে করুণার দ্বারা মৈত্রীর দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্মত লোকহিতৈষিতার দ্বারা আপনাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করে। স্বার্থ তখন পরমার্থে উত্তীর্ণ হয়—অর্থাৎ তখন সকলের হিতে নিজের হিত জানি। যে শুভবুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাত্মার সঙ্গে যোগসাধন হয়, উপনিষদে তারই জন্যে প্রার্থনা আছে—বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ—বিশ্বের আদিতে ও অন্তে যিনি পরিব্যাপ্ত তিনিই দেবতা,—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তিনি আমাদেরকে শুভবুদ্ধির দ্বারা যোগযুক্ত করুন। অশুভবুদ্ধি আমাদের অহংকে আশ্রয় করে—সে যে-সমস্ত পাপ ঘটায় সে তো গায়ে লেগে থাকে না, বাইরের অনুষ্ঠানে তাকে তাড়াবার কথা যখন মনে করি তখন গ্রহ মানি, পান্ডা মানি, পুরুৎ মানি, অন্তর্যামীকে মানিনে, মানিনে তাঁকে যিনি "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ", যিনি "বিশ্বকর্মা" যিনি "মহাত্মা" যিনি সর্বজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। যে সাধনায় পাপের মূল ক্ষয় হয়, সে আত্মিক সত্যের সাধনা, শুভবুদ্ধির সাধনা। সেই সাধনায় আত্মাকে মানি, এবং সেই আত্মার আশ্রয়ে বিশ্বাত্মাকে মানি। সেই মানা থেকে ভ্রষ্ট করে আর যে-কোনো স্থূল পদার্থকে মানতে বলো তাকে আমি ধর্ম্ম বলিনে। তুমি যখন দেবতাকে ভক্তির কথা ভালোবাসার কথা বলো তখন সেটা বুঝতে পারি, কিন্তু যখন তুমি বিচারের চেয়ে আচারকে, বুদ্ধির চেয়ে সংস্কারকে, পুরুষকারের চেয়ে গ্রহকে প্রাধান্য দিতে চাও, এবং দিয়ে বলো সেইটেই হিন্দুধর্ম্ম তখন মন অত্যন্ত পীড়িত হয়—একা তোমার জন্যে নয় এই শক্তিহীন বুদ্ধিহীন মোহাচ্ছন্ন দেশের জন্যে।

(চিঠিপত্র, নবমখন্ড, ৮ নভেম্বর ১৯৩১)

যিনি এক, যাঁর কোনো বর্ণ নেই, যিনি নানা শক্তি যোগে নানা বর্ণের মানুষের নিজ নিজ প্রয়োজন বিধান করেন। যিনি সমস্ত কিছুর আদিতেও আছেন অন্তেও আছেন, তিনি আমাদের দেবতা। তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।

(Mahatmaji & the Depressed Humanity Apperdix,
সর্ব্বজনীন নিবেদন, মঙ্গলাচরণ, বেদমন্ত্র, ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৯)

আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম ক'রে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি। কিন্তু, তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা ক'রে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে—

স দেবঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

(ভূমিকা, মানুষের ধর্ম, ১৮ মাঘ ১৩৩৯)

উপনিষদ বলেন, যিনি এক তিনি 'বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি'—নানা জাতির লোককে তাদের নিহিতার্থ দান করেন। নিহিতার্থ, অর্থাৎ প্রজারা যা চায় প্রজাপতি সেটা তাদের অন্তরেই প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। মানুষকে সেটা আবিষ্কার করে নিতে হয়, তা হলেই দানের জিনিস তার নিজের জিনিস হয়ে ওঠে। যুগে যুগে এই নিহিতার্থ প্রকাশ পেয়েছে। এই-যে নিহিতার্থ তিনি দিয়েছেন, এ 'বহুধা শক্তিযোগাৎ'—বহুধা শক্তির যোগে। নিহিতার্থের সঙ্গে সেই বহুদিক্গামী শক্তিকে পাই। আজকের যুগের য়ুরোপীয় সাধকেরা মানুষের সেই নিহিতার্থের একটা বিশেষ সন্ধান পেয়েছেন—তারই যোগে বিশেষ শক্তিকে পেয়েছেন। সেই শক্তি আজ বহুধা হয়ে বিশ্বকে নূতন করে জয় করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই শক্তি, এই অর্থ যাঁর, তিনি সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই এক—একোঽবর্ণঃ। সেই শক্তির অর্থ যে-কোনো বিশেষ কালে বিশেষ জাতির কাছে ব্যক্ত হোক-না কেন, তা সকল কালের সকল জাতির পক্ষেই এক। বিজ্ঞানের সত্য যে পণ্ডিত যখনই আবিষ্কার করুন, জাতিনির্বিশেষে তা এক। অতএব এই শক্তি-আবিষ্কার আমাদের সকলকে এক করবার সহায়তা করে যেন। বিজ্ঞান যেখানে সত্য সেখানে বস্তুতই সে সকল জাতির মানুষকে ঐক্য দান করছে। কিন্তু তার শক্তির ভাগাভাগি নিয়ে মানুষ হানাহানি করে থাকে; সেই বিরোধ সত্যের বা শক্তির মধ্যে নয়, আমাদের চরিত্রে যে অসত্য, যে অশান্তি, তারই মধ্যে। সেইজন্যে এই শ্লোকের শেষে আছে—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে, সকলের শক্তিকে, শুভবুদ্ধি-দ্বারা যোগযুক্ত করুন।

(পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮)

ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্নতা থেকে, জড়বুদ্ধি থেকে, বহিরন্তরের দাসত্বদশা থেকে, মুক্তি-লাভ করুক—য একঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

(ভারতপথিক রামমোহন, ১১ মাঘ ১৩৩৫)

আমাদের সকল দুর্গতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এ দেশে জন্মেছেন, তাঁর মধ্যে ভারতের পরিচয়। তাঁকে দেশের বহুজনে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন বলে স্বীকার না করে, তবুও চিরকালের ভারতবর্ষ তাঁকে গভীর অন্তরে নিশ্চিত স্বীকার করেছে। বর্ত্তমান যুগ-রচনায় আজও তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশালী, আজও তাঁর নীরব কণ্ঠ ভারতের অমর বাণীতে আহ্বান করছে তাঁকে—

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।

প্রার্থনা করছে—

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুযক্তু ॥

(সভাপতির অভিভাষণ, রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উৎসব,
ভারতপথিক রামমোহন রায় ১৪ পৌষ ১৩৪০)

চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য সকল প্রাণী, বাইরে থেকে জীবিকার অর্থ খুঁজে খুঁজে। মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে কাকে অনুভব করলে যিনি

নিহিতার্থো দধাতি, যিনি তাকে তার অন্তর্নিহিত অর্থ দিচ্ছেন। সেই অর্থ মানুষের আপন আত্মারই গভীর অর্থ। সেই অর্থ এই যে, মানুষ মহৎ; মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে সে মহৎ, তবেই প্রমাণ হবে যে সে মানুষ। প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ করতে হবে; কেন না তিনি চিরন্তন মানব, সর্বজনীন মানব, তিনি মৃত্যুর অতীত, তাঁকে যে অর্ঘ্য দিতে হবে সে অর্ঘ্য সকল মানুষের হয়ে সকল কালের হয়ে আপনারই অন্তরতম বেদীতে।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

প্রার্থনামন্ত্রে আছে, য একঃ, যিনি এক, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন। যে বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলি সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ৪।১৩

এক জায়গায় কেবল আমার বাধে। খেলনা নিয়ে নিজেকে ভোলাতে আমি কিছুতেই পারি নে। এটা পারে নিতান্তই শিশু বধূ। সাথী আছেন কাছে বসে তাঁর দিকে পিছন ফিরে খেলনার বাক্স খুলে বসা একেবারেই সময় নষ্ট করা। এতে করে সত্য অনুভূতির রস যায় ফিকে হয়ে। ফুল দিতে চাও দাও না, এমন কাউকে দাও যে-মানুষ ফুল হাতে নিয়ে বল্‌বে বাঃ—তার সেই সত্য খুসি সত্য আনন্দে গিয়ে পৌঁছয়। শিলাইদহের বোষ্টমী আমার হাতে আম দিয়ে বল্‌লে, তাঁকে দিলুম। এই তো সত্যকার দেওয়া—আমারই ভোগের মধ্যে তিনি আমটিকে পান। পূজারী ব্রাহ্মণ সকালবেলায় গোলকচাঁপার গাছে বাড়ি মেরে ফুল সংগ্রহ করে ঠাকুরঘরে যেত—তার নামে পুলিশে নালিশ করতে ইচ্ছা করত—ঠাকুরকে ফাঁকি দিচ্ছে বলে। সেই ফুল আমার মধ্যে দিয়েই ঠাকুর গ্রহণ করবেন বলেই গাছে ফুল ফুটিয়েছেন আর আমার মধ্যে ফুলে আনন্দ আছে। ঠাকুরঘরে যে মূর্ত্তি প্রতিদিন এই চোরাই মাল গ্রহণ করে সে তো সমস্ত বিশ্বকে ফাঁকি দিলে—মূঢ়তার ঝুলির মধ্যে ঢেকে তার চুরি। কত মানুষকেই বঞ্চিত করে তবে আমরা এই দেবতার খেলা খেলি। ঠাকুরঘরের নৈবেদ্যের মধ্যে আমরা ঠাকুরের সত্যকার প্রাপ্যকে প্রত্যহ নষ্ট করি।

এর থেকে একটা কথা বুঝতে পারবে, আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। নির্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্চে বলে' আমি ঠাকুরঘর থেকে দূরে থাকি এ কথা সত্য নয়—মানুষ বঞ্চিত হচ্চে বলেই আমার নালিষ। যে সেবা যে প্রীতি মানুষের মধ্যে সত্য করে তোলবার সাধনাই হচ্চে ধর্ম্মসাধনা তাকে আমরা খেলার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে মেটাবার চেষ্টায় প্রভূত অপব্যয় ঘটাচ্ছি। এইজন্যেই আমাদের দেশে ধার্মিকতার দ্বারা মানুষ এত অত্যন্ত অবজ্ঞাত। মানুষের রোগ তাপ উপবাস মিট্‌তে চায় না, কেননা এই চিরশিশুর দেশে খেলার রাস্তা দিয়ে সেটা মেটাবার ভার নিয়েচি। মাদুরার মন্দিরে

যখন লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা আমাকে সগৌরবে দেখানো হলো তখন লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ঐসব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। খেলার দেবতা এইসব সোনা জহরাৎকে ব্যর্থ করে বসে থাকুন—এদিকে সত্যকার দেবতা সত্যকার মানুষের কংকালশীর্ণ হাতের মুষ্ঠি প্রসারিত করে ঐ মন্দিরের বাহিরে পথে পথে ফিরচেন। তবু আমাকে বলবে আমি নিরঞ্জনের পূজারি? ঐ ঠাকুরঘরের মধ্যে যে পূজা পড়ছে সমস্ত ক্ষুধিতের ক্ষুধাকে অবজ্ঞা করে সে আজ কোন্ শূন্যে গিয়ে জমা হচ্চে?

হয়ত বল্‌বে এই খেলার পূজাটা সহজ। কিন্তু সত্যের সাধনাকে সহজ কোরো না। আমরা মানুষ, আমাদের এতে গৌরব নষ্ট হয়। দেবতার পূজা কঠিন দুঃখেরই সাধনা—মানুষের দুঃখভার পর্ব্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেচে সেইখানেই দেবতার আহবান শোনো—সেই দুঃসাধ্য তপস্যাকে ফাঁকি দেবার জন্যে মোহের গহবরের মধ্যে লুকিয়ে থেকো না। আমি মানুষকে ভালোবাসি বলেই এই খেলার দেবতার সঙ্গে আমার ঝগড়া। দরকার নেই এই খেলার, কেননা প্রেম দাবী করচেন সত্যকার ত্যাগের, সত্যকার পাত্রে।...............

রিলিজন্ অফ্ ম্যান্ বলে একটা ইংরেজি বই লিখেছি সেটা পড়লে বুঝতে পারবে আমার মতে

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

(চিঠিপত্র, নবম খন্ড, ২৯ চৈত্র ১৩৩৭)

মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে সে মহৎ, তবেই প্রমাণ হবে যে সে মানুষ। প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ করতে হবে; কেননা তিনি চিরন্তন মানব, সর্বজনীন মানব, তিনি মৃত্যুর অতীত, তাঁকে যে অর্ঘ্য দিতে হবে সে অর্ঘ্য সকল মানুষের হয়ে সকল কালের হয়ে আপনারই অন্তরতম বেদীতে। আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে : কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৪।১৭

উপনিষৎ বলছেন—'এষ দেবো বিশ্বকর্মা', এই দেবতা বিশ্বকর্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে ব্যক্ত করছেন, কিন্তু তিনিই 'মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', মহান্ আপন-রূপে পরম একরূপে সর্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌ৢপ্তো য এতৎ'—সেই হৃদয়ের যে জ্ঞান

যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান, সেই জ্ঞানে যাঁরা এঁকে পেয়ে থাকেন 'অমৃতাস্তে ভবন্তি', তাঁরাই অমৃত হন।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন ১৩১৭)

আমাদের চোখ যেমন একেবারে দেখে আমাদের হৃদয় তেমনি স্বভাবত একেবারে অনুভব করে—মধুরকে তার মিষ্ট লাগে, রুদ্রকে তার ভীষণ বোধ হয়, সেই বোধের জন্যে তাকে কিছুই চিন্তা করতে হয় না। সেই আমাদের হৃদয় যখন তার স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোধশক্তির দ্বারাই পরম এককে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্যে বেঁচে যায়। জোড়া দিয়ে দিয়ে অনন্তকালেও আমরা এককে পেতে পারি নে, হৃদয়ের সহজ বোধে এক মুহূর্ত্তেই তাঁকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়। তাই উপনিষৎ বলেছেন তিনি আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, তাই একেবারেই রসরূপে আনন্দরূপে তাঁকে অব্যবহিত করে পাই, আর-কিছুতে পাবার জো নেই।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন ১৩১৭)

যে দেবতা সকল **জনানাং হৃদয়ে,** যাঁর কর্ম আচারবিচারের নিরর্থক ক্রিয়াকর্ম নয় সকল বিশ্বের কর্ম, সকল আত্মার মধ্যে যে মহাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয় তিনিই উপনিষদের দেবতা, তাঁকেই দেউলের মধ্যে সরিয়ে রেখেছে যাকে বলি পুরাতন ভারত —আর সোনার শিকলে বাঁধতে চেয়েচে স্বর্ণলঙ্কাপুরীর য়ুরোপ। এই উভয়ে পরস্পরের সতীন বলেই এদের পরস্পরের প্রতি এত বিরাগ। মানুষের আত্মায় যিনি মহাত্মা, মানুষের কর্মে যিনি বিশ্বকর্মা, আমি জেনে না জেনে সেই দেবতাকেই মেনেচি —তিনি যেখানে উপবাসী পীড়িত সেখান থেকে আমার ঠাকুরের ভোগ অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারি নে।

(চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড, ১৮ জুন ১৯৩১)

আমি সহরের মানুষ, একদিন হঠাৎ এক পল্লীবাসী বাউল ভিখারীর মুখে গান শুনলুম, "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।" আমি যেন চমকে উঠলুম, বুঝতে পারলুম, এই মনের মানুষকে, এই সত্য মানুষকেই আমরা দেবতায় খুঁজি, মানুষে খুঁজি, কল্পনায় খুঁজি, ব্যবহারে খুঁজি, "হৃদা মনীষা"—হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে। সেই মহান্ আত্মার অমরাবতী হচ্চে, "সদা জনানাং হৃদয়ে।" কত লোক দেখেচি যারা নিজেকে নাস্তিক বলেই কল্পনা করে, অথচ সর্বজনের উদ্দেশে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করচে, আবার এও প্রায়ই দেখা যায় যারা নিজেকে ধার্ম্মিক বলেই মনে করে তারা সর্ব্বজনের সেবায় পরম কৃপণ, মানুষকে তারা নানা উপলক্ষ্যেই পীড়িত করে বঞ্চিত করে। বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে কর্ম্মের মিল আছে মহান্ আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ আছে কত নাস্তিকের,—তাদের সত্য পূজা জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে, কত বিচিত্র কীর্ত্তিতে জগতে নিত্য হয়ে গেছে, তাদের নৈবেদ্যের ডালি কোনোদিন রিক্ত হবে না। মনের মানুষের শাশ্বত রূপ তারা অন্তরে দেখেচে, তাই তারা অনায়াসে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত পণ করতে পারে।—তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ—সেই বেদনীয় পুরুষকে আপনার মধ্যে জানো, মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দিক্। য এতদ্-বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি—কারণ তারা বেঁচে থাকে সকল কালের সকল লোকের মধ্যে,

যাঁর উপলব্ধির মধ্যে তাদের আত্মোপলব্ধি তাঁর বিরাট আয়ু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সকল সত্তাকে নিয়ে। মানুষকে অন্নবস্ত্রবিদ্যা, আরোগ্য, শক্তি সাহস দিতে হবে এই সাধনায় যারা আত্মনিবেদন করেচে তারা কোনো দেবতাকে বিশেষ সংজ্ঞাদ্বারা মানুক বা না মানুক তারা সেই বেদ্য পুরুষকে জেনেচে, সেই মহান্ আত্মাকে, সেই বিশ্বকর্মাকে, যাঁকে জানলে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর ভিতরে থেকে বাঁধা অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁরা পূজাকে নিঃশেষিত করে তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না, কেননা, তাঁরা মনের মানুষকে দেখেচেন মনের মধ্যে, মানুষের মধ্যে নিত্যকালের বেদীতে। দেশ-বিদেশের সেই সব নাস্তিক ভক্তদের আমি আপন ধর্মভাই বলেই জানি। সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাঁদের বেশি দেখলুম, কিন্তু তাঁরা যে দেশে থাকেন সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক্, এই আমার কামনা। তোমার চিঠিতে বারবার তুমি লিখেচ, নিজের দেশের কাছ থেকেই নিতে হবে। সত্য কথা, কিন্তু নিজের দেশ সকল দেশেই আছে, অন্য দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সকল দেশের—যদি অভিমানে বা অশক্তিতে তা না নিই তবে নিজের সম্পত্তিকে অস্বীকার করা হয়,—বিশ্বমানবের বেদীতে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, জ্ঞানের প্রেমের কর্মের, তাতে সকল মানুষেরই ভোগের অধিকার,—তাকে নিয়েও যদি জাত মান্তে হয়, তবে সঙ্কীর্ণভাবে হিঁদু হয়েই মরব মানুষ হয়ে বাঁচব না। যদি বলো নকল, তা নিজের দেশের নকলও নকল, পরের দেশের নকলও নকল—যে কর্ম্ম খাঁটি তা নকল নয়, যা মেকি তাই নকল, তার উপর স্বদেশেরই ছাপ থাক্ আর বিদেশের।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ২৩ জুন ১৯৩১)

আমার মনের মানুষের উপলব্ধি আমার অন্তরে পূর্ণতা পাবে এই আমি কামনা করি। "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" এই মনের মানুষ কেবলমাত্র রসভোগের নেশায় মাতিয়ে রাখবার জন্যে নয়, মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উদ্বোধনের জন্যে। এই মনের মানুষই তো আমাকে একদিন আত্মনিবিষ্ট সাহিত্যসাধনার গণ্ডী থেকে শান্তিনিকেতনের কর্ম্মক্ষেত্রে টেনে এনেছিল। সে কি সংগ পাবার জন্যে, সুখ পাবার জন্যে। এই ত্রিশ বৎসর যে কঠিন দুঃখের পথে আমাকে চলতে হয়েচে তার ইতিহাস কেউ জানবে না—এই দুঃখেই আমার মনের মানুষের সংগে আমার যোগ।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ২১ অক্টোবর ১৯৩১)

আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম ক'রে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত ব'লেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু, তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'।

(ভূমিকা, মানুষের ধর্ম, ১৮ মাঘ ১৩৩৯)

এই জগৎকে জানি আপন বোধ দিয়ে। যে জানে সেই আমার আত্মা সে আপনাকেও আপনি জানে। এই স্বপ্রকাশ আত্মা একা নয়। আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা, এমন কত আত্মা। তারা যে এক আত্মার মধ্যে সত্য, তাঁকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানবপরমাত্মা, ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য সেই মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

(অবতরণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড)

ইনি দেব ইনি মহান্ আত্মা
আছেন বিশ্বকাজে,
সকল জনের হৃদয়ে হৃদয়ে
ইঁহারই আসন রাজে।
সংশয়হীন বোধের বিকাশে
ইঁহাকে জানেন যাঁরা
জগতে অমর তাঁরা।

(রূপান্তর)

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। ৪।১৯

যে ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্বত্র অনুভব করিবেন উপনিষদের এই অনুশাসন।

ব্রহ্মের সেই বিশুদ্ধ ভাব কিরূপে মনন করিতে হইবে?

....

কি ঊর্ধ্বদেশ, কি তির্য্যক্, কি মধ্যদেশ, কেহ ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না— ইঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্‌যশ!

প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবাত্মার লক্ষ্য স্থান এই পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল ওঁ।

(ব্রহ্মমন্ত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড,
৮ মাঘ ১৩০৭)

বৈদিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলেছে আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর সম্বন্ধে বলেছে: যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। তাঁর মহদ্‌যশই তাঁর নাম, তাঁর মহৎ কীর্ত্তিতেই তিনি সত্য। মানুষের স্বভাবও তাই—আত্মাকে প্রকাশ।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০ সাল)

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্‌।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য
এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৪।২০

ইঁহার স্বরূপ চক্ষুর সম্মুখে স্থিত নহে, ইঁহাকে কেহ চক্ষুতে দেখে না—হৃদিস্থিত বুদ্ধি-দ্বারা ইনি কেবল হৃদয়েই প্রকাশিত, ইঁহাকে যাঁহারা এইরূপেই জানেন তাঁহারা অমর হন—এমন-যে আত্মার অন্তরাত্মা তাঁহাকে বহির্বস্তুর মতো বাহিরে পাইতে গেলেই তাঁহাকে পাওয়া যায় না এ কথা আমরা কেন না স্মরণ করি?

(নিরাকার উপাসনা, পরিশিষ্ট, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড, মাঘ ১৩০৫)

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং॥ ৪।২১

তুমি অজাত, জন্মরহিত, কোন ভীরু তোমার শরণাপন্ন হইতেছে, হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

(ঔপনিষদব্রহ্ম, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা করো।

(প্রার্থনা, ধর্ম, ১৩১১)

হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।

হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে,—তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখ কখন দেখি, যখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে মত্ত, খ্যাতির অহংকারে আত্মবিস্মৃত, যখন আমরা নিরাপদ অকর্মণ্যতার মধ্যে সুখসুপ্ত তখন? নহে, নহে, কদাচ নহে। যখন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভয়ে ভাবনায় সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়া মান্য না করি—তখনই বধে বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিদ্র্যে দুর্যোগে, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। তখন দুঃখ এবং মৃত্যু, বিঘ্ন এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয়। নতুবা সুখে আমাদের সুখ নাই, ধনে আমাদের মঙ্গল নাই, আলস্যে আমাদের বিশ্রাম নাই। হে ভয়ংকর, হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব, কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের

মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্ব্বাদ করো। জাগাও হে জাগাও —যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন এক মুহূর্তে জাগাইয়া তুলিবে তখন, হে রুদ্র, সেই উদ্ধত ঐশ্বর্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি—এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে তাহাকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই দুঃসহ দুর্দিনকে আমরা যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি—এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—

আবিরাবীর্ম এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হউক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হউক, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হউক। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণ-মুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে; নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না—কারণ সেই দয়াই দুর্গতি, সেই দয়াই অবমাননা; এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে।

(দুঃখ, ধর্ম, ১৩১৪)

হে রুদ্র হে ভয়ানক—তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং, তোমার যে প্রসন্ন সুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও—তেন মাং পাহি নিত্যম্—তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে বাঁচাও, আমাকে নিত্যকালের মতো বাঁচাও—তোমার সেই প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ।

(প্রার্থনা, শান্তিনিকেতন, ২ পৌষ ১৩১৫)

হে রুদ্র, পাপ দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে যাক। তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ করো। কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাকুক, শিকড় থেকে বীজভরা ফল পর্যন্ত সমস্ত দগ্ধ হয়ে যাক। এ যে বহুদিনের বহু দুশ্চেষ্টার ফল, শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে ফলে রয়েছে। শিকড় হৃদয়ের রসাতল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। তোমার রুদ্রতাপের এমন ইন্ধন আর নেই। যখন দগ্ধ হবে তখনই এ সার্থক হতে থাকবে। তখন আলোকের মধ্যে তার অন্ত হবে।

তারপরে হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক্। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরমপুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক, হৃদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মঙ্গল করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদসংকট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন

অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবনপথের সম্বল হয়ে থাক্। আমারই অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃত, যে প্রকাশ রয়েছে তোমার প্রসন্নতার দ্বারা যখন তাকে উপলব্ধি করব তখনই রক্ষা পাব।

(প্রার্থনা, শান্তিনিকেতন, ১৪ ফাল্গুন ১৩১৫)

হে আবিঃ—তুমি যে প্রকাশরূপে নিরন্তর রয়েছ—সেই প্রকাশের দিকেই আমার দৃষ্টি নেই। আমি হতভাগ্য। সেইজন্য আমি কেবল তোমাকে রুদ্রই দেখছি—তোমার প্রসন্নতা যে আমার আত্মাকে নিয়ত পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা জানতেই পারছি নে। মার দিকে পিঠ করে শিশু অন্ধকার দেখে কেঁদে মরে—একবার পাশ ফিরলেই জানতে পারে মা যে তাকে আলিঙ্গন করেই রয়েছেন। তোমার প্রসন্নতার দিকেই তুমি আমাদের পাশ ফিরিয়ে নাও হে জননী, তা হলেই এক মুহূর্তে জানতে পারব আমি রক্ষা পেয়েই আছি, অনন্তকাল আমার রক্ষা, নইলে অরক্ষা-ভয়ের কান্না কোনোমতেই থামবে না।

(বিমুখতা, শান্তিনিকেতন, ১৮ ফাল্গুন ১৩১৫)

হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হ'ক, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোনো বাধা না পাক—সেই প্রকাশ নির্মুক্ত হলেই তোমার দক্ষিণ মুখের জ্যোতিতে আমি চিরকালের জন্যে রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্নতা।

(আদেশ, শান্তিনিকেতন, ৯ চৈত্র ১৩১৫)

মানুষের যা দুঃখ সে অপ্রকাশের দুঃখ—যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি এখনও তার মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছেন না; তার হৃদয়ের উপর অনেকগুলো আবরণ রয়ে গেছে; এখনও তার মধ্যে বাধা-বিরোধের সীমা নেই; এখনও সে আপনার প্রকৃতির নানা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারছে না; এখনও তার এক ভাগ অন্য ভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তার স্বার্থের সঙ্গে পরমার্থের মিল হচ্ছে না, এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যিনি আবিঃ তাঁর আবির্ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না; ভয় দুঃখ শোক অবসাদ অকৃতার্থতা এসে পড়ছে—যা গিয়েছে তার জন্যে বেদনা, যা আসবে তার জন্য ভাবনা চিত্তকে মথিত করছে—আপনার অন্তর বাহির সমস্তকে নিয়ে জীবন প্রসন্ন হয়ে উঠছে না। এইজন্যেই মানুষের প্রার্থনা : রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা করো।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড়ো কান্না পাপের কান্না। সে যে আপনার সমস্তটাকেই নিয়ে সেই পরম-একের সুরে মেলাতে পারছে না, সেই অমিলের বেসুর সেই পাপ তাকে আঘাত করছে। মানুষের নানা ভাগ নানা দিকে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার একটা অংশ যখন তার অন্য সকল অংশকে ছাড়িয়ে গিয়ে উৎপাতের আকার ধারণ করছে, তখন সে নিজেকে সেই পরম একের শাসনে বিধৃত দেখতে পাচ্ছে না; তখন সেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় কেঁদে উঠে সে বলছে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে আর আঘাত কোরো না, আঘাত কোরো না। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো, তোমার সঙ্গে আমার সমগ্রকে মিলিয়ে দাও—তা হলেই আমার আপনার মধ্যে আমার মিল হবে, সকলের মধ্যে আমার মিল হবে, আমার মধ্যে

তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হবে, জীবনের মধ্যে সমস্ত রুদ্রতা প্রসন্নতায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

অনেকে এমন ভাবে বলেন, যেন প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ; যেন যা আছে তাই নিয়েই প্রকৃতি; প্রকৃতির মধ্যে উপরে ওঠবার কোনো বেগ নেই; সেইজন্যেই মানবপ্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক্ করে দেখবার চেষ্টা হয়। কিন্তু, আমরা তো প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখতে পাচ্ছি; সে তো জড়যন্ত্রের মতো একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্তকাল অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করছে না। এ পর্যন্ত তাকে তো তার পথের কোনো জায়গায় থেমে থাকতে দেখি নি। সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্প-সংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মানুষে এসে পৌঁছেছে, এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। ইতিমধ্যে তার অবিরাম চেষ্টা কত গড়েছে এবং কত ভেঙে ফেলেছে, কত ঝড় কত প্লাবন কত ভূমিকম্প কত অগ্নি-উচ্ছ্বাসের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। আতপ্ত পঙ্কের ভিতর দিয়ে একদিন কত মহারণ্যকে সে তখনকার ঘনমেঘাবৃত আকাশের দিকে জাগিয়ে তুলেছিল, আজ কেবল কয়লার খনির ভাণ্ডারে তাদের অস্পষ্ট ইতিহাস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে। যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভালো করে নির্ণীত হয় নি তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ কত অদ্ভুত পাখি কত আশ্চর্য জন্তু কোন্ নেপথ্য-গৃহ থেকে এই সৃষ্টিরঙ্গভূমিতে এসে তাদের জীবলীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্ধরাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে তো যায় নি। থেমে যদি যেত তা হলে এখনই যা-কিছু সমস্তই বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আদিঅন্তহীন বিশৃঙ্খলতায় স্তূপাকার হয়ে উঠত। প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে ব'লেই তার বর্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে। কেবলই তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন ক'রে ক'রেই এগোতে হচ্ছে, কেবলই তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। এইজন্যেই এত দুঃখ, এত মৃত্যু। কিন্তু, সামঞ্জস্যেরই একটি সুমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোটো ছোটো সামঞ্জস্যের বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না, কেবলি ছিন্ন করে করে কেড়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে এই দুটিকেই আমরা একসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দেখতে পাই। তার চেষ্টার মধ্যে যে দুঃখ, অথচ তার সেই চেষ্টার আদিতে ও অন্তে যে আনন্দ, দুই একত্র হয়ে প্রকৃতিতে দেখা দেয়। এইজন্যে প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি অনবরত অতি ভীষণ ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত তাকে এই মুহূর্তেই স্থির শান্ত নিস্তব্ধ দেখতে পাচ্ছি। এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে সুন্দরকে দেখা—এর একটিকে বাদ দিতে গেলেই অন্যটি অর্থহীন সুতরাং শ্রীহীন হয়ে পড়ে।

মানবসংসারে কেন যে সব সময়ে আমরা এই দুটিকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পারি নে তার কারণ পূর্বেই বলেছি। সংসারের সমস্ত বেদনা আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে বাজে; যেখানে সামঞ্জস্য বিদীর্ণ হচ্ছে সেইখানেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সেই-সমস্তকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিয়ে যেখানে অনন্ত সামঞ্জস্য বিরাজ করছে

সেখানে সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এমনি করে আমরা সত্যকে অপূর্ণ করে দেখছি বলেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে দেখছি নে; সেইজন্যেই আবিঃ আমাদের কাছে আবির্ভূত হচ্ছেন না, **সেইজন্য রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে।**

কিন্তু, মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখতে চাও? তা হলে নিজের স্বার্থপর ছয়-রিপু-চালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এস। মানবচরিতকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ওই দেখো শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্ছে; তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী তার দীপ্তি, কী তার সৌন্দর্য, কী তার পবিত্রতা। কিন্তু, সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখো। কী দুঃসহ। কত দুঃখের দারুণ দাহে ওই সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে। সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তা হলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু, সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ একে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভগবান ঈশাকে দেখো। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা। সমস্তকে নিয়ে তিনি কত সুন্দর। শুধু তাই নয়; তাঁর চারিদিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা সংকীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিতমূর্তির উপকরণ—পঙ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি, মহাপুরুষদের জীবনেও মহদ্‌দুঃখের ভীষণ লীলাকে সেইরকম বৃহৎ করে সুন্দর করে দেখতে পাই। কেননা, সেখানে আমরা দুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি, এইজন্য তাকে দুঃখরূপে দেখি নে, আনন্দরূপেই দেখি।

আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখব; ভীষণকে সুন্দর বলে জানব; মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যিনি তাঁকে ভয়ে নয়, আনন্দে অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয়-অপ্রিয় সুখদুঃখ সম্পদ্‌বিপদ সমস্তকেই আমরা বীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই আমরা ভূমার মধ্যে অখণ্ড ক'রে এক ক'রে সুন্দর করে দেখব। যিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং তিনিই পরমসুন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই সুখদুঃখবন্ধুর ভাঙাগড়ার সংসারে সেই **রুদ্রের আনন্দলীলার** নিত্যসহচর হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হতে থাকব। নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। নইলে সমস্ত দুঃখ-কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা সৌন্দর্যকে যখন আমাদের দুর্বল আরামের উপযোগী করে ভোগ-সুখের বেড়া দিয়ে বেষ্টন করব তখন সেই সৌন্দর্য ভূমাকে আঘাত করতে থাকবে, আপনার চারিদিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ নষ্ট হয়ে যাবে—তখন সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে কেবল উগ্রগন্ধ মাদকতার সৃষ্টি করবে, আমাদের শুভবুদ্ধিকে স্খলিত করে তাকে ভূমিস্যাৎ করে দেবে। সেই সৌন্দর্য ভোগবিলাসের বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুষিত করবে, সকলের সঙ্গে সরল সামঞ্জস্যে যুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবে না। তাই বলছিলুম, সুন্দরকে জানার জন্যে কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার, প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে তো

মরীচিকা। সত্যকে যখন আমরা সুন্দর করে জানি তখনই সুন্দরকে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্মল, যার হৃদয় পবিত্র, বিশ্বের মধ্যে সর্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না।

(সুন্দর, শান্তিনিকেতন, ১৫ চৈত্র ১৩১৭)

হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি—তোমার প্রলয়-লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্যসুপ্ত তারগুলোকে কঠিন বলে আঘাত করুক, তা হলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টিলীলার নব আনন্দ সংগীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে। তা হলেই তোমার প্রসন্নতাকে অবারিত দেখতে পাবো,—তা হলেই আমি রক্ষা পাব। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

(নববর্ষ, শান্তিনিকেতন, ১ বৈশাখ ১৩১৮)

হে আমার পরম সত্য, আমি আমার অন্তরে বাহিরে কেবল নিজেকেই আশ্রয় করতে চাচ্ছি বলে কেবল অসত্যের মধ্যে অশুচি হয়ে ডুবছি—আমার মধ্যে হে মহান্, হে পবিত্র, তোমার প্রকাশ হোক, তা হলেই আমি চিরদিনের মতো রক্ষা পাব। হে প্রভু, পাহি মাং নিত্যং, পাহি মাং নিত্যম্।

(শুচি, শান্তিনিকেতন, আশ্বিন ১৩১৯)

নিজের হৃদয়কে প্রাণকে অনন্তের ভাণ্ডার থেকে প্রতিদিনই ভরে নিতে হবে—তাঁকে বলতেই হবে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—নইলে কিছুতে রক্ষা নেই, কিছুতে না।

(চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, ১৯১২)

পাহি মাং নিত্যং। আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। আমার সত্যের মধ্যে, সীমার মধ্যে আমাকে রক্ষা করো; আমি যেন সীমার বাহিরে আপনাকে হারাইয়া না ফেলি। আমি যাহা, পূর্ণরূপে তাহাই হইয়া যেন তোমার প্রসন্নতাকে তোমার আনন্দকে সুস্পষ্টরূপে নিজের মধ্যে অনুভব করি। অর্থাৎ, আমার যে সীমার মধ্যে তোমার বিলাস সেই সীমাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমি যেন নিজের জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, ইহাই আমার অস্তিত্বের মূলগত অন্তরতর প্রার্থনা।

(সীমার সার্থকতা, পথের সঞ্চয়, ১৩১৯)

মনুষ্যত্বের তপস্যা সহজ তপস্যা হয় নি, সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্তমাখা পায়ে মানুষকে চলতে হয়েছে, তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেছে; মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেছে; ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেছে—এবং 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং', হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ সেই মুখ মানুষ দেখতে পেয়েছে। সে দেখা তো সহজ নয়; সমস্ত অভাবকে পরিপূর্ণ করে দেখা, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দেখা। মানুষ সেই দেখা দেখেছে বলেই তো তার সকল কান্নার অশ্রু-জলের উপরে তার গৌরবের পদ্মটি ভেসে উঠেছে; তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দসম্মিলন।

(ছোটো এবং বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হতো তা হলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তা হলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়। তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পেঁৗছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয়।

(আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪)

রুদ্র, তোমার রুদ্রতার মধ্যে অনেক দুঃখদারিদ্র্য আছে—আমরা যেন বলতে পারি যে, সেই ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করেও তোমার দক্ষিণ মুখ দেখেছি।

(বিশ্বভারতী, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ৭ পৌষ ১৩৩০)

আমাদের প্রার্থনা যেন ছোটো না হয়। ভীরুর মতো, বলব না 'আমাদের দুঃখ দূর করো'। বীরের মত বলব, 'দুঃখ দাও, বিপদ দাও, অপমানের পথে আমাদের নিয়ে যাও। কিন্তু দুঃখ বিপদ অপমানের মধ্যেও অন্তরে যেন তোমার প্রসন্নতার আশীর্বাদ অনুভব করি।'

হে রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—তোমার যে প্রসন্নমুখ, আমাদের দেখাও। তমসো মা জ্যোতির্গময়—অন্ধকারের মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ করো। হে রুদ্র, হে নিষ্ঠুর, ক্ষতি-পরাভবের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাও। বাহিরের আঘাতের দ্বারা আমাদের শক্তিকে অন্তরে অন্তরে পুঞ্জিত করো।

(ভারতপথিক রামমোহন রায়, ৬ ভাদ্র ১৩৩৫)

আমরা দুঃখকে যে ভাবে দেখি বৃহতের মধ্যে সে ভাব থাকতে পারে না, যদি থাকত তা হলে সেখানে দুঃখের লাঘব বা অবসান হত না। সংগীতের অসম্পূর্ণতায় বিস্তর বেসুর আছে, সেই বেসুরের একটিও থাকতে পারে না সম্পূর্ণ সংগীতে—সেই সম্পূর্ণ সংগীতের দিকে যতই যাওয়া যায় ততই বেসুরের হ্রাস হতে থাকে। বেসুর আমাদের পীড়া দেয়, যদি না দিত তা হলে সুরের দিকে আমাদের যাত্রা এগোত না। তাই বিরাটকে বলি রুদ্র, তিনি মুক্তির দিকে আকর্ষণ করেন দুঃখের পথে।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০ সাল)

ব্রাহ্মসমাজে একটি শ্লোককে বাংলায় তর্জমা করতে গিয়ে একটা চরণের মানে এমন বদলে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে সমস্ত শ্লোকটাই আমার মতে নিরর্থক হয়ে গেছে। ঐ যে 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্ মুখম্ তেন মাম্ পাহি নিত্যম্'—এর বদলে বলা হয়েছে 'দয়াময় তোমার যে অপার করুণা তাহার দ্বারা সর্বদা আমাকে রক্ষা করো'; এটা প্রথম চরণগুলোর সঙ্গে মোটেই খাপ খায় নি। কারণ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই দুটো জিনিষকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে আসল মন্ত্রটাতে। যেমন অসত্য না থাকলে সত্যের, অন্ধকার না থাকলে আলোর, মৃত্যু না থাকলে অমৃতের মানে নেই, তেমনি রুদ্র না থাকলেও তাঁর প্রসন্নতার কোনো তাৎপর্য থাকে না। সেখানে তাঁকে শুধু দয়াময় বলা ভুল। কারণ তাঁর রুদ্রমূর্ত্তিও যে সংসারে দেখছি, সেটা তো অস্বীকার

করতে পারি নে। তাই উপনিষদ তাঁর কাছে দয়া ভিক্ষা না করে চেয়েছেন তাঁর প্রকাশ। সে প্রকাশ বিশ্বজগতের সব জিনিসের মধ্যেই রয়েছে; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের অন্তরের মধ্যে তা অনুভব করি ততক্ষণ আমার ভয় ঘোচে না, ততক্ষণ তিনি আমার কাছে রুদ্ররূপেই দেখা দেন। তাই তো প্রার্থনা 'অসত্য থেকে আত্মাকে সত্যেতে নিয়ে যাও, অন্ধকার পেরিয়ে জ্যোতিতে, মৃত্যু পার হয়ে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করো। হে আবিঃ, হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণ মুখ যেন সর্বদা আমি দেখতে পাই!' রুদ্রের প্রসন্নতা লাভ করা কি করে সম্ভব হয়, যদি না তাঁর প্রকাশ নিজের হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করি? আমার মতে সমস্ত প্রার্থনার মূল কথাটা হচ্ছে 'আবিরাবীর্ম এধি'। তিনি তো স্বপ্রকাশ, নিজেকে সর্বত্রই প্রকাশিত রেখেছেন; কিন্তু সেটা আমাকে কোনো সান্ত্বনা দেয় না, যদি না সেই প্রকাশকে আমি দেখতে পাই আপন অন্তরের মধ্যে। অসত্যের মাঝখানে থেকে সত্যের মহিমা বুঝবো কেমন করে? অন্ধকার ভেদ করে আলোর জন্যে এই কান্না মেটাবে কে? মৃত্যুর অন্তরে যে অমৃতলোক, সেই লোকে উত্তীর্ণ হবো কোন্ শক্তিতে? এ সবই সম্ভব হয় যদি সেই 'আবিঃ'কে আপনার অন্তরের মধ্যে অনুভব করি। সেই অনুভূতি যখন সত্য হয়ে ওঠে, কেবল তখনই আমি বুঝতে পারি রুদ্রের শাসনটাই একমাত্র সত্য নয়, তার আড়ালে তাঁর প্রসন্নমুখ সর্বদাই আমার জন্য রয়েছে। আমি আমার আপন দীনতা-বশতঃ যখন তা দেখতে পাই নে, তখনই আমার যত কান্না, যত ভয়। তখন তাঁকে 'দয়াময়' বলে কেবলি দয়া ভিক্ষা করতে চাই। কিন্তু বিধাতা তো আপন নিয়মকে আমার জন্য লঙ্ঘন করতে পারেন না, এতটা প্রশ্রয় আশা করাই মূঢ়তা। তাই অবোধ শিশুর মতো কেবলি 'আমাকে দয়া ভিক্ষা দাও' বলে কাঁদলে চলবে কেন? মা যখন সন্তানকে শাসন করেন, সে মনে করে মা নির্দয় হচ্ছেন, তাকে দণ্ড না দিলেই যেন দয়া করা হতো, কিন্তু আসলে তো তা নয়। সেই দণ্ডটাই যে তাঁর দয়া, শৈশবদশা কাটিয়ে উঠলে তবে তা আমরা বুঝতে পারি। মায়ের রুদ্রমূর্ত্তির আড়ালে যে তাঁর দক্ষিণমুখ রয়েছে, তা যখন সন্তান দেখতে পায়, তখন তার কান্না থেমে যায়। তাই বলেছিলুম অসত্যের পাশে সত্য, অন্ধকারের পাশে আলো, মৃত্যুর পাশে অমৃতের উল্লেখ যেমন করা হয়েছে, তেমনি রুদ্রের পাশে দক্ষিণমুখের কথাটা বলাই চাই। নইলে সমস্ত মন্ত্রটাই নিরর্থক হয়ে যায়।

(বাইশে শ্রাবণ, শ্রীমতী নির্মল কুমারী মহলানবীশ)

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি। ৪।১৪
স বৃক্ষ কালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো ৬।৬

আমরা ত সংসারের সঙ্কীর্ণতা-দ্বারা প্রতিহত, জটিলতা-দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত, খণ্ডতা-দ্বারা শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া আছি,—আমরা জানি সংসারের স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি—সংসারের সমুদয় স্রোত ভয়াবহ—সকলেরই মধ্যে ভয়দুঃখক্লেশে জরামৃত্যু-বিচ্ছেদের কারণ রহিয়াছে—অতএব আমরা যখন শান্তি চাই, অভয় চাই, আনন্দ চাই, অমৃত চাই, তখন সহজেই স্বভাবতই কাহাকে চাই? যাঁহাকে পাইলে শান্তিমত্যন্তমেতি, অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। তিনি কে? উপনিষৎ বলেন "স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ

তিনি সংসার কাল এবং আকৃতি অর্থাৎ সাকার পদার্থ হইতে পরঃ, শ্রেষ্ঠ, এবং অন্যঃ অর্থাৎ ভিন্ন। যদি তিনি সংসার কাল ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন না হইতেন তবে ত সংসারই আমাদের যথেষ্ট ছিল—তবে ত তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।

বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া অত্যন্ত শিব এবং অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়।

(ঔপনিষদব্রহ্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

সাকার মূর্ত্তির রূপ-ধারণা সহজ সন্দেহ নাই কিন্তু সাকার মূর্ত্তির সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা একেবারেই অসাধ্য; কারণ, স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ—তিনি সংসার হইতে, কাল হইতে, সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন এবং সেইজন্যই তাঁহাতে সংসারাতীত দেশকালাতীত শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি, অত্যন্ত মঙ্গল এবং অত্যন্ত শান্তিলাভ হয়...........

(ঔপনিষদব্রহ্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

সর্বা দিশ ঊর্ধ্বমধশ্চ তির্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৫।৪

রূপ হল হিরন্ময় পাত্র। তাতেও তো সত্যকে আড়াল করে। একমাত্র পরম সত্য অরূপ বলে তিনি কিছু আড়াল করেন না। তিনি—

সর্বা দিশঃ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে।

(ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৬।৭

সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর,
সব দেবতার পরমদেব,
সকল পতির পরম পতি,
সব পরমের পরাৎপর।
তাঁরে জানি তিনি নিখিলপূজ্য
তিনি ভুবনেশ্বর।

(রূপান্তর)

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। ৬।৮

ব্রহ্মর্ষি তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলেন নি, অত্যন্ত স্পষ্ট করেই তাঁকে সক্রিয় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

শুনেছি এঁর পরমা শক্তি এবং এঁর বিবিধা শক্তি এবং এঁর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বাভাবিকী।

ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়া হচ্ছে স্বাভাবিক—অর্থাৎ তাঁর স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল, বাইরে নয়। তিনি করছেন, তাঁকে কেউ করাচ্ছে না।

এইরূপে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে মুক্ত—কেননা এই কর্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্মের স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের শক্তি, কর্মের মধ্যে উন্মুক্ত হতে চায়। কেবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অন্তরের স্ফূর্তিবশত।

সেই কারণে কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি। কর্মেই আমরা বাহির হই প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মুক্তি তাতেই বন্ধন ঘটতে পারে। নৌকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যখন তাকে বাইরের দিকে টানে তখনই সে চলে, যখন নিজের দিকেই বেঁধে রাখে তখনই সে পড়ে থাকে।

আমাদেরও কর্ম যখন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তখন কর্ম ভয়ংকর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তখন সে ভূমার দিকে চলে না, বহুর দিকে চলে না, নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না, আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কর্মহীন অলস সেই রুদ্ধ। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র-কর্মা স্বার্থপর, জগৎসংসার তার সশ্রম কারাবাস। সে স্বার্থের কারাগারে অহোরাত্র একটা ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টানছে এবং এই পরিশ্রমের ফলকে সে যে চিরদিনের মতো আয়ত্ত করে রাখবে এমন সাধ্য তার নেই; এ তাকে পরিত্যাগ করতেই হয়, তার কেবল পরিশ্রমই সার।

অতএব কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্মত্যাগ করা মুক্তি নয়। আমরা যে-কোনো কর্মই করি—তা ছোটোই হ'ক আর বড়োই হ'ক সেই পরমাত্মার স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে দেখলে সেই কর্ম আমাদের আর বদ্ধ করতে পারবে না—সেই কর্ম সত্যকর্ম, মঙ্গলকর্ম এবং আনন্দের কর্ম হয়ে উঠবে।

(শক্তি, শান্তিনিকেতন, ২৮ পৌষ ১৩১৫)

যে এক ইচ্ছা বিশ্বজগতের মূলে বিরাজ করছে তারই সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন—স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। সেই একেরই জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। তা সহজ, তা স্বাধীন, তার উপরে বাইরের কোন কৃত্রিম তাড়না নেই।

আমাদের ইচ্ছা যখন সেই মূল মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে সংগত হয় তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়। অর্থাৎ তার সমস্ত কাজকে কোনো প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা ঘটায় না—অহংকার তাকে ঠেলা দেয় না, লোকসমাজের অনুকরণ তাকে সৃষ্টি করে না, লোকের খ্যাতি তাকে কোনোরকমে জীবিত করে রাখে না, সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধতার

উৎসাহ তাকে শক্তি জোগায় না, নিন্দা তাকে আঘাত করে না, উৎপীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈন্য তাকে নিরস্ত করে না।

মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে যাঁদের ইচ্ছা সম্মিলিত হয়েছে তাঁরা যে বিশ্বজগতের সেই অমর শক্তি সেই স্বাভাবিকী ক্রিয়াশক্তিকে লাভ করেন ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব কপিলবাস্তুর সুখসমৃদ্ধি পরিহার করে যখন বিশ্বের মঙ্গল প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন তখন কোথায় তাঁর রাজকোষ, কোথায় তাঁর সৈন্যসামন্ত। তখন বাহ্য উপকরণে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের দীনতম অক্ষমতম প্রজার সঙ্গে সমান। কিন্তু তিনি যে বিশ্বের মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাকে যোজিত করেছিলেন সেইজন্য তাঁর ইচ্ছা সেই পরাশক্তির স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে লাভ করেছিল। সেইজন্যে কত শত শতাব্দী হল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর মঙ্গলইচ্ছার স্বাভাবিকী ক্রিয়া আজও চলছে। আজও বুদ্ধগয়ার নিভৃত মন্দিরে গিয়ে দেখি সুদূর জাপানের সমুদ্রতীর থেকে সংসারতাপতাপিত জেলে এসে অন্ধকার অর্ধরাত্রে বোধিদ্রুমের সম্মুখে বসে সেই বিশ্বকল্যাণী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড় হাতে বলছে—বুদ্ধস্য শরণং গচ্ছামি। আজও তাঁর জীবন মানুষকে জীবন দিচ্ছে, তাঁর বাণী মানুষকে অভয় দান করছে—তাঁর সেই বহুসহস্র বৎসর পূর্বের ইচ্ছার ক্রিয়ার আজও ক্ষয় হল না।

যিশু কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্ এক পশুর রক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্যশালী রাজধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র ইহুদি যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল। যেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুসে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে যে চিরদিন ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায় নি। তাঁর শত্রুরা মনে করলে সমস্তই চুকে বুকে গেল—এই অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কার সাধ্য নেবায়। ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই। অত্যন্ত কৃশ এবং দীনভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করছে।

অখ্যাত অজ্ঞাত দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যেই সেই পরম মঙ্গলশক্তি যে আপনার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হে অবিশ্বাসী, হে ভীরু, হে দুর্বল, সেই শক্তিকে আশ্রয় করো, সেই ক্রিয়াকে লাভ করো—নিজেকে শক্তিহীন বলে বাইরের দিকে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরে বৃথা আক্ষেপে কাল হরণ ক'রো না—তোমার সামান্য যা সম্বল আছে তা রাজার ঐশ্বর্যকে লজ্জা দেবে।

(স্বাভাবিকী ক্রিয়া, শান্তিনিকেতন, ১১ ফাল্গুন ১৩১৫)

আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তাঁরই দানে এই জ্ঞানটিকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ করে তুলতে হবে এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। এই হলেই জগতে আমাদের থাকা করা এবং ভোগ, আমাদের সত্য মঙ্গল এবং সুখ সমস্তই সহজ হয়ে যাবে—কেননা যিনি স্বয়ম্ভূ, যাঁর জ্ঞান শক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জন্যেই আমাদের সকল চাওয়া।

(আত্মসমর্পণ, শান্তিনিকেতন, ১৮ চৈত্র ১৩১৫)

উপনিষৎ বলেন তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। তাঁর জ্ঞান শক্তি এবং কর্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমাশক্তি আপন স্বভাবেই কাজ করছে। আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।

(কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছে তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁর বল আর ক্রিয়া এই তো হল যা-কিছু; এই তো হল জগৎ। চার দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বল কাজ করছে; স্বাভাবিক এই কাজ। অর্থাৎ, আপনার জোরেই আপনার এই কাজ চলছে; এই স্বাভাবিক বল ও ক্রিয়া যে কী জিনিস তা আমরা আমাদের প্রাণের মধ্যে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই বল ও ক্রিয়া হল বাইরের সত্য। তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরের প্রকাশ আছে, সেইটি হল জ্ঞান। আমরা বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টায় দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখছি, কিন্তু বিরাটের মধ্যে এ একেবারে এক হয়ে আছে। সর্বত্র জ্ঞানের চালনাতেই বল ও ক্রিয়া চলছে এবং বল ও ক্রিয়ার প্রকাশেই জ্ঞান আপনাকে উপলব্ধি করছে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' মানুষ এমন কথা বলতেই পারত না, যদি সে নিজের মধ্যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাণ এবং উভয়ের যোগ একান্ত অনুভব না করত। এইজন্যই গায়ত্রী মন্ত্রে একদিকে বাহিরের ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং অন্য দিকে অন্তরের ধী উভয়কেই একই পরমাশক্তির প্রকাশরূপে ধ্যান করবার উপদেশ আছে।

(একটি মন্ত্র, শান্তিনিকেতন, ১৫ মাঘ ১৩২০)

সৃষ্টির মূলে আছে পরাশক্তির নিরবচ্ছিন্ন স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া। এই কর্মেই কর্মের শেষ।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ১৩ মার্চ ১৯২১)

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ৬।৮

কর্ম-বাঁধনে নহেন বাঁধা,
বাঁধে না তাঁহারে দেহ—
সমান তাঁহার কেহ না, তাঁ হতে
বড়ো নাই নাই কেহ।
তাঁর বিচিত্র পরমাশক্তি
প্রকাশে জলে স্থলে—
তাঁহার জ্ঞানের বলের ক্রিয়া
আপনা-আপনি চলে।

(রূপান্তর)

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥ ৬।৯

জগতে তাঁহার পতি নাই কেহ,
কলেবর নাই কভু—
তিনিই কারণ, মনের চালন—
নাই পিতা, নাই প্রভু।

(রূপান্তর)

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী। ৬।১১

আমরা বিশ্বের অন্য সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান চলে না—তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতমরূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। **"সর্বভূতান্তরাত্মা"** ব্রহ্ম এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তন্যরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদিগকে চিরকালসঞ্চিত প্রাণ বুদ্ধি প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্যকাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজ-ভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়—কারণ মানবসমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব করিতে পারা আমাদের অনুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম, সেই কর্ম দ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তি কর্মবৃত্তি আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি প্রীতি ও কর্মদ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই। মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ

শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি। এইজন্য মানবসংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা,—সেই উপাসনা দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।

(ধর্মপ্রচার, ধর্ম, ১৩১০)

মানুষ হয়ে জন্মেছি, ললাটের লিখনে নিয়ে এসেছি সোঽহম্; এই বাণীকে সার্থক করবার জন্যেই আমরা মানুষ। আমাদের একজনেরও অগৌরব সকল মানুষের গৌরব ক্ষুণ্ন করবে। যে সেই আপন অধিকারকে খর্ব করে সে নিজের মধ্যে তাঁর অসম্মান করে—যিনি কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী—যিনি সকলের কর্মের অধ্যক্ষ, সকলের যিনি অন্তরতম সাক্ষী, সকলের মধ্যে যাঁর বাস।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং
সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ৬।১২

যে ধীরেরা তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখেন তাঁহারাই নিত্য শান্তি লাভ করেন আর কেহ নহে। আর আমরা ঈশ্বরকে পাইবার কোনো চেষ্টা কোনো সাধনা না করিয়া এমন কথা কোন্ স্পর্ধায় বলিয়া থাকি যে, নিরাকার ব্রহ্মকে আত্মার মধ্যে না দেখিয়া, মূর্তির মধ্যে, অগ্নির মধ্যে, বাহ্যবস্তুর মধ্যেই দেখিতে হইবে, কারণ তাঁহাকে আর-কোনো উপায়ে আমাদের পাইবার সামর্থ্য নাই। এ কথা কেন মনে করি না যে, একমাত্র যে-উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে—অর্থাৎ আত্মার দ্বারা আত্মার মধ্যে—তাহা ছাড়া তাঁহাকে পাইবার উপায়ান্তর মাত্র নাই।

কেন করি না তাহার কারণ, আমরা তর্ক করি, কিন্তু ঈশ্বরকে চাহি না।

(নিরাকার উপাসনা, রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড,
পরিশিষ্ট, আধুনিক সাহিত্য, ১৩০৫)

অধিকাংশ মানুষকেই আমরা বহুর ভিড়ের ভিতরে দেখি, বিপুল অনেকের মধ্যে তারা অনির্দিষ্ট। যে-মানুষকে ভালোবাসি, সাধারণ অনেকের মাঝখানে সে বিশেষ এক। এই নিবিড় ঐক্যের বোধেই বন্ধু আমার পক্ষে হাজার লক্ষ অবন্ধুর চেয়ে সত্যতর। বন্ধুকে যেমন বিশেষ একজন ক'রে দেখ্‌লুম, বিশ্বের অন্তরতম এককে যদি তেম্‌নি স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে পাই তাহলে বুঝ্‌তে পারি সেই সত্য আনন্দময়। **আমার আত্মার মধ্যে একের উপলব্ধি** যদি তেমনি সত্য ক'রে প্রকাশ পায় তাহলে জীবনের সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে কোথাও আমার আনন্দের বিচ্ছেদ ঘটে না।

(ক্ষিতিমোহন সেনের "দাদু" গ্রন্থের কবি-রচিত ভূমিকা।)

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ ৬।১৩

আমরা ব্রহ্মকে কখন চাই? যখন দেখিতে পাই সংসারের পরিমিত পদার্থমাত্রই পরিবর্তনশীল—যখন এই চঞ্চল ঘূর্ণ্যমান বিষয়াবর্তের মধ্যে একটি নির্বিকার ধ্রুব অবলম্বনের জন্য আমাদের আত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন যিনি সকল আকার বিকার এবং সীমার অতীত সহজেই তাঁহাকেই চাই। যিনি—নিত্যোঽনিত্যানাং, অনিত্য সকলের মধ্যে নিত্য, চেতনশ্চেতনানাম্, সমস্ত চেতনার চেতয়িতা, তাঁহাকে সেই নিত্যরূপে, সেই চেতয়িতারূপেই পাইতে চাই।

(নিরাকার উপাসনা, রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড,
পরিশিষ্ট, আধুনিক সাহিত্য, ১৩০৫)

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ৬।১৪

যাঁহারা ঈশ্বরকে পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা কী বলিয়াছেন? তাঁহারা

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

সূর্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রতারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎসকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কী প্রকারে প্রকাশ করিবে?

(নিরাকার উপাসনা, রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড,
পরিশিষ্ট, আধুনিক সাহিত্য, ১৩০৫)

তিনি যেখানে সেখানে সূর্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্রতারকের প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায়? সেই জ্যোতির্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপ্যমান। তিনিই ওঁ।

(ব্রহ্মমন্ত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড,
৮ মাঘ ১৩০৭)

তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝখানে। একদিকে সমস্তই তিনি প্রকাশ করছেন আর-এক দিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। তাই উপনিষদ বলেন—

ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকা
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

সেখানে সূর্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারাও না, এই বিদ্যুৎসকলও দীপ্তি দেয় না,

কোথায় বা আছে এই অগ্নি—তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান, তাঁর আভাতেই সমস্ত বিভাত।

(ওঁ, শান্তিনিকেতন, ১৪ চৈত্র ১৩১৫)

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং ৬।১৮

সেই দেবতাকে আমাদের আত্মায় জানি যিনি আত্মবুদ্ধি প্রকাশক।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

ভারতবর্ষে উপনিষদের বাণী মানুষকে বল দিয়েছে। কিন্তু সে তো মন্ত্র, ধ্যানের বিষয়। যাঁদের জীবনে রূপ পেয়েছে সেই বাণী তাঁরা যদি আমাদের আপন হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে আসেন, তবে সে আমাদের মস্ত সুযোগ। কেন না শাস্ত্রবাক্য তো কথা বলে না, মানুষ বলে।

(খৃষ্ট, রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ২৫.১২.৩৬)

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

প্রথম অধ্যায়—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ শব্দের অর্থ, হাঁ। আছে এবং পাওয়া গেল এই কথাটাকে স্বীকার।..............

যেখানে আমাদের আত্মা "হাঁ"কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁকে যখন খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁরা কোথায় খুঁজে শেষে কোথায় পেলেন? প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে আঘাত করলেন। বললেন চোখে দেখার মধ্যে এই হাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখলেন চোখে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই—তা হাঁ এবং নায়ে খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই—তা ভালোও দেখে মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে খানিকটা দেখে না; সে দেখে কিন্তু শোনে না।

এমনি করে কান নাক বাক্য মন সর্বত্রই সন্ধান করে দেখলেন, সর্বত্রই খণ্ডতা আছে সর্বত্রই দ্বন্দ্ব আছে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পেঁছোলেন তখন এই শরীরের মধ্যে একটা হাঁ পেলেন। কারণ এই প্রাণই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই চোখও দেখছে কানও শুনছে নাসিকাও ঘ্রাণ করছে। এর মধ্যে যে কেবল একটা "হাঁ" এবং অন্যটা "না" হয়ে আছে তা নয়, এর মধ্যে দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ সকলগুলিই এক জায়গায় হাঁ হয়ে আছে। অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই আমরা পেলুম ওঁ। বাস, অঞ্জলি ভরে উঠল।

ছান্দোগ্য বলছেন মিথুনের মাঝখানে অর্থাৎ দুই যেখানে মিলেছে সেইখানেই এই ওঁ। যেখানে একদিকে ঋক্ একদিকে সাম, একদিকে বাক্য একদিকে সুর, একদিকে সত্য একদিকে প্রাণ ঐক্য লাভ করেছে সেইখানেই এই পরিপূর্ণতার সংগীত ওঁ।

যাঁর মধ্যে কিছুই বাদ পড়ে নি, যাঁর মধ্যে সমস্ত খণ্ডই অখণ্ড হয়েছে, সমস্ত বিরোধ মিলিত হয়েছে আমাদের আত্মা তাঁকেই অঞ্জলি জোড় করে হাঁ বলে স্বীকার করে নিতে চায়। তার পূর্বে সে নিজের পরম পরিতৃপ্তি স্বীকার করতে পারে না; তাকে ঠেকতে হয়, তাকে ঠকতে হয়, মনে করে ইন্দ্রিয়েই হাঁ, ধনেই হাঁ, মানেই হাঁ। শেষকালে দেখে, এর সব তাতেই পাপ আছে, দ্বন্দ্ব আছে, "না" তার সঙ্গে মিশিয়ে আছে।

(ওঁ, শান্তিনিকেতন, ১৫ চৈত্র ১৩১৫)

মিথুন যেখানে মিলেছে সেইখানেই হচ্ছেন তিনি—কেউ যেখানে বর্জিত হয়নি সেইখানেই তিনি। এই যে পরিপূর্ণতা যা সমস্তকে নিয়ে অথচ যা কোনো খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়, যা চন্দ্রে নয় সূর্যে নয় মানুষে নয় অথচ সমস্ত চন্দ্র সূর্য মানুষে, যা কানে নয় চোখে নয় বাক্যে নয় মনে নয় অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে, সেই

এককেই, সেই হাঁকেই, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই পরিপূর্ণতাকেই স্বীকার হচ্ছে ওংকার।

(ওঁ, শান্তিনিকেতন, ১৫ চৈত্র ১৩১৫)

সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা সাজে, কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন 'এষঃ', এই-যে তিনি, সেখানে তো কোনো কথা বলা চলে না। 'সীমা' শব্দটার সঙ্গে একটা 'না' লাগিয়ে দিয়ে আমরা 'অসীম' শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি। কিন্তু অসীম তো 'না' নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন 'হাঁ'। তাই তো তাঁকে ওঁ বলে ধ্যান করা হয়। ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যা-কিছু আছে সমস্তকে নিয়ে অখন্ড পরিপূর্ণতা। আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিসটি যেমন—কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতিমুহূর্তেই তার ধ্বংস হচ্ছে, সে যেন মৃত্যুর মালা; কিন্তু তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজবোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখতে পাই আমাদের প্রাণ তার প্রতিমুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছে; মৃত্যুর 'না' দিয়ে তার পরিচয় হয় না, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্ছে 'হাঁ'।

সীমার মধ্যে অসীম হচ্ছেন তেমনি ওঁ।

(ছোটো ও বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

বিশ্ব বলছে, ওঁ; বলছে, হাঁ; বলছে, অয়মহং ভোঃ, এই-যে আমি।.........সত্তাকে সত্তা বলেই যেখানে মানি সেখানে তার মধ্যে আমি সেই খুশিকেই দেখি যে-খুশি আমার নিজের মধ্যে চরমরূপে রয়েছে।

(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ৭ অক্টোবর ১৯২৪)

স এষ রসানাং রসতমঃ ১।১।৩

পরমাত্মার মধ্যে আত্মাকে এইরূপ যোগযুক্ত করে উপলব্ধি করা এ কি কেবল জ্ঞানের দ্বারা হবে? তা কখনোই না। এতে প্রেমেরও প্রয়োজন।

কেননা আমাদের জ্ঞান যেমন সমস্ত খন্ডতার মধ্যে সেই এক পরম সত্যকে চাচ্ছে তেমনি আমাদের প্রেমও সমস্ত ক্ষুদ্র রসের ভিতরে সেই সকল রসের রসতমকে সেই পরমানন্দস্বরূপকে চাচ্ছে—নইলে তার তৃপ্তি নেই।

(সমগ্র এক, শান্তিনিকেতন, ১৯ চৈত্র ১৩১৫)

দেবো বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে
ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্॥ ১।৪।২

অনেকদিন আগে শান্তিনিকেতনে আমাদের পাঠসভাতে কিছুদিন যে ছান্দোগ্য

উপনিষৎ পড়া চলেছিল, তাতে একটা জায়গায় আমি চম্‌কে উঠেছিলুম। দেবতারা নাকি মৃত্যু-ভয়ে ভীত হয়ে ত্রয়ী বিদ্যা অর্থাৎ বেদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং ছন্দের দ্বারা আচ্ছাদন করলেন। ঐ যে 'ছন্দের দ্বারা আচ্ছাদন করলেন' তাই হোলো ছন্দের নিজস্ব মর্মকথা। ছদ্‌ ধাতুর অর্থ-ই যে আচ্ছাদন করা।

দেবতারা নাকি অমৃতের দ্বারা মৃত্যুকে জয় করেচেন। এখানে দেখা যাচ্চে ছন্দই সেই অমৃত। এই ছন্দের দ্বারাই মৃত্যু হতে রক্ষা পাবার জন্য আচ্ছাদন করা হোলো। এদিকে ছন্দের অর্থ ইচ্ছা, কামনা, গোপন, খুসি, ইত্যাদি। যে আচ্ছাদন আমাদের ঢেকে রেখে খুসি করতে, মুগ্ধ করতে চায় তাই তো সৌন্দর্যের আচ্ছাদন।

মোহময় এই আচ্ছাদন হতে মুক্তি পেয়ে আপন স্বরূপ দেখাবার জন্যই তো ব্যাকুলতা এসেছিল মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মনে। 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের ভিতরের কথাই তো তাই।

(ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির ভাষণ।)

উপনিষদে দেখা যাচ্ছে, আচ্ছাদন করে বলেই ছন্দ। অথচ ছন্দই আমাদের ভাবকে প্রকাশ করবার মস্ত সহায়। সংগীতও আমাদের মনের গভীর সুখ-দুঃখকে একদিকে আচ্ছাদন করে আবার অন্য দিকে নানা বৈচিত্র্যে তাকে প্রকাশও করে।

(ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির ভাষণ।)

প্রথম অধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

সীমাবদ্ধ সৃষ্টিকে মানুষ প্রত্যক্ষ দেখছে, তাকে ব্যবহার করছে, কিন্তু তার মন বলছে এই-সমস্তেরই সত্য রয়েছে সীমার অতীতে। এই সীমাকে যদি প্রশ্ন করি তার শেষ উত্তর পাই নে এই সীমার মধ্যেই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে, ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন, সামগানের মধ্যে যে রহস্য আছে তার প্রতিষ্ঠা কোথায়।

দাল্‌ভ্য বললেন, "এই পৃথিবীতেই।" স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের চরম আশ্রয়, বোধ করি দালভ্যের এই ছিল মত।

প্রবাহণ বললেন, "তা হলে তোমার সত্য তো অন্তবান হল, সীমায় এসে ঠেকে গেল যে।"

ক্ষতি কি তাতে। ক্ষতি এই যে, সীমার মধ্যে মানুষের জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত থেকে যায়। কোনো সীমাকেই মানুষ চরম ব'লে যদি মানত তা হলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ করত। একদিন পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, ভৌতিক বিশ্বের মূল উপাদানস্বরূপ আদিভূতগুলিকে তাঁরা একেবারে কোণঠাসা করে ধরেছেন, একটার পর একটা আবরণ খুলে এমন-কিছুতে ঠেকেছেন যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। বললে কী হবে। অন্তরে আছেন প্রবাহণ রাজা, তিনি বহন করে নিয়ে চলেছেন মানুষের সব প্রশ্নকে সীমা থেকে দূরতর ক্ষেত্রে। তিনি বললেন—

অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে সাম,
অন্তবদ্ বৈ কিল তে সাম।

আদিভূতের যে-বস্তুসীমায় প্রশ্ন এসে থেমেছিল সে সীমাও পেরোল। আজ মানুষের চরম ভৌতিক উপলব্ধি পৌঁছল গাণিতিক চিহ্নসংকেতে, কোনো বোধগম্যতায় নয়। একদিন আলোকের তত্ত্বকে মানুষ বোধগম্যতার পরপারেই স্থাপন করেছিল। অদ্ভুত কথা বলেছিল, 'ঈথরের ঢেউ' জিনিসকেই আলোকরূপে অনুভব করি। অথচ ঈথর যে কী আমাদের বোধের ভাষায় তার কোনো কিনারা পাওয়া যায় না। আলো, যা আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল ভৌতিক জিনিসকে প্রকাশ করে, দাঁড়ালো তা এমন-কিছুর প্রকাশ যা সম্পূর্ণই ভৌতিক ধর্মের অতীত, কেবল ব্যবহারে মাত্র জানা যায় যে তাতে নানা ছন্দের ঢেউ খেলে। কিন্তু প্রবাহণের গণনা থামে না। খবর আসে, কেবল তরঙ্গধর্মী বললে আলোর চরিত্রের হিসাব পুরো মেলে না, সে কণিকাবর্ষীও বটে। এই-সব স্ববিরোধী কথা মানুষের সহজ বুদ্ধির সহজ ভাষার সীমার বাইরেকার কথা। তবু বোধাতীতের ডুবজলেও মানুষ ভয় পেলে না। পাথরের দেয়ালটাকেও বললে বিদ্যুৎকণার নিরন্তর নৃত্য। সন্দেহ করলে না যে, হয়তো বা পাগল হয়ে গেছি। মনে করলে না, হয়ত প্রজ্ঞা, যাকে বলে রীজ্‌ন্, সে মানস-সার্কাসের ডিগ্‌বাজী-খেলোয়াড়, সব জিনিসকে একেবারে উলটিয়ে ধরাই তার ব্যবসা। পশুরা যদি বিচারক হত মানুষকে বলত জন্ম-পাগল। বস্তুত মানুষের বিজ্ঞান সব মানুষকে এক-পাগলামিতে-পাওয়া জীব বলে প্রমাণ করছে। বলছে, সে যাকে যে রকম জানছে বলে মনে করে সেটা একেবারেই তা নয়, সম্পূর্ণই উল্টো। জন্তুরা নিজেদের সম্বন্ধে এরকম লাইবেল প্রচার করে না। তাদের বোধের কাছে যেটা যা সেটা তাই; অর্থাৎ তাদের কাছে কেবল আছে তথ্য, তাদের অবিচলিত নিষ্ঠা প্রতীয়মানের প্রতি। তাদের জগতের আয়তন কেবল তলপৃষ্ঠ নিয়ে। তাদের সমস্ত দায় ঐ একতলাটাতেই। মানব-জগতের আয়তনে বেধ আছে, যা চোখে পড়ে তার গভীরে। প্রত্যক্ষ তথ্যকে উপেক্ষা করলে মানুষের চলে না, আবার সত্যকেও নইলে নয়।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩।১২।৬

মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে, আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যেদিকে তার পূর্ণতা, যেদিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যেদিকে বিশ্ব-মানব। ঋগ্‌বেদে সেই বিশ্বমানবের কথা বলেছেন,

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি—

তাঁর একচতুর্থাংশ আছে জীবজগতে, তাঁর বাকি বৃহৎ অংশ ঊর্ধ্বে অমৃতরূপে॥ মানুষ যেদিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতকে প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে

সত্য, সেই দিকে সে মৃত্যুহীন, সেই দিকে তার তপস্যা শ্রেষ্ঠকে আবিষ্কার করে সেই দিক আছে তার অন্তরে, যেখান থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করে, রূপদান করে সকলের আনন্দকে। যে-পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমানসত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনও আছে অব্যক্ত। তাঁকেই ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণপুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান; কিন্তু তিনি এখনও এসে পৌঁছন নি। বরযাত্রীরা আসছে, যুগের পর যুগ অপেক্ষা করছে, বরের বাজনা আসছে দূর থেকে। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে দূতেরা চলেছে দুর্গম পথে। এই-যে অনিশ্চিত আগামীর দিকে মানুষের এত প্রাণপণ আগ্রহ—এই-যে অনিশ্চিতের মধ্যে, অনাগতের মধ্যে, তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত—তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বারবার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারলে না। এই অধ্যবসায়কে বলা যেতে পারত পাগলামি, কিন্তু মানুষ তাকেই বলেছে মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের আশ্রয় কোথায়। অলক্ষ্য একটা পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের মনের আকর্ষণ দেখতে পাই; অন্ধকার ঘরের গাছে, তার শাখায় প্রশাখায়, যেমন একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা প্রাচীরের ও পারের আলোকের দিকে। আলোক যেমন সত্য, পূর্ণের আকর্ষণ নিয়ত যেখান থেকে প্রেরিত সেও যদি তেমনি সত্য না হত তাহলে জীবিকার প্রয়োজনের বাইরে আত্মার উৎকর্ষের জন্যে মানুষ যা-কিছু চিন্তা করে, কর্ম করে, তার কোনো অর্থই থাকে না। এই সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করি আমাদের সংকল্পে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের আদর্শে। সেই অভাবনীয় পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রো ন্বহমস্মীতি॥ ৪।৪।১

সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্‌বেদ তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি॥ ৪।৪।২

স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি॥ ৪।৪।৩

তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্ম্যপৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাঽহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি॥ ৪।৪।৪

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি॥ ৪।৪।৫

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন,
'ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার?'
তিনি বললেন, 'জানি নে, তাত, কী গোত্র তুমি।
যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি;
তাই জানি নে তোমার গোত্র।
জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,
তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।'

সত্যকাম বললে হারিদ্রুমত গৌতমকে,
'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।'
তিনি বললেন, 'সৌম্য, কী গোত্র তুমি?'
সে বললে, 'আমি তা জানি নে।
মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমার গোত্র কী।
তিনি বলেছেন— যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম
তোমাকে পেয়েছি।
আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল।'

তিনি তখন বললেন, 'এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পারে না।
সত্য থেকে নেমে যাও নি তুমি।
সমিধ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।'

(রূপান্তর)

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি

শ্রান্ত হোমধেনুগণে; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটীরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে; মহর্ষি গৌতম
কহিলেন, 'বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
করো অবধান।'

হেনকালে অর্ঘ্য বহি
করপুট ভরি, পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক; বন্দি ফলফুলদলে
ঋষির চরণপদ্ম, নমি ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,
'ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী,
সত্যকাম নাম মোর।' শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে,
'কুশল হউক সৌম্য! গোত্র কী তোমার?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।' বালক কহিলা ধীরে,
'ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য, করো অনুমতি।'

এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি সত্যকাম ঘন-অন্ধকার
বনবীথি দিয়া, পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী; বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননীকুটীরে
করিলা প্রবেশ॥

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি; হেরি তারে বক্ষে টানি
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণকুশল। শুধাইলা সত্যকাম,
'কহো গো জননী, মোর পিতার কী নাম—
কী বংশে জনম। গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে, গুরু কহিলেন মোরে—

বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে। মাতঃ, কী গোত্র আমার?'
শুনি কথা মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী, 'যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি তাত!'

পরদিন
তপোবনতরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপসবালক,
শিশিরসুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নবপুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলিগান,
মধুপগুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণকণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্তসামগীতি॥

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম;
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য আশিস করি শুধাইলা তবে,
'কী গোত্র তোমার সৌম্য, প্রিয়দরশন?'
তুলি শির কহিলা বালক, 'ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে; কহিলেন তিনি, সত্যকাম,
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।'

শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো। সবে বিস্ময়বিকল—
কেহ বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার॥

উঠিলা গোতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি; বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত—
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত!'

(ব্রাহ্মণ, চিত্রা, ফাল্গুন ১৩০১)

গদ্যে যে অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হতে পারে তার উদাহরণ আমরা উপনিষদে পাই। সত্যকাম জাবালের কথা আমি আমার 'ব্রাহ্মণ' কবিতায় লিখেচি বটে কিন্তু তার যে অপূর্ব কাব্যরূপটি ছান্দোগ্যের মধ্যে দেখা যায় তার অনুকরণ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য।...........

এই অপূর্ব বাণীর কি কখনো অনুবাদ হয়? কী ঠাস-বুননো কথা! কী তার ছন্দ!

(*ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

শুনেচি বেদের ও উপনিষদের সময়ে সাধুভাষায় ও চল্‌তি ভাষায় বিচ্ছেদ বেশি ছিল না। কাজেই সে যুগের মনীষীরা তাঁদের বড় বড় ভাবকে যে সহজ সুন্দর করে চল্‌তি কথার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতেন তাতে আর আশ্চর্য কিছু নেই। তাঁদের কথার আঁট ও জোর দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম জাবালের উপাখ্যানে যে অপূর্ব শক্তির পরিচয় পাই তা যে কত বিস্ময়কর তা আপনাদের আগেই বলেচি। অনেক চেষ্টায়ও ব্রাহ্মণ কবিতায় আমি সেই শক্তি দেখাতে পারি নি।

(*ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

একমেবাদ্বিতীয়ম্। ৬।২।১

বিশ্বের মধ্যে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্, মানুষের ইতিহাসে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্, আমার হৃদয়ের সত্যতম প্রেমে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্—এই কথা জানতে এবং জানাতে আমরা এখানে এসেছি। তর্কের দ্বারা নয়, যুক্তির দ্বারা নয়। আনন্দের দ্বারা, শিশু যেমন সহজবোধে তার পিতামাতাকে জানে এবং জানায় সেই রকম পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের দ্বারা!

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, মাঘ ১৩১৭)

......প্রাণঃ প্রাণেন যাতি......৭।১৫।১

উপনিষদে দেখচি,—প্রাণ চলেছে প্রাণশক্তিতে।

(*ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি
ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ৭।২৩।১

অনন্ত আকাশ আমাদের কাছে মণ্ডলবদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া আকাশ দেখার সাধ মিটাইতে পারি না। আমি যতদূরে পর্যন্ত দেখিতে পাই তাহা না দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।

এই-যে প্রয়াস বস্তুত ইহাই উপাসনা। আমার শেষ পর্যন্ত গিয়াও যখন তাঁহার শেষ পাই না—আমার মন যখন একাকী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হয়, যখন অগণ্য গ্রহ চন্দ্র তারকা অনন্ত জটিল জ্যোতিররণ্য-মধ্যে সে হারাইয়া যায় এবং প্রভাতকরপ্লাবিত নীলাকাশের মহোচ্চ দেশে বিলীনপ্রায় বিহঙ্গমের মতো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠে 'তুমি ভূমা, আমি তোমার শেষ পাইলাম না', তখন তাহাতেই সে কৃতার্থ হয়। সেই অন্ত না পাইয়াই তাহার সুখ। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

(সাকার ও নিরাকার, আধুনিক সাহিত্য, আশ্বিন ১৩০৫)

আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রসর সংকীর্ণ তথাপি সমুদয় সৌর জগতের একমাত্র উদ্দীপনকারী সূর্যই কি আমাদিগকে আলোক বিতরণের জন্য নাই? অবরুদ্ধ অন্ধ-কূপই আমাদের মত ক্ষুদ্রকায়ার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে তবু কি অনন্ত আকাশ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি? পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একাংশ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলেই আমাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, তবু কেন মনুষ্য চন্দ্রসূর্যগ্রহ-তারার অপরিমেয় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অশ্রান্ত কৌতূহলে নিরন্তর লোকলোকান্তরে আপন গবেষণা প্রেরণ করিতেছে? আমরা যতই ক্ষুদ্র হই না কেন তথাপি ভূমৈব সুখং ভূমাই আমাদের সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমাদের সুখ নাই।

ঔপনিষদব্রহ্ম, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

যাহা ধারণা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের তৃপ্তির অবসান হইয়া যায়, যাহা ধারণা করি, তাহাতে প্রতিক্ষণে বিকার ঘটিতে থাকে। সুখের আশাতেই আমরা সমস্ত কিছু ধারণা করিতে যাই, কিন্তু যাহা ধারণা করি, তাহাতে আমাদের সুখের অবসান হয়। এইজন্য উপনিষদে আছে—যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই।

সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণযোগ্য করিবার জন্য অল্প করিয়া লই, তবে তাহা দুঃখসৃষ্টি করিবে,—দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কী করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত-জড়িত করিলে চলিবে না।

একটি উদাহরণ দিই। গৃহ আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের বাসযোগ্য। মুক্ত আকাশ আমাদের পক্ষে সেরূপ বাসযোগ্য নহে, কিন্তু এই মুক্ত আকাশকে মুক্ত রাখাই আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। মুক্ত আকাশের সহিত আমাদের গৃহস্থিত আকাশের অবাধ যোগ রাখিলেই তবেই আমাদের গৃহ আমাদের পক্ষে কারাগার, আমাদের পক্ষে কবরস্বরূপ হয় না। কিন্তু যদি বলি, আকাশকে গৃহেরই মতো আমার আপনার করিয়া লইব—যদি আকাশের মধ্যে কেবলই প্রাচীর তুলিতে থাকি, তবে তাহাতে আমাদের গৃহেরই বিস্তার ঘটিতে থাকে, মুক্ত আকাশ দূর হইতে সুদূরে

চলিয়া যায়। আমরা যদি বৃহৎ ছাদ পত্তন করিয়া সমস্ত আকাশকে আমার আপনার করিয়া লইলাম বলিয়া কল্পনা করি, তবে আলোকের জন্মভূমি, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের অনন্ত ক্রীড়াক্ষেত্র আকাশ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করি।

(ধর্ম্মের সরল আদর্শ, ধর্ম্ম, ১৩০৯)

দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত-সচেতন করিয়া তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। কারণ, ভূমৈব সুখং. নাল্পে সুখমস্তি—অল্পে আমাদের আনন্দ নাই।

যাহাতে আমাদের খর্বতা, আমাদের স্বল্পতা, তাহা অনেক সময় আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না—যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়।

(মনুষ্যত্ব, ধর্ম্ম, ১৩১০)

যে জাতি খণ্ড সত্যকে প্রাধান্য দেন, যাঁহারা বাস্তব সত্যের অনুসরণে ক্লান্তিবোধ করেন না, কাব্যকে যাঁহারা প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন; তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছেন; মানবজাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী। অন্যদিকে যাঁহারা বলিয়াছেন 'ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'—যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি, উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন—তাঁহাদেরও ঋণ কোন কালে পরিশোধ হইবার নহে। তাঁহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে, মানবসভ্যতা আপন ধূলিধূমসমাকীর্ণ কারখানা-ঘরের জনতা-মধ্যে নিশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া, কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে।

(রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য, ৫ পৌষ ১৩১০)

ইহা জানো যে, আমরা যাহাকে সম্পদ বলিয়া উন্মত্ত হই তাহা সম্পদ নহে; যাহাকে বিপদ বলিয়া ভীত হই তাহা বিপদ নহে; আমাদের অন্তরাত্মা সম্পদ-বিপদের অতীত যে পরমা শান্তি তাহাকে আশ্রয় করিবার অধিকারী। 'ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' —সমস্ত জীবন দিয়া ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা করো, এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে ভূমাকেই সপ্রমাণ করো।

(চারিত্রপূজা, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১)

জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক্, তাহারই জয় হইবে; আমরা—যাহারা ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—

'মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী সমানা'।

তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে; আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট-ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের

পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে: পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও। তিনি কহিবেন :

ওঁ ইতি ব্রহ্ম।

তিনি কহিবেন :

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

(নববর্ষ, ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩০৯)

ভারতবর্ষের লক্ষ্য ক্ষুদ্র নহে, তাহা ভারতবর্ষ স্বীকার করিয়াছে—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।

(চীনেম্যানের চিঠি, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩০৯)

ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। যাহা ভূমা, যাহা মহান্, তাহাই সুখ; অল্পে সুখ নাই।

(জাতীয় বিদ্যালয়, শিক্ষা, ভাদ্র ১৩১৩)

মানবাত্মা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাজ বল, রাজ্য বল, যা কিছু সৃষ্টি করছে তার ভিতরকার একটি মাত্র মূল তাৎপর্য এই যে, মানুষ একাকিত্ব পরিহার করে বহুর মধ্যে বিচিত্রের মধ্যে আপনার নানা শক্তিকে নানা সম্বন্ধে বিস্তৃত করে দিয়ে নিজেকে বৃহৎ ক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে—এই তার যথার্থ সুখ। এইজন্যেই বলা হয়েছে "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ভূমাই সুখ অল্পে সুখ নেই। তার কারণ, অল্পে আত্মাও অল্প হয়।

যে সমাজ সভ্য সেই সমাজ বহুকে বিচিত্রভাবে আত্মার সংগে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেই সে সমাজের গৌরব। নইলে কেবল উপকরণবাহুল্য এবং সুবিধার সমাবেশ তার সার্থকতা নয়।

সভ্য সমাজে যেখানে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মচেষ্টা নিয়ত দূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে আছে সেইখানে যে-মানুষ বাস করে সে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে না। সে ব্যক্তির শক্তি অল্প হলেও সে শক্তি সহজেই নিজেকে সার্থক করবার অবকাশ পায়। এইজন্যেই সকলের যোগে ভূমার যোগে সভ্যসমাজবাসী প্রত্যেকেই যথাসম্ভব বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যে সমাজ সভ্য নয় সে সমাজে স্বভাববলিষ্ঠ লোকও দুর্বল হয়ে থাকে, কারণ সে সমাজের লোকেরা আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। সে সমাজে যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে সে কেবল ঘরের উপযোগী গ্রামের উপযোগী, ভূমার সঙ্গে যে-সকল সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানের যোগ নেই—সেখানে চিত্তসমুদ্রের জোয়ার এসে পৌঁছয় না; এইজন্যে সেখানে মানুষ নিজের সত্য নিজের গৌরব অনুভব করে শক্তিলাভ করতে পারে না, সে সর্বত্র পরাভূত হয়ে থাকে। তার দারিদ্র্যের অন্ত থাকে না।

এইজন্যেই আমাদের সভ্যতার সাধনা করতে হবে, রেলওয়ে টেলিগ্রাফের জন্যে নয়। কারণ রেলওয়ে টেলিগ্রাফেরও শেষ গম্যস্থান হচ্ছে মানুষ—কোনো স্থানীয় ইষ্টেশন বিশেষ নয়।

(দিন, শান্তিনিকেতন, ১৩ পৌষ ১৩১৫)

যিনি ভূমা তিনি স্বয়ং আমাদের ললাটে রাজটিকা পরিয়ে পাঠিয়েছেন। অতএব আমরা যেন নিজেকে অকুলীন বলে মাথা হেঁট করে সংকুচিত হয়ে সংসারে সঞ্চরণ না করি—নিজের অনন্ত আভিজাত্যের গৌরবে নিজের উচ্চ স্থানটি যেন গ্রহণ করতে পারি।

প্রভাতে, শান্তিনিকেতন, ১৫ পৌষ ১৩১৫)

উপনিষৎ বলেছেন ভূমৈব সুখং। অর্থাৎ সুখ সুখই নয় বড়োই সুখ। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—এই বড়োকেই জানতে হবে এঁকেই পেতে হবে। এই কথাটির তাৎপর্য যদি ঠিকমতো বুঝি তাহলে কখনোই বলিনে যে, চাই নে তোমার বড়োকে।

কেননা, টাকায় বল, বিদ্যাতে বল, খ্যাতিতে বল, কোনো-না-কোনো বিষয়ে আমরা সুখকে ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় যাকে পেয়ে আমার আত্মা বলতে পারে আমার সব পাওয়া হল।

অতএব যিনি ব্রহ্ম যিনি ভূমা যিনি সকলের বড়ো তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিবৃত্তিকে নয়।

(ভূমা, শান্তিনিকেতন, ১৪ চৈত্র ১৩১৫)

ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করাটা যে কেবল যন্ত্রবৎ জড় শাসনে ঘটে উঠছে তা নয়। এর মধ্যে প্রেম আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে একটা রস আছে। স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের পরস্পরের যোগকে স্বেচ্ছাকৃত আনন্দময় অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমময় যোগরূপে জাগিয়ে তুলছে। আমরা দায়ে পড়ে নয় আনন্দের সঙ্গে স্বার্থ বিসর্জন করছি। মা ইচ্ছা করেই সন্তানের সেবা করছে; মানুষ অন্ধভাবে নয় সজ্ঞানে প্রেমের দ্বারাই সমাজের হিত করছে। এই যে বৃহৎ আমি, সামাজিক আমি, স্বাদেশিক আমি, মানবিক আমি, এর প্রেমের জোর এত যে. এই চৈতন্য যাকে যথার্থ-ভাবে অধিকার করে সে এই বৃহতের প্রেমে নিজের ক্ষুদ্র আমির সুখ দুঃখ জীবন মৃত্যু সমস্ত অকাতরে তুচ্ছ করে। সমগ্রতার মধ্যে এতই আনন্দ; বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই দুঃখ দুর্ব্বলতা। তাই উপনিষদ বলেছেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

(সমগ্র এক, শান্তিনিকেতন, ১৯ চৈত্র ১৩১৫)

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়ো, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়ার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, এই কথাটি যে মানুষ বলতে পেরেছে, এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই. এইজন্যেই সে গভীরকে চায়—তবু যদি তুমি বল, 'আমার হাতের তেলোর মধ্যে সহজকে এনে দাও', তবে তুমি আর-কিছুকে চাচ্ছ।

(গুহাহিত, শান্তিনিকেতন, ২৩ চৈত্র ১৩১৬)

মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে। মুক্তি অধিকার বিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

(যিশুচরিত, খৃষ্ট, ২৫ ডিসেম্বর ১৯১০)

মানুষ যখন প্রকাশের সম্পূর্ণতাকে চাবার জন্যে সচেতন হয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সে সুখকে সুখই বলে না। তখন সে বলে : যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। যা ভূমা

তাই সুখ। আপনার মধ্যে যখন সে ভূমাকে চায় তখন আর আরামকে চাইলে চলবে না, স্বার্থকে চাইলে চলবে না, তখন আর কোণে লুকোবার জো নেই, তখন কেবল আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাস নিয়ে আপনার আঙিনায় কেঁদে লুটিয়ে বেড়াবার দিন আর থাকে না। তখন নিজের চোখের জল মুছে ফেলে বিশ্বের দুঃখের ভার কাঁধে তুলে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তখন কর্মের আর অন্ত নেই, ত্যাগের আর সীমা নেই। তখন ভক্ত বিশ্ববোধের মধ্যে, বিশ্বপ্রেমের মধ্যে, বিশ্বসেবার মধ্যে আপনাকে ভূমার প্রকাশে প্রকাশিত করতে থাকে।

(আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩১৭)

প্রয়োজন-সাধনের ইচ্ছা জন্তুদের বাহন। এইটে না থাকিলে তাহাদের জীবনযাত্রা একেবারেই চলিত না। এই ইচ্ছাটাই প্রাকৃতিক জীবনের মূল ইচ্ছা। ইহাই দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যেখানে বাধা পায় সেইখানেই জন্তুদের দুঃখ, যেখানে তাহার পূরণ হয় সেইখানেই তাহাদের সুখ। তাই দেখা যায়, জন্তুদের সুখদুঃখ আছে, কিন্তু পাপপুণ্য নাই।

কিন্তু, মানুষের মধ্যে এই-যে আরো'র ইচ্ছা ইহা আরামের ইচ্ছা নহে, সুখের ইচ্ছা নহে, বস্তুত ইহা দুঃখেরই ইচ্ছা। মানুষ যে কেবলই প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আপন জ্ঞান প্রেম ও শক্তিরাজ্যের উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিবার জন্য বারম্বার বাহির হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহার সুখের সাধনা নহে। ইহা তাহার কোনো বর্ত্তমান প্রয়োজন-সাধনের ইচ্ছা নহে।

বস্তুত মানুষের মধ্যে এই-যে দুই স্তরের ইচ্ছা আছে ইহার মধ্যে একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর-একটা অপ্রয়োজনের ইচ্ছা। একটা যাহা না হইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অন্যটা যাহা না হইলে অনায়াসেই চলে তাহার ইচ্ছা। আশ্চর্য এই যে, মানুষের মনে এই দ্বিতীয় ইচ্ছাটার শক্তি এমন প্রবল যে, সে যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে ছারখার করিয়া দেয়। তখন সে সুখ-সুবিধা-প্রয়োজনের কোনো দাবিতেই একেবারে কর্ণপাত করে না। তখন সে বলে, 'আমি সুখ চাহি না, আমি আরো'কেই চাই; সুখ আমার সুখ নহে, আরো'ই আমার সুখ।' তখন সে বলে, 'ভূমৈব সুখম্।'

সুখ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ভূমা নহে। ভূমা সুখ নহে, আনন্দ। সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নহে। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ তেমনি করিয়া দুঃখকে অনায়াসেই গ্রহণ করে। এমন-কি, দুঃখের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থক করে, আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই দুঃখের তপস্যাই আনন্দের তপস্যা।

তাই দেখিতেছি, অন্যান্য জন্তুদের ন্যায় মানুষের নীচের ইচ্ছাটা দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, আর উপরের ইচ্ছাটা দুঃখকে আত্মসাৎ করিয়া আনন্দলাভের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই কেবলই আমাদিগকে বলিতেছে, 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।'

তাই প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে আপন সহজ বোধটুকু লইয়া জন্তু দুঃখনিবৃত্তিচেষ্টার সনাতন গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল। মানুষ তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞানপ্রেমশক্তির কোনো সীমাতেই বদ্ধ হইতে চাহিল না; সে বলিল, 'অভ্যাসকে নহে, সংস্কারকে নহে, প্রথাকে নহে, আমি ভূমাকে জানিব।'

(দুই ইচ্ছা, পথের সঞ্চয়, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)

মানুষের মনে এই-যে একটা পাপের বোধ আসে সে জিনিসটা কী তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে মহতী ইচ্ছা আমাদিগকে ভূমার দিকে লইয়া যাইবে তাহাকে ঠিক বিপরীত পথে ক্ষুদ্র অহমের অভিমুখে টানিয়া আনিলে কেবল যে দুঃখ ঘটে তাহা নহে—এমন-কি, স্থলবিশেষে দুঃখ না ঘটিতেও পারে—তাহাতে আমরা ভূমাকে হারাই। আমাদের বড়োর দিক, আমাদের সত্যের দিক, নষ্ট হইয়া যায়; জন্তুর পক্ষে তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু মানুষের পক্ষে তেমন বিনাশ আর-কিছু নাই। এই বিনাশের বোধ সকলের চিত্তে সমান নহে, এমন-কি, কারও কারও চিত্তে অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু, মোটের উপর সমগ্র মানবের মনে এই পাপের বোধ দুঃখবোধের চেয়ে অনেক বড়ো হইয়া আছে। এতই বড়ো যে বহু দুঃখের দ্বারা মানুষ এই পাপকে ক্ষয় করিতে চায়। পাপ-নামক শব্দের দ্বারা মানুষ নিজের যে একটি গভীরতম দুর্গতিকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, ইহার দ্বারাই মানুষ আপনার সত্যতম পরিচয় দিয়াছে।

সে পরিচয়টি এই যে, সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নহে, অনন্তের মধ্যেই মানুষের আনন্দ; অহমের দিকই মানুষের চরম সত্যের দিক নহে, ব্রহ্মের দিকেই তাহার সত্য! মানুষ আপনার মধ্যে যে একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে-ইচ্ছা কোনোমতেই অল্পকে মানিতে চায় না, তাহা দুঃসহ তপস্যার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মানুষের চিত্তকে আনন্দময় মুক্তির অভিমুখে কেবলই প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেম ভক্তি ও পবিত্রতায় মানুষের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিসীম অতলস্পর্শ অমৃতপারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মানুষের সেই পরমগতিকে যাহা-কিছু বাধা দেয়, যাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই দুর্গতি, তাহাই তাহার মহতী বিনষ্টি।

(দুই ইচ্ছা, পথের সঞ্চয়, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)

সীমাহীনতার প্রতি আমাদের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণই আমাদের জীবনকে গতিদান করে। সেই আকর্ষণকে অবহেলা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে মঙ্গল নাই। ভূমাকে আমাদের পাইতেই হইবে, সেই পাওয়াতেই আমাদের সুখ।

কিন্তু, নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমরা অসীমকে খর্ব করিয়া থাকি। এ কথা সত্য, এক সীমার মধ্যে অন্য সীমাবদ্ধ পদার্থ সম্পূর্ণ স্থান পায় না। কিন্তু, অসীমের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তিনি একটি বালুকার মধ্যেও অসীম। এইজন্য একটি বালুকণাকেও যখন সম্পূর্ণরূপে সর্বতোভাবে আয়ত্ত করিতে যাই তখন দেখি, বিশ্বকে আয়ত্ত না করিলে তাহাকে পাইবার জো নাই; কারণ, এক জায়গায় নিখিলের সঙ্গে সে অবিচ্ছেদ্য, তাহার এমন একটা দিক আছে যে দিকটাতে কিছুতেই তাহাকে শেষ করা যায় না।

আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের সাধনা। কারণ, সেই অসীমেরই আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করিয়াছেন; সেই সীমার মধ্যেই তাঁহার বিলাস, তাঁহার বিহার। তাঁহার সেই নিকেতনকে ভাঙিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বেশী করিয়া পাইব, এমন কথা মনে করাই ভুল।

গোলাপ-ফুলের মধ্যে সৌন্দর্যের একটি অসীমতা আছে তাহার কারণ, সে সম্পূর্ণরূপেই গোলাপ-ফুল—সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ, কোনো অনির্দিষ্টতা নাই। এইজন্যই গোলাপ-ফুলের মধ্যে এমন একটি আবির্ভাব সুস্পষ্ট হইয়াছে যাহা চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে, যাহা জগতের সমস্ত সুন্দরের মধ্যে। সে সুনিশ্চিত সত্যরূপে গোলাপ-ফুল বলিয়াই সমস্ত জগতের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা সত্য।

বস্তুত অস্পষ্টতাই ব্যর্থতা; সুতরাং সেইখানেই ভূমার প্রকাশ প্রতিহত, ভূমার আনন্দ প্রচ্ছন্ন। তাঁহার আনন্দ রূপগ্রহণের দ্বারাই সার্থক। অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর। এইজন্য জগৎসৃষ্টির ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলই সুব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে; সীমা হইতে সীমার অভিমুখে চলিয়াছে অসীমের অভিসারযাত্রা। কুঁড়ি হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, কেবলই রূপ হইতে ব্যক্ততর রূপ।

এইজন্যই আপনাকে স্পষ্ট করিয়া পাওয়াই মানুষের সাধনা। স্পষ্ট করিয়া পাওয়ার অর্থই সীমাবদ্ধ করিয়া পাওয়া। যখনই নানা পথে নানা দুরাশার বিক্ষিপ্ততা হইতে নিজেকে সংহত করিয়া সীমার মধ্যে আপনাকে স্পষ্ট করিয়া দাঁড় করানো যায়, তখনই জীবনের সার্থকতাকে লাভ করি।

(সীমার সার্থকতা, পথের সঞ্চয়, ১৩১৯)

মানুষ বলেছে: ভূমৈব সুখং, ভূমাই আমার সুখ; ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমাকেই আমার জানতে হবে; নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমার সুখ নেই।

এই ভূমাকে মা যখন সন্তানের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মসুখের লালসা থাকে না। এই ভূমাকে মানুষ যখন স্বদেশের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। যে সমাজনীতিতে মানুষকে অবজ্ঞা করা ধর্ম বলে শেখায় সে সমাজের ভিতর থেকে মানুষ আপনার অনন্তকে পায় না; এইজন্যই সে সমাজে কেবল শাসনের পীড়া আছে, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ নেই। মানুষকে আমরা মানুষ বলেই জানি নে যখন তাকে আমরা ছোটো করে জানি। মানুষ সম্বন্ধে যেখানে আমাদের জ্ঞান কৃত্রিম সংস্কারের ধূলিজালে আবৃত সেইখানেই মানুষের মধ্যে ভূমা আমাদের কাছে আচ্ছন্ন। সেখানে কৃপণ মানুষ আপনাকে ক্ষুদ্র বলতে, অক্ষম বলতে, লজ্জা বোধ করে না। 'সত্যকে মতে মানি, কাজে করতে পারি নে' এ কথা স্বীকার করতে সেখানে সংকোচ ঘটে না। সেখানে মঙ্গল-অনুষ্ঠানও বাহ্য-আচার-গত হয়ে ওঠে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে ভূমা যে আছে, এইজন্যই ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমাকে না জানলে সত্য জানা হয় না। সমাজের মধ্যে যখন সেই জানা সকল দিকে জেগে উঠবে তখন মানুষ 'আনন্দরূপমমৃতং' আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে সর্বত্র সৃষ্টি করতে থাকবে। প্রদীপের শিখার মতো আত্মদানেই মানুষের আত্ম-উপলব্ধি। এই কথাটি আপনার মধ্যে নানা আকারে প্রত্যক্ষ করে মানুষ অনন্তস্বরূপকে বলেছে 'আত্মদা,' তিনি আপনাকে দান করছেন, সেই দানেই তাঁর পরিচয়।

(একটি মন্ত্র, শান্তিনিকেতন, ১৫ মাঘ ১৩২০)

এই আরো-কিছুর দিকেই সমস্ত জগতের আনন্দ কেন? এই অজানা আরো-কিছুর বাঁশি শুনেই সে কুল ত্যাগ করে কেন? ওই দিকে শূন্য নয় ব'লেই, ওই দিকেই সে পূর্ণকে অনুভব করে ব'লেই। সেইজন্যই উপনিষদ বলেছেন—ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব

বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সেইজন্যই তো সৃষ্টির এই লীলা দেখছি, আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আসছে আলোর কূলে। আলোর মন ভুলেছে কালোয়, কালোর মন ভুলেছে আলোয়।

(জাপানযাত্রী, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)

এখন প্রত্যক দেশকে আপন গৃহবাতায়ন খুলিয়া দিয়া বিশ্বকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। ছোটো হইয়া থাকায় সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ।

ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।

(ভারতপথিক রামমোহন রায়, ১১ আশ্বিন ১৩২৪)

জগতে একটা খুব বড়ো শক্তি হচ্ছে প্রাণ, অথচ সেই শক্তি বাইরের দিক থেকে কত ছোটো, কত সুকুমার, একটু আঘাতেই ম্লান হয়ে যায়। এমন জিনিসটা প্রতি মুহূর্ত্তে বিপুল জড়-বিশ্বের ভারাকর্ষণের সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে লড়াই করে দাঁড়িয়ে আছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

বালক অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহে ঢুকে লড়াই করেছিলো, আমাদের সুকুমার প্রাণ তেমনি অসংখ্য মৃত্যুর সৈন্যদলের মধ্যে দিয়ে অহর্নিশি লড়াই করে চলেচে। বস্তুর দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, এই প্রাণের উপকরণ অতি তুচ্ছ—খানিকটা জল, খানিকটা কয়লা, খানিকটা ছাই, খানিকটা ঐ রকম সামান্য কিছু; অথচ প্রাণ আপনার ঐ বস্তুর পরিমাণকে বহু পরিমাণে অতিক্রম করে আছে। মৃতদেহে সজীব দেহে বস্তুপিণ্ডের পরিমাণের তফাত নেই, অথচ উভয়ের মধ্যকার তফাত অপরিসীম। শুধু তাই নয়, সজীব বীজের বর্ত্তমান আবরণের মধ্যে মহারণ্য লুকিয়ে আছে। ছোটোর মধ্যে এই-যে বড়োর প্রকাশ, এই হচ্ছে আশ্চর্য। আরেক শক্তি হচ্ছে, মনের শক্তি। এই মনটি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় নিয়ে এই অসীম জগতের রহস্য আবিষ্কার করতে বেরিয়েছে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত দুর্ব্বল। চোখ কতটুকুই দেখে, কান কতটুকুই শোনে, স্পর্শ কতটুকুই বোধ করে! কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলি ছাড়িয়ে যাচ্ছে—অর্থাৎ সে যা, সে তার চেয়ে অনেক বড়ো। তার উপকরণ সামান্য হলেও সে অতি-ক্ষুদ্র এবং অতি-বৃহৎ অতি-নিকট এবং অতি-দূরকে কেবলি অধিকার করছে। তা ছাড়া, তার মধ্যে যে-ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন, সেও অপরিমেয়। একটি ছোটো শিশুর মনের মধ্যেই নিউটনের, সেক্‌স্‌পীয়রের মন লুকিয়ে ছিল। বর্ব্বরতার যে-মন পাঁচের বেশী গণনা করতে পারতো না, তারি মধ্যে আজকের সভ্যতার মন জ্ঞানের সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধিলাভ করেছে। শুধু তাই নয়, আরো ভবিষ্যতে সে-যে আরো কী আশ্চর্য চরিতার্থতা লাভ করবে, আজ আমরা তা কোনোমতেই কল্পনা করতে পারি নে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে আমাদের এই-যে মন, যা এক দিকে খুব ছোটো, খুব দুর্ব্বল দেখতে, আর-এক দিকে তার মধ্যে যে ভূমা আছে, হিমালয়-পর্ব্বতের প্রকাণ্ড আয়তনের মধ্যে তা নেই। তেমনি আমাদের আত্মা ছোটো-দেহ, ছোটো-মন, ছোটো-সব প্রবৃত্তি দিয়ে ঘেরা, অনেক সময় তাকে যেন দেখতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তার মধ্যেই সেই ভূমা আছেন। সেইজন্যেই তো একদিকে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আমাদের রাগ-বিরাগ যখন আমাদের কাছে অন্ন-বস্ত্র ও অন্য হাজার-রকম বাসনার জিনিসের জন্যে দরবার করছে, সেই মুহূর্ত্তেই এই প্রবৃত্তির দাস, এই বাসনার বন্দী, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পায়ের নীচে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছে—অসত্য

থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, যা অসীম একেবারে তাকেই চাই। এত বড়ো চাওয়ার জোর এতটুকুর মধ্যে আছে কোথায়? সে-জোর যদি না থাকতো, তবে এত বড়ো কথা তার মুখ দিয়ে বেরোতো কেমন ক'রে? এ কথার কোনো মানে সে বুঝতো কী করে? আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানবের আত্মা যা নিয়ে দেখছে, শুনছে, ছুঁচ্ছে, খাওয়া-পরা করছে, তাকেই চরম সত্য বলতে চাচ্ছে না;—যাকে চোখে দেখলো না, হাতে পেলো না, তাকেই বলচে সত্য। তার একটি মাত্র কারণ, ছোটোর মধ্যেই বড়ো আছেন, সেই বড়োই ছোটোর ভিতর থেকে মানুষের আত্মাকে কেবলি মুক্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন—তাই মানুষের আশার অন্ত নেই। এখন প্রত্যেক মানুষের কাজ হচ্ছে কী। নিজের কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে এইটেই যেন প্রকাশ করি যে, আমাদের মধ্যে সেই বড়োই সত্য। তা না করে যদি মানুষের ছোটোটার উপরেই ঝোঁক দিই—যে-সব বাসনা তার শিকল, তার গণ্ডী, যাতে তাকে খর্ব্ব করে, আচ্ছন্ন করে, তাকেই যদি কেবল প্রশ্রয় দিই তা হলে মানুষকে তার সত্য পরিচয় থেকে ভোলাই। আত্মা যে অমর, আত্মা যে অভয়, আত্মা যে সমস্ত সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভের চেয়ে বড়ো, অসীমের মধ্যেই যে আত্মার আনন্দ নিকেতন, এই কথাটি প্রকাশ করাই হচ্ছে মানুষের সমস্ত জীবনের অর্থ; এইজন্যেই আমরা এত শক্তি নিয়ে এত বড়ো জগতে জন্মেছি—আমরা ছোটো-খাটো এটা-ওটা-সেটা নিয়ে ভেবে কেঁদে মরতে আসি নি।

(ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৪ আশ্বিন ১৩২৫)

উপনিষদ বলেছেন, 'ভূমৈব সুখং'। উচ্চাশা বৃহৎকে দেখিয়ে বলে, এই ভূমা।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ১৭ ডিসেম্বর ১৯২০)

আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং—তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর-মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধনপথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে; তাঁরা জেনেছেন যে, ভূমৈব সুখং—দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।

(বিশ্বভারতী, ৪ ভাদ্র ১৩২৯)

মানুষের বহুধা শক্তি, সেই শক্তির যোগে নিহিতার্থকে কেবলই উদ্‌ঘাটিত করতে হবে—মানুষ কোথাও থামতে পারে না। মানুষের পক্ষে 'নাল্পে সুখমস্তি'। অধিককে বাদ দিয়ে সহজ করা মানুষের নয়, সমস্তকে নিয়ে সামঞ্জস্য করাই তার।

(অরবিন্দ ঘোষ, ২৯ মে ১৯২৮)

দুঃখকে মানুষ মনুষ্যত্বের বাহন বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে এবং সুখকেই সে সুখ বলে নাই, বলিয়াছে "ভূমৈব সুখং।"

(ধর্ম্মের অধিকার, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

মানুষ কোনো একটা জায়গায় আসিয়া হাল ছাড়িয়া চোখ বুজিয়া সীমাকে মানিতে চায় না বলিয়াই সে মানুষ। মানুষের এই যে কেবলি অরো-র দিকে গতি, ভূমার দিকে টান এইখানেই তাহার শ্রেয়।

(ধর্মের অধিকার, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

অন্য জীবজন্তু যেমন অবস্থায় সংসারে এসেছে সেই অবস্থাতেই তাদের পরিণাম। অর্থাৎ, প্রকৃতিই তাদের প্রকাশ করেছে এবং সেই প্রকৃতির প্রবর্তনা মেনেই তারা প্রাণ-যাত্রা নির্বাহ করে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু নিজের ভিতর থেকে নিজের অন্তরতর সত্যকে নিরন্তর উদ্‌ঘাটিত করতে হবে নিজের উদ্যমে—মানুষের এই চরম অধ্যবসায়। সেই আত্মোপলব্ধ সত্যেই তার প্রকাশ, প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত প্রাণযাত্রায় নয়। তাই তার দুরূহ প্রার্থনা এই যে, সকল দিকেই অনন্তকে যেন প্রকাশ করি। তাই সে বলে, ভূমৈব সুখং, মহত্ত্বই সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্প-কিছুতেই সুখ নেই।

মানুষের পক্ষে তাই সকলের চেয়ে দুর্গতি, যখন আপনার জীবনে সে আপন অন্তর্নিহিত ভূমাকে প্রকাশ করতে পারলে না—বাধাগুলো শক্ত হয়ে রইল। এই তার পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে বড় মৃত্যু। আহারে বিহারে ভোগে বিলাসে সে পরিপুষ্ট হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের দীপ্তিতে, ত্যাগের শক্তিতে, প্রেমের বিস্তারে, কর্মচেষ্টার সাহসে, সে যদি আপনার প্রবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ কিছু পরিমাণেও প্রকাশ করতে না পারে তবে তাকেই বলে মহতী বিনষ্টিঃ—সে বিনষ্টি জীবের মৃত্যুতে নয়, আত্মার অপ্রকাশে।

সভ্যতা যাকে বলি তার এক প্রতিশব্দ হচ্ছে, ভূমাকে প্রকাশ। মানুষের ভিতরকার যে নিহিতার্থ, যা তার গভীর সত্য, সভ্যতায় তারই আবিষ্কার চলছে। সভ্য মানুষের শিক্ষাবিধি এত ব্যাপক, এত দুরূহ এইজন্যেই। তার সীমা কেবলই অগ্রসর হয়ে চলেছে। সভ্য মানুষের চেষ্টা প্রকৃতিনির্দিষ্ট কোনো গণ্ডীকে চরম বলতে চাচ্ছে না।

(পল্লীসেবা, পল্লীপ্রকৃতি, ফাল্গুন ১৩৩৭)

অন্যান্য জন্তুর মতোই তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো। তাই ঐশ্বর্য-অভিমানী মানুষ বলছে : ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। বলেছে, অল্পে সুখ নাই, বৃহতেই সুখ।

এটা নিতান্তই বেহিসাবী কথা হল। হিসাবী বুদ্ধিতে বলে, যা চাই আর যা পাই এই দুটো মাপে মিলে গেলেই সুখের বিষয়। ইংরেজিতে একটা চলতি কথা আছে, যা যথেষ্ট সেটাই ভুরিভোজের সমান-দরের। শাস্ত্রেও বলছে : সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। তবেই তো দেখছি, সন্তোষে সুখ নেই আবার সন্তোষেই সুখ, এই দুটো উলটো কথা সামনে এসে দাঁড়ালো। তার কারণ, মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত; সেই দিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশী চায়, সে ভূমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত, কেননা তার মধ্যে আছি অমিতমানব। সেই অমিতমানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিতমানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলই মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে। আমাদের ভিতরকার ছোটো মানুষটি তা নিয়ে বিদ্রূপ ক'রে থাকে; বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। উপায় নেই। বিশ্বের মানুষটি ঘরের মানুষকে

পাঠিয়ে দেন বুনো মোষটাকে দাবিয়ে রাখতে, এমন-কি, ঘরের খাওয়া যথেষ্ট না জুটলেও।

মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

উপনিষদে ভগবান-সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। স ভগবঃ কস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতঃ। সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত। এই প্রশ্নের উত্তর : স্বে মহিম্নি। নিজের মহিমায়। সেই মহিমাই তাঁর স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত।

মানুষেরও আনন্দ মহিমায়। তাই বলা হয়েছে : ভূমৈব সুখম্‌।

মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

যে ওস্তাদ তানের অজস্রতা গণনা ক'রে গানের শ্রেষ্ঠতা বিচার করে তার বিদ্যাকে সেই উটের সঙ্গে তুলনা করব। শ্রেষ্ঠ গান এমন পর্যাপ্তিতে এসে স্তব্ধ হয় যার উপরে আর একটিমাত্র সুরও যোগ করা যায় না। বস্তুত, গানের সেই থামাকে সীমা বলা যায় না। সে এমন একটি শেষ যার শেষ নেই। অতএব, যথার্থ গায়কের আত্মা আপন সার্থকতাকে প্রকাশ করে তানের প্রভূত সংখ্যার দ্বারা নয়, সমগ্র গানের সেই চরম রূপের দ্বারা যা অপরিমেয়, অনির্বচনীয়, বাইরের দৃষ্টিতে যা স্বল্প, অন্তরে যা অসীম। তাই মানুষের যে সংসার তার অহং এর ক্ষেত্রে সেদিকে তার অহংকার ভূরিতায়, যেদিকে তার আত্মা সেদিকে তার সার্থকতা ভূমায়। একদিকে তার গর্ব স্বার্থসিদ্ধিতে, আর-এক দিকে তার গৌরব পরিপূর্ণতায়। সৌন্দর্য, কল্যাণ, বীর্য, ত্যাগ প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকে ; অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে ; উপলব্ধি করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে। যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

নীহারিকার মহাক্ষেত্রে যেখানে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে মাঝে মাঝে এক-একটি তারা দেখা যায়; তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সমস্ত নীহারিকার বিরাট অন্তরে সৃষ্টি-হোম-হুতাশনের উদ্দীপনা। তেমনি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের দেখি। তাঁদের থেকে এই কথাই বুঝি যে সমস্ত মানুষের অন্তরেই কাজ করছে অভিব্যক্তির প্রেরণা। সে ভূমার অভিব্যক্তি। জীবমানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন ক'রে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে। বস্তুত, সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্বপৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে।

মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে আনন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি **তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা**। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।

মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

এক সময়ে বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। পালাবার ইচ্ছে করেছি, শান্তি পাই নি তা নয়। বিক্ষোভের থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েছি। প্রলোভনের হাত থেকে এমনিভাবে উদ্ধার পেয়েছি। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। দেখলুম, মানবনাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই-যে দেখা এ'কে ছোটো বলব না। এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।

মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে—সেই ভূমৈব সুখম্। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়; আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে, লীলা যদি না হত তবে বুক যেত ফেটে।

(সাহিত্যের পথে, ৮ আশ্বিন ১৩৪৩)

জ্ঞানবুদ্ধি যখন ইন্দ্রিয়ের গণ্ডি পার করে এগিয়ে জ্ঞানের জগতে আমাদের নিয়ে যায়, তখনই বৃহত্তর সত্যের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। আবার জ্ঞানজগৎও একটা গণ্ডি। তারও পরে অধ্যাত্মজগৎ। সেখানকার সত্যকে জানবার জন্যও আমাদের মধ্যে প্রেরণা রয়েছে—'ভূমৈব সুখম্'। সেখানকার সত্য আরও বিরাট।

(ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

স ভগবঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি ৭।২৪।১

ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি"—"হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?" ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন—"স্বে মহিম্নি"—"আপন মহিমাতে।" তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে হইবে—

(ধর্মপ্রচার, ধর্ম, ১৩১০)

মুক্তি বলতে কী বোঝায়। প্রকাশের পূর্ণতা। ভগবান সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরছলে ঋষি একটি চরম কথা বলেছেন : স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি। সেই

ভুবন কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তার উত্তর, নিজের মহিমাতেই। অর্থাৎ, তিনি স্বপ্রকাশ।

(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫)

উপনিষদে ভগবান-সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ। সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত। এই প্রশ্নের উত্তর : স্বে মহিম্নি। নিজের মহিমায়। সেই মহিমাই তাঁর স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত।

মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

ওঁ। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্ত-রাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি॥ ৮।১।১

আমাদের হৃদয়ের গোপন বিজনঘরে প্রিয়তম আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। তাঁর কাছে বার বার ঘুরে ঘুরে না এলে বস্তুর দৌরাত্ম্য অসহ্য হয়ে ওঠে। অন্তর যেন জানে তার অতল অন্তঃস্তরেই লুকানো রয়েছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। হৃদয়ের কৃপণতা দূর করতে হলে এই অসংশয় বিশ্বাস চাই।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯১৬)

এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি ৮।৩।৪

আত্মা যে অমর, আত্মা যে অভয়, আত্মা যে সমস্ত সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভের চেয়ে বড়ো, অসীমের মধ্যেই যে আত্মার আনন্দনিকেতন, এই কথাটি প্রকাশ করাই হচ্ছে মানুষের সমস্ত জীবনের অর্থ; এইজন্যেই আমরা এত শক্তি নিয়ে এত বড়ো জগতে জন্মেচি—আমরা ছোটো-খাটো এটা-ওটা-সেটা নিয়ে ভেবে কেঁদে মরতে আসি নি।

(ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৪ আশ্বিন ১৩২৫)

তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্ ইতি। ৮।৩।৪

জীবাত্মা যা কিছু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পেয়েছে তাই সে পরমাত্মার মধ্যে অসীমরূপে উপলব্ধি করতে চায়।

নিজের মধ্যে আমরা কী কী দেখছি।

প্রথমে দেখছি আমি আছি—আমি **সত্য**।

তার পরে দেখছি যেটুকু এখনই আছি এইটুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি

হব, যা এখনও হইনি তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারি নে ছুঁতে পারি নে কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।

একে আমি বলি শক্তি। আমার দেহের শক্তি যে কেবল বর্তমানেই দেহকে প্রকাশ করে কৃতার্থ হয়ে বসে আছে তা নয়—সেই শক্তি দশ বৎসরের পরেও আমার এই দেহকে পুষ্ট করবে বর্ধিত করবে। যে পরিণাম এখন উপস্থিত নেই সেই পরিণামের দিকে শক্তি আমাকে বহন করবে।

আমাদের মানসিক শক্তিরও এইরূপ প্রকৃতি। আমাদের চিন্তাশক্তি যে কেবলমাত্র আমাদের চিন্তিত বিষয়গুলির মধ্যেই সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত তা নয়—যা চিন্তা করি নি ভবিষ্যতে করব তার সম্বন্ধেও সে আছে। যা চিন্তা করতে পারতুম, প্রয়োজন উপস্থিত হলে যা চিন্তা করতুম তার সম্বন্ধেও সে আছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে বর্ত্তমান, তার মধ্যে আর একটি পদার্থ বিদ্যমান, যা তাকে অতিক্রম করে অনাদি অতীত হতে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে ব্যাপ্ত।

এই যে শক্তি, যা আমাদের সত্যকে নিশ্চল জড়ত্বের মধ্যে নিঃশেষ করে রাখে নি, যা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এ যে কেবলমাত্র গতিরূপে অহরহ আপনাকে অনাগতের অভিমুখে প্রকাশ করে চলেছে তা নয়, এর আর-একটি ভাব দেখছি। এ একের সঙ্গে আরকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যোজনা করছে।

যেমন আমাদের দেহের শক্তি। এ যে কেবল আমাদের আজকের এই দেহকে কালকের দেহের মধ্যে পরিণত করছে তা নয়, এ আমাদের দেহটিকে নিরন্তর একটি সমগ্রদেহ করে বেঁধে রাখছে। এ এমন করে কাজ করছে যাতে আমাদের শরীরের "আজ"ই একান্ত হয়ে না দাঁড়ায় শরীরের "কাল"ও আপনার দাবি রক্ষা করতে পারে— তেমনি আমাদের শরীরের একাংশই একান্ত হয়ে না ওঠে, শরীরের অন্যাংশের সঙ্গে তার এমন সম্বন্ধ থাকে যাতে পরস্পর পরস্পরের সহায় হয়। পায়ের জন্যে হাত মাথা পেট সকলেই খাটছে আবার হাত মাথা পেটের জন্যেও পা খেটে মরছে। এই শক্তি হাতের স্বার্থকে পায়ের স্বার্থ করে রেখেছে পায়ের স্বার্থকে হাতের স্বার্থ করে রেখেছে।

এইটিই হচ্ছে শরীরের পক্ষে মঙ্গল। তার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ সমস্ত অঙ্গকে রক্ষা করছে, সমগ্র অঙ্গ প্রত্যেক প্রত্যঙ্গকে পালন করছে। অতএব শক্তি আয়ুরূপে শরীরকে অনাগত পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং মঙ্গলরূপে তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় বন্ধন করছে, ধারণ করছে। এই শক্তির প্রকাশ শুধু যে মঙ্গলে তা তো নয়, কেবল যে তার দ্বারা যন্ত্রের মতো রক্ষাকার্য চলে যাচ্ছে তা নয়, এর মধ্যে আবার একটি আনন্দ রয়েছে।

আয়ুর মধ্যে আনন্দ আছে। সমগ্র শরীরের মঙ্গলের মধ্যে স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি আনন্দ আছে।

এই আনন্দকে ভাগ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে জ্ঞান এবং আর একটি প্রেম।

আমার মধ্যে যে একটি সমগ্রতা আছে তার সঙ্গে জ্ঞান আছে—সে জানছে আমি হচ্ছি আমি; আমি হচ্ছি একটি সম্পূর্ণ আমি।

শুধু জানছে নয় এই জানায় তার একটি প্রীতি আছে। এই একটি সম্পূর্ণতাকে

সে এত ভালোবাসে যে এর কোনো ক্ষতি সে সহ্য করতে পারে না। এর মঙ্গলে তার লাভ, এর সেবায় তার আনন্দ।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, শক্তি একটি সমগ্রতাকে বাঁধছে, রাখছে এবং তাকে অহরহ একটি ভাবী সম্পূর্ণতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে।

তার পরে দেখতে পাচ্ছি এই যে সমগ্রতা যার মধ্যে একটি সক্রিয় শক্তি অংশ প্রত্যংশকে এক করে রয়েছে, অতীত অনাগতকে এক করে রয়েছে—সেই শক্তির মধ্যে কেবল যে মঙ্গল রয়েছে অর্থাৎ সত্য কেবল সমগ্র আকারে রক্ষা পাচ্ছে ও পরিণতি লাভ করছে তা নয়, তার মধ্যে একটি আনন্দ রয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে একটি সমগ্রতার জ্ঞান এবং সমগ্রতার প্রেম আছে। সে সমস্তকে জানে এবং সমস্তকে ভালোবাসে।

যেটি আমার নিজের মধ্যে দেখছি, ঠিক এইটেই আবার সমাজের মধ্যে দেখছি। সমাজ-সত্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্তমান, যা সমাজকে কেবলই বর্ত্তমানে আবদ্ধ করছে না তাকে তার ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ এবং সকলের স্বার্থকে প্রত্যেকের স্বার্থ করে তুলছে।

(সমগ্র এক, শান্তিনিকেতন, ১৯ চৈত্র ১৩১৫)

সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ নেই, সত্য সব নিয়ে এক। মর্ত্ত্যজগৎ সয়তানের সৃষ্টি নয়, আমারও ঘরের বানান নয়, সে সেই মহাসত্যেরই অন্তর্গত যার মধ্যে তুমি সংসারাতীতকে খুঁজে বেড়াচ্চ। পরমার্থসাধনাকে অশুচি করা হয় যখন সত্যের কোনো অংগকে অশুচি কল্পনা করে ঘৃণার অন্ধ সংস্কার রচনা করো। অশুচিতা আমাদের নিজের বিকৃতিতে। পরমার্থচিন্তাকেও আমরা অশুচি করি যখন তার মধ্যে অহঙ্কার আসে, অন্ধতা আসে, ভেদবুদ্ধি দেখা দেয়।.........সত্যই যজ্ঞ.........যেখানে সত্য নেই, দয়া নেই, চিত্তের নির্ম্মলতা নেই আছে পূজা অর্চ্চনা, আছে ভক্তিরসের সম্ভোগ সেখানে আধ্যাত্মিকতা আত্মপ্রবঞ্চনা। বিধাতার জগৎকে অবিশ্বাস কোরো না, ঘৃণা কোরো না, তিনি পৃথক একটা স্বর্গ সৃষ্টি করে নিজের পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ বাধান নি।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ১৯ অক্টোবর ১৯৩৫)

য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ৮।৭।১

আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরামৃত্যুশোকক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, যিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে। "মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।" এই-যে তাঁকে সন্ধান করা, তাঁকে জানা, এ তো বাইরে জানা, বাইরে পাওয়া নয়; এ-যে আপন অন্তরে আপনি হওয়ার দ্বারা জানা, হওয়ার দ্বারা পাওয়া।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ১।৩।২৮

যখন কারাগারের পাষাণভিত্তি আমাদিগকে ক্লিষ্ট করে তখন নূতন প্রাচীর গাঁথিয়া আমরা মুক্তি কল্পনা করিতে পারি না। অসৎ যখন আমাদিগকে পীড়িত করে, যখন কাতর অন্তঃকরণ হইতে প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়া উঠে, অসতো মা সদ্গময়, অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, তখন কি নবতর অসত্যপাশ আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে?

আমরা ব্রহ্মকে কখন চাই? একদিন যখন উপলব্ধি করি আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের বাসনা মুহূর্তে মুহূর্তে অসৎ সংসারের ধূলিকর্দম আহরণ করিয়া আমাদের আলোকের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে; আমরা সেই নিবিড় মোহান্ধকারে মণি বলিয়া যাহা সংগ্রহ করিতেছি তাহা মুষ্টির মধ্যে ধূলি হইয়া যাইতেছে, সুখ বলিয়া যাহা আলিঙ্গন করিতেছি তাহা সহস্রশিখা জ্বালারূপে আপাদমস্তক দগ্ধ করিতেছে, জল বলিয়া যাহা পান করিতেছি তাহা তৃষা-হুতাশনে আহুতিস্বরূপে বর্ধিত হইতেছে, তখন পাপের বিভীষিকায় ভয়াতুর হইয়া যাঁহাকে ডাকিয়া বলি, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' তিনি কি আমাদেরই মতো বাসনা-প্রবৃত্তির দ্বারা জড়িত সুখদুঃখপীড়িত পুরাণকল্পিত তমসাচ্ছন্ন দেবতা?

(পরিশিষ্ট, আধুনিক সাহিত্য, মাঘ ১৩০৫)

আমরা সংসারের যত সুখ যত ঐশ্বর্য্য তাহার নিকট আহরণ করি সে বলিতে থাকে, এ তো আমার মৃত্যুর উপকরণ! সে আপন ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠে, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।

(পরিশিষ্ট, আধুনিক সাহিত্য, মাঘ ১৩০৫)

আর্যধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা বলিবেন সংসারের সহিত যদি ব্রহ্মের যোগসাধন করিতে হয়, তবে ব্রহ্মকে সংসারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। তাই যদি হইল তবে সত্যের প্রয়োজন কি? সংসার ত আছেই—কাল্পনিক সৃষ্টির দ্বারা সেই সংসারেরই আয়তন বিস্তার করিয়া লাভ কি? আমরা অসৎ সংসারে আছি বলিয়াই আমাদের সত্যের প্রয়োজন—আমরা সংসারী বলিয়াই সেই সংসারাতীত নির্ব্বিকার অক্ষর পুরুষের আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে—সে আদর্শ বিকৃত হইতে দিলেই তাহা সছিদ্র তরণীর ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেয় না। যদি সত্যকে, জ্যোতিকে, অমৃতকে আমরা অসৎ অন্ধকার এবং মৃত্যুর পরিমাপে খর্ব্ব করিয়া আনি, তবে কাহাকে ডাকিয়া কহিব

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সংসারী জীবের পক্ষে একটি মাত্র প্রার্থনা আছে—সে প্রার্থনা অসৎ হইতে আমাকে

সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও—সে প্রার্থনা করিবার স্থান সংসারে নাই, আমাদের কল্পনার মধ্যে নাই,—সত্যকে মিথ্যা করিয়া লইয়া তাহার নিকট সত্যের জন্য ব্যাকুলতা-প্রকাশ চলে না, জ্যোতিকে স্বেচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার নিকট আলোকের জন্য প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র, অমৃতকে স্বহস্তে মৃত্যুধর্ম্মের দ্বারা বিকৃত করিয়া তাহার নিকট অমৃতের প্রত্যাশা মূঢ়তা।

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ মাঘ ১৩০৭)

অসৎ হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

আমাদের অভাব কেবল সত্যের অভাব, আলোকের অভাব, অমৃতের অভাব—আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ পাপ নিরানন্দ কেবল এইজন্যই। সত্যের, জ্যোতির, অমৃতের ঐশ্বর্য যিনি কিছু পাইয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহাতে আমাদের জীবনের সমস্ত অভাবের একেবারে মূলচ্ছেদ করিয়া দেয়। যে-সকল ব্যাঘাতে তাঁহার প্রকাশকে আমাদের নিকট হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাই বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নানা দুঃখ এবং অকৃতার্থতার মধ্যে অবতীর্ণ করিয়া দেয়। সেইজন্যেই আমাদের মন অসত্য, অন্ধকার ও বিনাশের আবরণ হইতে রক্ষা চাহে। যখন সে বলে আমার দুঃখ দূর করো তখন সে শেষ পর্যন্ত না বুঝিলেও এই কথাই বলে—যখন সে বলে আমার দৈন্য মোচন করো, তখন সে যথার্থ কী চাহিতেছে, তাহা না জানিলেও এই কথাই বলে। যখন সে বলে আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করো, তখনও এই কথা। সে না বুঝিয়াও বলে—

আবিরাবীর্ম এধি।

হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

আমরা ধ্যানযোগে আমাদের অন্তর বাহিরকে যেমন বিশ্বেশ্বরের দ্বারাই বিকীর্ণ দেখিতে চেষ্টা করিব, তেমনি আমরা প্রার্থনা করিব যে, যে সত্য যে জ্যোতি যে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রহিয়াছি, তাহাকে সচেতনভাবে জানিবার যাহা-কিছু বাধা, সেই অসত্য সেই অন্ধকার সেই মৃত্যু যেন দূর হইয়া যায়।

(ধর্মের সরল আদর্শ, ধর্ম, ১৩০৯)

স্বার্থের জড়তা এবং পাপের আবর্ত ব্রহ্মের এই নিত্যবিরাজমান আনন্দের অনুভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে। তখন সহস্র রাজা আমাদের নিকট হইতে করগ্রহণে উদ্যত হয়, সহস্র প্রভু আমাদিগকে সহস্র কাজে চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান করে। তখন যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই বড়ো হইয়া উঠে—তখন সকল বিরহই ব্যাকুল, সকল বিপদই বিভ্রান্ত করিয়া তোলে—সকলকেই চূড়ান্ত বলিয়া ভ্রম হয়। লোভের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেই মনে হয় তাহাকে না পাইলে নয়, বাসনার বিষয় উপস্থিত হইলেই মনে হয় ইহাকে পাইলেই আমার চরম সার্থকতা। ক্ষুদ্রতার এই সকল অবিশ্রাম ক্ষোভে ভূমা আমাদের নিকটে অগোচর হইয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদিগকে প্রতিপদে অপমানিত করিয়া যায়।

সেইজন্যই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে,

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও;—প্রতি নিমেষের খণ্ডতা হইতে তোমার অনন্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে আমাকে উপনীত করো;—অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও;—অহংকারের যে অন্তরাল, বিশ্বজগৎ আমার সম্মুখে যে স্বাতন্ত্র্য লইয়া দাঁড়ায়, আমাকে এবং জগৎকে তোমার ভিতর দিয়া না দেখিবার যে অন্ধকার তাহা হইতে আমাকে মুক্ত করো; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও,—আমার প্রবৃত্তি আমাকে মৃত্যুদোলায় চড়াইয়া দোল দিতেছে, মুহূর্তকাল অবসর দিতেছে না; আমার মধ্যে আমার ইচ্ছাগুলাকে খর্ব করিয়া আমার মধ্যে তোমার আনন্দকে প্রকাশমান করো, সেই আনন্দই অমৃতলোক।..............সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য আমরা করপুট করিয়া দাঁড়াইয়াছি।

(নববর্ষ, ধর্ম, ১৩০৯)

যাহা সাধারণ বুদ্ধিবল-বাহুবলের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহাতেই প্রতিভা বা অসামান্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহা কেবল একান্তভাবে, যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম। ইহা আর কিছু নয়—যাহা কাছেই আছে, তাহাকেই পাওয়া।

(প্রার্থনা, ধর্ম, ১৩১১)

আমাদের ছোটো বড়ো সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড়ো ইচ্ছা, এই মর্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদিগকে খর্ব করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

এ-যে কেবল আমাদের খাওয়া-পরা, আমাদের ধনমান-অর্জন সম্বন্ধেই খাটে তাহা নহে—আমাদের বড়ো বড়ো চেষ্টা সম্বন্ধে আরও বেশি করিয়াই খাটে।

যেমন দেশহিতৈষা। এ-প্রবৃত্তি যদিও আমাদের আত্মত্যাগ ও দুষ্কর তপঃসাধনের দিকে লইয়া যায়, তবু ইহা মানবত্বের গুরুতর-অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। ইহার প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই, আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিরা ইহাকেই তাহাদের চরম লক্ষ্য পরমধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে আলোককে অমৃতকে য়ুরোপের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতেছে। য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে সার্থকতালাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপ কেবলই মাটি চাহিতেছে, সোনা চাহিতেছে, প্রভুত্ব চাহিতেছে—এমন লোলুপভাবে এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে, সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা তাহা য়ুরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ—পথ নহে,—ইহাই মৃত্যু।

আমাদের সম্মুখে আমাদের অত্যন্ত নিকটে য়ুরোপের এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে প্রতিদিন মোহাভিভূত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই কথাই কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য-আলোক-অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী বিষয়ানুরাগই হউক আর দেশানুরাগই হউক, আপনার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ে যেখানে এই সত্য, আলোক ও অমৃতকে অতিক্রম করিতে চাহে, সেখানেই তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতে

হইবে—"বিনিপাত"! বলা কঠিন, প্রলোভন প্রবল, ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য, তবু ভারতবর্ষ এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

(প্রার্থনা, ধর্ম, ১৩১১)

সপ্তলোক যখন অন্তরীক্ষে ঊর্ধ্বকররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও, 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'—তখন তুমি বলিতেছ আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কী চাই! ঐশ্বর্যের ইহাই বিড়ম্বনা—দীনাত্মার কাছে ঐশ্বর্যই চরম সার্থকতার রূপ ধারণ করে।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১)

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—'অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও'—ইহা যে আমাদের সকলেরই প্রার্থনা; মানুষের সকল প্রার্থনার মধ্যেই এই প্রার্থনা রহিয়াছে। আমরা যখন ধনকে প্রার্থনা করিতেছি, তখন আমরা ধনকেই সত্য, ধনকেই আলোক, ধনকেই অমৃত জানিয়া প্রার্থনা করিতেছি। এই-সমস্ত বৃথা প্রার্থনার পরম দুঃখ হইতে কে আমাদিগকে মুক্তিদান করিবে! মানুষ যথার্থই যাহা চায়, মানুষকে কে তাহা সত্যভাবে সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত করিবে! সেই মহাত্মগণ—স্বার্থের অপেক্ষা পরমার্থ যাঁহাদের নিকট সহজেই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সুখের অপেক্ষা মঙ্গলকে যাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে বরণ করিয়াছেন, ধর্মেই যাঁহাদের আনন্দ, যাঁহাদের স্থিতি।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১১ মাঘ ১৩১১)

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ এই কথাটি সবেগে বলেই কি সেই ব্রহ্মবাদিনী তখনই জোড়হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখটি আকাশের দিকে তুলে বলে উঠলেন—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—আবিরাবীর্ম এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্?

উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কী চাই অথচ কী নেই তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণীহৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে।—হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে, হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে, হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্ন রাত্রির পথিকের মতো নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

(প্রার্থনা, শান্তিনিকেতন, ২ পৌষ ১৩১৫)

সতী আত্মা যে প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রেমের কোনো অঙ্গের অভাব ছিল না। তিনি যে অমৃত চেয়েছিলেন, তা পরিপূর্ণ প্রেম—তা কর্মহীন জ্ঞান-হীন প্রমত্ত প্রেম নয়। তিনি বলেছিলেন, অসতো মা সদ্‌গময়—অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। তিনি বলেছিলেন, আমি যাঁকে চাই তিনি যে সত্য, নিজেকে সকল দিকে সত্যের নিয়মে সত্যের বন্ধনে না বাঁধলে তাঁর সঙ্গে যে আমার পরিণয়বন্ধন সমাপ্ত হবে না। বাক্যে চিন্তায় কর্মে সত্য হতে হবে, তাহলেই যিনি বিশ্বজগতে সত্য, যিনি বিশ্বসমাজে সত্য তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সত্য হয়ে উঠবে, নইলে পদে পদে বাধতে থাকবে। এ সাধনা কঠিন সাধনা, এ পুণ্যের সাধনা, এ কর্মের সাধনা।

তারপরে তিনি বলেছিলেন, তমসো মা জ্যোতির্গময়। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ—বিশ্বজগতের মধ্যে তিনি যেমন ধ্রুব সত্যরূপে আছেন, তেমনি সেই সত্যকে যে আমরা জানছি সে জ্ঞান যে জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশ। সেইজন্যই তো গায়ত্রীমন্ত্রে একদিকে ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোকের মধ্যে তাঁর সত্য প্রত্যক্ষ করবার নির্দেশ আছে তেমনি অন্যদিকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাঁর জ্ঞানকে উপলব্ধি করবারও উপদেশ আছে—যিনি ধীকে প্রেরণ করছেন তাঁকে জ্ঞানের মধ্যে ধীস্বরূপ বলেই জানতে হবে। বিশ্ব-ভুবনের মধ্যে সেই সত্যের সঙ্গে মিলতে হবে, জ্ঞানের মধ্যে সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিলতে হবে। ধ্যানের দ্বারা যোগের দ্বারা এই মিলন।

তারপরের প্রার্থনা মৃত্যোর্মামৃতংগময়। আমরা আমাদের প্রেমকে মৃত্যুর মধ্যে পীড়িত খণ্ডিত করছি ; তোমার অনন্ত প্রেম অখণ্ড আনন্দের মধ্যে তাকে সার্থক করো। আমাদের অন্তঃকরণের বহুবিভক্তরসের উৎস, হে রসস্বরূপ, তোমার পরিপূর্ণ রসসমুদ্র মিলিত হয়ে চরিতার্থ হ'ক। এমনি করে অন্তরাত্মা সত্যের সংযমে, জ্ঞানের আলোকে ও আনন্দের রসে পরিপূর্ণ হয়ে, প্রকাশই যাঁর স্বরূপ তাঁকে নিজের মধ্যে লাভ করুক তাহলেই রুদ্রের যে প্রেমমুখ তাই আমাদের চিরন্তন কাল রক্ষা করবে।

(বিকারশঙ্কা, শান্তিনিকেতন, ৩ পৌষ ১৩১৫)

আত্মা যেদিন অমৃতের জন্যে কেঁদে ওঠে তখন সর্বপ্রথমেই বলে—অসতো মা সদ্‌গময়—আমার জীবনকে আমার চিত্তকে সমস্ত উচ্ছৃংখল অসত্য হতে সত্যে বেঁধে ফেলো—অমৃতের কথা তার পরে।

আমাদেরও প্রতিদিন সেই প্রার্থনাই করতে হবে বলতে হবে, অসতো মা সদ্‌গময়—বন্ধনহীন অসংযত অসত্যের মধ্যে আমাদের মন হাজারটুকরো করে ছড়িয়ে ফেলতে দিয়ো না—তাকে অটুট সত্যের সূত্রে সম্পূর্ণ করে বেঁধে ফেলো—তারপরে সে হার তোমার গলায় যদি পরাতে চাই তবে আমাকে লজ্জা পেতে হবে না।

(হিসাব, শান্তিনিকেতন, ৬ পৌষ ১৩১৫)

হে সত্য, আমার এই অন্তরাত্মার মধ্যেই যে তুমি অন্তহীন সত্য—তুমি আছ। এই আত্মায় তুমি যে আছ, দেশে কালে গভীরতায় নিবিড়তায় তার আর সীমা নাই। এই আত্মা অনন্তকাল এই মন্ত্রটি বলে আসছে—সত্যং। তুমি আছ, তুমিই আছ। আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা হতে এই যে মন্ত্রটি উঠছে, তা যেন আমার মনের এবং সংসারের অন্যান্য সমস্ত শব্দকে ভরে সকলের উপরে জেগে ওঠে—সত্যং সত্যং সত্যং।

সেই সত্যে আমাকে নিয়ে যাও—সেই আমার অন্তরাত্মার গূঢ়তম অনন্ত সত্যে—যেখানে "তুমি আছ" ছাড়া আর কোনো কথাটি নেই।

হে জ্যোতির্ময়, আমার চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তোমার অনন্ত আকাশের কোটি সূর্যলোকে যে জ্যোতি কুলোয় না, সেই জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় ক্ষালন করে ফেলো, আমাকে জ্যোতির্ময় করো, আমার অন্য সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই শুভ্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি।

হে অমৃতস্বরূপ, আমার অন্তরাত্মার নিভৃত ধামে তুমি আনন্দং পরমানন্দং। সেখানে কোনোকালেই তোমার মিলনের অন্ত নেই। সেখানে তুমি কেবল আছ না তুমি মিলেছ, সেখানে তোমার কেবল সত্য নয় সেখানে তোমার আনন্দ। সেই তোমার অনন্ত আনন্দকে তোমার জগৎসংসারে ছড়িয়ে দিয়েছ। গতিতে প্রাণে সৌন্দর্যে সে আর কিছুতে ফুরোয় না, অনন্ত আকাশে তাকে আর কোথাও ধরে না। সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে স্তব্ধ করে রেখেছি। সেখানে তোমার সৃষ্টির কাউকে প্রবেশ করতে দাও নি; সেখানে আলোক নেই, রূপ নেই, গতি নেই; কেবল নিস্তব্ধ নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে। সেই আনন্দধামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার ডাক দাও প্রভু। আমি যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছি, তোমার অমৃত-আহ্বান আমার সংসারের সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হক, অতিদূরে চলে যাক, অতি গোপনে প্রবেশ করুক। সকল দিক থেকেই আমি যেন যাই যাই বলে সাড়া দিই। ডাক দাও—ওরে আয় আয়, ওরে ফিরে আয়, চলে আয়। এই অন্তরাত্মার অনন্ত আনন্দধামে আমার যা-কিছু সমস্তই এক জায়গায় এক হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসুক, খুব গভীরে খুব গোপনে।

(প্রার্থনা, শান্তিনিকেতন, ১৪ ফাল্গুন ১৩১৫)

হে সত্য, আর কিছু নয়, যেদিকে তুমি, যেদিকে সত্য, সেইদিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দাও—আমি যে কেবল অসত্যের দিকেই তাকিয়ে আছি। তোমার আনন্দ-লীলা-মঞ্চে তুমি সারি সারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েছ—আমি তার উল্টোদিকের অন্ধকারে তাকিয়ে ভেবে মরছি এ সমস্ত কী। তোমার জ্যোতির দিকে আমাকে ফেরাও। আমি কেবলই দেখছি মৃত্যু—তার কোনো মানেই ভেবে পাচ্ছি নে, ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছি। ঠিক তার ওপাশেই যে অমৃত রয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত মানে রয়েছে সে-কথা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে?

(বিমুখতা, শান্তিনিকেতন, ১৮ ফাল্গুন ১৩১৫)

আমাদের প্রার্থনা যে, আমরা যেন এই মানবজীবনে সত্যকেই প্রকাশ করি, অসত্যকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত হয়ে না থাকি। আমরা যেন প্রবৃত্তির অন্ধকারের মধ্যেই আত্মাকে আচ্ছন্ন করে না রাখি, আত্মা যেন এই ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি না হারায়, মোহমুক্ত নির্মল জ্যোতিতে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে, সে যেন নানা অনিত্য উপকরণের সঞ্চয়ের মধ্যে পদে পদে আঘাত খেতে খেতে হাতড়ে না বেড়ায়, সে যেন আপনার অমৃতরূপকে আনন্দরূপকে তোমার মধ্যে লাভ করে।

(আত্মার প্রকাশ, শান্তিনিকেতন, ৮ চৈত্র ১৩১৫)

মৈত্রেয়ীর প্রার্থনাও সেই প্রকাশের প্রার্থনা। যে-প্রার্থনা বিশ্বের সমস্ত কুঁড়ির মধ্যে, কিশলয়ের মধ্যে, যে-প্রার্থনা দেশকালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে নিয়ত উঠছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে যে-প্রার্থনা, যে-প্রার্থনার যুগযুগান্তরব্যাপী ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী রোদসী বলেছে সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। আমাকে প্রকাশ করো, আমাকে প্রকাশ করো। আমি অসত্যে আচ্ছন্ন আমাকে সত্যে প্রকাশ করো। আমি অন্ধকারে আবিষ্ট আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ করো, আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট আমাকে অমৃতে প্রকাশ করো।

(আদেশ, শান্তিনিকেতন, ৯ চৈত্র ১৩১৫)

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে ব'লে আমি-টুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব। যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার স্বার্থ, সেইদিকে তার পাপ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার ত্যাগ, সেদিকে তার পুণ্য; যে দিকে সে পৃথক সেই দিকে তার কঠোর অহংকার, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকেই তার সকল মাধুর্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং আর-এক দিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাধানের প্রার্থনা : অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

(জাগরণ, শান্তিনিকেতন, ১৩১৫)

আমি উপাসনাকালে এবং অন্যসময়েও 'পিতা নোহসি' এবং 'অসতো মা' এই দুই মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকি—করিতে করিতে যে পর্যন্ত আমার মন এই দুটি মন্ত্র সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া না উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না।

(চিঠিপত্র, সপ্তম খণ্ড, ১৮ পৌষ ১৩১৭)

বনস্পতির প্রবল প্রাণশক্তিই প্রচুর পল্লব বর্ষণ করে, অবিশ্রাম পরিত্যক্ত মৃতপত্রে তাহার মৃত্যু প্রমাণ করে না। জীবনই প্রতিমুহূর্তে মরিতে পারে--মৃত্যু যখন বন্ধ হইয়া যায় তখনই যথার্থ মৃত্যু।......অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যুউৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না?

(পথের সঞ্চয়, আষাঢ় ১৩১৯)

অসতো মা সদ্গময়। সত্যকে চাই। সমস্ত মিথ্যাজাল ছিন্ন করে দাও। এই প্রার্থনা জগতে যত মানব জন্মগ্রহণ করেছে সকলের চিরকালের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই মানুষের সমাজ গড়েছে, সাম্রাজ্য রচনা করেছে, শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। আজ এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে ধ্বনিত হয়ে উঠুক।

(প্রতীক্ষা, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ ১৩২০)

অসতো মা সদ্গময়। অসত্যে জড়িয়ে আছি, তোমার সঙ্গে মিললে তবে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে মিলন হবে। মৃত্যুর পথ

মাড়িয়ে অমৃতলোকে মিলন হবে। বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করছে তেমনি আমার জীবনকে করবে।

(সৃষ্টির অধিকার, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।

অসত্যের জড়তা থেকে চিরবিকাশমান সত্যের মধ্যে আমাকে নিয়ত চালনা করো, অন্ধকার হতে আমার জ্ঞানের আলোক উন্মীলিত হতে থাক্।

(একটি মন্ত্র, শান্তিনিকেতন, ১৫ মাঘ ১৩২০)

আমাদের জীবনের প্রার্থনা হোক—

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

জড়তা হতে আমাদের সত্যে নিয়ে যাও, মূঢ়তা হতে আমাদের জ্ঞানে নিয়ে যাও, মৃত্যুর খণ্ডতা হতে আমাদের অমৃতে নিয়ে যাও।

অবিরাম হোক সেই তোমার নিয়ে যাওয়া, সেই আমাদের চিরজীবনের গতি।

(একটি মন্ত্র, শান্তিনিকেতন, ১৫ মাঘ ১৩২০)

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হবে, সে আমি জানি। যে বেদনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে, ভগবান জানেন, তা মৃত্যুযন্ত্রণাই। নিজের পুরোনো সত্তাকে ত্যাগ করা খুবই কঠিন। সময় না এলে কেউ বুঝতেই পারে না, কতদূর পর্যন্ত তার শিকড় ছড়িয়ে গেছে, আর কোন্ অভাবিত অজ্ঞাত গভীরে তার সূক্ষ্ম তন্তুগুলি পৌঁছে অমৃতময় জীবনরস আকর্ষণ করে শুষে নিচ্ছে।

আমাদের মা কিন্তু স্নেহ-সুকোমল নন। তিনি নির্মমতায় মিথ্যার সমস্ত জাল ছিন্ন করে দেন। যা মরে গেছে তা নিজের সত্তার মধ্যে পোষণ করা অনুচিত। কারণ মৃত্যুই মৃত্যু ঘটায়। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতে পৌঁছতে হয়। দুঃখের মাশুল পুরোই দিতে হবে।

যতক্ষণ জীবনের সব ঋণশোধ না হবে এবং মৃত অতীতের বন্ধন আমরা ছিন্ন করতে না পারব, ততক্ষণ নির্মুক্ত জ্যোতির্লোক বা প্রেমের অমল অমৃতলোকে প্রবেশ নিরুদ্ধ থাকবে। তবে আমি জানি, মা আমার সঙ্গেও রয়েছেন, আবার আমার সম্মুখ-পথেও তিনি।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ২১ মে ১৯১৪)

অসত্য যখন জীবনের অনেকখানি স্থান হালকাভাবে জুড়ে বসে থাকে, তখন তাকে দেখাও যায় না, অনুভবও করা যায় না। আমরা যেন তার সঙ্গে খানিকটা আপস করে চলি। কিন্তু এখন, আমি যেমনি তার অনাবৃত বীভৎস রূপটি দেখে নিয়েছি, অমনি তার সঙ্গে প্রতিদিন সংগ্রামের অঙ্গীকার মেনেছি।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ২৩ মে ১৯১৪)

বীণায় যখন তার থাকে অসংখ্য তখন তার প্রত্যেকটিতে সুর মেলানো

যেমন কঠিন, তেমনি মানুষের প্রকৃতিই যেখানে জটিল সেখানে সুসংগতি কঠিনতর।

তবু আমি জানি জীবন সরল, তার যান্ত্রিক গঠন যতই জটিল হোক না কেন। জীবনের কেন্দ্রে যে সরল সত্য রয়েছে তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ২৪ মে ১৯১৪)

রাতের চেয়ে অনেকবেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও দিন সহজস্বচ্ছ, কারণ তা উজ্জ্বল এবং প্রত্যক্ষ। রাত্রি বাস্তবের সব সমস্যা ঢেকে রেখে স্বপ্নরাজ্যের একাধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আলোক সত্যের অন্তস্তল উন্মোচিত করে দেখায়। যা-কিছু অপরিণত অথবা সংগ্রামে রত, যা কিছু মুমূর্ষু অথবা মৃত, সবই প্রকাশিত করে দেয়; শ্রী ও শক্তি নিয়ে উদ্গত যে অঙ্কুর তার বিস্তারে শুধু সাহায্য করে তা নয়, তার মূলেও রয়েছে এই আলোক।

সব অসংগতি চোখে দেখেও সংগতির সুষমা আমরা অন্তরে অনুভব করি। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সর্বত্রই আছে, তবু সুন্দর চিরজয়ী। দিন যখন অনাড়ম্বর শুভ্র পরিচ্ছদে আবির্ভূত হয়, রাত্রি তখন মিথ্যার রহস্যজাল নিয়ে লজ্জায় আত্মগোপন করে। দিনের পশ্চাতে বিজয়গৌরব বয়ে আনে আশা এবং আনন্দ। কেন না তখন আর একটি ঘাসের শীষ বা কণ্টক পর্যন্ত চক্ষুর অগোচরে থাকে না।

আমার জীবনেও অবশেষে প্রাতঃসূর্যের অভ্যুদয় হয়েছে। ছায়ার সঙ্গে সংঘর্ষের কাল আমি অতিক্রম করে এসেছি। এখন পিছন ফিরে জীবনের বন্ধুর পথের দিকে তাকালে দেখি তা কোথাও পরিণত-শ্যামল, কোথাও বালুকাময় ঊষর। তবু মন বলে, এ সবই ভালো। প্রশস্ত এই পথ, দিগন্ত-বিস্তৃত এর গতি ; তার চারিদিকে বিরাজ করছে রবির আলো।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ২৫ মে ১৯১৪)

আমাদের মধ্যে যে সৃজনের প্রেরণা আছে তা নব নব রূপে নিজেকে সার্থক করতে চায়। শারীরিক মৃত্যুর অর্থও তাই। সমাধিমন্দির এক জায়গায় চিরস্থির হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু জীবনকে কে কবে বেঁধে রাখতে পেরেছে? তাকে যে নিত্য তার বন্ধন কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে। নয়তো একই রূপের কারাগারে সে বন্দী হয়ে থাকবে। মানুষ অমর, তাই তাকে বারে বারে মরতে হয়। কেননা জীবন ক্রমাগতই এগিয়ে চলেছে—প্রতি পদক্ষেপেই তার চাই নতুন নতুন রূপ।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ৭ জুলাই ১৯১৫)

'এসো এসো, বাইরে বেরিয়ে এসো'—আত্মার এই ক্রন্দন অহরহ উঠছে। ডিমের কঠিন আবরণের মধ্যে পক্ষিশাবকের কাতরতাও এরই অনুরূপ। সত্য যেমন আমাদের স্বাধীনতা দেয়, স্বাধীনতাও আমাদের সত্যকেই দেয়। তাই বুদ্ধ বলেছিলেন, আমাদের

জীবনকে 'অহং'-এর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে, তবে সত্য আপনা থেকেই আবির্ভূত হবে।

পরিশেষে এতদিনে জানলেম, আমার মধ্যে এতকাল যে অধীরতা ছিল তা এরই জন্যে। অভ্যাসের জড়তা থেকে 'অহং'-এর এই খণ্ডিত জগৎ থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। তার আগে প্রয়োজন নির্বিচল নির্জনতার।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ১২ অক্টোবর ১৯১৫)

ধর্মবোধের এই-যে যাত্রা এর প্রথমে জীবন, তারপরে মৃত্যু, তারপরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃতলোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি তারা পারে যাবে কী করে। সেই-জন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

(আত্মপরিচয়, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪)

মৃত্যুর অন্তরে আছে জীবনের অবিরাম আনন্দলীলা। ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা কি তা জানি নে? এই অপূর্ব সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের বাঁচার কী অধিকার আছে? তাকে কি আমরা দগ্ধ করি নে, ধ্বংস করি নে? তবু বিশ্বরচয়িতার এই সৃজনীশক্তিই কি তাঁর সৃষ্টিতে আমাদের নিজস্ব স্থান দেয় নি? অন্য মানুষকে বিচার করতে গিয়ে আমরা যেন সে কথা না ভুলি।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০)

'অসতো মা সদ্‌গময়' এই প্রার্থনা যুগে যুগে ধ্বনিত হবে। এমন-কি যখন সব দেশের ভৌগলিক সত্তা বা নাম পর্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে তখনো এই প্রার্থনা টিকে থাকবে।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ১৮ অক্টোবর ১৯২০)

অসতো মা সদ্‌গময়—সত্যে আমাদের বিশ্বাস যেন অসত্যের মোহে আচ্ছন্ন না হয়।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ২২ ডিসেম্বর ১৯২০)

মানুষের ছোটো আর বড়ো—দুই-ই আছে। সেই ছোটো মানুষটি জন্ম আর

মৃত্যুর মাঝখানে কয়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোটো সংসার পেতেছে—সেইখানে তার যত খেলার পুতুল সাজানো—সেইখানে তার প্রতিদিনের আহরণ জমা হচ্ছে আর ক্ষয় হচ্ছে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়োটি জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চলেছে, এই চলবার পথে তার কত সুখ-দুঃখ, কত লাভ-ক্ষতি ঝরে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর দুটি আবর্ত্তন আছে—একটি আহ্নিক, একটি বার্ষিক। একটি আবর্ত্তনে সে আপনাকেই ঘুরছে, আর একটিতে সে নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ করছে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখতে পায় যে, তার নিজের কোনো আলো নেই, তার নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা,—কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুকে না জানলে সূর্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেতো না। আমরাও আমাদের ছোটো আবর্ত্তনে নিজেকে ঘুরি ; এ ঘোরাতেই জানতে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা ; কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি। এইজন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জান্‌তে থাকলে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম করতে করতে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ করতে করতে চিরদিনের পথে চলতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন আমাদের বৃহৎ-চিরদিনকে প্রণাম করতে করতে চলতে থাকবে, আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন তার সমস্ত আহরণগুলিকে বৃহৎ-চিরদিনের চরণে সম্পর্ণ করতে করতে চলবে।

(ভানুসিংহের পত্রাবলী, ২৯ ভাদ্র ১৩২৫)

আমি চিরদিন আলো ভালোবাসি। গাজিপুরে, পশ্চিমের গরমেও, আমি দুপুর-বেলায় আমার ঘরের দরজা বন্ধ করি নি। অনেকদিন বর্ষার আচ্ছাদনের পর সেই আলো পেয়েছি—সেই আলো আজ আমার দেহের মধ্যে, মগজের মধ্যে, মনের মধ্যে প্রবেশ করছে। আমার সামনে পূর্বদিকের ঐ খোলা দরজা দিয়ে ঐ আলো নীল আকাশ থেকে আমার ললাটে এসে পড়েছে, আর সবুজ ক্ষেতের উপর দিয়ে এসে আমার দুই চোখের সঙ্গে সঙ্গে যেন কানে-কানে কথা বলছে। পৃথিবীর ইতিহাসে কত হানাহানি কাটাকাটি হয়ে গেল, মানুষের ঘরে ঘরে কত সুখ-দুঃখ, কত মিলন-বিচ্ছেদ, কত যাওয়া-আসার বিচিত্র লীলা প্রতিদিন বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল, কিন্তু এই শরতের সবুজটি পৃথিবীর প্রসারিত অঞ্চলের উপরে যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে আপন আসন অধিকার করেচে—কিছুতেই এই সুগভীর শান্তি সৌন্দর্যের 'পরে, এই রসপরিপূর্ণ নির্মলতার উপরে, কোনো আঘাত করতে পারে নি। সেই কথা যখন মনে করি, তখন সামনের ঐ আকাশের দিকে চেয়ে যুগযুগান্তরের সেই শান্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষোভকে আপন অসীমতার মধ্যে মিশিয়ে নেয়।

(ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৪ আশ্বিন ১৩২৫)

জগতে একটা খুব বড়ো শক্তি হচ্ছে প্রাণ, অথচ সেই শক্তি বাইরের দিক থেকে কত ছোটো, কত সুকুমার, একটু আঘাতেই ম্লান হয়ে যায়। এমন জিনিসটা প্রতি মুহূর্তে বিপুল জড়-বিশ্বের ভারাকর্ষণের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে দাঁড়িয়ে আছে, বেরিয়ে বেড়াচ্ছে।

বালক অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহে ঢুকে লড়াই করেছিল, আমাদের সুকুমার প্রাণ তেমনি অসংখ্য মৃত্যুর সৈন্যদলের মধ্যে দিয়ে অহর্নিশি লড়াই করে চলেছে। বস্তুর দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, এই প্রাণের উপকরণ অতি তুচ্ছ—খানিকটা জল, খানিকটা কয়লা, খানিকটা ছাই, খানিকটা ঐ রকম সামান্য কিছু; অথচ প্রাণ আপনার ঐ বস্তুর পরিমাণকে বহু পরিমাণে অতিক্রম করে আছে। মৃতদেহে সজীব দেহে বস্তুপিণ্ডের পরিমাণের তফাৎ নেই, অথচ উভয়ের মধ্যকার তফাৎ অপরিসীম। শুধু তাই নয়, সজীব বীজের বর্তমান আবরণের মধ্যে মহারণ্য লুকিয়ে আছে। ছোটোর মধ্যে এই-যে বড়োর প্রকাশ, এই হচ্ছে আশ্চর্য। আরেক শক্তি হচ্ছে, মনের শক্তি। এই মনটি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় নিয়ে এই অসীম জগতের রহস্য আবিষ্কার করতে বেরিয়েছে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত দুর্বল। চোখ কতটুকুই দেখে, কান কতটুকুই শোনে, স্পর্শ কতটুকুই বোধ করে! কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলই ছাড়িয়ে যাচ্ছে—অর্থাৎ সে যা, সে তার চেয়ে অনেক বড়ো। তার উপকরণ সামান্য হলেও সে অতি-ক্ষুদ্র এবং অতি-বৃহৎ অতি-নিকট এবং অতি-দূরকে কেবলি অধিকার করছে। তা ছাড়া, তার মধ্যে যে-ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন সেও অপরিমেয়। একটি ছোটো শিশুর মনের মধ্যে নিউটনের, সেক্‌স্‌পীয়ারের মন লুকিয়ে ছিল। বর্বরতার যে-মন পাঁচের বেশী গণনা করতে পারতো না, তারি মধ্যে আজকের সভ্যতার মন জ্ঞানের সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধিলাভ করেছে। শুধু তাই নয়, আরো ভবিষ্যতে সে-যে আরো কী আশ্চর্য চরিতার্থতা লাভ করবে, আজ আমরা তা কোনো-মতেই কল্পনা করতে পারি নে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে আমাদের এই-যে মন, যা একদিকে খুব ছোটো, খুব দুর্বল দেখতে, আর-একদিকে তার মধ্যে যে ভুমা আছে, হিমালয়-পর্বতের প্রকাণ্ড আয়তনের মধ্যে তা নেই। তেমনি আমাদের আত্মা ছোটো-দেহ, ছোটো-মন, ছোটো-সব প্রবৃত্তি দিয়ে ঘেরা, অনেক সময় তাকে যেন দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তার মধ্যেই সেই ভূমা আছেন। সেইজন্যেই তো একদিকে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আমাদের রাগ-বিরাগ যখন আমাদের কাছে অন্ন-বস্ত্র ও অন্য হাজার-রকম বাসনার জিনিসের জন্য দরবার করছে, সেই মুহূর্তেই এই প্রবৃত্তির দাস, এই বাসনার বন্দী, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পায়ের নীচে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছে—অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, যা অসীম একেবারে তাকেই চাই। এত বড়ো চাওয়ার জোর এতটুকুর মধ্যে আছে কোথায়? সে-জোর যদি না থাকতো, তবে এত বড়ো কথা তার মুখ দিয়ে বেরোতো কেমন করে? এ-কথার কোনো মানে সে বুঝতো কী করে? আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানবের আত্মা যা নিয়ে দেখছে, শুনছে, ছুঁচ্ছে, খাওয়া-পরা করছে, তাকেই চরম সত্য বলতে চাচ্ছে না;—যাকে চোখে দেখলো না, হাতে পেলো না, তাকেই বলচে সত্য। তার একটি মাত্র কারণ, ছোটোর মধ্যেই বড়োই আছেন, সেই বড়োই ছোটোর ভিতর থেকে মানুষের আত্মাকে কেবলি মুক্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন—তাই মানুষের আশার অন্ত নেই। এখন প্রত্যেক মানুষের কাজ হচ্ছে কী। নিজের কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে এইটেই যেন প্রকাশ করি যে, আমাদের মধ্যে সেই বড়োই সত্য। তা না করে যদি মানুষের ছোটোটার উপরেই ঝোঁক দিই—যে-সব বাসনা তার শিকল, তার গণ্ডী, যাতে তাকে খর্ব করে, আচ্ছন্ন করে, তাকেই যদি কেবল প্রশ্রয় দিই তা হলে মানুষকে তার সত্য পরিচয় থেকে ভোলাই।

(ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৪ আশ্বিন ১৩২৫)

সফলতার সন্ধানে পাছে সত্য থেকে বিচ্যুত হই—এই আশঙ্কা মনে জাগে। সেই লোভ মাঝে মাঝে এসে আমাকে আক্রমণ করে। তবে সেটা বাইরের দিক থেকেই আসে। অন্তরের অন্তস্তলে আমার অটল বিশ্বাস রয়েছে মুক্ত দীপ্ত এই মহাজীবনে। আমার প্রার্থনা হল—'অসতো মা সদ্‌গময়'—সত্যে আমাকে প্রকাশ কর।

(রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ২১ এপ্রিল ১৯২১)

মৃত্যুতে অন্তর্ধান ঘটে না, দূরত্ব ঘটে না, মানুষ যেখানে অমৃতকে লাভ করেছে সেখানে সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে গেছে,

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৬ মাঘ ১৩২৮)

অসতো মা সদ্‌গময়—অসত্য-বুদ্ধি থেকে আমার চিত্তকে সত্যের মধ্যে মুক্তি দাও।.........মৃত্যোর্মামৃতং গময়—হে পরমাত্মন্‌, যে-মোহ ছোটোর মধ্যে মৃত্যুলোকে আমাদের ধরে রাখে তার বন্ধন থেকে আমাদের চিত্তকে অমৃতলোকে মুক্তি দান করো।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩২৯)

অসত্যে গোপন করে, সত্যে প্রকাশ করে। তাই আমাদের প্রার্থনা, 'অসতো মা সদ্‌গময়'—অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও;

(বিশ্বভারতী, ১ বৈশাখ ১৩৩০)

......আমাদের এই প্রার্থনা যে, সকল অন্ধকার ও অসত্য থেকে আমাদের জ্যোতিতে নিয়ে যাও—সোনা-হীরা-মাণিক্যের জ্যোতি নয়, কিন্তু অধ্যাত্মলোকের জ্যোতিতে নিয়ে যাও। ভারতবর্ষ আজ এই প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, তাকে মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। আমরা অকিঞ্চন হলেও তবু আমাদের কণ্ঠ থেকে সকল মানুষের জন্য এই প্রার্থনা ধ্বনিত হোক।

(বিশ্বভারতী, ৭ পৌষ ১৩৩০)

একজন আধুনিক জাপানি রূপদক্ষের রচিত একটি ছবি আমার কাছে আছে। সেটি যতবার দেখি আমার গভীর বিস্ময় লাগে। দিগন্তে রক্তবর্ণ সূর্য—শীতের বরফ-চাপা শাসন সবেমাত্র ভেঙে গেছে, প্লাম গাছের পত্রহীন শাখাগুলি জয়ধ্বনির বাহুভঙ্গির মতো সূর্যের দিকে প্রসারিত, সাদা সাদা ফুলের মঞ্জরীতে গাছ ভরা। সেই প্লাম গাছের তলায় একটি অন্ধ দাঁড়িয়ে তার আলোকপিপাসু দুই চক্ষু সূর্যের দিকে তুলে প্রার্থনা করছে।

আমাদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন : তমসো মা জ্যোতির্গময়, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও। চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে তাঁরা জ্যোতি বলেছেন।

(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪)

শিবকে অশিবের মধ্যে দেখা—সেও হচ্ছে আত্মার দেখা। মহাপুরুষেরা এই দৃষ্টি নিয়ে আসেন। তাঁরা বিপদকে ভয় করেন না, নিন্দা-ক্ষতিকে গ্রাহ্য করেন না। অবমাননার ভিতর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেন। যাঁরা মহৎ ভগবান তাঁদের বাহিরের

দিক থেকে দয়া করেন না। নিষ্ঠুর ভগবান মহাপুরুষকে সম্মানের পথে পুষ্পবৃষ্টির ভিতর দিয়ে আহ্বান করেন না, দুঃখের কঠোর পথই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেইজন্য দুঃখের মধ্যেই মহাপুরুষের জীবনের সার্থকতা তাঁর সত্যের প্রমাণ। এই নির্দয়তার মধ্যে আমরা দেখি ভগবানের দয়া—তখন ভয় যায়, তখন আমরা ভরসা পাই, তখন আমরা প্রণাম করি।

এই প্রণামের পরিপূর্ণ প্রার্থনা হচ্ছে 'অসতো মা সদ্‌গময়'—অসত্য আছে জানি, তার মধ্যেই সত্য দেখা দাও। কে এই সত্যকে আমাদের কাছে উজ্জ্বল করে দেখায়? যখন বহুল উপকরণের প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে মানুষ বলতে পারে 'যা অমৃত নয় তা নিয়ে আমি কী করব', বীর যখন আঘাতের পর আঘাতেও অবসন্ন হন না, তখন অসত্যের মাঝখানে সত্যের যে আবির্ভাব, তাকে আমরা দেখতে পাই। মানব-ইতিহাসের সংকটময় নিত্যবাধাগ্রস্ত অভিযানের মধ্যে আমরা সত্যের প্রকাশকে দেখি। আবার নিজের মধ্যেও দেখি—বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম ক'রে অসত্যকে পরাভব ক'রে সত্য প্রকাশ পায়। তখন এই বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়েই আমাদের প্রণাম পৌঁছয়। তখন বলি 'আবিরাবীর্ম এধি'—আমার প্রকাশের অস্বচ্ছতার মধ্যেই তোমার প্রকাশ উজ্জ্বল হোক। তখন আমরা বলি 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আলোক প্রকাশ পাক। 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়'—মৃত্যুর মধ্যে অমৃত জাগ্রত হউক।

(ভারত পথিক রামোহন রায়, ৬ ভাদ্র ১৩৩৫)

সবচেয়ে যিনি বড়ো তাঁরই কাছে আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই—অসতো মা সদ্‌গময়। কেমন করে এ প্রার্থনা সার্থক হবে। না, আমার মধ্যে তাঁর আবির্ভাব যদি পূর্ণ হয়। তাঁকে যদি আমার মধ্যে সত্য করে দেখি তবেই আমি'র উপদ্রব শান্ত হতে পারে।

(পথে ও পথের প্রান্তে ৬ কার্ত্তিক ১৩৩৬)

প্রত্যেক জন্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে মুক্তির মন্ত্র, অন্ধকার থেকে জ্যোতির মধ্যে মুক্তি।

(পথে ও পথের প্রান্তে, ৬ই কার্ত্তিক ১৩৩৬)

আমরা দ্বিজ, একটা জন্ম পশুলোকে, আর একটা জন্ম মানবলোকে, এই দ্বিতীয় জন্মের জন্যেই প্রার্থনা করি অসতো মা সদ্‌গময়।

(চিঠিপত্র, নবম খন্ড, ২০ জুলাই ১৯৩১)

হারাসান সব-শেষে নিয়ে গেলেন একটি লম্বা সংকীর্ণ ঘরে ; সেখানে একদিকের প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটি খাড়া পর্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে ; প্লাম গাছের ডালে একটাও পাতা নেই, সাদা সাদা ফুল ধরেছে, ফুলের পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়ছে; বৃহৎ পর্দার একপ্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য দেখা দিয়েছে, পর্দার অপরপ্রান্তে প্লাম গাছের রিক্তডালের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটি অন্ধ হাতজোড় করে সূর্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য, আর সোনায়-ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ—এমন ছবি আমি কখনো দেখিনি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধরে আমার কাছে দেখা দিলে ঃ তমসো মা জোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির

এই প্রার্থনা 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' সেই শ্লাম গাছের একাগ্রপ্রসারিত শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠছে। অথচ, আলোয় আলোময়—তারই মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।

(জাপানযাত্রী)

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ ১।৪।১
স বৈ নৈবে রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।
.........স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী
চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব ১।৪।৩

অসীম যখন আপনি একা—তখন তিনি অপূর্ণ। সীমার মধ্যেই পূর্ণের গৌরব—তাই তাঁর সৃষ্টির প্রয়োজন। আনন্দের পূর্ণতা রূপে রূপে প্রতিফলিত হতে চায়, কিন্তু সেই ইচ্ছা সফল হয় সৃষ্টি-তপস্যার বেদনায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, অসীম কেন সীমা মেনে আপনাকে প্রকাশ করেন ? —আনন্দ কেনই-বা এমন দুঃখের তাপে ভরা ? এ বিস্ময়ের কোন উত্তর নেই। তবে মন যখন জাগে তখন খুশি হই—এই আগুন-ভরা আনন্দেই।

অসীমের এই রহস্যে যদি জীবন-মরণ তুফান তোলার খেলাই দেখি, তবে ভয়ে মরি। যখন নিখিলের অস্তিত্বে অপূর্ণতার আড়ালে পূর্ণতার পরিচয় পাই, তখন ধন্য হই। নইলে দুঃখীর প্রতি আমাদের প্রাণে করুণার ভাব জাগত কি ? অসম্পূর্ণতার প্রতি প্রেমের সঞ্চার হত কি ?

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ২৯ জুলাই ১৯১৫)

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।

দুইয়ের মধ্যে একের যে প্রকাশ তাই হল যথার্থ সৃষ্টির প্রকাশ। নানা বিরোধে যেখানে এক বিরাজমান সেখানেই মিলন, সেখানেই এককে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রে তাই, এক ছাড়া দুইকে মানতে চায় নি। কারণ, দুইয়ের মধ্যে একের যে ভেদ তার অবকাশকে পূর্ণ করে দেখলেই এককে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। এইটিই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা। উপরের সঙ্গে নীচের যে মিলন, বিশ্বকর্মার কর্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র আমাদের কর্মের যে মিলন, বিশ্বে নিরন্তর তারই লীলা চলছে। তার দ্বারা সব পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

(খৃষ্টোৎসব, খৃষ্ট, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৩ চৈত্র ১৩৩০)

......এখন প্রশ্ন এই—সেই অদ্বিতীয় একই বা কেন বহুধা-বিচিত্র হতে গেলেন ?

ঋষিরা বলেচেন, 'আদিতে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন। তাঁর সেই একা-একা ভাবটি আর ভালো লাগলো না। তিনি সঙ্গী খুঁজলেন। সেই অদ্বিতীয় পুরুষ

সঙ্গী পাবেন কোথায়? তাই তিনি আপনাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রকৃতি-পুরুষ এই দুই রূপেই হোলো আদি-বৈচিত্র্য। এরা দুয়েই পরস্পরে পরস্পরকে চায়। এদের কেউই একা পূর্ণ নয়, দুই দুইয়ের অপেক্ষা রাখে।

পরমাত্মা যখন একা ছিলেন তখন কোনো বালাই ছিল না। যেই প্রকৃতি-পুরুষ অর্থাৎ নর-নারী ভাগ হোলো তখন হতেই যত দুঃখ বেদনা। পুরুষ হলেন শুদ্ধমুক্ত স্বভাববান্। অথচ প্রকৃতি তাঁকে না বেঁধে ছাড়বেন না। প্রকৃতি মাতৃরূপে পুরুষকে বাঁধতে এলেন, প্রণয়িনী-রূপে পুরুষকে বাঁধতে এলেন, কন্যারূপে পুরুষকে বাঁধতে এলেন। পুরুষ যদি তাতে ধরা পড়লেন তবে ঘুচলো তাঁর মুক্তি। আর পুরুষ যদি ধরা না পড়লেন তো প্রকৃতির বেদনার আর অন্ত নেই। পুরুষকে বাঁধতে গিয়েই প্রকৃতির যত সৌন্দর্যলীলা, যত রূপ-গীত-গন্ধ-রস-স্পর্শবৈচিত্র্য। এই সবই প্রকৃতির অনুনয়। এই অনুনয়ে বাঁধা পড়লে মুক্ত পুরুষ হন বদ্ধ। তখন পুরুষের ব্যাকুল বেদনা জাগে মুক্তির জন্য। নয়তো প্রকৃতির বেদনা চলতে থাকে পুরুষকে বাঁধবার জন্য। এই দুঃখেই জগৎসংসার পরিপূর্ণ। এই বেদনাতেই শূন্য অনন্ত আকাশ ভ'রে রয়েচে। তাই তার নাম রোদসী বা ক্রন্দসী।

(ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা। স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ ১।৪।৮

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতেই প্রিয়। তিনিই ওঁ।

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮ মাঘ ১৩০৭)

সেই অমৃত পুরুষ ছাড়িয়া আমাদের আত্মার অন্য গতি নাই, ঋষিরা ইহা প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—স যঃ অন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ—অর্থাৎ, যিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্যকে আপনার প্রিয় করিয়া বলেন—প্রিয়ং রোৎস্যতীতি—তাঁহার প্রিয় বিনাশ পাইবে! আমাদের জ্ঞানের পক্ষে যে সত্য সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ আমাদের আত্মার পক্ষে তাহাই সকল প্রিয়ের প্রিয়তম—তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা। এই-যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতর পরমাত্মা ইনি আমাদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। তিনি শুষ্ক জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের আত্মার প্রিয়তম।

আধুনিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোন ধর্ম সংস্থাপন হইতে পারে না, তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদের অবলম্বনীয়, তাঁহারা উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ করিবেন। ইহা কেবল বাক্যমাত্র নহে প্রীতিরসকে অতি নিবিড়

নিগঢ়েরূপে আস্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদার উন্মুক্তভাবে এমন সরল সবল কণ্ঠে প্রিয়ের প্রিয়ত্ব ঘোষণা করা যায় না।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—

ব্রহ্মর্ষি এ কথা কোনো ব্যক্তি বিশেষে বদ্ধ করিয়া বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন না যে, তিনি আমার নিকট আমার পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। তিনি বলিতেছেন আত্মার নিকটে তিনি সর্বাপেক্ষা অন্তরতর— জীবাত্মা-মাত্রেরই নিকট তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়—জীবাত্মা যখনই তাঁহাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে তখনি বুঝিতে পারে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।

অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জানিব তদেতৎ সত্যং তাহা নহে, তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিব তদমৃতং। তাঁহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া জানিব, এবং সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব। জ্ঞান ও প্রেম-সমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা—তদ্ভাবগতেন চেতসা এই সাধনা করিতে হইবে। ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।

উপনিষদের ঋষি যে জীবাত্মামাত্রেরই নিকট পরমাত্মাকে সর্বাপেক্ষা প্রীতিজনক বলিতেছেন তাহার অর্থ কি? যদি তাহাই হইবে তবে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যমান হই কেন? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি যখন বলেন কাব্যরসাবতারণায় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ কবি, তখন এ কথা বুঝিলে চলিবে না যে, কেবল তাঁহারই নিকট বাল্মীকির কাব্যরস সর্বাপেক্ষা উপাদেয়। তিনি বলেন সকল পাঠকের পক্ষেই এই কাব্যরস সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই মনুষ্য-প্রকৃতি। কিন্তু কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য জানপদ বাল্মীকির কাব্য অপেক্ষা যদি স্থানীয় কোন পাঁচালি গানে অধিক সুখ অনুভব করে তবে তাহার কারণ তাহার অজ্ঞতামাত্র। সে লোক অশিক্ষাবশতঃ বাল্মীকির কাব্য যে কি তাহা জানে না, এবং সেই কাব্যের রস যেখানে, অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেখানে সে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাহার অশিক্ষা-বাধা দূর করিয়া দিবামাত্র যখনি সে বাল্মীকির কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবে তখনি সে স্বভাবতই মানবপ্রকৃতির নিজগুণেই গ্রাম্য পাঁচালী অপেক্ষা বাল্মীকির কাব্যকে রমণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। তেমনি যে ঋষি ব্রহ্মের অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অন্য সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি ইহা সহজেই বুঝিয়াছেন যে ব্রহ্ম স্বভাবতই আত্মার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রীতিদায়ক— ব্রহ্মের প্রকৃত পরিচয় পাইবামাত্র আত্মা স্বভাবতই তাঁহাকে পুত্র, বিত্ত, ও অন্য সকল হইতে প্রিয়তম বলিয়া বরণ করে।

(ব্রহ্মমন্ত্র, অচলিতসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ মাঘ ১৩০৭)

বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্লিষ্ট-বিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সেই যে এক, তিনি সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় অন্য সকল হইতেই প্রিয়।

(প্রাচীন ভারতের "একঃ", ধর্ম, ১৩০৮)

'এই যে নিখিলের অন্তরতর আত্মা ইনি পুত্র হইতেও প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেই প্রিয়।'

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১১ মাঘ ১৩১১)

সংসারের সমস্ত স্নেহপ্রেমের সামগ্রীর মধ্যে মানুষের যে প্রেম সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় নাই, সংসারের সমস্ত প্রিয় পদার্থের অন্তরে তাহার অন্তরতর যে প্রিয়তম, যিনি সমস্ত আত্মীয়পরের অন্তরতর, যিনি সমস্ত দূর-নিকটের অন্তরতর, তাঁহার প্রতি যে প্রেম এমন প্রবল আবেগে এমন অসংশয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে—আমরা জানি, মানুষের যে পরমতম প্রেম আপনার সমস্ত প্রিয় সামগ্রীকে একমুহূর্তে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়, মানুষের সেই পরমাশ্চর্য প্রেমশক্তির গৌরব অদ্য আমরা উপলব্ধি করিয়া উৎসব করিতে সমাগত হইয়াছি।

(উৎসবের দিন, ধর্ম, ১৩১১)

আমাদের যে একটি আত্মপ্রেম আছে, আত্মাতে আত্মার আনন্দ, এই আনন্দই হচ্ছে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, বিশ্বাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি। অর্থাৎ এই আত্মপ্রেমেরই পরিপূর্ণতম সত্যতম বিকাশ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতি প্রেম—সেই ভূমানন্দেই আত্মার আনন্দের পরিণতি। আমাদের আত্মপ্রেমের চরম সেই পরমাত্মায় আনন্দ। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

(আত্মপ্রত্যয়, শান্তিনিকেতন, ২১ চৈত্র ১৩১৫)

'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ'—এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতেও প্রিয়, অন্য সব-কিছু হতেও প্রিয়—

(ছোটো ও বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

সমস্ত মানুষের মধ্যে সেই এক আত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব করবার উদারশক্তি যাঁরা পেয়েছেন তাঁদেরই তো বলি মহাত্মা, তাঁরাই তো সর্বমানবের জন্য প্রাণ দিতে পারেন। তাঁরাই তো এই এক গূঢ় আত্মার প্রতি লক্ষ্য করে বলতে পারেন : তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। তিনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য-সকল হতে প্রিয়, এই আত্মা যিনি অন্তরতর।

বৈজ্ঞানিক এই কথা শুনে ধিক্‌কার দেন, বলেন, দেবতাকে প্রিয় বললে দেবতার প্রতি মানবিকতা আরোপ করা হয়। আমি বলি, মানবত্ব আরোপ করা নয়, মানবত্ব উপলব্ধি করা। মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন ক'রে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেচে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না। করা তার পক্ষে সত্যই নয়। ঈথরের কম্পনে মানুষ আলোকত্ব আরোপ করে না, তাকে স্বতই আলোকরূপে অনুভব করে, আলোকরূপেই ব্যবহার করে, ক'রে ফল পায়—এও তেমনি।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্। ১।৪।১০

যে-মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে. সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এমন কথা ভাবে. সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।

অর্থাৎ. সেই দেবতার কল্পনা মানুষকে আপনার বাইরে বন্দী করে রাখে ; তখন মানুষ আপন দেবতার দ্বারাই আপন আত্মা হতে নির্বাসিত, অপমানিত।

এই যেমন শোনা গেল উপনিষদে, আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই. তাকে বলে মনের মানুষ। বলে. 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।'

মানুষের ইতিহাসে এমন অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যারা কাঠ পাথর-পূজাকে বলেছে হীনতা এবং তাই নিয়ে তারা মার-কাট করতে ছোটে। স্বীকার করি—কাঠ-পাথর বাইরের জিনিস. সেখানে সর্বকালের সর্বমানুষের পূজা মিলতে পারে না। মানুষের ভক্তিকে জাতিতে জাতিতে প্রথায় প্রথায় সেই পূজা বিচ্ছিন্ন করে. তার ঐতিহাসিক গণ্ডিগুলি সংকীর্ণ।

কিন্তু. তাদের বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়েরও দেবতা প্রতিমার মতোই বাইরে অবস্থিত, নানাপ্রকার অমানুষিক বিশেষণে লক্ষণে সজ্জিত—শুধু তাই নয়, বিশেষ জাতির ঐতিহাসিক কার্যকলাপে জড়িত ও কাল্পনিক কাহিনী-দ্বারা দৈশিক ও কালিক বিশেষত্ব-গ্রস্ত। এই পৌত্তলিকতা সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত ব'লেই নিজেকে অপৌত্তলিক ব'লে গর্ব করে। বৃহদারণ্যক এই বাহ্যিকতাকেও হীন ব'লে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন. যে-দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে বাইরে স্থাপন করি তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।

এমনতরো কথায় একটা ক্রুদ্ধ কলরব উঠতে পারে। তবে কি মানুষ নিজেকে নিজেই পূজা করবে। নিজেকে ভক্তি করা কি সম্ভব। তাহলে পূজা-ব্যাপারকে তো বলতে হবে অহংকারের বিপুলীকরণ।

একেবারে উল্টো। অহংকে নিয়েই অহংকার। সে তো পশুও করে। অহং থেকে বিযুক্ত আত্মায় ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য। কেননা মানুষের পক্ষে তাই সত্য। ভূমা আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয়। ভূমা বিশুদ্ধ জ্ঞানে. বিশুদ্ধ প্রেমে. বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ কিন্তু আপনার চিন্তায়. আপনার কর্মে, পরম-মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা।......................অহংকারকে দূর করতে হয়. তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাতে পৌঁছতে পারি।

(মানুষের ধর্ম. ১৩৪০)

সতো হ্যেষ রসঃ। ২।৩।৪

এই যে সত্তা, সৌন্দর্যই কি তার মূল, না সৌন্দর্যেরই মূল হল সত্তা? অর্থাৎ জগতে যা কিছু আছে তা কি সুন্দর বলেই থাকবার অধিকার পেয়েছে? না, যা আছে,

তা আছে বলেই সুন্দর? এমন করে ভাগাভাগি করে দেখলে চলবে না। বৃহদারণ্যক বলেন, সৎ অর্থাৎ যা আছে, তা আছে বলেই এই রস বা আনন্দ। আমাদের ভক্ত সাধকেরা বলেন তিনি আছেন বলে সৎ। আবার সৎ বলেই তিনি আমাদের চিৎ বা চৈতন্যকে জাগান, আর সৎ এবং চিৎ বলেই তিনি আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দই তাঁর পূর্ণ পরিচয়। যেখানে একান্তভাবে সত্তার উপলব্ধি, সেখানেই আনন্দ। এই আনন্দেই সত্যের চিন্ময় ঐক্যকে উপলব্ধি করি।

(ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি॥ ২।৪।২

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই; বিদ্যারই কী আর বিষয়েরই কী, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে; চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে তখনই সে অমৃত লাভ করে।

(জাতীয় বিদ্যালয়, শিক্ষা, ভাদ্র ১৩১৩)

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং ২।৪।৩

য়ুরোপের মধ্যযুগে যেমন আল্কেমি-তত্ত্বান্বেষীরা গোপন গৃহে নিহিত থেকে বিবিধ অদ্ভুত যন্ত্রতন্ত্র-যোগে চিরজীবনরস (Elixir of Life) আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের জ্ঞানীরাও সেইরূপ গোপন সতর্কতা-সহকারে আধ্যাত্মিক চিরজীবন-লাভের উপায় অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এবং অত্যন্ত দুঃসাধ্য উপায়ে অন্তরের মধ্যে সেই অমৃত রসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

(নূতন ও পুরাতন, স্বদেশ ১২৯৮)

আমরা ব্রহ্মকে কখন চাই? যখন আমাদের আত্মা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর ন্যায় সমস্ত সংসারকে একপার্শ্বে সরাইয়া দিয়া বলিয়া উঠে,

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্,

যাহার দ্বারা আমি অমর না হইব তাহা লইয়া আমি কি করিব? আমরা সংসারের যত সুখ যত ঐশ্বর্য্য তাহার নিকট আহরণ করি সে বলিতে থাকে, এ তো আমার মৃত্যুর উপকরণ! সে আপন ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠে,

মৃত্যোর্মামৃতং গময়, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।

(পরিশিষ্ট, নিরাকার উপাসনা, আধুনিক সাহিত্য, মাঘ ১৩০৫)

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে, তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্? যাহার দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়—কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই একককে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন; তাঁহার কোন ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রয়িয়াছেন, লাভক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন;

(প্রাচীন ভারতের "একঃ", ধর্ম, ১৩০৮)

রেশম-পশম আসন-বসন কাষ্ঠ-লোষ্ট্র স্বর্ণ-রৌপ্য লইয়া কে বিরোধ করিবে? তাহারা আমার কে? তাহারা আমাকে কী দিতে পারে? তাহারা আমার পরমসম্পৎকে অন্তরাল করিতেছে, তাহাতে দিবারাত্রির মধ্যে লেশমাত্র ক্ষোভ অনুভব করিতেছি না, কেবল তাহাদের পুঞ্জীকৃত সঞ্চয়ে গর্ববোধ করিতেছি। হস্তি-অশ্ব-কাচ-প্রস্তরেরই গৌরব, আত্মার গৌরব নাই, শূন্য হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের স্থান নাই। সর্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থহীনতা, তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত শ্রীহীন মলিন, কেবল বসনে-ভূষণে উপকরণে-আয়োজনে আমি স্ফীত। জগদীশ্বরের কাজ করিতে পারি না; কেননা শয্যা-আসন-বেশভূষার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছি, জড়-উপকরণ জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া বসিয়াছি, সেই সকল ধূলিময় পদার্থের ধূলা ঝাড়িতেই আমার দিন যায়। ঈশ্বরের কাজে আমার কিছু দিবার সামর্থ্য নাই, কারণ খট্টাপর্যঙ্ক-অশ্বরথে আমার সমস্ত দান নিঃশেষিত। সমস্ত মঙ্গলকর্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচজনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান। শতছিদ্র কলসের মধ্যে জলসঞ্চয় করিবার জন্য জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্যন্ত ব্যাপৃত রহিয়াছি, অবারিত অমৃতপারাবার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে-বাহিরে জ্ঞানে-ধর্মে কোথাও তাঁহাকে দেখি না—এত বড়ো অন্ধতা লইয়া আমি পরিতৃপ্ত। যিনি আনন্দরূপমমৃতম্, যে আনন্দের কণামাত্র আনন্দে সমস্ত জীবজন্তুর প্রাণের চেষ্টা মনের চেষ্টা প্রীতির চেষ্টা পুণ্যের চেষ্টা উৎসাহিত রহিয়াছে, তাঁহাতে আমার আনন্দ নাই, আমার আনন্দ আমার গর্ব কেবল উপকরণসামগ্রীতে—এমন বৃহৎ জড়ত্বে আমি পরিবৃত; যাঁহার অদৃশ্য অঙ্গুলি নির্দেশে জীবপ্রকৃতি অজ্ঞাত অকীর্তিত সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া স্বার্থ হইতে পরমার্থে, স্বেচ্ছাচার হইতে সংযমে, এককতা হইতে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইয়াছে, যিনি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্ যিনি দগ্ধেন্ধন ইবানলঃ, সর্বকালে সর্বলোকে যিনি আমার ঈশ্বর, তাঁহার আদেশবাক্য আমার কর্ণগোচর হয় না, তাঁহার কর্মে আমার কোন আস্থা নাই, কেবল জীবনের কয়েকদিন মাত্র যে-কয়েকটি লোককে পাঁচজন

বলিয়া জানি, তাহাদেরই ভয়ে এবং তাহাদেরই চাটুবাক্যে চালিত হওয়াই আমার দুর্লভ মানবজন্মের একমাত্র লক্ষ্য—এমন মহামূঢ়তার দ্বারা আমি সমাচ্ছন্ন। আমি জানি না, আমি দেখিতে পাই না—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্। আমার কাছে সমস্ত জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সমস্ত বিজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড, সমস্ত জীবনের লক্ষ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র অংশে বিভক্ত বিদীর্ণ।

(প্রাচীন ভারতের "একঃ", ধর্ম, ১৩০৮)

আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণ সামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই—কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে থাকে.........................আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্ব্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনোই অমর হইবে না, তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা ধনমত্ততা সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে। হে অদ্বিতীয় এক, তপস্বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বল্কলবসন পরিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই মধুর কণ্ঠে বলিতে পারে—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্? যাহা দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব?

(প্রাচীন ভারতের "একঃ", ধর্ম, ১৩০৮)

ভারতের ব্রহ্মবাদিনী বলিয়াছেন : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। যাহার দ্বারা অমর না হইব তাহা লইয়া আমি কী করিব? কেবলমাত্র পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সুব্যবস্থার দ্বারা আমি অমর হইব না, তাহাতে আমার আত্মার বিকাশ হইবে না। সমাজ যদি আমকে সম্পূর্ণ সার্থকতা না দেয়, তবে সমাজ আমার কে? সমাজকে রাখিবার জন্য যে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে, একথা স্বীকার করা যায় না—য়ুরোপেও বলে, 'individual'কে যে সমাজ পঙ্গু ও প্রতিহত করে সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিলে হীনতা স্বীকার করা হয়। ভারতবর্ষও অত্যন্ত অসংকোচে নির্ভয়ে বলিয়াছে, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ। সমাজকে মুখ্য করিলে উপায়কে উদ্দেশ্য করা হয়। ভারতবর্ষ তাহা করিতে চাহে নাই, সেইজন্য তাহার বন্ধন যেমন দৃঢ় তাহার ত্যাগও সেইরূপ সম্পূর্ণ। সাংসারিক পরিপূর্ণতার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনাকে বেষ্টিত বদ্ধ করিত না, তাহার বিপরীতই করিত। যখন সমস্ত সঞ্চিত হইয়াছে, ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিয়াছে, যখন সেই পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত সংসারের মধ্যে আরাম করিবার—ভোগ করিবার—অবসর উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই সময়েই সংসার পরিত্যাগের ব্যবস্থা; যতদিন খাটুনী ততদিন তুমি আছ, যখন খাটুনি বন্ধ তখন আরামে ফলভোগের দ্বারা জড়ত্বলাভ করিতে বসা নিষিদ্ধ। সংসারের কাজ হইলেই সংসার হইতে মুক্তি হইল, তাহার পরে আত্মার অবাধ অনন্ত গতি। তাহা নিশ্চেষ্টতা নহে। সংসারের হিসাবে তাহা জড়ত্বের ন্যায় দৃশ্যমান, কিন্তু চাকা অত্যন্ত ঘুরিলে যেমন তাহাকে দেখা যায় না তেমনি আত্মার অত্যন্ত

বেগকে নিশ্চলতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আত্মার সেই বেগকে চতুর্দিকে নানারূপে অপব্যয় না করিয়া সেই শক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই আমাদের সমাজের কাজ ছিল। আমাদের সমাজে প্রবৃত্তিকে খর্ব করিয়া প্রত্যহই নিঃস্বার্থ মঙ্গলসাধনের যে ব্যবস্থা আছে তাহা ব্রহ্মলাভের সোপান বলিয়াই আমরা তাহা লইয়া গৌরব করি। বাসনাকে ছোটো করিলে আত্মাকেই বড়ো করা হয়, এইজন্যই আমরা বাসনা খর্ব করি— সন্তোষ অনুভব করিবার জন্য নহে। য়ুরোপ মরিতে রাজি আছে, তবু বাসনাকে ছোটো করিতে চায় না। আমরাও মরিতে রাজি আছি, তবু আত্মাকে তাহার চরমগতি পরম-সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া ছোটো করিতে চাই না। দুর্গতির দিনে ইহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি—সেই সমাজ আমাদের এখনো আছে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাভিমুখী মোক্ষাভিমুখী বেগবতী স্রোতোধারা 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'—এই গান করিয়া ধাবিত হইতেছে না—

মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে
রয়েছে ডোর।

সেইজন্য আমাদের এতদিনকার সমাজ আমাদিগকে বল দিতেছে না, গৌরব দিতেছে না, আধ্যাত্মিকতার দিকে আমাদিগকে অগ্রসর করিতেছে না; আমাদিগকে চতুর্দিকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। এই সমাজের মহৎ উদ্দেশ্য যখন আমরা সচেতনভাবে বুঝিব, ইহাকে সম্পূর্ণ সফল করিবার জন্য যখন সচেষ্টভাবে উদ্যত হইব, তখনই মুহূর্তের মধ্যে বৃহৎ হইব, মুক্ত হইব, অমর হইব—জগতের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা হইবে, প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইবে এবং পিতামহগণ আমাদের মধ্যে কৃতার্থ হইয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন।

(চীনেম্যানের চিঠি, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩০৯)

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য একটি প্রধান অন্তরায়। সামান্য সোনার প্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অমৃত-আলোককে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধনসম্পদের মধ্যেই দীনহৃদয় আপনার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে থাকে—সে বলে, এই তো আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দশে আমার স্তব করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ হইতেছে, বাহিরে আমার আড়ম্বর অভ্রভেদ করিতেছে, ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতিদিন স্তরে স্তরে রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে, আমার আর কী চাই। হায় রে দরিদ্র, নিখিল মানবের অন্তরাত্মা যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে—যাহাতে আমি অমর না হইব তাহা লইয়া আমি কী করিব— 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'—সপ্তলোক যখন অন্তরীক্ষে ঊর্ধ্ব-কররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও; 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'— তখন তুমি বলিতেছ আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কী চাই! ঐশ্বর্যের ইহাই বিড়ম্বনা—দীনাত্মার কাছে ঐশ্বর্যই চরমসার্থকতার রূপ ধারণ করে।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্রপূজা, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১)

যেনাহং নামৃতং স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

ক্ষুধিত শিশুকে প্রত্যক্ষ মাতার স্তন ছাড়া দীর্ঘকাল আর কী দিয়া ভুলাইয়া

রাখিবে! মানুষ যখন অচেতনভাবে থাকে, মানুষ যখন যথার্থভাবে ঈশ্বরকে চাহে না, তখন আচার বিচার প্রথার সংস্কারপাশ তাহাকে চারি দিকে জড়িত করিয়া ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতে থাকে—নিশ্চেষ্ট মানুষ তাহারই মধ্যে অনায়াসে আবৃত জড়িত হইয়া পড়িয়া থাকে। প্রত্যক্ষ সত্য, প্রত্যক্ষ আলোক, প্রত্যক্ষ অমৃতের জন্য যে মহাত্মার আকাঙ্ক্ষা সচেতনরূপে জাগ্রত হইয়া উঠে, তিনি এই-সমস্ত বহুকাল-সঞ্চিত সংস্কারের স্তূপীকৃত আবরণ ছিন্ন করিয়া সর্বত্র ঈশ্বরের অব্যবহিত স্পর্শ সন্ধান করিবার জন্য ব্যাকুল বাহু প্রসারিত করেন। মানুষকে তাহার স্ব-রচিত জাল হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য মাঝে মাঝে এইরূপ নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১১ মাঘ ১৩১১)

–

উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্যপল্লবিত তা নয় এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে—তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ওই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নী দুটিকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলো তো এসব নিয়ে কি আমি অমর হব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না, তা হবে না, তবে কিনা উপকরণ-বন্তের যেমনতরো জীবন তোমার জীবন সেই রকম হবে। সংসারীরা যেমন করে তাদের ঘরদুয়ার গোরুবাছুর অশনবসন নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তোমরাও তেমনি করে দিন কাটাতে পারবে।

মৈত্রেয়ী তখন একমুহূর্তে বলে উঠলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।" যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব। এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়—তিনি তো চিন্তার দ্বারা ধ্যানের দ্বারা কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেক লাভ করে এ-কথা বলেন নি—তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে একবার ঘষে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন "আমি যা চাই এ তো তা নয়।"

উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায় নি—সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্তস্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানাদিকে নানাভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম এমন সময় হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি এই নাও। খ্যাতি এনে বলি এই তুমি জমিয়ে রাখো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কতদিক থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই—স্ত্রীটিকে বলছে এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে, এ সবে আমার কোনো ফল হবে না, সে মনে

করছে হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও সব পেলুম বলে তার মন মানছে না। সে ভাবছে হয়তো পাওয়ার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে—টাকা আরও চাই, খ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হলে চলছে না। কিন্তু সেই আরও-র শেষ হয় না। বস্তুত সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নয় এটা একদিন তাকে বুঝতেই হবে—একদিন এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে একপাশে আবর্জনার মতো ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে—

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্!

কিন্তু মৈত্রেয়ী ওই যে বলেছিলেন, আমি যাতে অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব, তার মানেটা কী। অমর হওয়ার মানে কি এই পার্থিব শরীরটাকে অনন্তকাল বহন করে চলা। অথবা মৃত্যুর পরেও কোনোরূপে জন্মান্তরে বা অবস্থান্তরে টিঁকে থাকা? মৈত্রেয়ী যে শরীরের অমরতা চান নি এবং আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না এ কথা নিশ্চিত। তবে তিনি কী ভাবে অমৃতা হতে চেয়েছিলেন।

তিনি এই কথা বলেছিলেন, সংসারে আমরা তো কেবলই একটার ভিতর দিয়ে আর একটাতে চলেছি—কিছুতেই তো স্থির হয়ে থাকতে পারছি নে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায় আমার মনও সরে যায়। যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে তাকে যখন ছাড়ি তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি করে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি—এই যে মৃত্যুর পর্যায় এর আর অন্ত নেই।

অথচ আমার মন এমন কিছুকে চায় যার থেকে তাকে আর নড়তে হবে না—যেটা পেলে সে বলতে পারে এ-ছাড়া আমি আর বেশি চাই নে—যাকে পেলে আর ছাড়া-ছাড়ির কোনো কথাই উঠবে না। তাহলেই তো মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ানো যায়। এমন কোন্ মানুষ এমন কোন্ উপকরণ আছে যাকে নিয়ে বলতে পারি এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল—আর কিছুই দরকার নেই!

সেইজন্যেই তো স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ঠেলে ফেলে দিয়ে মৈত্রেয়ী বলে উঠেছিলেন, এ সব নিয়ে আমি কী করব। আমি যে অমৃতকে চাই।

আচ্ছা, বেশ, উপকরণ তো অমৃত নয়, তাহলে অমৃত কী! আমরা জানি অমৃত কী। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাই নি তা নয়। যদি না পেতুম তাহলে তার জন্যে আমাদের কান্না উঠত না। আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার কারণ ক্ষণে-ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ করে যায়।

মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরমপদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি "যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।"

এই যে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কী স্পষ্ট, কী সত্য, কী মধুর হয়েই উঠেছে। সমস্ত চিন্তা সমস্ত যুক্তি পরিহার করে কী অনায়াসেই এটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ওগো, আমি ঘরদুয়ার কিছুই চাই নে আমি প্রেম চাই—এ কী কান্না।

মৈত্রেয়ীর সেই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনো শোনা গিয়েছে? সমস্ত মানবহৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুলকণ্ঠে চিরন্তন কালের জন্যে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

(প্রার্থনা, শান্তিনিকেতন, ২ পৌষ ১৩১৫)

হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এস সংসারের উপকরণপীড়িতের হৃদয়ের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ দুটি আজ স্থাপন করো—তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর কণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও—নিত্যকাল যে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।

(প্রার্থনা, শান্তিনিকেতন, ২ পৌষ ১৩১৫)

মানুষের একটা এমন পাওয়া আছে যার সম্বন্ধে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এই পাওয়ার দিকেই খুব করে মন দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই ভারতবর্ষের হৃদয় মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে বলেছেন—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্? সেইজন্যে মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ষ আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করেছিলেন।

(পাওয়া, শান্তিনিকেতন, ২৫ পৌষ ১৩১৫)

ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে হবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। প্রবলরা দুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বলতে হবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন, ১৩১৫)

এমন একটা অদ্ভুত ধারণা লইয়া আসাও আশ্চর্য নহে যে, ইংলণ্ডের প্রতাপ পার্লামেণ্টের দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে—য়ুরোপের ঐশ্বর্য কারখানাঘরে প্রস্তুত হইতেছে এবং পাশ্চাত্য মহাদেশের সমস্ত মাহাত্ম্য যুদ্ধের অস্ত্র, বাণিজ্যের জাহাজ এবং বাহ্যবস্তুপুঞ্জের দ্বারা সংঘটিত। নিজের মধ্যে শক্তির সত্য অনুভূতি যাহার নাই অতি সহজেই সে মনে করিয়া বসে, শক্তি বাহিরেই আছে এবং যদি কোনো সুযোগে আমরাও কেবলমাত্র ঐ জিনিষগুলা দখল করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের অভাবপূরণ হয়। কিন্তু, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—এ কথাটি য়ুরোপেরও অন্তরের কথা। য়ুরোপও নিশ্চয়ই জানে, রেলে টেলিগ্রাফে কলেকারখানায় সে বড়ো নহে। এইজন্যই য়ুরোপ বীরের ন্যায় সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে; বীরের ন্যায় সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে, এবং যতই ভুল করিতেছে, যতই ব্যর্থ হইতেছে, ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে—কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না। মাঝে মাঝে অমঙ্গল দেখা দিতেছে, সংঘাতে সংঘর্ষে বহি

জ্বলিয়া উঠিতেছে, সমুদ্রমন্থনে মাঝে মাঝে বিষও উদ্গীর্ণ হইতেছে, কিন্তু মন্দকে তাহারা কোনোমতেই মানিয়া লইতেছে না। অস্ত্র তাহাদের প্রস্তুত, সৈন্যদল তাহাদের নির্ভীক, এবং সত্যের দীক্ষায় তাহারা মৃত্যুজয়ী বললাভ করিয়াছে।

(পথের সঞ্চয়, আষাঢ় ১৩১৯)

ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে না, যে মৈত্রেয়ীর মতো বলতে পেরেছে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্, সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্বত্র উদ্ঘাটিত করতে পারে।

(বিশ্বভারতী, রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ ভাদ্র ১৩২৯)

মৃত্যু যখন জীবনের সামনে আসে তখন এই কথাটাই প্রশ্ন করে, 'আমি যা নিলুম তার ভিতরকার কিছু কি বাকি আছে। কিছুই যদি বাকি না থাকে তাহলে সম্পূর্ণ ঠকেছ।' প্রাণ প্রাণকেই চায়, সে কোনোমতেই মৃত্যুর দ্বারা ঠকতে চায় না—যেই ঠিকমত বুঝতে পারে ঠকেছি, অমনি সে ব্যাকুল হয়ে ব'লে ওঠে : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। মানুষ কতবার এই কথা বলে আর কতবার এই কথা ভোলে।

(পথে ও পথের প্রান্তে, ৭ ডিসেম্বর ১৯২৬)

হাতির মতো বড়ো হওয়াকে মানুষ বড়োলোক হওয়া বলে না, হয়তো বর্বর মানুষ তাও বলে। বাহিরের উপকরণ পুঞ্জিত করার গর্ব করা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। অন্যের চেয়ে আমার বস্তুসঞ্চয় বেশি, এ কথা মানুষের পক্ষে বলবার কথা নয়। তাই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। তিনি উপেক্ষা করে-ছিলেন উপকরণবতাং জীবিতম্ *।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী কথাটিও চমৎকার। যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্—এর ছন্দ কবিতার চেয়েও চমৎকার।

(ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ২।৪।৫

এ কথা আমরা কখনো জিজ্ঞাসা করি না যে, আমি আমাকে কেন ভালবাসি। আমার আপনার অনুভূতিতেই যে আনন্দ। সেই আমার অনুভূতিকে অন্যের মধ্যেও যখন পাই তখন এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার কোনো প্রয়োজনই হয় না যে, তাহাকে আমার কেন ভালো লাগিতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছিলেন...............

---

* বৃহদারণ্যক ২।৪।২

পুত্রকে চাহি বলিয়াই যে পুত্র প্রিয় হয় তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তকে চাহি বলিয়াই যে বিত্ত প্রিয় হয় তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই বিত্ত প্রিয় হয় ইত্যাদি।

এ কথার অর্থ এই, যাহার মধ্যে আমি নিজেকেই পূর্ণতর বলিয়া বুঝিতে পারি আমি তাহাকেই চাই। পুত্র আমার অভাব দূর করে—তাহার মানে, আমি পুত্রের মধ্যে আমাকে আরও পাই। তাহার মধ্যে আমি যেন আমিতর হইয়া উঠি। এইজন্য সে আমার আত্মীয়; আমার আত্মাকে আমার বাহিরেও সে সত্য করিয়া তুলিয়াছে। নিজের মধ্যে যে-সত্যকে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়া প্রেম অনুভব করি পুত্রের মধ্যেও সেই সত্যকে সেইমতোই অত্যন্ত অনুভব করাতে আমার সেই প্রেম বাড়িয়া উঠে। সেইজন্য একজন মানুষ যে কী তাহা জানিতে গেলে, সে কী ভালবাসে তাহা জানিতে হয়। ইহাতেই বুঝ যায়, এই বিশ্বজগতে কিসের মধ্যে সে আপনাকে লাভ করিয়াছে, কতদূর পর্যন্ত সে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছে। যেখানে আমার প্রীতি নাই সেখানেই আমার আত্মা তাহার গণ্ডির সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

(বিশ্বসাহিত্য, সাহিত্য, ১৩১৩)

পুত্রকে কামনা করছ বলেই যে পুত্র তোমার প্রিয় হয় তা নয় কিন্তু আত্মাকেই কামনা করছ বলে পুত্র প্রিয় হয়।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আত্মা পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অনুভব করে বলেই পুত্র তার আপন হয়, এবং সেইজন্যেই পুত্রে তার আনন্দ।

আত্মা যখন স্বার্থ এবং অহংকারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একলা হয়ে থাকে তখন সে বড়োই ম্লান হয়ে থাকে, তখন তার সত্য স্ফূর্তি পায় না। এইজন্যেই আত্মা পুত্রের মধ্যে মিত্রের মধ্যে নানা লোকের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়ে থাকে কারণ তার সত্য পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকে।

ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে যখন ক খ গ প্রত্যেক অক্ষরকে স্বতন্ত্র করে শিখছিলুম তখন তাতে আনন্দ পাই নি। কারণ, এই স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির কোনো সত্য পাচ্ছিলুম না। তারপরে অক্ষরগুলি যোজনা করে যখন "কর" "খল" প্রভৃতি পদ পাওয়া গেল তখন অক্ষর আমার কাছে তার তাৎপর্য প্রকাশ করাতে আমার মন কিছু কিছু সুখ অনুভব করতে লাগল। কিন্তু এরকম বিচ্ছিন্ন পদগুলি চিত্তকে যথেষ্ট রস দিতে পারে না—এতে ক্লেশ এবং ক্লান্তি এসে পড়ে। তারপরে আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যেদিন "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" বাক্যগুলি পড়েছিলুম সেদিন ভারি আনন্দ হয়েছিল, কারণ, শব্দগুলি তখন পূর্ণতর অর্থে ভরে উঠল। এখন শুদ্ধমাত্র "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" আবৃত্তি করতে মনে সুখ হয় না বিরক্তি বোধ হয়, এখন ব্যাপক অর্থযুক্ত বাক্যাবলীর মধ্যেই শব্দবিন্যাসকে সার্থক বলে উপলব্ধি করতে চাই।

বিচ্ছিন্ন আত্মা তেমনি বিচ্ছিন্ন পদের মতো। তার একার মধ্যে তার তাৎপর্যকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এইজন্যেই আত্মা নিজের সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। সে যখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের সার্থকতার একটা রূপ দেখতে পায়—সে যখন আত্মীয় পরকীয় বহুতর লোককে আপন করে জানে তখন সে আর ছোটো আত্মা থাকে না, তখন সে মহাত্মা হয়ে ওঠে।

এর একমাত্র কারণ আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা আমিতেই সার্থক। এইজন্যে সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম

আমিকেই খুঁজছে। আমার আমি যখন পুত্রের আমিতে গিয়ে সংযুক্ত হয় তখন কী ঘটে? তখন, যে পরম আমি আমার আমির মধ্যেও আছেন পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন তাঁকে উপলব্ধি করে আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু তখন মুশকিল হয় এই যে, আমার আমি এই উপলক্ষে যে সেই বড়ো আমির কাছেই একটুখানি এগোল তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। সে মনে করে সে পুত্রকেই পেল এবং পুত্রের কোন বিশেষ গুণবশতই পুত্র আনন্দ দেয়। সুতরাং এই আসক্তির বন্ধনেই সে আটকা পড়ে যায়। তখন সে পুত্র-মিত্রকে কেবলই জড়িয়ে বসে থাকতে চায়। তখন সে এই আসক্তির টানে অনেক পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এইজন্য সত্যজ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন আমরা যথার্থত পুত্রকে চাই নে আত্মাকেই চাই। এ কথাটিকে ঠিকমতো বুঝলেই পুত্রের প্রতি আমাদের মুগ্ধ আসক্তি দূর হয়ে যায়। তখন উপলক্ষ্যই লক্ষ্য হয়ে আমাদের পথ রোধ করতে পারে না।

যখন আমরা সাহিত্যের বৃহৎ তাৎপর্য বুঝে আনন্দ বোধ করতে থাকি, তখন প্রত্যেক কথাটি স্বতন্ত্রভাবে আমি আমি করে আমাদের মনকে আর বাধা দেয় না, প্রত্যেক কথা অর্থকেই প্রকাশ করে নিজেকে নয়। তখন কথা আপনার স্বাতন্ত্র্য যেন বিলুপ্ত করে দেয়।

তেমনি যখন আমরা সত্যকে জানি তখন সেই অখণ্ড সত্যের মধ্যেই সমস্ত খণ্ডতাকে জানি—তারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আর আমার জ্ঞানকে আটক করে না। এই অবস্থাই বৈরাগ্যের অবস্থা। এই অবস্থায় সংসার আপনাকেই চরম ব'লে আমাদের সমস্ত মনকে কর্মকে গ্রাস করতে থাকে না।

কোনো কাব্যের তাৎপর্যের উপলব্ধি যখন আমাদের কাছে গভীর হয় উজ্জ্বল হয় তখনই তার প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা সেই সমগ্র ভাবের মাধুর্যে আমাদের কাছে বিশেষ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। তখন যখন ফিরে দেখি দেখতে পাই কোনো শব্দটিই নিরর্থক নয় সমগ্রের রসটি প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। তখন সেই কাব্যের প্রত্যেক পদটিই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে। তখন তার পদগুলি সমগ্রের উপলব্ধিতে আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা করে বলেই আমাদের কাছে বড়োই মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তেমনি বৈরাগ্যে যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়, তখন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে হচ্ছিল, যারা পদে পদে আমাদের পথরোধ করছিল, তারা প্রত্যেকে সেই ভূমার প্রতিই আমাদের বহন করে, রোধ করে না।

তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁধে রাখে না—সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু।

(বৈরাগ্য, শান্তিনিকেতন, ১৫ ফাল্গুন ১৩১৫)

দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচি থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দ লাভ হল। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও

কেন হয় আনন্দ। বিষয়কে বড় করে পায় বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো ক'রে, সত্য ক'রে পায় ব'লে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

আমাদের জানা দুরকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য-কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে, বিশেষ রসে, বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা। সেইজন্যে উপনিষদ্ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

(সাহিততত্ত্ব, সাহিত্যের পথে, ভাদ্র ১৩৪০)

যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই বলেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।

মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে, অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র বৃহৎ লীলার জগৎ সাহিত্যে।

(সাহিত্যের পথে, ৮ আশ্বিন ১৩৪৩)

আমাদের উপনিষদে আছে : ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি—আত্মা পুত্রস্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়, তাই পুত্রস্নেহ তার কাছে মূল্যবান।

(সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা, সাহিত্যের স্বরূপ, রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, আশ্বিন ১৩৪৮)

যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স.........২।৫।১

এই বাহিরের প্রকৃতিতে যিনি শোভমান, আমার অন্তরেও তিনিই বিরাজমান। কাজেই আমিও এই বিশ্বের সঙ্গে আজ একাত্ম হয়ে রয়েছি। প্রকৃতির এইসব শোভা আমার অন্তরে আছে বলেই আজ বুঝেছি আমি শুধু ব্যক্তিবিশেষ মাত্র নই। বিশ্ববাণীর সঙ্গে আজ আমি বাণীরূপে, বিশ্বগানের সঙ্গে আজ আমি গানরূপে, বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে আজ আমি প্রাণরূপে এক হয়ে বিরাজমান। মায়ের কোলে যেমন শিশু

জন্মলাভ করে, তেমনি বিশ্ব-অন্ধকারের হৃদয় বিদীর্ণ করে জ্বলজ্বল অগ্নিশিখার মত আমার এই ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমি যেন আজ বেরিয়ে এলাম।

আজ আমার এই দেহ বা সংকীর্ণ কোনো স্বরূপই আমার একমাত্র পরিচয় নয়, আজ চরাচরময় অন্ধকারের মধ্যে আমি যেন একটি বিদেহ দীপ্ত আলোক। বিশ্বের সঙ্গে আজ আমার অতি ঘনিষ্ঠ যোগ। আমিও আজ বিশ্বচরাচরে চিন্ময়রূপে পরিব্যাপ্ত।

(ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্॥ ২।৫।১০

আমাদের হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে প্রিয়তম আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। তাঁর কাছে বার বার ঘুরে ঘুরে না এলে বস্তুর দৌরাত্ম্য অসহ্য হয়ে ওঠে। অন্তর যেন জানে তার অতল অন্তঃস্তরেই লুকানো রয়েছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। হৃদয়ের কৃপণতা দূর করতে হলে এই অসংশয় বিশ্বাস চাই।

রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯১৬)

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো ২।৫।১০
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো ২।৫।১৪
ব্রহ্ম সর্বানুভূরিত্যনুশাসনম্। ২।৫।১৯

ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্ছে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কী?

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ, যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্বানুভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনি অনুভব করছেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তের মধ্যে ব্যাপৃত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্ছে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে সমস্ত জগৎকে সর্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি—তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য পৃথিবীকে টানছে, তাঁরই অনুভূতির মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়—যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ—এই আত্মাতেও তিনি সর্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ, যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্যন্তই সে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

হে সর্বানুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্মল চেতনার মধ্যে যে কী আশ্চর্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়। মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্ছে। মনে হয় যেন এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করে নিস্তব্ধ করে ধরলে তাঁদের সেই বৈদ্যুতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বস্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুলবে। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণতার মূর্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে—এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইজন্যে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্র শূন্যকে কোথাও তাঁরা দেখতে পান নি, মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি। এইজন্যে অমৃতকে যেমন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন, যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।

(বিশ্বোধ, শান্তিনিকেতন)

হে আনন্দময় আমরা দীন নই, দরিদ্র নই। তোমার অমৃতময় অনুভূতি দ্বারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক। তা হলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্যময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

ক্ষিতিমোহনের অমূল্য সংগ্রহ থেকে বাউলের এই বাণী পাই—

জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার—
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি,
যার নিত্যলীলা চমৎকার।

প্রতিদিনই মানবসমাজে এই লীলা। অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে নানা আকারেই অপরিমেয়কে প্রকাশ করছে। ইতিহাসে তাদের নাম ওঠে না, আপন প্রাণ থেকে মানুষের প্রাণ প্রবাহে তারা ঢেলে দিয়ে যায় তাঁরই অমিত তেজ যশ্চায়মস্মিন্ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ—যিনি এই আত্মার মধ্যেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমস্তই অনুভব করেন, যেমন আকাশব্যাপী তেজকে উদ্ভিদ্ আপন প্রাণের সামগ্রী করে নিয়ে পৃথিবীর প্রাণলোকে উৎসর্গ করে।

উদ্ভিদের ভিতর দিয়ে বিশ্বতেজ যদি প্রাণবস্তুতে নিয়ত পরিণত না হতে পারত তাহলে জীবলোক যেমন মরুশয্যাশায়ী হত, তেমনি আমাদের গোচরে অগোচরে দেশে দেশে কালে কালে নরনারী নিজের অন্তরস্থিত পরমপুরুষের অমিততেজ যদি কল্যাণে ও প্রেমে, জ্ঞানে ও কর্মে, নিরন্তর সমাজর প্রাণবস্তুতে পরিণত না করত, তাহলে সমাজ সোঽহংতত্ত্ববর্জিত হয়ে পশুলোকের সাথে এক হয়ে যেত। তাও নয়, আপন সত্য হতে স্খলিত হয়ে বাঁচতেই পারত না।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে, দেখি মহামানবকে, দেখি যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ; এবং শুভকামনায় হৃদয়কে সর্বত্র এই বলে ব্যাপ্ত করতে পারি—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা দুক্খাপমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।—

সকল জীব সুখিত হোক, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কালহরণ করুক! সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক॥—

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ২।৫।১৯

ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন। স্থূল বাহ্য ভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক, গভীর ভাবে এ কথা সত্য বই কি। তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েই তো মানুষকে তৈরি করে তুলছেন। সেইজন্যে মানুষ আপনার সব-কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি কাকে অনুভব করছে। সেইজন্যেই ওই বাউলের দলই বলেছে : খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়! আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা।—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!

অসীমের মধ্যে যে-একটি ছন্দ দূর ও নিকট-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ; তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে : আমার মনের মানুষ কে রে! আমি কোথায় পাব তারে! সে যে কে তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না। তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে; সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বন্ধ হবে না। কোথায় পাব তারে! কোনো বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তো পাওয়া যাবে না; স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া; আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

মানুষ এমনি করেই তো আপনার মনের মানুষের সন্ধান করছে। এমনি করেই তো তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়ে যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। যতই তাকে পাচ্ছে ততই বলছে, 'আমি কোথায় পাব তারে।' সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না-পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্যটানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্য লাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্মক্ষেত্রের প্রসার—এককথায়, পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই-যে একটি চিরবিরহ আছে এ বিরহ তো কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই তো এর পূর্ণতা হতে পারে না, জ্ঞানে কর্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েছে—ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে, যে দিকেই মানুষ বলেছে 'আমি চিরকালের মতো পেঁচৈছি', 'আমি পেয়ে বসে আছি', এই বলে যেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে। এই-যে তার চিরকালর গান : আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে! এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন : মনের মানুষ যেখানে বলো কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে! কেন না, সন্ধান এবং পেতে থাকা এক সঙ্গে; যখনই সন্ধানের অবসান তখনই উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

(ছোটো ও বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

আমি বলতে চাই ধরুন, টেলিগ্রাফের তারে জড়ানো মৃত বানরটি সেদিন যখন আপনি দেখলেন তখনো তার চারপাশের সৌন্দর্য অক্ষত মহিমায় বিরাজ করছে। সেই অসামঞ্জস্য আপনার চোখে ভারি নিষ্ঠুর ঠেকেছিল। এটাই হল বড়ো কথা। অসুন্দরই যদি চরম সত্য হত, তবে এই নিষ্করুণ দৃশ্য আপনাকে পীড়া দিত না। **পূর্ণতার প্রতিসৃষ্টি আপনার ধ্যানে** রয়েছে বলে আপনি বেদনা বোধ করলেন। চিরন্তনের পটে

এই বিশ্বছবির আভাস আমাদের আশ্বাসে ভরে সব সন্দেহের নিরসন করে দেয়। সৃষ্টির পরিপূর্ণ আনন্দ যদি অপূর্ণের হাহাকার ছাপিয়ে না উঠত তবে এই দুঃখ-চেতনা হত নিতান্তই অসংগত।

রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন
শ্রীমতী মলিনা রায়, ২৯ জুলাই ১৯১৫)

ব্রহ্ম সর্বানুভূরিত্যনুশাসনম্। ২।৫।১৯

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম সামনের আকাশে নববর্ষার জল-ভারনত মেঘ, নিচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল; সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চারদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখদুঃখের নানা খণ্ড-প্রকাশ চলছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরমদ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

(মানবসত্য, মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

'তিনি সর্বানুভূঃ', তিনি তাঁর মধ্যে সকল প্রাণীর অনুভূতি অনুভব করেন, সুতরাং সকল অনুভূতির মধ্যে তিনি নিজেকে অনুভব করেন।

(May 1917-এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The Second Birth অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

•

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি। ৩।৮।৯

অক্ষরপুরুষকে আশ্রয় করিয়া দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে,

(নববর্ষ, ধর্ম, ১৩০৯)

আমরা ক্ষণকালের মধ্যে বন্ধ করিয়া ধরিয়া যাহাকে জমাট করিয়া দেখি বস্তুত তাহার সে রূপ নাই কেন না সত্যই তাহা বন্ধ হইয়া নাই এবং ক্ষণকালেই তাহার শেষ নহে। আমরা দেখিবার জন্য জানিবার জন্য তাহাকে স্থির করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে যে নাম দিতেছি সে নাম তাহার চিরকালের সত্য নাম নহে। এইজন্যই আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহাকে মায়া বলা হইয়াছে। নাম ও রূপ যে শাশ্বত নহে একথা আমাদের দেশের চাষারাও বলিয়া থাকে।

কিন্তু গতিকে এই যে স্থিতির মধ্য দিয়া আমরা জানি এই স্থিতির তত্ত্বটা তো আমাদের নিজের গড়া নহে। আমাদের গড়িবার ক্ষমতা কিসের? অতএব, গতিই সত্য, স্থিতি সত্য নহে, একথা বলিলে চলিবে কেন? বস্তুত সত্যকেই আমরা ধ্রুব বলিয়া থাকি, নিত্য বলিয়া থাকি। সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধৃতিসূত্রে আমরা যাহা কিছু জানিতেছি নহিলে সেই জানার বালাইমাত্র থাকিত না—যাহাকে মায়া বলিতেছি তাহাকে মায়াই বলতে পারিতাম না যদি কোনো-খানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।

সেই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিতেছেন "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতা-স্তিষ্ঠন্তি।" সেই নিত্য পুরুষের প্রশাসনে, হে গার্গি, নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র অর্দ্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর সকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

অর্থাৎ এই সমস্ত নিমেষ মুহূর্ত্তগুলিকে আমরা একদিকে দেখিতেছি চলিতেছে কিন্তু আর একদিকে দেখিতেছি তাহা একটি নিরবচ্ছিন্নতা-সূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। এইজন্যই কাল বিশ্বচরাচরকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া যাইতেছে না, তাহাকে সর্বত্র জুড়িয়া গাঁথিয়া চলিতেছে। তাহা জগৎকে চকমকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গ পরম্পারার মতো নিক্ষেপ করিতেছে না, আদ্যন্ত যোগযুক্ত শিখার মতো প্রকাশ করিতেছে। তাহা যদি না হইত তবে আমরা মুহূর্ত্তকালকেও জানিতাম না। কারণ আমরা এক মুহূর্ত্তকে অন্য মুহূর্ত্তের সঙ্গে যোগেই জানিতে পারি বিচ্ছিন্নতাকে জানাই যায় না। এই যোগের তত্ত্বই স্থিতির তত্ত্ব। এইখানেই সত্য, এইখানেই নিত্য।

(রূপ ও অরূপ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌতিষ্ঠতঃ এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাব্যাপৃথিব্যৌ বিধৃতেতিষ্ঠতঃ এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্য প্রতীচ্যোঽন্যাঃ,৩।৮।৯

ওগো, কে বাজায়, বুঝি শোনা যায়,
মহারহস্যে রসিয়া,
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর'পরে বসিয়া।

গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল—
গগনে গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া॥

ওগো, কে বাজায়, কে শুনিতে পায়,
না জানি কী মহা রাগিণী!
দুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।
ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে—
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কি গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে,
মর্মরে দিনযামিনী॥.........

পশুবিহঙ্গ কীটপতঙ্গ
জীবনের ধারা ছুটিছে।
কী মহাখেলায় মরণবেলায়
তরঙ্গ তার টুটিছে।
কোনোখানে আলো কোনোখানে ছায়া,
জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া,
চেতনাপূর্ণ অদ্ভুত মায়া
বুদ্‌বুদসম ফুটিছে।
(বিশ্বনৃত্য, সোনার তরী, ২৬ ফাল্গুন ১২৯৯)

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

(নৈবেদ্য, ১৩০৮)

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে— সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে

লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে; বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্রদোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।

(নৈবেদ্য, ১৩০৮)

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্য তারা দলে দলে;
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু
চরাও মহা-গগনতলে।
তৃণের সারি তুল্‌চে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় ক'রেচে ফুলে ফলে।

(গীতিমাল্য, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১)

একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই—বহুর পরিচয়, যেখানে ভেদ; এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল।

জগতে রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নয় সংযম দেখি। সীমাটা অন্য-সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাৎ করিয়া আর সংযমটা অন্য-সমস্তের সঙ্গে রফা করিয়া। রূপ একদিকে আপনাকে মানিতেছে, আর-এক দিকে অন্য-সমস্তকে মানিতেছে, তবেই সে টিঁকিতেছে।

তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, সূর্য ও চন্দ্র, দ্যুলোক ও ভূলোক, একের শাসনে বিধৃত। সূর্য চন্দ্র দ্যুলোক ভূলোক আপন আপন সীমায় খণ্ডিত ও বহু, কিন্তু তবু তার মধ্যে কোথায় এককে দেখিতেছি। যেখানে প্রত্যেকে আপন-আপন ওজন রাখিয়া চলিতেছে, যেখানে প্রত্যেকে সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ভেদের দ্বারা বহুর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বহুর রক্ষা। যেখানে অনেককে টিঁকিতে হইবে সেখানে প্রত্যেককে আপন পরিমাণটি রাখিয়া আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়। জগৎসৃষ্টিতে সমস্ত রূপের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে, পরিমাণের যে সংযম সেই সংযমই মঙ্গল, সেই সংযমই সুন্দর। শিব যে যতী।

(ছবির অঙ্গ, বিচিত্র প্রবন্ধ, আষাঢ় ১৩২২)

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিল্লোঁকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মা-ল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণো..................৩।৮।১০

ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে এই কথাটিকে খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের কর্ম নহে—তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, তাঁহাকে না

জানিয়া যে মানুষ কেবল জপ তপ করিয়াই কাটায় অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়—তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, স কৃপণঃ—সে কৃপাপাত্র।

(ধর্মের অধিকার, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

•

এষাহস্য পরমা গতিরেষাহস্য পরমা সম্পদেষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ ৪।৩।৩২

এষঃ মানে ইনি—এই সামনেই যিনি, এই কাছেই যিনি আছেন। অস্য মানে ইহার—সেও খুব নিকটের ইহার। ইনিই হচ্ছেন ইহার পরম গতি। যিনি যার পরম গতি তিনি তার থেকে লেশমাত্র দূরে নেই। এতই কাছে যে তাঁকে ইনি বললেই হয়, তাঁর নাম করবারও দরকার নেই—"এই যে ইনি" বলা ছাড়া তাঁর আর কোন পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয় না। ইনিই হচ্ছেন ইহার সমস্তই। ইনি যে কে এবং ইহার যে কাহার সে আর বলাই হল না। সমুদ্রের এপারে যে আছে সে তো ওপারের লোককে এষঃ বলে না, ইনি বলে না।

ইনি হচ্ছেন ইহার পরমাগতি। আমরা যে চলি, আমাদের চালায় কে? আমরা মনে করি টাকা আমাদের চালায়, খ্যাতি আমাদের চালায়, মানুষ আমাদের চালায়; যিনি পার হয়েছেন তিনি বলেন ইনিই ইহার গতি—এ'র টানেই এ চলেছে—টাকার টান, খ্যাতির টান, মানুষের টান, সব টানের মধ্যে পরম টান হচ্ছে এ'র—সব টান যেতে পারে কিন্তু সে টান থেকেই যায়—কেননা সব যাওয়ার মধ্যেই তাঁর কাছে যাওয়ার তাগিদ রয়েছে। টাকাও বলে না তুমি এইখানেই থেকে যাও, খ্যাতিও বলে না, মানুষও বলে না—সবাই বলে তুমি চলো—যিনি পরমাগতি তিনিই গতি দিচ্ছেন, আর কেউ যে পথের মধ্যে বরাবরের মতো আটক করে রাখবে এমন সাধ্য আছে কার?

আমরা হয়তো মনে করতে পারি পৃথিবী যে আমাকে টানছে সেটা পৃথিবীরই টান, কিন্তু তাই যদি হবে, পৃথিবীকে টানে কে? সূর্য্যকে কে আকর্ষণ করছে? এই যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহতারানক্ষত্রকে ঘোরাচ্ছে, কাউকে নিশ্চল থাকতে দিচ্ছে না। সেই বিরাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্র তো পৃথিবীতে নেই। একটি পরমাগতি আছে, যা আমারও গতি, পৃথিবীরও গতি, সূর্যেরও গতি।

(এপার ওপার, শান্তিনিতেন, ১২ পৌষ১৩১৫)

আমার পরমাগতি দূরে নেই, আমার সকল তুচ্ছ গতির মধ্যেই সেই পরমাগতি আছেন। যেমন আপেল ফলটি মাটিতে পড়ার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রাকর্ষণ শক্তি আছে। আমার শরীরের সকল চলা এবং আমার মনের সকল চেষ্টার যিনি পরমাগতি, তিনি হচ্ছেন এষঃ, এই ইনি। সেই গতির কেন্দ্র দূরে নয়—এই যে এইখানেই।

তারপরে যিনি আমাদের পরম সম্পৎ, আমাদের পরম আশ্রয়, আমাদের পরম আনন্দ—তিনি আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত সম্পদ, প্রতিদিনের সমস্ত আশ্রয় এবং প্রতিদিনের সমস্ত আনন্দের মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের ধনজন, আমাদের ঘরদুয়ার,

আমাদের সমস্ত রসভোগের মধ্যেই যিনি পরমরূপে রয়েছেন তিনি যে এষঃ—তিনি যে ইনি—এই যে এইখানেই।

আমার সমস্ত গতিতে সেই পরম গতিকে, আমার সমস্ত সম্পদে সেই পরম সম্পদকে, আমার সমস্ত আশ্রয়ে সেই পরম আশ্রয়কে আমার সমস্ত আনন্দেই সেই পরম আনন্দকে এষঃ বলে জানব—একেই বলে পার হওয়া।

(এপার ওপার, শান্তিনিকেতন, ১২ পৌষ ১৩১৫)

পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো কিছু বাকি নেই কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে—যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি "অস্য" "এষ" হয়ে আছেন। তিনি এর এই হয়ে বসেছেন, নাম করবার জো নেই। তাই তো ঋষি কবি বলেন—এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানারকম করে পাচ্ছি—সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকান্তরে।

(পরিণয়, শান্তিনিকেতন, ৯ ফাল্গুন ১৩১৫)

সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো—উল্টো দিকে নয়, নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তাহলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলই তিনিময় হতে থাকবে, কেবলই তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠবে। তা হলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জানতে পারবে ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাতেই তোমার পরম হওয়া।

(হওয়া, শান্তিনিকেতন, ৬ বৈশাখ ১৩১৬)

আমার দিকটা যখন একান্ত হয় তখন সে অসত্য হয় এইজন্যই সে অপবিত্র হয়ে ওঠে, কেননা কেবলমাত্র আমার মধ্যে আমি সত্য নই। সেইজন্য যখন কেবল আমার দিকেই আমি সমস্ত মনটাকে দিই তখন আত্মা অসতী হয়ে ওঠে, সে আপনার শুচিতা হারায়। আত্মা পতিব্রতা স্ত্রীর মতো; তার সমস্ত দেহ মন প্রাণ আপনার স্বামীকে নিয়েই সত্য হয়। তার স্বামীই তার প্রিয় আত্মা, তার সত্য আত্মা, তার পরম আত্মা। তার সেই স্বামিসম্বন্ধেই উপনিষদ বলেছেন : এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরমআনন্দঃ। ইনিই তার পরম গতি, ইনিই তার পরম সম্পদ, ইনিই তার পরম আশ্রয়, ইনিই তার পরম আনন্দ।

(শুচি, শান্তিনিকেতন, আশ্বিন ১৩১৯)

সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ করিয়া দেখি তবে মানুষের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে

জগতে এমন কোনো সেতু নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথ্যা।

কিন্তু, মানুষের ধর্ম মানুষকে বলিতেছে, 'তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই অসীমকে পাইবে। তুমি মানুষ হও; সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই তোমার অনন্তের সাধনা সফল হইবে।' এইখানেই আমাদের অভয়, আমাদের অমৃত। যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা। এইজন্যই উপনিষৎ বলিয়াছেন, ইনিই ইহার পরমা গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পৎ, ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনন্দ।

(সীমা ও অসীমতা, পথের সঞ্চয়, ১৩১৯)

মানুষ যখন জানিতে পারে সীমাতেই অসীম, তখনই মানুষ বুঝিতে পারে— এই রহস্যই প্রেমের রহস্য; এই তত্ত্বই সৌন্দর্যতত্ত্ব; এইখানেই মানুষের গৌরব; আর, যিনি মানুষের ভগবান, এই গৌরবেই তাঁহারও গৌরব। সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য, সীমাই অসীমের আনন্দ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিতেছেন।

(সীমা ও অসীমতা, পথের সঞ্চয়, ১৩১৯)

সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা সাজে, কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন 'এষঃ', এই-যে তিনি, সেখানে তো কোনো কথা বলা চলে না।

(ছোটো ও বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখলেই দেখা যায় সমস্ত চলে যাচ্ছে, সমস্ত স্খলিত হচ্ছে বটে, কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্ছে। সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্তন সমস্ত গতায়াত সত্ত্বেও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানছি; নিরন্তর সমস্ত চলে-যাওয়াকে পেরিয়ে থেকে-যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করছে। বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখছি; কখনো আজ কখনো পাঁচদিন পরে, কখনো এক ঘটনায় কখনো অন্য ঘটনায়। তাঁর সম্বন্ধে আমার বাইরের বোধটাকে জড়ো করে দেখলে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয়, অথচ অন্তরের মধ্যে তার সম্বন্ধে যে-একটি নিরবচ্ছিন্ন বোধের উদয় হয়েছে তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জানার কূল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেছে। যে কাল গত সে কালও তাকে ধরে রাখে নি, যে কাল সমাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখে নি, এমন-কি মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করে নি। বরঞ্চ আমার বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেছি সেই সীমাবচ্ছিন্ন দেখাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে মনে আনতে চাইলে মন হার মানে—কিন্তু, সমস্ত খণ্ড জানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে গিয়ে আমার বন্ধুর যে-একটি পরম অনুভূতি অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ; কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলেছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি করেই যাঁরা আপনার

সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম থাকাটিকে একান্ত অনুভব করেছেন তাঁরাই বলেছেন : এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরমআনন্দঃ। এ তো জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এ যে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি। এষঃ, এই-যে ইনি, এই-যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরমা গতি, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ। তিনি একদিকে যেমন গতি আর-এক দিকে তেমনি আশ্রয়, একদিকে যেমন সাধনার ধন আর-এক দিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ।

(ছোটো ও বড়ো, শান্তিনিকেতন, ১১ মাঘ ১৩২০)

আমরা আমাদের জীবনের বৃহত্তম বিভেদের সম্মুখীন হই—সে বিভেদ সীমা অসীমের বিভেদ। আমাদের মধ্যে যা আছে ও আমাদের বাইরে যা আছে, এ দুয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে এখানেই আমরা সচেতন হই। বর্তমান মুহূর্তে যা আছে ও ভবিষ্যতে যা আসবে, এ দুয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই।

আমাদের শারীরিক অস্তিত্বের সঙ্গেই এই সম্পর্কের চেতনা আমাদের মধ্যে দেখা দেয়। সেখানে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও বস্তুগত বিশ্বজীবনের মধ্যে বিচ্ছেদ ও মিলন রয়েছে। তা আমাদের মানসিক জীবনে গভীরতর রঙের প্রলেপ দিয়েছে। সেখানে আমাদের ব্যক্তিগত মন ও বিশ্বগত যুক্তির জগতের মধ্যে বিচ্ছেদ ও ক্রমান্বয় পুনর্মিলন স্থাপিত হচ্ছে। যেখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও বিশ্বগত মানবিক ব্যক্তিত্বের জগতের মধ্যে বিচ্ছেদ ও মিলন বর্তমান, সেখানে এই চেতনা বিস্তারিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত এক ও অনন্তের মধ্যে বিশ্বগত এক—এ দুয়ের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ও মিলন রয়েছে, সেখানেই এই চেতনা পরম অর্থে উপনীত হয়। আর একের সঙ্গে একের এই চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ ও মিলনের বিন্দুতে মানুষের বিস্ময়কর সংগীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

এষাস্য পরমা গতিঃ,
এষাস্য পরমা সম্পৎ।
এষোঽস্য পরমো লোকঃ,
এষোঽস্য পরম আনন্দঃ॥

সেই এক ও এই একের সম্পর্কই জীবন। বস্তু ও মানুষের জগতে সেই এক ও এই একের নৃত্যস্পন্দন অন্তহীন ছন্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পরম এক ও এই পরম একের মধ্যে উপলব্ধি পূর্ণ হয়ে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সম্পর্কের অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে না।

(May 1917-এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The Second Birth অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব,
অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মানুষের ইতিহাসে এমন-সব মুহূর্ত এসেছে যখন ঈশ্বরের জীবন-সংগীত পরিপূর্ণ সঙ্গতিতে মানবজীবনকে স্পর্শ করেছে, এবং সে সংগীত আমরা শুনেছি। আমরা জেনেছি যে, মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা প্রকাশিত হয় আপন ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রকৃতি গ্রহণে ও ভালোবাসার প্রাচুর্যে আত্মদানে। মানুষ এই প্রকৃতির জগতে নানা মানবিক বাধা ও ক্ষুধা নিয়ে জন্মেছে। তথাপি মানুষ প্রমাণ করেছে যে সে অধ্যাত্ম জগতে

নিঃশ্বাস নিয়েছে, এবং সর্বাপেক্ষা বড়ো সত্য হল এই যে ভালোবাসার পূর্ণ মিলনেই ব্যক্তিত্বের মুক্তি। মানুষ নিজেকে সকল স্বার্থ-আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত করেছে, জাতি ও জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করেছে, ভয় এবং মতবাদ ও প্রথার দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। অনন্তের সঙ্গে মুক্ত সক্রিয় জীবনের যোগে ও ত্যাগের সীমাহীন প্রাচুর্যে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়েছে। মানুষ দুঃখ পেয়েছে ও ভালোবেসেছে। জগতের সকল অসতের আঘাত মানুষ বুক পেতে নিয়েছে ও প্রমাণ করেছে যে, আত্মার জীবন মৃত্যুহীন। কত বিশাল রাজ্য তাদের আকৃতি বদ্‌লেছে ও মেঘের মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে, কত প্রতিষ্ঠান স্বপ্নের মতো আকাশে বিলীন হয়ে গেছে, কত জাতি তাদের কাজ করেছে ও বিস্মৃতিতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে; কিন্তু এই-সব ব্যক্তি তাদের মধ্যে সকল মানুষের মৃত্যুহীন জীবনকে বহন করে চলেছে। তাদের বিরামহীন জীবন প্রবল বন্যাবেগে নদীর মতো কত শ্যামল প্রান্তর ও মরুভূমির মধ্য দিয়ে, কত দীর্ঘ অন্ধকার বিস্মৃতির গভীর খাদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে এবং সূর্যালোকের নৃত্যপর আনন্দ-লোকে উপনীত হয়েছে। এই জীবনধারা অন্তহীন কালের মধ্য দিয়ে বহু মানবের দ্বারে জীবন-বারি পৌঁছে দিয়েছে, তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছে, দৈনন্দিন ধূলিময় জীবনের অপবিত্রতাকে নির্মল করেছে, এবং হট্টগোলের মধ্য দিয়ে চিরকালের জীবনের সংগীত জীবন্ত কণ্ঠে গেয়েছে; সে সংগীতের ভাষা এই—

এষাস্য পরমা গতিঃ
এষাস্য পরমা সম্পৎ।
এষোঽস্য পরমো লোকঃ
এষোঽস্য পরম আনন্দঃ॥

(May 1917-এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত The Second Birth অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব, অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

তিনি 'পরমআনন্দ পরমাগতিঃ' এই কথা উপলব্ধি করবার জন্য যে ত্যাগের দরকার যারা তা শেখে নি তারা মৃত্যুর ভয়ে, ক্ষতির ভয়ে, প্রাণকে বুকে করে নিয়ে ফিরেছে—অন্তরের ভয় লোভ মোহের দ্বারা শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করেছে।

(খৃষ্ট, রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, চৈত্র ১৩৩০)

অথর্ববেদ বলেছেন—

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে।

ঋত সত্য তপস্যা রাষ্ট্র শ্রম ধর্ম কর্ম ভূত ভবিষ্যৎ বীর্য সম্পদ বল সমস্তই উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ উদ্‌বৃত্তে আছে। অর্থাৎ মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতিরিক্ততা থেকে। জীবজগতে মানুষ বাড়তির ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে কুলোল না। ইতিপূর্বে জীবাণুকোষের সঙ্গে সমগ্র দেহের সম্বন্ধ আলোচনা করেছিলুম। অথর্ববেদের ভাষায় বলা যেতে পারে প্রত্যেক জীবকোষ তার অতিরিক্তের মধ্যে বাস করে। সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য আনন্দ শক্তি, সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার করে আছে সৌন্দর্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত ভূত ভবিষ্যৎ। জীবকোষ এই সমগ্র দেহগত বিভূতি উপলব্ধি করে না। কিন্তু,

মানুষ প্রকৃতিনির্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে পেরিয়ে যায়; পেরিয়ে গিয়ে যে আত্মিক সম্পদ্‌কে উপলব্ধি করে অথর্ববেদ তাকেই বলেছেন, ঋতং সত্যম্। এ সমস্তই বিশ্বমানবমনের ভূমিকায়, যারা একে স্বীকার করে তারাই মনুষ্যত্বের পদবীতে এগোতে থাকে। অথর্ববেদ যে-সমস্ত গুণের কথা বলেছেন তার সমস্তই মানবগুণ। তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীবধর্মসীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনোই অমানব নয়, তা মানবব্রহ্ম। আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি। এই কথাটিকেই উপনিষদ্ আর-এক রকম করে বলেছেন—

এষাস্য পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পদ্
এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

এখানে উনি এবং এ, এই দুয়ের কথা। বলছেন, উনি এর পরম গতি, উনি এর পরম সম্পদ্, উনি এর পরম আশ্রয়, উনি এর পরম আনন্দ। অর্থাৎ, এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। উৎকর্ষের পথে এ চলেছে সেই বৃহতের দিকে, এর ঐশ্বর্য সেইখানেই, এর প্রতিষ্ঠা তাঁর মধ্যেই, এর শাশ্বত আনন্দের ধন যা-কিছু সে তাঁতেই।

এই তিনি বস্তু-অবচ্ছিন্ন একটা তত্ত্ব মাত্র নন। যাকে বলি 'আমার আমি' সে যেমন অন্তরতমভাবে আমার একান্ত বোধবিষয় তিনিও তেমনি। যখন তাঁর প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে, যখন তাঁতে আনন্দ পাই, তখন আমার এই আমি-বোধই বৃহৎ হয়, গভীর হয়, প্রসারিত হয় আপন সীমাতীত সত্যে। তখন অনুভব করি, এক বৃহৎ আনন্দের অন্তর্গত আমার আনন্দ।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার জল-ভারনত মেঘ, নীচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল; সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ডলীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চারদিকে ঘরে-ঘরে জনে-জনে মুহূর্তে-মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে. সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখদুঃখের নানা খণ্ড-প্রকাশ চলছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরম দ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

এমনি ক'রে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীর-ভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল।

একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম ক্ষণকাল অবসরযাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন; ইচ্ছে করছে, সম্পূর্ণ আত্ম-

নিবেদন করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সংগী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করছেন তাঁর নিত্যে। তখনই মনে হল, আমার একদিক থেকে বেরিয়ে এসে আর-এক দিকের পরিচয় পাওয়া গেল। এষোঽস্য পরম আনন্দঃ, আমার মধ্যে এ এবং সে—এই এ যখন সেই সে'র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ।

সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম, আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু— যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধনজনমান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু, পরম পুরুষ আছেন সেই-সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারি নে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখি নে। কোনো-এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে "জীবনদেবতা" শ্রেণীর কাব্যে।

ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমীন, সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে, ঐক্য হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলুম, "তুমি কি খুশি হয়েছো আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।"

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্ব মানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি 'Religion of Man' বক্তৃতা-গুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেক কাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত; তাকে আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।

(মানবসত্য, মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ৪।৩।৩২

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্তে মুহূর্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায়

কণায় পাচ্ছি—দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অন্নে জলে, ফুলে ফলে, দেহে মনে, অন্তরে বাহিরে বিচিত্র করে ভোগ করছি।

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন)

'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

(ভূমিকা, বনবাণী, ২৩ অক্টোবর ১৯২৬)

আমি মানি রসস্বরূপকে, যাঁর পরমানন্দের মাত্রা জীবে জীবে। আমি সেই আনন্দকে উপলব্ধি করতে চাই বিশ্বের সর্ব্বত্র—বিশ্বপ্রকৃতিতে বিশ্বমানবে।

(চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, ১৫ মে ১৯৩৬)

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। ৪।৪।৬

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্যে আমরা যাকে পাই তাকে তো কেবল প্রয়োজনের মতোই পাই তার বেশি তো পাই নে। অন্ন কেবল খাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্ত্র কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ওই সকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমাতে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লঙ্ঘন করা যায় না।

এইরকম বিশেষ প্রয়োজনের সংকীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেইজন্যে ঈশ্বরকে লাভের কথা যখন ওঠে তখনও ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ওইরকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ, তাঁকে দর্শন মানে কোনো বিশেষ মূর্ত্তিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বলতে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়। তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত। তিনি আমাদের বিষয়-সম্পত্তি নন।

ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া, পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলই হয়ে উঠতে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে মরতে মরতে বাঁচতে বাঁচতে আমি কেবলই হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া, সে তো লাভ নয় সে বিকাশ।

ভীরু লোকে বলবে, বল কী। তুমি ব্রহ্ম হবে। এমন কথা তুমি মুখে আন কী করে!

হাঁ, আমি ব্রহ্মই হব। এ-কথা ছাড়া অন্য কথা আমি মুখে আনতে পারি নে। আমি অসংকোচেই বলব, আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু আমি ব্রহ্মকে পাব এত বড়ো স্পর্ধার কথা বলতে পারি নে।

তবে কি ব্রহ্মেতে আমাতে তফাত নেই? মস্ত তফাত আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি, আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

নদী কেবলই বলছে আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্ধা নয়—সে যে সত্য কথা, সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত চরমে সমুদ্র হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার দুই দীর্ঘ উপকূলে কত খেত কত শহর কত গ্রাম কত বন আছে তার ঠিক নেই। নদী তাদের তুষ্ট করতে পারে পুষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। এই সমস্ত শহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও শহর গ্রাম বন হয়ে উঠতে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোটো সচল জল সেই বড়ো অচল জলের একই জাত। এইজন্যে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ওই বড়ো জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহা গহ্বরে লুকিয়ে রাখতে পারে না, যদি কোনো ছোট জলকে দেখিয়ে সে মূঢ়ের মতো বলে, হাঁ সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি তাকে উত্তর দেব, ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেননা সে সমুদ্র হতে চাচ্ছে সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্ছে না।

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি আর কিছুই হতে পারি নে। আর কোনো হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হই নে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারি নে ব্রহ্মকে। ছোটো সেখানে বড়ো হয়। কিন্তু তার সেই বড়ো হওয়া শেষ হয় না, এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাকব। যেখানে বাধা পাব সেখানে হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহংকার, স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতি মুহূর্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

(হওয়া, শান্তিনিকেতন, ৬ বৈশাখ ১৩১৬)

সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো—উল্টোদিকে নয়, নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তাহলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলই তিনিময় হতে থাকবে, কেবলই তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠবে। তাহলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জানতে পারবে ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।

(হওয়া, শান্তিনিকেতন, ৬ বৈশাখ ১৩১৬)

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তদ্বয়ং
ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ। ৪।৪।১৪

ব্রহ্মকে না জানিলেই নয়। কিন্তু কে জানিয়াছে? কাহার কথায় আমরা আশ্বাস পাইব? ঋষি বলিতেছেন—

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তৎ বয়ং
ন চেৎ অবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।

এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে আমরা জানিয়াছি, যদি না জানিতাম তবে আমাদের মহতী বিনষ্টি হইত।

আমরা কি সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিব?........................ ....ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য এক, ধর্ম এক, ব্রহ্ম এক; যাহাতে ঋষিজীবনের সার্থকতা, আমাদের জীবনের সার্থকতাও তাহাতেই; যাহাতে তাঁহাদের মহতী বিনষ্টি তাহাতে আমাদের পরিত্রাণ নাই। শক্তি এবং নিষ্ঠার তারতম্য অনুসারে সত্যে ধর্মে এবং ব্রহ্মে আমাদের ন্যূনাধিক অধিকার হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অসত্য অধর্ম অব্রহ্ম আমাদের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ঋষিদের সহিত আমাদের ক্ষমতার প্রভেদ আছে বলিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত পথের বিপরীত পথে গিয়া আমরা সমান ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না।

(ঔপনিষদব্রহ্ম, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩০৮)

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ ৪।৪।১৫

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই, যে-প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ম এধি—হে প্রকাশ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। তাঁর সেই প্রকাশ যাঁর জীবনে আবির্ভূত তিনি তো আর নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে সর্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন

যদৈতম্ অনুপশ্যাতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যখন এই দেবতাকে এই পরমাত্মাকে এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখতে পান তখন তিনি আর গোপনে থাকতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই দেখেছেন তাঁর আর পর্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই। তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। যারা সেই আত্মাকে দেখে নি তারা অহংকেই বড়ো করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার খাওয়া আমার পরা,

আমার বুদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—একেই প্রধান করে দেখে। এই যে অহংকার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই; এ আলোকের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যে-লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহং-এর দিকে দৃকপাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহং-এর আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে-প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই তো নিজের প্রচুর তেল ও পলতের সঞ্চয় নিয়ে গর্ব করে। আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল পলতের দিকে ফিরে তাকায়? সে ওই আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত পলতে উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাকতে পারে না।

ন ততো বিজুগুপ্সতে। কেন? কেননা তিনি অনুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক। অহং দীপ যখন এই দীপ্তিকে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে কি আর অহংকারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোককেই প্রকাশ করে।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধিপতি। সেইজন্যেই সে যে সেই বৃহৎকালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব কিছুকেই দেখতে পায়। সে তো কোনো সাময়িক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না, কোনো সাময়িক ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এইজন্যই তার বাক্য ও কর্ম নিত্য হয়ে ওঠে। তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে নিজের আচ্ছাদনকে দগ্ধ করে আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

(আশ্রম, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ ১৩১৬)

প্রাণস্য প্রাণম্.................................
...............................যে.........বিদুঃ।
তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্ ॥ ৪।৪।১৮

জীবনের যেটা চরম তাৎপর্য, যা তার নিহিতার্থ, বাইরে যা ক্রমাগত পরিণামের দিকে রূপ নিচ্ছে, তাকে বুঝতে পারছি সে **প্রাণস্য প্রাণং**, সে প্রাণের অন্তরতর প্রাণ। আমার মধ্যে সে যে সহজে যাত্রার পথ পেয়েছে তা নয়, পদে পদে তার প্রতিকূলতা ঘটেছে। এই জীবনযন্ত্র যে-সকল মাল-মসলা দিয়ে তৈরী, গুণী তার থেকে আপন সুর সব সময়ে নিখুঁত করে বাজিয়ে তুলতে পারেন নি। কিন্তু জেনেছি, মোটের উপর আমার মধ্যে তাঁর যা অভিপ্রায় তার প্রকৃতি কী। নানা দিকের নানা আকর্ষণে মাঝে মাঝে ভুল করে বুঝেছি, বিক্ষিপ্ত হয়েছে আমার মন অন্য পথে, মাঝে মাঝে হয়তো অন্য পথের শ্রেষ্ঠত্বগৌরবই আমাকে ভুলিয়েছে। এ কথা ভুলেছি প্রেরণা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের পথের মূল্যগৌরব স্বতন্ত্র। 'নটীর পূজা' নাটিকায় এই কথাটাই

বলবার চেষ্টা করেছি। বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার **প্রাণের প্রাণ।**

আমার মনে সন্দেহ নেই আমার মধ্যে সেইরকম সৃষ্টিসাধনকারী একাগ্র লক্ষ্য নির্দেশ করে চলেছেন একটি গূঢ় চৈতন্য, বাধার মধ্যে দিয়ে, আত্মপ্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। তাঁরই প্রেরণায় অর্ঘ্যপাত্রে জীবনের নৈবেদ্য আপন ঐক্যকে বিশিষ্টতাকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করে তুলতে পারে যদি তার সেই সৌভাগ্য ঘটে। অর্থাৎ যদি তার গূঢ়াহিত প্রবর্তনার সঙ্গে তার অবস্থা তার সংস্থানের অনুকূল সামঞ্জস্য ঘটতে পারে, যদি বাজিয়ের সঙ্গে বাজনার একাত্মকতায় ব্যবধান না থাকে। আজ পিছন ফিরে দেখি যখন, তখন আমার প্রাণযাত্রার ঐক্যে সেই অভিব্যক্তকে বাইরের দিক থেকে অনুসরণ করতে পারি; **সেই সঙ্গে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি তাকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে যে অদৃশ্য পুরুষ একটি সংকল্পধারায় জীবনের তথ্যগুলিকে সত্যসূত্রে গ্রথিত করে তুলছে।**

(আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, ১ বৈশাখ ১৩৪৭)

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং ধ্রুবম্। ৪।৪।২০

অন্তহীন কার্যকারণের ক্লান্তিকর শাখাপ্রশাখা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান বলিল—

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।

বিচিত্র বিশ্বের চঞ্চল বহুত্বের মধ্যে এই অপরিমেয় ধ্রুবকে একধাই দেখিতে হইবে।

(প্রাচীন ভারতের একঃ, ধর্ম, ১৩০৮)

আমরা যখন সৈন্যদলকে চলিতে দেখি তখন একদিকে দেখি প্রত্যেকে আপন সীমার দ্বারা স্বতন্ত্র, আর-এক দিকে দেখি প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট মাপ রাখিয়া ওজন রাখিয়া চলিতেছে। সেইখানেই সেই পরিমাণের সুষমার ভিতর দিয়া জানি ইহাদের ভেদের মধ্যেও একটি এক প্রকাশ পাইতেছে : সেই এক যতই পরিস্ফুট এই সৈন্যদল ততই সত্য। বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করিয়া পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ও অবশেষে পরস্পরকে পায়ের তলায় দলাদলি করিয়া চলে তখন বহুকেই দেখি, এককে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই দেখি ভূমাকে দেখি না—অথচ এই ভূমার রূপেই কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ।

নিছক বহু কী জ্ঞানে, কী প্রেমে, কী কর্মে, মানুষকে ক্লেশ দেয়, ক্লান্ত করে; এজন্য মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে—নহিলে তার মন মানে না, তার সুখ থাকে না, তার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তার বিজ্ঞানের বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায়

তখন সৌন্দর্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে এককে পাইবার জন্য।

(ছবির অঙ্গ, বিচিত্র প্রবন্ধ, আষাঢ় ১৩২২)

একখণ্ড লোহার রহস্যভেদ করে বৈজ্ঞানিক বলেছেন, সেই টুকরোটি আর-কিছুই নয়, কতকগুলি বিশেষ ছন্দের বিদ্যুৎমণ্ডলীর চিরচঞ্চলতা। সেই মণ্ডলীর তড়িৎ-কণাগুলি নিজেদের আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে সহজ দৃষ্টিতে যদি সেইরকম দেখা যেত, তাহলে মানবমণ্ডলীতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন পৃথক দেখি তেমনি তাদেরও দেখতুম। এই অণুগুলি যত পৃথকই হোক এদের মধ্যে একটা শক্তি কাজ করছে। তাকে শক্তিই বলা যাক। সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে ঐ লোহখণ্ডের সংঘশক্তি। আমরা যখন লোহা দেখছি তখন বিদ্যুৎকণা দেখছি নে, দেখছি সংঘরূপকে। বস্তুত, এই-যে লোহার প্রতীয়মানরূপ এ একটা প্রতীক। বস্তুটা পরমার্থত যা, এ তা নয়। অন্যবিধ দৃষ্টি যদি থাকে তবে এর প্রকাশ হবে অন্যবিধ। দশটাকার নোট পাওয়া গেল, বিশেষ রাজত্বে তার বিশেষ মূল্য। একে দেখবা মাত্র যে জানে যে, এই কাগজখানা স্বতন্ত্র দশসংখ্যক টাকার সংঘরূপ, তা হলেই সে একে ঠিক জানে। কাগজখানা ঐ সংঘের প্রতীক।

আমরা যাকে চোখে দেখছি লোহা সেও প্রকাশ করছে সেই সংঘকে যাকে চোখে দেখা যায় না, দেখা যায় স্থূল প্রতীকে। তেমনি ব্যক্তিগত মানুষগুলির মধ্যে দেশ-কালের ব্যবধান যথেষ্ট, কিন্তু সমস্ত মানুষকে নিয়ে আছে একটি বৃহৎ এবং গভীর ঐক্য। সেই ইন্দ্রিয়বোধাতীত ঐক্য সাংখ্যিক সমষ্টিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে অতিক্রম করে। সেই হচ্ছে সমস্তের এক গূঢ় আত্মা, একধৈবানুদ্রষ্টব্যঃ, কিন্তু বহুধাশক্তিযোগে তার প্রকাশ।

(মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায়। ৪।৪।২২

সহস্র বিভীষিকা ও বিস্ময়ের মধ্যে দেবতা-সন্ধানশ্রান্ত ভক্তি তখন বলিল—এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

এই একই সকলের ঈশ্বর, সকল জীবের অধিপতি, সকল জীবের পালনকর্ত্তা—এই একই সেতুস্বরূপ হইয়া সকল লোককে ধারণ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন।

(প্রাচীন ভারতের একঃ, ধর্ম, ১৩০৮)

আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনোই প্রমত্ত নন; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্তকাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্ছে: এষ সেতুর্বিধরণো লোকানামসম্ভেদায়।

(সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন)

ভারতের মরমিয়া কবিরা শাস্ত্রনির্ম্মিত পাথরের বেড়া থেকে ভক্তের মনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রেমের অশ্রুজলে দেবমন্দিরের অঙ্গন থেকে রক্তপাতের কলঙ্করেখা মুছে দেওয়া ছিল তাঁদের কাজ। যাঁর আবির্ভাব ভিতরের থেকে আনন্দের আলোকে মানুষের সকল ভেদ মিটিয়ে দেয়, সেই রামের দূত ছিলেন তাঁরা। ভারত ইতিহাসের নিশীথরাত্রে ভেদের পিশাচ যখন বিকট নৃত্য করছিল তখন তাঁরা সেই পিশাচকে স্বীকার করেন নি। ইংরেজ মরমিয়া কবি যেমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে, বিশ্বের মর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী আনন্দলক্ষ্মীই মানুষকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন, তেমনি তাঁরা নিশ্চয় জানতেন যাঁর আনন্দে তাঁরা আপনাকে অহমিকার বেষ্টন থেকে ভাসিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাঁরই আনন্দে মানুষের ভেদবুদ্ধি দূর হ'তে পারবে; বাইরের কোনো রফারফি থেকে নয়। তাঁরা এখনো কাজ করচেন। আজও যেখানে কোথাও হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক প্রেমের যোগ দেখি সেখানে দেখ্‌তে পাই তাঁরাই পথ ক'রে দিয়েচেন। তাঁদের জীবন দিয়ে গান দিয়ে **সেই মিলনদেবতার পূজাপ্রতিষ্ঠা হয়েচে যিনি "সেতুর্বিধরণরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।"** তাঁদেরই উত্তরসাধকেরা আজও বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে একতারা বাজিয়ে গান গায়; তাদের সেই একতারার তার ঐক্যেরই তার। ভেদবুদ্ধির পাণ্ডা শাস্ত্রজ্ঞের দল তাদের উপর দণ্ড উদ্যত করেচে। কিন্তু এতদিন যারা সামাজিক অবজ্ঞায় মরে নি, তারা-যে সামাজিক শাসনের কাছে আজ হার মানবে এ-কথা বিশ্বাস করি নে।

যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম, নানা জাতি, সেইজন্যেই ভারতের মর্ম্মের বাণী হচ্চে ঐক্যের বাণী। সেইজন্যেই যাঁরা যথার্থ ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁরা মানুষের আত্মায় আত্মায় সেতু নির্ম্মাণ করতে চেয়েচেন।

(ক্ষিতিমোহন সেনের "দাদূ" গ্রন্থের কবি-রচিত ভূমিকা)

শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা.........৪।৪।২৩

চীরধারী যে-একটি দল নিজেকে সাধু ও সাধক বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা গাঁজার নেশাকে আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের সাধনা বলিয়া মনে করে। নেশায় একাগ্রতা জন্মে, উত্তেজনা হয়, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক স্বাধীন সবলতা হ্রাস হইতে থাকে। আর-সমস্ত ছাড়া যায়, কিন্তু এই নেশার উত্তেজনা ছাড়া যায় না—ক্রমে মনের বল যত কমিতে থাকে নেশার মাত্রাও তত বাড়াইতে হয়। ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বা সশব্দে বাদ্য বাজাইয়া, নিজেকে উদ্‌ভ্রান্ত ও মূর্চ্ছান্বিত করিয়া, যে ধর্ম্মোন্মাদের বিলাস সম্ভোগ করা যায় তাহাও কৃত্রিম। তাহাতে অভ্যাস জন্মিয়া গেলে, তাহা অহিফেনের নেশার মতো আমাদিগকে অবসাদের সময় কেবলই তাড়না করিতে থাকে। আত্ম-সমাহিত শান্ত একনিষ্ঠ সাধনা ব্যতীত যথার্থ স্থায়ী মূল্যবান কোনো জিনিস পাওয়া যায় না ও স্থায়ী মূল্যবান কোনো জিনিস রক্ষা করা যায় না।

(ব্রাহ্মণ, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩০৯)

সফলতার সবচেয়ে বড়ো শত্রু হল প্রবল উদ্যমশীলতা। যে-শক্তি জয়লাভ করে,

তা শান্ত। তার সম্বৃত তেজের অন্তরেই অক্ষয় সম্পদ্ বিরাজ করে। লোভ নিজেকেই নিজে ক্ষয় করে, সে যদি দেবত্বের প্রতি লোভ হয়, তাও।

(রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী, অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমতী মলিনা রায়, ২৩ মে ১৯১৪)

আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্বমাত্মানং পশ্যতি। ৪।৪।২৩

আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—নয়, কেবল আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়, সেই দেখাই আবার সর্বত্রেই।

(ওঁ, শান্তিনিকেতন, ১৫ চৈত্র ১৩১৫)

সত্যকে তিনিই জানেন যিনি আপনাকেই জানেন সকলের মধ্যে।

(°ক্ষিতিমোহন সেনের "দাদূ" গ্রন্থের কবি-রচিত ভূমিকা)

স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো। ৪।৪।২৫

আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকা.........

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।৭।১

ধর্ম মানুষের পূর্ণ শক্তির অকুণ্ঠিত বাণী, তাহার মধ্যে কোন দ্বিধা নাই। সে মানুষকে মূঢ় বলিয়া স্বীকার করে না, দুর্ব্বল বলিয়া অবজ্ঞা করে না। সেই তো মানুষকে ডাক দিয়া বলিতেছে, তুমি অজর, তুমি অশোক, তুমি অভয়, তুমি অমৃত। সেই ধর্মের বলেই মানুষ যাহা পারে নাই তাহা পারিতেছে, যাহা হইয়া উঠিরে বলিয়া কোনদিন স্বপ্নেও মনে করে নাই একদিন তাহাই হইয়া উঠিতেছে।

(ধর্মের অধিকার, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

আত্মা অজর অমর অমৃত অভয় ব্রহ্ম।

(°ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমায় উদ্ধৃত কবির বচন)

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ৬।৩।৬

আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।

ভারতবর্ষে এই উদ্বোধনের যে মন্ত্র আছে, তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা এক

নিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়—তাহা গায়ত্রী মন্ত্র। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব—গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ—চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়। মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী—আমি কোনো বিশেষ-প্রদেশবাসী নহি—আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোকলোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য, তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্য গ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন—স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধগৃহ ছাড়িয়া প্রত্যূষে একবার উন্মুক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্য সাধু দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃ-স্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্য জ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কী মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি।

এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ, তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে এই মুহূর্তে এবং প্রতি-মুহূর্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য নিজে আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছেন, সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন—যে শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের, এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।

ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই যে প্রাচীন বৈদিকপদ্ধতি ইহা যেমন উদার, তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার-কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। বাহিরের বিশ্বজগৎ এবং অন্তরের ধী, ইহা কাহাকেও কোথাও অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় না—ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জগৎকে এবং এই বুদ্ধিকে তাঁহার অশ্রান্তশক্তি দ্বারা তিনি অহরহ প্রেরণ করিতেছেন, এই কথা স্মরণ করিলে তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেমন

গভীরভাবে সমগ্রভাবে একান্তভাবে হৃদয়ংগম হয়, এমন আর কোন্ কৌশলে, কোন্ আয়োজনে, কোন্ কৃত্রিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোনো স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সংকীর্ণতা নাই।

(ধর্মের সরল আদর্শ, ধর্ম, ১৩০৯)

বিশ্বসবিতা এই সমস্ত ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোককে যেমন প্রত্যেক নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন—তেমনি তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেষে প্রেরণ করিতেছেন—তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি —তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া সেই চেতনস্বরূপকে ধ্যান করি।

(নববর্ষ, ধর্ম, ১৩০৯)

আমি যেভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি—আমি এখন কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতিমুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই-যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃ স্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব? ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি। সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুণ আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম রূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতা রূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এই দুইই একই শক্তির বিকাশ—ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে—এইজন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব :

(শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড,
২৭ কার্ত্তিক ১৩০৯)

গায়ত্রীমন্ত্রে তাই তো শুনতে পাই সেই বিশ্বসবিতার ভর্গ তাঁর তেজ তাঁর শক্তি ভূর্ভুবঃ স্বঃ হয়ে কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলই ধীরূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ হচ্ছে। কেবলই উঠছে, কেবলই আসছে সুরের পর সুর, সুরের পর সুর।

(শোনা, শান্তিনিকেতন, ৫ পৌষ ১৩১৫)

আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবঃ স্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি একদিকে ভূর্ভুবঃ স্বঃকেও সৃষ্টি করছেন আর-এক দিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজন্য তিনি ওঁ।

(ওঁ, শান্তিনিকেতন, ১৫ চৈত্র ১৩১৫)

আমার চৈতন্য ও বুদ্ধিযোগে যে-কিছু জ্ঞান আমি পাচ্ছি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছি—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের ধীশক্তিসকল প্রেরণ করছেন। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড এক করে রয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে ছাড়া কোনো জ্ঞান, আর কোথা পাব! কিন্তু সেই সঙ্গে যেন এই বোধটুকু পাই যে তিনিই দিচ্ছেন।

(নমস্তেঽস্তু, শান্তিনিকেতন, ২৬ চৈত্র ১৩১৫)

যে-ব্রহ্মের শক্তি আমার অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই নিজেকে উৎসর্জন করছে, যিনি 'আত্মদা', আমি জলে-স্থলে-আকাশে সুখে-দুঃখে সর্বত্র সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি, এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে তুলতে হবে। এই সাধনার ধ্যানই হচ্ছে গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্ছে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে এবং চলতে শেখা।

(দুর্লভ, শান্তিনিকেতন, ১৩১৬)

বড়োর মধ্যেই আমাদের বাস এই সত্যটি স্মরণ করবার জন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আছে : ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।

(সত্যবোধ, শান্তিনিকেতন, ১৩১৯)

নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে-জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে, সেটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি;

(পিতৃদেব, জীবনস্মৃতি, ১৩১৯)

গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু-একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মতো এমন কোনো-একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পেঁছায় না।

(পিতৃদেব, জীবনস্মৃতি, ১৩১৯)

বন্ধ ঘরে কেরোসিন জ্বলছে, সমস্ত রাত সেখানে অনেকে মিলে ঘুমোচ্ছে, দূষিত বাষ্পে ঘর ভরা—তখন যদি দরজা জানলা খুলে দিয়ে বন্ধ-আকাশকে অসীম-আকাশের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে সমস্ত সঞ্চিত তাপ এবং গ্লানি তখনি দূর হয়ে যায়। তেমনি আপনার বন্ধ চিত্তকে ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোকে পরম চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেই তার চারিদিকের পাপসঞ্চয় সহজেই বিলীন হয়—এই মুক্তির সাধনা ভারতবর্ষের।

(খৃষ্টধর্ম, খৃষ্ট, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, পৌষ ১৩২১)

একজন আধুনিক জাপানি রূপদক্ষের রচিত একটি ছবি আমার কাছে আছে। সেটি যতবার দেখি আমার গভীর বিস্ময় লাগে। দিগন্তের রক্তবর্ণ সূর্য—শীতের বরফ-চাপা শাসন সবে মাত্র ভেঙে গেছে, প্লাম গাছের পত্রহীন শাখাগুলি জয়ধ্বনির বাহুভঙ্গির মতো সূর্যের দিকে প্রসারিত, সাদা সাদা ফুলের মঞ্জরিতে গাছ ভরা। সেই প্লাম গাছের তলায় একটি অন্ধ দাঁড়িয়ে তার আলোকপিপাসু দুই চক্ষু সূর্যের দিকে তুলে প্রার্থনা করছে।

আমাদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন : তমসো মা জ্যোতির্গময়, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও। চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে তাঁরা জ্যোতি বলেছেন। তাঁদের ধ্যান-মন্ত্রে সূর্যকে তাঁরা বলেছেন : ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, আমাদের চিত্তে তিনি ধীশক্তির ধারাগুলি প্রেরণ করছেন।

(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪)

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোটো ছোটো সীমার মধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। এমন অবস্থায় মানুষ স্বার্থপরভাবে কাজ করে, গ্রাম্যভাবে চিন্তা করে, ও সঙ্কীর্ণ সংস্কারের অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত অনুদারভাবে নিজের রাগদ্বেষকে প্রচার করে। এইজন্যই দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়াও নিজেকে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অন্তত একবার করিয়াও এ কথা বুঝিতে হইবে যে কোনো ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডেই আমার চিরকালের দেশ নহে, সমস্ত ভূর্ভুবঃ স্বঃ আমার বিরাট আশ্রয়; অন্তত একবার করিয়াও অন্তরের মধ্যে এই কথাটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হইবে যে, আমার ধীশক্তি আমার চৈতন্য কোনো একটা কলের জিনিষের মতো আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বন্ধ নহে, জগদ্ব্যাপী

ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে।

(ধর্ম্মের নবযুগ, সঞ্চয়, চৈত্র ১৩৩৫)

বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব-কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময়ে উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না। বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হ'ত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।

এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এইরকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।

(মানবসত্য, মানুষের ধর্ম, ১৩৪০)

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ॥ তার অর্থ সম্পূর্ণতা। এই শব্দটি যথার্থই অনন্ত, সম্পূর্ণ, চিরন্তনের অর্থবাহী প্রতীক শব্দ। এই শব্দের ধ্বনি সম্পূর্ণ ধ্বনি, তা সকল বস্তুর সমগ্রতাকে বোঝায়।

আমাদের সকল ধ্যান ওঁ-তে শুরু হয় এবং ওঁ-তে শেষ হয়। এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যার ফলে মন অনন্ত সম্পূর্ণতার ব্যঞ্জনায় পূর্ণ হয় এবং সংকীর্ণ স্বার্থের জগৎ থেকে মুক্ত হয়।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ॥ ভূঃ শব্দের অর্থ এই পৃথিবী।
ভুবঃ শব্দের অর্থ মধ্যদেশ—আকাশ।
স্বঃ শব্দের অর্থ তারকাশোভিত গগনক্ষেত্র।

পৃথিবী, আকাশ, তারকাশোভিত গগন। আপনাকে এই বিশ্বের হৃদয়দেশে আপনার মনকে স্থাপন করতে হবে। আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আপনি অনন্তে জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনি এই পৃথিবীর কোনো বিশেষ স্থানের অন্তর্ভুক্ত নন, আপনি সমগ্র জগতের অন্তর্ভুক্ত।

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি॥

বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তার পূজনীয় শক্তির আমি ধ্যান করি। সৃষ্টিকর্ত্তা শব্দটির নিরন্তর ব্যবহারে তার অর্থ মলিন হয়েছে। কিন্তু আপনাকে আপনার চেতনদৃষ্টিতে সব-কিছুর বিশালতা অনুভব করতে হবে, এবং তারপর বলতে হবে, ঈশ্বর তাঁর অনন্ত সৃজনীশক্তির বলে নিরন্তর প্রতিমুহূর্ত্তে এই জগতকে সৃষ্টি করছেন, তা একটি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার ফল নয়।

সব-কিছুই সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত ইচ্ছার প্রতিনিধি। তা মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের মতো নয়; আমি যাকে অর্চনা করতে পারি না অথবা যা আমার পূজা দাবি করতে পারে না, এমন বিমূর্ত বস্তুমাত্র নয়। কিন্তু এই মন্ত্র বলেছেন যে এই শক্তি পূজনীয়, তা এক মহান্ পুরুষের শক্তিবলে আমাদের পূজা দাবি করে। তাই এই শক্তি নিছক বিমূর্ততা নয়।

এই শক্তির প্রকাশ কী?

এই শক্তি একদিকে পৃথিবী, আকাশ ও নক্ষত্রশোভিত গগন; অপরদিকে তা আমাদের চেতনা।

আমার সঙ্গে জগতের চিরন্তন সম্পর্ক রয়েছে, কারণ আমার চেতনায় এই জগতের অপরদিকটি রয়েছে। যদি তার উৎস ও কেন্দ্রে কোনো মহান্ চেতনা ও চেতনসত্তা না থাকত, তবে জগতের সৃষ্টি হত না।

ঈশ্বরের শক্তি আমার চেতনায় ও বাহির বিশ্বে নিঃসৃত ও প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ আমরা নিজেরাই একে বিভক্ত করি। কিন্তু সত্যি বলতে কি সৃষ্টির এই দুটি দিক অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ, কারণ তারা একই উৎস থেকে যাত্রা শুরু করেছে।

এই ভাবেই এই ধ্যানের অর্থ হচ্ছে, আমার চেতনা ও আমার বাইরে বিশাল জগৎ এক। এই ঐক্য কোথায়?

ঐক্য রয়েছে মহাশক্তিতে। তিনি আমার মধ্যে ও আমার বাইরেকার জগতে চেতনাকে প্রবাহিত করেন।

এই ধ্যানের অর্থ আমাতে কিছু গ্রহণ করা নয়, আমাকে বর্জন করা ও সকল সৃষ্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

এই আমাদের মন্ত্র। আমরা এতেই আমাদের মনকে নিবিষ্ট করি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের মন নিবিষ্ট হয় ও বাইরের আকর্ষণ দূরীভূত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বারবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করি। তার ফলে কোনো ক্ষতি, কোনো ভয়, কোনো যন্ত্রণা আমাদের স্পর্শ করতে পারে না, মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সরল ও স্বাভাবিক হয়, আমরা মুক্ত হই। এই হল ধ্যান—এই সত্যে নিমজ্জিত হওয়া, এর মধ্যে জীবন ধারণ ও চলাফেরা করা, এবং এর মধ্যে আমাদের সত্তাকে লাভ করাই আমাদের ধ্যান।

(May 1917-এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত Meditation. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব, অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা,
যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনাধারা—
তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।

(রূপান্তর)

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ৬।৩।৬

বায়ু মধু বহন করিতেছে। নদী সিন্ধু সকল মধুক্ষরণ করিতেছে। ওষধী বনস্পতি সকল মধুময় হউক। রাত্রি মধু হউক, ঊষা মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হউক। সূর্য মধুমান হউক।

(বর্ষশেষ, ধর্ম, ১৩০৮)

কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে, কত প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোকবিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতিমগ্ন হইতেছে, কত কুবেরের ভাণ্ডার ভগ্নস্তূপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে—কিন্তু হে আনন্দময়, এই-সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে 'মধু বাতা ঋতায়তে' বায়ু মধু বহন করিতেছে, 'মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' সমুদ্রসকল মধুক্ষরণ করিতেছে—তোমার অনন্ত মাধুর্যের কোনো ক্ষয় নাই, তোমার সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপ বিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক।

মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্তম্ উতোষসঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

'ওষধিরা আমাদের পক্ষে মাধ্বী হউক, রাত্রি এবং ঊষা আমাদের পক্ষে মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান হউক, এই-যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ইহা আমাদের পক্ষে মধু হউক, সূর্য মধুমান্ হউক এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধ্বী হউক।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মাঘ ১৩১১)

বৈরাগ্যে যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়, তখন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে হচ্ছিল, যারা পদে পদে আমাদের পথরোধ করছিল, তারা প্রত্যেকে সেই ভূমার প্রতিই আমাদের বহন করে, রোধ করে না।

তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁধে রাখে না—সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। এই মৃত্যুরই সৎকার মন্ত্র হচ্ছে—মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ।

বায়ু মধু বহন করছে, নদীসিন্ধুসকল মধুক্ষরণ করছে। ওষধি বনস্পতিসকল মধুময় হ'ক, রাত্রি মধু হ'ক, ঊষা মধু হ'ক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হ'ক, সূর্য মধুমান হ'ক।

যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জলস্থল-আকাশ, জড়জন্তু মনুষ্য সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তখন আনন্দের অবধি নেই।

(বৈরাগ্য, শান্তিনিকেতন, ১৫ ফাল্গুন ১০১৫)

যেদিন বিশ্বব্যাপী অমৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠবার দিন, সেইদিনকারই আনন্দমন্ত্র হচ্ছে—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

এই আনন্দমন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সমস্তকে অমৃতে অভিষিক্ত করে মধুময় করে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন। সত্যম্—তিনি সত্য, অতএব সমস্ত তাঁর মধ্যে সত্য, এই শ্রদ্ধা যেদিন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, সেই দিনই আমরা বলতে পারি আনন্দম্—তিনি আনন্দ এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ।

(মাতৃশ্রাদ্ধ, শান্তিনিকেতন)

.........আজও প্রতি শ্রাদ্ধকালে উচ্চারিত ঋষি গোতমের সেই মন্ত্রটি মনে পড়চে। —বায়ুতে চলচে অমৃতের বন্যা, সেই বন্যাই নদীতে সাগরে। ওষধির নৃত্যে, উষা-সন্ধ্যায় ধীরপদসঞ্চারে, পৃথিবীর ধূলায়, দ্যুলোকের মহত্ত্বে, বনস্পতির ছায়ায়, সূর্যের আলোয়, সর্বজীবে আজ সেই অমৃতকেই প্রত্যক্ষ করতে চাই। আমাদের ছন্দ দিয়ে বিশ্বছন্দের সেই অমৃত-প্লাবনকে উপলব্ধি করতে হবে।

ছন্দের এই অমৃতলীলা শুধু তো মর্ত্যলোকেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্তরীক্ষে বা দ্যুলোকে সর্বত্রই এই লীলা।

অন্তরীক্ষের নাম রোদসী বা ক্রন্দসী। এই রোদন বা ক্রন্দনের এই হেতু যে, সেখানে (শূন্য অন্তরীক্ষে) সেই প্রকাশের কোনো উপায় নেই। পৃথিবীতে নদী সমুদ্র, গিরি দরী, বৃক্ষ লতা, জীব মানব নানারূপে সেই ছন্দের প্রকাশ আছে। দ্যুলোকে জ্যোতির্ময় গ্রহ-চন্দ্র-তারা-সৌরমণ্ডলে সেই ছন্দ দীপ্যমান। কিন্তু শূন্য অন্তরীক্ষে প্রকাশ হবে কিসে? সেখানে অব্যক্ত-গায়ত্রীর ছন্দের বেদনায় সব শূন্যতা ভ'রে রয়েচে। সেই বেদনায় সব আকাশ বেদনাময়।

(°ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

শ্রাদ্ধকালের 'মধুবাতা' মন্ত্র এক অপূর্ব মন্ত্র। মৃত্যুর সঙ্গে আনন্দময় অনন্ত জীবনের কোথাও অসঙ্গতি নেই, জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের যোগেই পূর্ণ—

(°ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত কবির বচন।)

পরিশিষ্ট

'ক'-চিহ্নিত অংশ—° ক্ষিতিমোহন সেনের "বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা"য়
উদ্ধৃত কবির বচন।

'খ'-চিহ্নিত অংশ—° ক্ষিতিমোহন সেনের "দাদূ" গ্রন্থের
কবি-রচিত ভূমিকার অন্তর্গত।

ঈশোপনিষৎ

জগত্যাং জগৎ ১

চরাচর সম্বন্ধে তাঁরা যে 'জগৎ' ও 'সংসার' শব্দ ব্যবহার করেছেন তাতে তো গতিই বুঝায়। মায়াবাদীরা অবশ্য সেই কারণেই জগৎ ও সংসারকে মায়া বলেছেন, কিন্তু বেদে সত্যের যে মহনীয় নাম **'ঋত'** তা'তো 'ঋ' ধাতু হতেই নিষ্পন্ন। 'ঋ' অর্থই তো গতি।

(ক)

ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা ১

যা পাওয়া যায় তার মধ্যে তো অসীমতা নেই। জগতে তো কেউ পূর্ণ সার্থকতা (achievement) পায় না। প্রত্যক্ষ ফলরূপে যা মেলে তা ক্ষুদ্র, সাংসারিক হিসাবে তাতে যত লাভই দেখা যাক না কেন! আর ত্যাগে যা পাই তার আর শেষ নেই।

....

অনাসক্ত হয়ে যে ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়তে পারে সে-ই আপনার অসীম স্বরূপকে পায়। যারা শুধু ফল পেয়ে বিষয় পেয়েই খুসি তারা তো বণিক্। ত্যাগীর কাছে এই খুসির কোনো মূল্য নেই। দেবার মুক্তির জন্যই সে ব্যাকুল। পেতে হলেই থামতে হয়। পাওয়া সম্পদ্ নানা ভাবে নানা দিকে জড়িয়ে ধরে। কাজেই বন্ধনের মধ্যে ধীরে ধীরে পচে মরতে হয়। আর দেওয়া মানেই চলা। চলার আনন্দেই তার সার্থকতা।

(ক)

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো ৪

আমাদের দেশের কেন্দ্র-ধ্যানী যোগীর দল যাকে বল্লেন স্থির—একদল দার্শনিক তাকেই বল্লেন সত্য স্থির ধ্রুব। আর একদল বিশ্লেষণ-যুক্তিপরায়ণ দার্শনিক বল্লেন—কিছুই স্থির নয়। সবই ক্ষণে আসচে ক্ষণে যাচ্চে। বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদে ত স্থির সত্য বলে কিছুই দাঁড়ায় না। তাঁরা বৈনাশিকের দল। অর্থাৎ সব কিছুই প্রতিক্ষণে হচ্চে ও প্রতিক্ষণেই নষ্ট হচ্চে, বিনাশপ্রাপ্ত হচ্চে। তাঁদের মতো গতিবাদী দল জগতে আজও কোথাও জন্মান নি।...........

উপনিষৎ বলেচেন, 'না চলেও তা মন হতেও বেগগামী',—

(ক)

অদৃশ্য বলে যা মনে হচ্ছে যেন অচল, তাও চিন্তার ও মনের চেয়ে বেশি বেগে ধাবমান।

(ক)

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে ৫

পরম সত্যকে 'চলচে' ও 'চলচে না' এই দুইই বলা চলে। উপনিষৎ তাই বলেচেন, 'তা চলচে, তা চলচে না'।

(ক)

আমাদের দেশের দার্শনিকেরা ভুল যে করেচেন তা বলচি নে। সূর্যচন্দ্রকে দূর হতে দেখলে মনে হয় অচল, সামনে গেলে দেখা যায় তাদের প্রচণ্ডগতি। কাজেই এই আমাদের দুই রকমের সিদ্ধান্তের মধ্যে দূর বা নিকট থেকে দেখায় একই সত্য আপেক্ষিকভাবে দুই সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েচে—

'তাই সচল, আবার তাই অচল, তাই দূরে, তাই নিকটে'।

(ক)

প্রাণলীলায় বিশ্বচক্র পরিধির মত ক্রমাগত ঘুরচে। বিশ্রাম আছে তার কেন্দ্রে। সেই বিশ্বকেন্দ্রেই পরমাত্মা। তাই পরমসত্যকে চলচে ও চলচে না, দুইই বলা চলে।

(ক)

যাকে আমরা গতি-হীন স্থিরতা ও স্তব্ধতা বলি তাকেও ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে তার মধ্যে গতি ধরা পড়বে। উপনিষদের বাণীতেও বুঝি চলা ও না-চলা দুইই একই সত্যের দুই রকম প্রকাশ। দূর থেকে দেখলে যা স্থির মনে হয়, সামনে গিয়ে দেখলে দেখা যায় তাই সচল।

এই কথাই ঈশ-উপনিষৎ বল্লেন—

তদেজতি তন্নৈজতি
তদ্‌দূরে তদ্‌ উ অন্তিকে।

আমি আমার Personalityতে বলেছি—স্তব্ধতা আর কিছুই নয়, শুধু সুরকে অতিশয় ঠায় করে শোনা, যেমন সা...............। তবে তার আদ্যন্ত জলদ করে গাইলে তাই খুব ঠাসা সচল সুরে বেজে ওঠে।

(ক)

শংকরাচার্য ব্রহ্মকে স্থির ও গতিকে মায়া বলেছেন। কিন্তু উপনিষৎ তো এমন কোনো ভাগাভাগি করে বলেন নি। উপনিষদের কাছে কোনো বিরোধ নেই। তাঁরা বল্লেন—'তা-ই চলে, তা-ই চলে না'।

আপনাকে প্রকাশ করা ছাড়া সত্যের অর্থই হয় না। প্রকাশ না থাকলে আর সত্তা কি?

(ক)

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ ৮

আমাদের দেশের কেন্দ্র-ধ্যানী যোগীর দল বল্লেন স্থির—একদল দার্শনিক তাকেই বল্লেন সত্য স্থির ধ্রুব। আর একদল বিশ্লেষণ-যুক্তিপরায়ণ দার্শনিক বল্লেন—কিছুই

স্থির নয়। সবই ক্ষণে আসচে ক্ষণে যাচ্চে। বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদে তো স্থির সত্য বলে কিছুই দাঁড়ায় না। তাঁরা বৈনাশিকের দল। অর্থাৎ সব কিছুই প্রতিক্ষণেই হচ্চে ও প্রতিক্ষণেই নষ্ট হচ্চে, বিনাশপ্রাপ্ত হচ্চে। তাঁদের মতো গতিবাদী দল জগতে আজও কোথাও জন্মান নি।

ধ্যানী-যোগীরা না মানলেও কবি-শিল্পীর দলকে গতি মানতেই হবে। ঋগ্বেদের একটি সূক্ত আমার বড় ভালো লাগে। তা হচ্চে বাক্ বা বাণীর সূক্ত। বাক্‌ই হচ্চেন প্রকাশ। সেই বাণী বলচেন, 'বিশ্বভুবনে সর্ব রূপ ও সৌন্দর্য রচনা করতে-করতে আমি বায়ুর মত সদাই সম্মুখের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেচি'। সূক্তটা আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু ঋগ্বেদের এই কথাটি পরম সত্য। বিশ্বরচনাও হচ্চে প্রকাশ, বাক্‌ও হচ্চে প্রকাশ। তাই এক হিসাবে বিধাতাই বাণীর অধিপতি কবি। উপনিষৎ তো বিধাতাকে **কবিই** বলেচেন। কবি হয়ে রূপে ও রসে ভগবান সকলের মনকে আকর্ষণ করচেন আর বিশ্বচরাচর হয়ে তিনি নিয়মের দ্বারা সকলের প্রভু হয়েচেন। শক্তিতে তিনিই সকলকে চালিত করচেন।

আমার কাছে তাঁর সচল বৈচিত্র্য ও তাঁর অচল ধ্রুব শান্ত স্বরূপ দুইই পাশাপাশি-ভাবে বিরাজিত হয়ে অপরূপ চমৎকার লাগে। তবে কবিরূপে আমি তাঁর সদাসচল বৈচিত্র্যকে স্মরণ না করে পারি নে।

(ক)

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তেদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ ১১

ছেলেবেলা থেকে একটা ভাবাবেগ আমাকে পূর্ণ করে (idea posses) রয়েছে, তাকে আমি নানা আকার দিয়েচি। অল্প বয়সে আমার সেই ভাবাবেগকে কোনো রকমে আঁকু বাঁকু ক'রে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।

মায়ামোহত্যাগী এক সন্ন্যাসী ভালবাসার বাঁধন সীমার শৃঙ্খল ছিঁড়তে চায়। জীবনের সব আনন্দকে তুচ্ছ মায়ামোহ ক্ষুদ্র মনে করে সব ছেড়ে পর্বতগহ্বরে তপস্যার জন্য সে গেল। আপনাকে কেন্দ্র করে কী নিরানন্দে তার দিনগুলি তখন চলচে। ঘটনাক্রমে একটি নিরাশ্রয় বালিকার দিকে তার স্নেহধারা ধাবিত হল। তখন মায়ার দূতী মনে করে ক্রোধে তাকে সে ত্যাগ করল। সে কী অন্তর্দ্বন্দ্ব (struggle)! কিন্তু, হায়, সন্ন্যাসী যতই দূরে যায় ততই সেই বালিকাটির কান্নার ধ্বনি হৃদয়ে বাজে। এ যে প্রকৃত সত্য reality, বেদনাতেই তার অনুভব। সেই নতুন সুরে সন্ন্যাসী তখন সব দেখতে লাগল। সব প্রকৃতির আনন্দ তখন তার প্রত্যক্ষ হল।

তখন সে দেখল জীবনকে বর্জনে কোনো সার্থকতা নেই, গ্রহণেই তো সার্থকতা। এই সীমাকে পাওয়ার মধ্যেই অসীমকে স্পর্শ করা যায়। সীমার মধ্যে যে অসীম তাকেই প্রত্যক্ষ করা চলে। অসীমকে উপলব্ধি করবার আর তো কোনো উপায় নেই। তখন আমরা প্রত্যেকটি সীমার মধ্যেই সার সত্যকে (reality) দেখি। তখন দেখি

মায়া মোহ প্রভৃতি আমাদেরই রচিত কৃত্রিম সব বাধা, সত্যের আনন্দকে আড়াল করে সব দাঁড়িয়ে রয়েচে।

আমার এই ভাবটা প্রথমে অজ্ঞাতসারে পরে জ্ঞাতসারে উত্তরোত্তর আমার নানা কবিতায় বরাবরই দেখা দিয়েচে। চিরদিনই আমি এই কথাই বলচি যে সীমাতেই অসীম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি।

ঈশ-উপনিষদে আছে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে
অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো
য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

অর্থাৎ যাঁরা শুধু অবিদ্যাকে উপাসনা করেন তাঁরা অন্ধতমোলোকে প্রবেশ করেন আর যাঁরা শুধু বিদ্যাকে উপাসনা করেন তাঁরা আরও অন্ধতর লোকে প্রবেশ করেন। ঈশ-উপনিষৎ আরও বলেন—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

বিদ্যা অবিদ্যা উভয়কে যাঁরা যুক্ত করে দেখেন তাঁরাই সত্য দেখেন। সীমা হতে বিযুক্ত অসীম যেমন ব্যর্থ অসীম হতে বিযুক্ত সীমা তেমনই অর্থহীন। রূপ ছাড়া ভাব একটা অনর্থ (abstraction) মাত্র, আবার ভাবহীন রূপও একটা খাপছাড়া উন্মত্ততা। 'Absolute', 'Finite' এসব গায়ের জোরের কথা। বিশ্ব-চরাচরের কোথাও এইসব ঝুটা বুলির স্থান থাকলে এই সৃষ্টি হতেই পারত না।

যে বিষয়ী সে অন্ধ। যে সব কিছুকে ছেড়ে শূন্য অনন্তকে নিয়ে রৈল সে আরও অন্ধ। কারণ তার মধ্যে বস্তু (Content) কিছুই নেই। এইসব কথা আঠারো বছর বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখবার সময়ে বুঝি নি। তারপর না জেনে ও না বুঝে বারবার এই কথাই বলেছি। কে যেন আমাকে এই কথা না বলিয়ে ছাড়ে নি। পরে দেখেছি এই তত্ত্বই ভারতের সর্বতত্ত্বের সারতত্ত্ব।

এটা আমার তত্ত্ববাদ (Philosophy) মাত্র নয়। আমি কবি বলেই এটা বুঝেছি। প্রকাশের পূর্বের বেদনা যে কী তা আমি জানি। তারপর যখন সে বাণী হয়ে দেখা দেয় তখন যে কী আনন্দ তাও জানি। তার উদ্ভব এক অপূর্ব ব্যাপার। ছন্দ-সৌন্দর্য-সুর নিয়ে অপার অকূল সাগর হতে উর্বশীর মতো তার জন্ম। অব্যক্তের মধ্য হতে আজ ব্যক্তের উদ্ভব হল। অসীম যেই সীমায়-রূপে-সৌন্দর্যে-ছন্দে-সুরে ধরা দিল তখনই সে সত্য হল। তখনই পরমানন্দ। অসীমের মহিমাই সীমায়।

(ক)

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যামশ্নুতে॥ ১৪

জীবন-মৃত্যু সীমা-অসীম দুইই আছে। জীব ব্রহ্মে লয় হয়ে যায় এ কথা যাঁরা মানেন না তাঁরাও রাধা-কৃষ্ণ যুগল তত্ত্ব মানেন। এই যুগলের একটিকেও বাদ দিলে

চলে না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে এই দুইই আছে। রাধা ছাড়া কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ ছাড়া রাধার অর্থ কি? একটি আর একটিকে পূর্ণ করছে (Complementary)। প্রতি আত্মাতেই সীমা-অসীমের যুগললীলা রয়েছে। এই ভাবটাকে আমি প্রকাশও করেছি—

অসীম সে চাহে সীমার
নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হ'তে চায় অসীমের
মাঝে হারা।

সীমাও তো উপেক্ষণীয় নয়। তার মধ্য দিয়ে অসীম আপনাকে প্রকাশ করতে পারেন, নইলে অসীমের তো প্রকাশই হতে পারে না।

এর মধ্যে হয়তো একটা তত্ত্ব (Philosophy) আছে। অনেক সময় সেই তত্ত্ব জানি না বা বুঝি না। তাতে কিছু আসে যায় না। তত্ত্ব না বুঝলেও তার আনন্দ আমরা পেতে পারি।

(ক)

সীমা ছাড়া অসীমের প্রকাশ নেই, অসীম ছাড়া সীমারও সত্তা নেই।

(ক)

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫

মোহময় এই আচ্ছাদন হতে মুক্তি পেয়ে আপন স্বরূপ দেখাবার জন্যই তো ব্যাকুলতা এসেছিল মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মনে। 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের ভিতরের কথাই তো তাই। আর উপনিষদেও দেখি এই ব্যাকুলতা—'হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ-খানি ঢাকা পড়েচে। সত্যধর্মের উপলব্ধির জন্য সেই আবরণটি সরিয়ে দাও'।

অমৃতময় অপরূপ সুন্দর এই আচ্ছাদন হতে মুক্তি পাবার জন্য যদিও মন হয় আকুল, তবু আচ্ছাদনই মনকে ক্রমাগত টানে। যা অত্যন্ত অনাবৃত তার দিকে মন একটুও আকৃষ্ট হয় না।

(ক)

অলংকারশাস্ত্রমতেও শুদ্ধোচি কাব্যরসের জন্য যেমন একটুখানি আবরণ দরকার তেমনি একটুখানি অনাবরণও চাই। আবার অতিরিক্ত অনাবৃত হওয়াও দোষের। সেইজন্য ছন্দ একটি মধ্যপন্থা। সংগীতে যেমন অতি-ঢিলা তারে সুর বাজে না, তেমনি অতি-কড়া বাঁধনেও তার ছিঁড়ে যায়। ছন্দ হোলো সুরের মতো মধ্যলীলাময় আবরণ বা হিরণ্ময় পাত্র। বিশ্বরচয়িতা তাঁর মর্মসত্যকে এই হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে ঢেকে রেখেচেন। এই হিরণ্ময় পাত্রেই তিনি তাঁর আপন অমৃত-রস আমাদের পরিবেশন করেন।

(ক)

নাম-রূপের (form) মধ্যে দুটি জিনিষ রয়েছে। রূপ রয়েছে বলেই তার খানিকটা প্রকাশ পাচ্ছে, আর তার সেই রূপ দিয়েই খানিকটা আড়াল করেও রাখা হয়েছে। যা

আমরা দেখছি তাতেই তো তার অতীতকে তারই দেহ দিয়ে আড়াল করে রাখছে। রূপ হল হিরণ্ময় পাত্র। তাতেও তো সত্যকে আড়াল করে।

(ক)

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ১৬

এই কবিতা* রচনার দিন আমার মন সূর্যচন্দ্রতারার সঙ্গে যাত্রা করেছিল। কী নিবিড় সত্য সেদিন আনন্দ হয়ে আমাকে ধন্য করেছিল। বিশ্বনৃত্যমন্দাকিনীর স্নানে সেদিন শুদ্ধ শুচি হয়েছিলাম।

এই প্রত্যক্ষ সৃষ্টির আনন্দ পাবার জন্যই আমার মন-বলাকা সেই মানস-লোকে গিয়ে মানস-সরোবরে ধন্য হয়ে মন্দাকিনী-ধারায় পবিত্র হয়ে বার বার এই উপলব্ধিটি পেয়ে ধন্য হতে চায়। এ আনন্দ প্রকাশের আর কোনো ভাষা নেই।

আমার কাছে সেদিন আর রূপ-অরূপের কোনো বাধা ছিল না, যুগ-যুগান্তরের পরদা আমার দৃষ্টি হতে সরে গিয়েছিল। সেদিন আমি বলতে পেরেছি, 'তোমার কল্যাণতম যে রূপ, আজ তা আমার কাছে দীপ্যমান প্রত্যক্ষ। এই বিশ্ব-চরাচরে যে পুরুষ আমার মধ্যেও সেই পুরুষ, কোনো বাধা নেই কোনো ভেদ নেই।'

(ক)

'আমি' মানে ব্যক্তি-বিশেষ নয়।......আমি অর্থে ব্যক্ত জগতের প্রতিনিধি।

(ক)

আমি মানে সৃষ্টজগৎ। আমি সেই অসীমের প্রতিরূপ।

(ক)

শৈশব হতে যে ঐক্যধারা বেয়ে এসেছি তাকেই ব্যক্তিত্ব (Personality) বলেছি। তাতেই আমার আনন্দ। অসীমের ব্যক্তিত্ব (Personality) ও আমার ঐক্য-বোধের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংগতি (Harmony) আছে। দ্বৈতের মধ্যে ঐক্যকে নিবিড়ভাবে অনুভব করলেই আনন্দ ও প্রেম জাগে।

বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের যে প্রেম তার মধ্যেও বিচ্ছেদ আছে। কিন্তু বিচ্ছেদ সত্ত্বেও ঐক্যসূত্র আছে। বিশ্বের মূলেও এই সত্য। আমি একটা বৃহত্তর আমিরই প্রতিরূপ। আমার জীবনের মধ্যে জীবলোকের নাট্যলীলা চলেছে। আমার সত্তায় বিশ্বের সত্তা। 'আমি' মানে একটা বিচ্ছিন্ন আমি নয়। আমার জ্ঞান আমার প্রেম আমার আনন্দ সব মিলিয়ে যে আমিত্ব তাই হল যথার্থ আমি। আমিই সেই অসীমের মধ্যে দুঃখ-সুখের তরঙ্গ তুলেছি। আমি এসেছি বলেই এপারে-ওপারে যোগাযোগের সম্ভাবনা হয়েছে।

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হোতো যে মিছে।

(ক)

---

* বলাকার ৮নং কবিতা।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥ ১৭

দেহের পঞ্চভূত মরণান্তে বিশ্বের পঞ্চভূতে বিলীন হোক। তাই অগ্নিসংকার-কালে তাঁরা গম্ভীর মন্ত্রে বলেছেন,—এখন শরীর ভস্মসাৎ হোক, দেহবায়ু বিশ্ববায়ুতে বিলীন হয়ে অমৃত হোক, আমার কর্মময় চেতনা আজ কৃত কর্মকে স্মরণ করুক, তার তপস্যাকে স্মরণ করুক।

(ক)

কঠোপনিষৎ

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ ১।২।২

কল্যাণ ও মনোরম দুইই জগতে আছে, তাই এই সংসারে শ্রেয় প্রেয় দুইই মানুষের কাছে আসে। উপনিষৎ বললেন,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ

(ক)

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ। ১।২।২১

ঋষিরা বলেন, 'বসে থেকেও তা দূরে চলেচে। শয়ান হয়েও তা সর্বত্রগামী'।

(ক)

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। ২।৩।২

চরাচর সম্বন্ধে তাঁরা যে 'জগৎ' ও 'সংসার' শব্দ ব্যবহার করেচেন তাতে তো গতিই বুঝায়।................................তবে স্থিরত্বের কথাই বা বলবো কেন? চক্রের যেমন পরিধি ঘুরচে অথচ তার কেন্দ্র তো স্থির। যাঁরা যোগী বা ধ্যানী তাঁরা ঐ কেন্দ্রকে আশ্রয় করে চরাচরের মধ্যস্থিত স্থির ধ্রুব অচল আশ্রয় পেতে চান। আর যাঁরা শিল্পী কবি, তাঁদের নাম ও রূপ নিয়েই কারবার। তাঁরা সেই চক্রের পরিধির দিকে দেখচেন। সেখানে ক্রমাগতই গতি ও রূপবৈচিত্র্য। আসল কথা কি জানেন, আত্মারূপে যা কেন্দ্রগত ও স্থির তাই প্রাণরূপে সর্বত্র ও সর্বদা কম্পিত ও ধাবিত। যাকিছু সবই প্রাণে এজিত অর্থাৎ কম্পিত—ধাবিত।

(ক)

আমাদের দেশের মতেও পুরুষ বা আত্মা ক্রমাগতই চলচে। হংসের মতোই সে লোক হতে লোকান্তরে যাত্রা করে চলেচে। তার মন্ত্র—

'চরৈবেতি'

অর্থাৎ এগিয়ে চলো। আমাদের দেশে লোকে মনীষী সাধক ও গুরুদের কাছে চেয়েছেন

'গতি দাও, মুক্তি দাও'। মধ্যযুগের সাধকেরাও সবাই গতিরই জয়গান করেছেন। বৌদ্ধাদি দর্শনে বস্তুমাত্রই গতিতে আপন আপন রূপ নিচ্চে ও তার পরক্ষণেই সেই রূপটি হারিয়ে আবার নব নব রূপ নিয়ে চলেছে। সব নাম ও রূপই নৃত্যের ও গতির ক্ষণিক লীলা মাত্র। কোনো বস্তুরই কোনো স্থির-সত্তা নেই। জীবেরও গতির বিশ্রাম নেই, প্রকৃতিরও নেই।

(ক)

বের্গস'র মতে যে সত্তা (reality) নিত্য-প্রকাশমান তাই সত্য। যদি গতি হারিয়ে সে রুদ্ধ (static) হয়ে যায় তবে তার আর কোনো মূল্য নেই। তখন সে তুচ্ছতা হতেও অধম, সে সত্য-ভ্রষ্ট। এই কথা আমাদের অতি পুরাতন সত্য—

'প্রাণ এজতি' ও 'চরৈবেতি'।

সব কিছু ক্রমাগত চলে বলেই তো 'জগৎ', সরে বলেই 'সংসার'। জগৎ-সংসার ছাড়া তো কিছুই নেই।

(ক)

'বলাকা' গতিরই কাব্য। এই সমন্ধে আমার 'ফাল্গুনী' নাটকেও আমি বিশ্বগতিকে আমার প্রণতি জানিয়েছি। প্রকৃতিতে ও মানবে যে চিরপ্রবহমান জীবন-লীলা, আমি আমার নানা রচনায় তারই বার্তা দিয়েছি।

'ডাকঘরে'ও আমার সেই কথা। 'ডাকঘরে' গৃহসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ ব্যথিত মানব-আত্মার কান্না। অমল চিরতরুণ আত্মা। সে চায় মুক্তি। প্রবীণ (prudent) মাধব তাকে চায় প্রাচীর গেঁথে আপনার করে ধরে রাখতে। বৈদ্য তার দরজা বন্ধ করে দেয়। মোড়ল এসে তাকে শাসায়। কিন্তু তার নীড়রুদ্ধ গগন-ব্যাকুল মানস-বিহঙ্গ কেবল পাখা ছটফটিয়ে মরে। অবশেষে বিশ্ববিধান এসে তার দরজা খুলে দেয়। মৃত্যু এসে তাকে মুক্তি দেয়। মৃত্যুর মতো মুক্তিদাতা আর কেউ তো নেই।

যত বড় বাঁধনওয়ালাই হোক এই মুক্তিদাতাকে তো কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। যে মৃত্যু-ভয় দেখিয়ে সকলকে সে বাঁধতে চায় সেই মৃত্যুই তো এসে দেয় সকলকে মুক্তি। বন্ধ আত্মার সকল বন্ধনের অবসান তো মৃত্যুতে। বন্ধ ও অবরুদ্ধদের পক্ষে এত বড় মুক্তিদাতা তো আর নেই। এই মুক্তির অধিকার থেকে কে কাকে বঞ্চিত করতে পারে?

(ক)

বিজ্ঞান বলেন, প্রাণ এবং অপ্রাণ একই সত্যের বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন রূপ। উপনিষদও বলচেন, জগতে যা কিছু সবই প্রাণে কম্পিত।

বিজ্ঞানেও দেখচি Radio-activity গতিশীলতা। এই নিত্যগতি অসীমেরই গতিশীলতার প্রকাশ। অণু-পরমাণু সবই নিরন্তর বেগে চলেছে। Nucleus-এর চতুর্দিকে electronগুলি সৌর-জগতের মত নিরন্তর আবর্তিত। এদেরও অসীম প্রতিষ্ঠাভূমি (background) আছে। আমাদের গতির অসীম প্রতিষ্ঠা (infinite background) আছে, অথচ আমাদের ব্যক্তিত্বের ও জ্ঞানের অসীম ভিত্তিভূমি নেই—এ হতেই পারে না।

(ক)

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ২।৩।৩

আমার বাল্যকাল হতেই আমি গতির উপাসক। আমরা জন্মান্তরবাদী। এদেশে এই গতির ইঙ্গিতই সর্বত্র। মৃত্যু আমাদের শাশ্বত গতিপথের দ্বার খুলে দেয়। যে চলতে চায় না তাকেও মৃত্যু লোকলোকান্তরে ঠেলে নিয়ে যায়। জন্মান্তরবাদী এমন দেশে মানুষ কেন জাতিসম্প্রদায় প্রভৃতি কৃত্রিম বাঁধনে বন্ধ হতে চায় তাই ভাবি। জন্মজন্মান্তরে কত কত জাতি কত কত ধর্ম কত কত দেশ দেখে এসেচি; আরও কত দেখবো। তবে কেন এই সংকীর্ণতা? আমার সর্বজাতীয়তারও মূল এখানেই। কারণ কত দেশ কত জাতির মধ্য দিয়ে আমরা এসেচি ও কত দেশ ও জাতির মধ্য দিয়ে আমাদের ভবিষ্যতে যেতে হবে। কেউ তো আমাদের পর নয়, কেউ তো শত্রু নয়।

ভাল করে ভেবে দেখলে এই জন্মান্তরবাদ বুদ্ধদেবের মত সর্বজীবে মৈত্রী না হয়ে যায় না। গতির মত মুক্তিদাতা আর নেই।

আমার রক্তে সেই গতির ডাক আছে।.........

(ক)

মৃত্যুও একটা বিরাট মুক্তির দ্বার। এই কথা আমি বার বার বলেচি। যাকে সবাই বন্ধ করে রাখতে চায় তাকেও মৃত্যু এসে অন্তত একদিন মুক্ত করে দেবেই।

(ক)

সীমা যে একটা কিছু হয়ে আপনাকে ব্যক্ত করতে পারে এই হওয়াটাই একটা পরম আনন্দ। যেই সে ব্যক্ত হল অমনি তার গতি হল, বেগ হল, প্রকাশ হল, চরাচর তার সেবায় লেগে গেল। তখন তাকে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য আলো দেয়, মেঘ জল দেয়, বায়ু বীজন করে, সম্মুখে এগিয়ে যাবার জন্য মৃত্যু এসে তার দ্বার খুলে দেয়।

(ক)

ভারতের মনীষীরাও তো স্বীকার করেন এক এক লোকে যখন জীর্ণতা ও Convention এসে ব্যক্তি-বিশেষকে বা জীবকে চেপে মারতে চায়—তখন ভগবানই মৃত্যুরূপে তার দ্বার মুক্ত করে তাকে লোকান্তরে নবজীবনের অধিকার দিতে এগিয়ে নিয়ে যান। এরই নাম জন্ম-জন্মান্তর।

(ক)

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ২।৩।১৪

বিশ্বে সুন্দর বিরাজমান, আমার অন্তরেও সুন্দর আছেন। আমাদের কামনা মত্ত হয়ে তাঁকে আবৃত আচ্ছন্ন করে। এই কামনার পর্দাটুকু সরালে সুন্দর আপনি দেখা দেন। তাঁকে বাইরে থেকে আনতে হয় না। কঠ-উপনিষৎ বলেন,—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামাঃ।

তখনই আমরা সেই পূর্ণকে উপলব্ধি করি। সেই ঈশই-আপনার অপরূপ সৌন্দর্যে

সকলকে চালাচ্ছেন। সেই সৌন্দর্যে সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আমাদের কামনা বাধা হওয়ায় আমরা তা দেখতে অক্ষম। উপনিষৎ বলেন—

মা গৃধঃ, মা প্রমদঃ।

লোভ ছাড় কামনা ছাড়, প্রমত্ত হোয়ো না। এই কামনাতেই আমরা প্রমত্ত হয়ে নিজের অসুন্দরকে দিয়ে বিশ্বের ও অন্তরের সুন্দরকে আঘাত করি, অপমান করি। এই আঘাত করে কারা? যারা পথের প্রমোদে মত্ত হয়ে নিজের সুকুমার চেতনাকে হারিয়েছে, তারা অচেতন (heedless) অন্ধ। পথের দুধারে সুন্দর সুকুমার যেসব ফুল ফুটে থাকে এই অচেতনেরা তা পথের ধূলায় চরণে বিদলিত করে চলে। জীবনে বিরাজিত সুন্দরকে ও সংসারের সব সুন্দরকে এইসব কুৎসিতের দল উপেক্ষা, অপমান ও আঘাত করে।

(ক)

মহানারায়ণোপনিষৎ

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ। ১০

বেদে সত্যের যে মহনীয় নাম **'ঋত'** তা'তো **'ঋ'** ধাতু হতেই নিষ্পন্ন। 'ঋ' অর্থই তো গতি। উপনিষৎ বলেচেন, তপস্যাই **ঋত**, তপস্যাই সত্য।

(ক)

মুণ্ডকোপনিষৎ

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ২।২।৭

আনন্দ দিয়ে দেখাই হল কাব্য। আনন্দই তো সত্যের সোজা (positive) দিক। আনন্দের এই সহজ ঘোষণা তো দার্শনিক মতবাদমাত্র (speculation) নয়।

(ক)

.........সকল সভ্যতার কেন্দ্র এই মহান্ পুরুষ নিছক নিষ্ক্রিয় নেতিবাচক গ্রহণকারী সত্তা ন'ন—'আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যৎ বিভাতি'। তিনি আনন্দ, সকল রূপের মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে সকল সৃষ্টি হয়।

(May 1917-এ প্রকাশিত Personality গ্রন্থের অন্তর্গত
The Second Birth. অনুবাদগ্রন্থ ব্যক্তিত্ব; অনুবাদ
করিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

একাত্মপ্রত্যয়সারং.........স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ॥ ৭

যেখানে স্বার্থের বাইরে, প্রয়োজনের বাইরে মানুষের বিশেষ-কোনো বাস্তব লাভ-ক্ষতির বাইরে কোনো একটি একের পূর্ণতা হৃদয়ে অনুভব করতে পারি সেখানে

আমাদের বিশুদ্ধ আনন্দ। জ্ঞানের মহলেও তার পরিচয় পেয়েচি, দেখেচি টুক্‌রো টুক্‌রো তথ্য মনের পক্ষে বোঝা, যেই কোনো-একটিমাত্র তত্ত্বে সেই বিচ্ছিন্ন বহু ধরা দেয় অম্‌নি আমাদের বুদ্ধি আনন্দিত হয়, বলে, পেয়েচি সত্যকে। তাই আমরা জানি, ঐক্যই সত্যের রূপ, আর আনন্দই তার রস।

অধিকাংশ মানুষকেই আমরা বহুর ভিড়ের ভিতরে দেখি, বিপুল অনেকের মধ্যে তারা অনির্দ্দিষ্ট। যে-মানুষকে ভালোবাসি, সাধারণ অনেকের মাঝখানে সে বিশেষ এক। এই নিবিড় ঐক্যের বোধেই বন্ধু আমার পক্ষে হাজার লক্ষ অবন্ধুর চেয়ে সত্যতর। বন্ধুকে যেমন বিশেষ একজন ক'রে দেখ্‌লুম, বিশ্বের অন্তরতম এককে যদি তেম্‌নি স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে পাই তাহলে বুঝ্‌তে পারি সেই সত্য আনন্দময়। আমার আত্মার মধ্যে একের উপলব্ধি যদি তেমনি সত্য ক'রে প্রকাশ পায় তাহলে জীবনের সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে কোথাও আমার আনন্দের বিচ্ছেদ ঘটে না। যতক্ষণ সেই উপলব্ধি আমাদের না হয় ততক্ষণ আমাদের চৈতন্য বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বিচ্ছিন্ন। যখন সেই উপলব্ধিতে এসে পৌঁছই আমাদের চৈতন্য তখন অখণ্ডভাবে সেই সৃষ্টিসঙ্গীতেরই অঙ্গ হয়ে ওঠে। তখন সে শুধুমাত্র জানে না, শুধুমাত্র করে না, সমস্তের সঙ্গে সুরে বেজে ওঠে।

(খ)

এই ঐক্যটি বস্তুর একত্র হওয়ার মধ্যে নয়, এ যে একটি অনির্বচনীয় অদৃশ্য সম্বন্ধের রহস্য। ফুলের মধ্যে যে-ঐক্য দেখে আমরা আনন্দ পাই, সে তাহার বস্তুপিণ্ডে নেই, সে তার গভীর অন্তর্নিহিত এমন একটি সত্যের মধ্যে যা সমস্ত বিশ্বভুবনে একের সঙ্গে আরকে নিগূঢ় সামঞ্জস্যে ধারণ ক'রে আছে। এই সম্বন্ধের সত্য মানুষকে আনন্দ দেয়, মানুষকেও সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করে।

(খ)

শান্তং শিবমদ্বৈতং ৭

সৃষ্টি অর্থই গতি। তাতেই ভগবানের অনুভূতি। এতেই তিনি আপনাকে প্রকাশিত করচেন, নইলে কোথায় তাঁর প্রকাশ? তাঁর প্রকাশের মাহাত্ম্যেই সব গতিকে মনে হচ্ছে শান্ত। এই যে গ্রহচন্দ্রতারার এত প্রচণ্ড গতি, সবই মনে হয় শান্ত। গতির মধ্যেই এই শান্তির বোধ। উপনিষদের 'শান্তম্‌'-এর মর্ম এইখানে।

সর্বচরাচর নিরন্তর চলেছে সত্য, কিন্তু সেই গতির উপরে বিরাজমান এক অপরূপ সংগতি (harmony)। তা-ই তো পরমত্ব (perfection)। এই পরমতাই সব গতিকে অর্থ দিচ্চে ও তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করচে। এই গতির মধ্যেই শান্তি। তাতে কোনো বিরোধ নেই।

(ক)

শান্তি সত্য, শিব সত্য, সেই চিরন্তন একই সত্য।

(ক)

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্বম্‌।
পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি॥ ১।৭

মানুষের দুই হাত, দুই পা; তার সঙ্গে মাথা এসে পাঁচ অঙ্গ বা বিষম ছন্দ হোলো। তাই মহানারায়ণ উপনিষৎ বল্লেন—ছন্দাংসি অঙ্গেষু আশ্রিতানি। অথর্বের মধ্যেও সেই কথাই দেখা যাচ্চে—পাঁচের ছন্দেই পঞ্চাঙ্গ মানুষ হয়েছে।

বৃহদারণ্যকেও দেখতে পাই—পঞ্চাঙ্গ পুরুষ, সবই পঞ্চাঙ্গ।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বল্লেন—সবই পঞ্চাঙ্গ। পঞ্চাঙ্গ দিয়েই পঞ্চাঙ্গ পায়। অর্থাৎ মানবের বিষম ছন্দ দিয়েই বিষম বিশ্বছন্দকে পাওয়া যায়।

এই ছন্দের অমৃতবন্যাতেই সব কিছু প্লাবিত। চরাচরে কোথাও কোনো শূন্যতা নেই, সর্বত্রই এই অমৃত-প্রবাহ।

(ক)

স তপোঽতপ্যত। ২।৬

আমি গান রচনা করি। সেই গান তো আমারই মধ্যে ছিল। তবে তা কেন বাইরে সৃষ্টি করি? যতক্ষণ সে আমার মধ্যে ছিল ততক্ষণ তার থাকা না থাকা আমার পক্ষে সমান। আমার ভিতর হতে তাকে হারিয়ে আমার বাইরে তাকে কথায় ও সুরে যখন একত্র করে পেলাম তখনই তাকে নতুন করে পেলাম।

এই রকম করে হারিয়ে পাওয়ার সাধনার অনেক দুঃখও আছে। তবু সেই দুঃখের সাধনা ছাড়া গতি নেই। বিধাতাকেও বিশ্বসৃষ্টির জন্য কঠোর তপস্যা করতে হয়েছে।

তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ ২।৬
রসো বৈ সঃ। ২।৭

ভগবান্‌ রসস্বরূপ, তাই সর্ব চিত্তে যুক্ত থাকবার জন্য তিনি সবার মধ্যে প্রবেশ করে রয়েছেন।

(ক)

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌। ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ২।৯

অনন্তকে ত জ্ঞানে কুলিয়ে ওঠে না, ঋষি তাই বলেন, তাঁকে না পেয়ে মন ফিরে আসে। সেই অনন্তের সমস্ত রহস্য বাদ দিয়ে তাঁকে সম্প্রদায়ের ঈশ্বর, শাস্ত্রবাক্যের ঈশ্বর, কবুলতিপত্রে দশে মিলে দস্তখতের দ্বারা স্বীকার ক'রে নেওয়া হাটে বাটে গোলে-হরিবোলের ঈশ্বর ক'রে নিই। সেই বরদাতা, সেই ত্রাণকর্ত্তা. সেই সুনির্দ্দিষ্ট মতের ফ্রেম-দিয়ে বাঁধানো ঈশ্বরের ধারণা একেবারে পাথরের মত শক্ত; তাকে মুঠোয়

ক'রে নিয়ে সাম্প্রদায়িক ট্যাঁকে গ'ুজে রাখা চলে, পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করা সহজ হয়। আমাদের মরমিয়াদের ঈশ্বর কোনো একটি পুণ্যাভিমানী দলবিশেষের সরকারী ঈশ্বর নন, তিনি প্রাণেশ্বর।

কেননা, ঋষি বলেচেন, জ্ঞানে তাঁকে পাওয়া যায় না, আনন্দেই তাঁকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ হৃদয় যখন অনন্তকে স্পর্শ করে তখন হৃদয়মন তাঁকে অমৃত ব'লে বোধ করে, আর এই নিবিড় রসবোধেই সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়। শেলি সেই বোধের গানই গেয়েছেন, মরমিয়া কবিদের কণ্ঠে সেই বোধেরই গান। যা রহস্য, জ্ঞানের কাছে তা নিছক অন্ধকার, তা একেবারে নেই বললেই হয়। কিন্তু যা রহস্য, হৃদয়ের কাছে তারই আনন্দ গভীর। সেই আনন্দের দ্বারাই হৃদয় অসীমতার সত্যকে প্রত্যক্ষ চিন্‌তে পারে। তখন সে কোনো বাঁধা রীতি মানে না, কোনো মধ্যস্থের ঘটকালিকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

অমৃতের রসবোধ যার হয় নি, সে-ই মানে ভয়কে, ক্ষুধাকে, ক্ষমতাকে। সে এমন একটি দেবতাকে মানে, যিনি বর দেন, নয় দণ্ড দেন। যাঁর দক্ষিণে স্বর্গ, বামে নরক। যিনি দূরে ব'সে কড়া হুকুমে বিশ্বশাসন করেন। যাঁকে পশুবলি দিয়ে খুসি করা চলে, যাঁর গৌরব প্রচার করবার জন্যে পৃথিবীকে রক্তে ভাসিয়ে দিতে হয়, যাঁর নাম ক'রে মানবসমাজে এত ভেদবিচ্ছেদ, পরস্পরের প্রতি এত অবজ্ঞা, এত অত্যাচার।

(খ)

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। ৩।২

আধি-ভৌতিক জগতেও অসীম আছেন। তাই শ্রুতিতে দেখি, 'অন্নং ব্রহ্ম'।

(ক)

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আপন আপন দর্শন আছে। এমন কি যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়ী (materialist), তারও দর্শন আছে। নইলে সে তার মতামত যুক্তি দিয়ে অন্যকে বোঝাতে যাবে কেন? তার 'অন্ন-ব্রহ্ম' মতবাদ যদি তার নিজস্ব Philosophyর উপর প্রতিষ্ঠিত ও সংযুক্ত হয় তবে তাও আর উপেক্ষণীয় নয়। বিশ্ববিধানের সঙ্গে যুক্ত হলে যে-কোনো মতবাদেরই সংকীর্ণতা দোষ কেটে যায়। তখন সে ক্রমশঃ পবিত্র ও শুচি হয়ে ওঠে।

(ক)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্‌
বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ৪।১

প্রাচীন ভারত একদিন যখন বিধাতার কাছে বর চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন— "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত"—"য একঃ অবর্ণঃ"—যিনি এক, যিনি বর্ণ-ভেদের

অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।........."বুদ্ধ্যা শুভয়া" শুভবুদ্ধির দ্বারাই মিলতে চেয়েছিলেন, অন্ধতার লম্বা শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন বিধানের কঠিন কানমলার দ্বারা নয়।..............

.........ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে, শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, **চিন্তা দিয়ে কর্ম্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দিয়ে,**—"য একঃ অবর্ণঃ" যিনি এক এবং সকল বর্ণ-ভেদের অতীত, "স ন বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" তিনিই **আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন॥**

(সমস্যা, কালান্তর, ১৩৩০)

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব ১।৪।৩

.........সীমা-অসীম দুইই আছে। জীব ব্রহ্মে লয় হয়ে যায় একথা যাঁরা মানেন না তাঁরাও রাধাকৃষ্ণ যুগল তত্ত্ব মানেন। এই যুগলের একটিকেও বাদ দিলে চলে না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে এই দুইই আছে। রাধা ছাড়া কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ ছাড়া রাধার অর্থ কি? একটি আর একটিকে পূর্ণ করছে (complementary)। প্রতি আত্মাতেই সীমা-অসীমের যুগললীলা রয়েছে। এই ভাবটাকে আমি প্রকাশও করেছি—

অসীম সে চাহে সীমার
নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের
মাঝে হারা।

সীমাও তো উপেক্ষণীয় নয়। তার মধ্য দিয়েই অসীম আপনাকে প্রকাশ করতে পারেন, নইলে অসীমের তো প্রকাশই হতে পারে না।

এর মধ্যে হয়তো একটা তত্ত্ব (Philosophy) আছে। অনেক সময় সেই তত্ত্ব জানি না বা বুঝি না। তাতে কিছু আসে যায় না। তত্ত্ব না বুঝলেও তার আনন্দ আমরা পেতে পারি।

(ক)

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ৬।৩।৬

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুয়েরই মধ্যে এক রূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সারমন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী : ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

এক দিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর-এক দিকে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শাক্তি বিকীর্ণ করছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে, তাঁকে তাঁর এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।............

.........যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্বত্রই ব্যাপকভাবে দেখতে পাবার কত সুখ, যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপরসগীতগন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার কত আনন্দ!

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্ছে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা.........

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩২৬)

কোনো কোনো লোক, ঈশ্বরকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এক একটি মন্ত্রকে আশ্রয় করে থাকেন—রামমোহন রায় সমস্ত চিত্তক্ষোভ থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করবার জন্য গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করেছিলেন—যখনি তাঁর মন কোনো কারণে চঞ্চল হত তখনি তিনি ঐ মন্ত্র মনে মনে স্মরণ করতেন এবং ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত বন্ধন এড়িয়ে মুক্তিক্ষেত্রে গিয়ে উপনীত হতেন। **আমিও উপনিষদের কোনো কোনো শ্লোককে এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি।** এই রকম এক-একটি মন্ত্র তুফানের সময় হালের মত কাজ করে।

(চিঠিপত্র, সপ্তম খণ্ড, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫)

অনুক্রমণিকা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০	২	আত্মহনো	আত্মহনো
৩০	১৪	আত্মহনো	আত্মহনো
৩১	২০	ক্ষণমুহূর্ত্তের	ক্ষণ মুহূর্ত্তের
৪৫	২৩	ভাবুকতা পবিত্রতা	ভাবুকতা ও পবিত্রতা
৪৬	৯	পরিবহণ	পরিহরণ
৫২	৭	সঙ্গীতহীন	সংগীতহীন
৫৪	৭	সে	যে
৫৯	২৮	শোকে	শ্লোকে
৬৮	১৪	ঘায়ুরনিলমৃতমেদং	বায়ুরনিলমমৃতমথেদং
১২৭	২০	প্রান্তরে	প্রান্তে
১৮৯	৬	প্রাচ্ছন্ন	প্রচ্ছন্ন
১৯৬	১৪	কেন না	কেননা
১৯৭	২২	হ্যেবানন্দায়তি	হ্যেবানন্দয়াতি
২০৯	২	নিজর	নিজের
২০৯	২	দ্বারতেই	দ্বারাতেই
২১৭	৩৬	নিশ্বের	বিশ্বের
২২১	শীর্ষদেশ	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	ঐতরেয়োপনিষৎ
২২৩	শীর্ষদেশ	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	ঐতরেয়োপনিষৎ
২২৪	২১	আবিরাবীর্য	আঁবিরাবীর্ম
২২৪	২৩	আবিরাবীর্য	আঁবিরাবীর্ম
২২৪	৩৯	আবিরাবীর্য	আঁবিরাবীর্ম
২৩১	২২	স্বলোকে	স্বর্লোকে
২৩৭	২৯	মন্দিরর	মন্দিরের
২৪১	৬	শোনেন নি	শোনাননি
২৪১	৯	অন্ধকারে	অন্ধকারের
২৪১	১৬	সূর্যের্	সূর্যের
২৫২	৬	বিচৈতি	বি চৈতি
২৫৫	২৩	Apperdix	Appendix
২৫৬	২৬	বর্ত্তর্মান	বর্ত্তমান
২৫৬	৩৩	সংযুযক্ত	সংযুনক্ত
২৫৮	৩৩	যে জ্ঞান	সে জ্ঞান,
২৭৬	১৪	তাঁহারা	তাঁহারা বলেন—
২৭৯	২৯	দেবো	দেবা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮১	২৬	ত্রিপাসদ্যামৃতং	ত্রিপাদস্যামৃতং
২৮৩	২	বহুবং	বহুবহং
২৮৩	৫	সোম্যাহরোপত্বা	সোম্যাহরোপ ত্বা
২৮৭	২	ভূমাত্বেব	ভূমা ত্বেব
২৮৯	২৯	যে-সবল	যে-সকল
২৯৭	২০	তত	ততঃ
২৯৮	২৫	কস্মিন	কস্মিন্
৩১২	১৯	সম্পর্ণ	সম্পূর্ণ
৩১৬	৬	নৈবে	নৈব
৩২২	৩১	আন্দরূপমমৃতম্	আনন্দরূপমমৃতম্
৩৪৫	৯	গতি রেষাস্য	গতিরেষাস্য
৩৬২	১৮	গৌতম	গোতম
৩৬৬	৩২	দল বল্লেন	দল যাকে বল্লেন
৩৬৮	৩৪	তীত্বা	তীর্ত্বা
৩৬৮	৩৪	সম্ভূত্যামশ্নুতে	সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে